প্রচ্ছদপট

অঙ্কণ — পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ — ন্যাশনাল হাফটোন

GALPA SAMAGRA Vol-II

A Collection of short stories by Narayan Gangopadhyay Vol II
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

ISBN 81-7293-576-5

শব্দগ্রন্থন ঃ

পি. বি. প্রিন্টার্স, ৭২/১ শিশির ভাদুড়ি সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

গল্পসমগ্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ভোগবতী

এ পারে বাঙলা, ওপারে মানভূম। পাথর মেশানো রাঢ়ের অনুর্বর কঠিন বিস্তারের ওপর দিয়ে রাঙা সুরকির পথ। মাঝে মাঝে শালের ঘন-বিন্যাস। হিমালয়ের বুকে শালবীথির যে সমুন্নত উদ্ধত মহিমা—এরা যেন তাদের সংক্ষিপ্ত হাস্যকর সংস্করণ। আকন্দের ঝোপের মতো রাশি রাশি পলাশও মাঝে মাঝে বিকীর্ণ হয়ে আছে, ওই পলাশবন যে বসন্তে রাঙা ফুলের চেলী পরে নিজের বিন্দুতম শ্যামলিমাকেও নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে—এটা যেন কেমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এ দেশটার রীতিই এই। যেন জগৎটাকে সৃষ্টি করবার আগে বিশ্বকর্মা এখানে তাদের ছোটখাটো কতকগুলো মডেল তৈরি করে নিয়েছিলেন। অথবা যেন পৃথিবীর বড়সড় আকারের একটা রিলিফ ম্যাপ। নদী আছে, কিন্তু মোটা মোটা বালিরদানা আর ছোট বড় পাথরের টুকরোর ভেতর দিয়ে তাদের জলের ধারাটা একফালি অভ্রের পাত বলে ভুল হতে পারে। আর আছে পাহাড়। শুধু রাত্রির অন্ধকারে যেখানে বার্নপুরের চিমনির আভায় কালো দিগন্তটা লাল হয়ে থাকে, সেদিকটা ছাড়া আর তিনদিকেই চলেছে পাহাড়ের অনন্ত শ্রেণী।

একদিকের দূরান্ত রেখায় পঞ্চকোট, অন্যদিকের চক্রবালে শুশুনিয়া পাহাড়ের অলক্ষ্যপ্রায় ছায়ামূর্তি। মাঝখানে বিহারীনাথ পাহাড়। তা ছাড়া ছোট বড় অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা পাহাড়ের কোনো সীমাসংখ্যাই নেই। কোনোটায় পলাশের জঙ্গল, কোনোটা একেবারে ন্যাড়া। কোনোটা নিতান্তই জংলা—শতমূলী সহস্রমূলী থেকে সুরু করে দু'হাত উঁচু আবলুশ গাছ আর নলবনের মতো সরু সরু পাহাড়ী বাঁশ—অথবা বাঁশের ক্যারিকেচার। তাতে কখনো কখনো বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় আর মাঝে মাঝে দেখা হয় শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গে। স্বল্পবিস্তীর্ণ একটা ব্যাসার্ধের ভেতরে সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয়।

বহু দূরে দূরে ভদ্রলোকের গ্রাম। আর সাঁওতাল—সব সাঁওতাল। চাষী সাঁওতাল, খেড়ে সাঁওতাল। চাষী সাঁওতালরা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি এসে বাসা বেঁধেছে, চাষ করে, সবজি লাগায়। জামা কাপড় পরে তারা, কখনো কখনো কাঁচা চামড়ার ফাটা ফাটা মোটা জুতোও। আর খেড়ে সাঁওতালের কোমরে এখনো লেংটি, কানে ফুল গোঁজা, মাথায় বাবরী, হাতে কাঁড় বাঁশ। ভাতের মহিমা উপলব্ধি করে তারা এখনো পুরোপুরি 'ভেতো' হয়ে উঠতে পারেনি, বনে জঙ্গলে প্রচুর প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এদের মাঝামাঝি যারা, তারা কাঠুরে। ভদ্রলোক জমিদার বাবুদের পাহাড়ে তারা বিনা অনুমতিতে কাঠ কাটে। এসব পাহাড়ে তাদের জন্মগত অধিকার। দশ মাইল দূরের জমিদার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের বলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এ সমস্ত পাহাড়ের ভোগ দখলের অধিকারী, তাদের স্থূল মস্তিষ্কে সেটা সহজে প্রবেশ করে না।

দূরের থেকে যে পাহাড়টাকে কাল-বৈশাখী মেঘের মতো নিবিড় নীলবর্ণ বলে মনে

হয় ওর নাম ভৈরব পাহাড়। ওর সর্বাঙ্গে জঙ্গল, নিবিড় জঙ্গল। মাটি আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে যেন প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। কিন্তু ছোট পাহাড়টির মতো গাছগুলিও ছোট ছোট—জ্বালানি ছাড়া কোনো কাজেই তারা লাগে না।

এই পাহাড়ে কাঠ কাটতে এল শুকলাল আর সোনা।

ভোর হয়ে আসছে। বার্নপুরের আকাশে রক্তাভা ফিকে হয়ে আসছে—আর রাঙা রঙ ধরছে শুশুনিয়ার ছায়ামূর্তির আশেপাশে। হালকা শিশিরে ভেজা পাহাড়ী গাছগাছড়া আর রাঢ়ের রাঙা মাটির বুক থেকে উঠছে প্রতিদিনের পরিচিত লঘু একটা মিষ্টি গন্ধ।

ঝাঁকড়া তিন-চারটে মহুয়া গাছের তলা থেকে এখনো রাত্রির অন্ধকার সরে যায়নি। সেটাকে পাশ কাটিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল শুকলাল, পেছন থেকে সোনা তার হাত চেপে ধরলে।

—এই মোড়লের পো, বাবাঠাকুরকে প্রণাম করলি নে?

থেমে দাঁড়িয়ে শুকলাল হাসল।

—ঠাকুরের ঘুম এখনো ভাঙেনি। জাগালে রাগ করবে। দেরি করিসনি সোনা, চল্।

সোনা ভ্রূকুটি করলেঃ মস্করা করিস নে খালভরা। ঠাকুরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিস, পাহাড়ে তোকে বাঘে ধরবে দেখিস। আয়, প্রণাম করে যা ঠাকুরকে।

নিজের পেশল শরীরটার দিকে একবার তাকালো শুকলাল। পলিমাটির দুলাল নয়, পাথুরে দেশের পাথরে তৈরি দামাল ছেলে। বললে, বাঘের বরাত মন্দ না হলে বাঘ আমাকে ধরতে আসবে না।

—থাক, থাক—খুব মরদ হয়েছিস—গলার স্বরে অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করলেও সেটা ফুটল না। কালো সাঁওতাল মেয়ের কালো চোখে আনন্দিত গর্বের আলোই ঝিলিক দিয়ে গেল। সত্যিই অহংকার করবার অধিকার আছে শুকলালের। তার কুড়ুলের ঘায়ে শুধু গাছগাছালিই নয়, শক্ত পাথর পর্যন্ত গুঁড়ো হয়ে যায়। শুকলালের চওড়া বুকের ওপর খেলা করে গেল সোনার সানুরাগ সস্নেহ দৃষ্টি।

আর তেমনি সপ্রেম গভীর চোখে সোনার ওপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শুকলাল। শুশুনিয়া পাহাড়ের আকাশে রঙের সমুদ্রে ডুব দিয়ে রক্ত-পদ্মের মতো সবে ফুটে উঠেছে প্রথম সূর্য। সোনার যৌবনোজ্জ্বল দেহেও তার আভাস এসে পড়েছে—যেন তারও ভেতরে কোথায় পাপড়ি মেলেছে ভোরের পদ্ম। হাওয়ায় কাঁপা পদ্মপাতার শ্যামলতা তার ভেতরেও যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে।

চকিতে চোখ নামিয়ে নিলে সোনা। বললে, আয়, প্রণাম করবি।

মহুয়াকুঞ্জের তলায় ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার—অবসিত রাত্রি আর ছায়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটছে এতক্ষণে। পাথরের ঠাকুরও বোধ হয় ঘুমভরা চোখ মেলে জেগে উঠেছেন, মহুয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে কালো গ্রানিটের ওপরে পড়েছে টুকরো টুকরো রঙের ফালি।

পাহাড়ের নিচে প্রতীহারী হয়ে আছেন বাবা ঠাকুর। চওড়া একখানা শিলাপট্ট—মাটির ভেতরে আধাআধি পরিমাণে সমাহিত। তার মাথার ওপর ছেনি দিয়ে কাটা একটা সিংহের আকৃতি। নিচে অশ্বারোহী একটি বীর পুরুষের মূর্তি—তার প্রসারিত হাতে খোলা একখানা সুদীর্ঘ তরবারি, বোঝা যায় কোনো দিগ্বিজয়ী রাজা নিজের শৌর্য-বীর্যকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। শিলাপট্টের গায়ে কিছু কিছু লেখাও আছে, তার আভাসমাত্র

পাওয়া যায়। বাকিটা তলিয়ে আছে মাটির নিচে—হয়তো ভবিষ্যৎকালের কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদের হাতে মুক্তির প্রতীক্ষায়।

কিন্তু এসব বোঝবার শিক্ষা-দীক্ষা নেই সরল সাঁওতালের। গাছতলায় একটা বড় পাথর দেখলেই তারা সিঁদুর মাখিয়ে পূজো করে, একটা ভাঙা মূর্তি দেখলেই থান বসিয়ে দেয় মুরগী বলি। তাই এখানকার বিস্মৃতনামা রাজা রূপান্তরিত হয়েছেন পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা ভৈরব ঠাকুরে।

ঠাকুর প্রণাম করে পাহাড়ে উঠল শুকলাল আর সোনা। কাঠুরেদের যাতায়াতে জঙ্গল ভেঙে দু-একটা সরু পথ আপনা থেকে তৈরি হয়েছে এদিকে ওদিকে—সরীসৃপ গতিতে পাহাড়ের চারদিকে পাক খেয়ে গেছে। তা ছাড়া দুর্ভেদ্য জঙ্গল—পাথরের চাঙাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাটির ভেতর থেকে রাশি রাশি বুনো গাছ আর লতার জটিলতা। কাঁটা গাছের মাথায় হাওয়ায় দুলছে বন-ধুঁদুল। মাঝে মাঝে ফুটেছে ভুঁইচাঁপা আর কাঠগোলাপ। কোথাও কোথাও বেগুনে রঙের ফুলের বাহার নিয়ে পাথরের আড়ালে আড়ালে উঁকি দিচ্ছে লজ্জাবতী। ছোট ছোট পাখি নেচে বেড়াচ্ছে এদিকে ওদিকে।

শুকনো আধ-শুকনো গাছ খুঁজে কুড়ুল চালাতে লাগল শুকলাল আর মোটা একটা গুলঞ্চের লতা দিয়ে খড়ির আঁটি বাঁধতে লাগল সোনা। ওরই এক ফাঁকে কখন দুটো ধুঁদুল সংগ্রহ করেছে সোনা, গোটা কয়েক কাঠগোলাপও সাজিয়ে নিয়েছে খোঁপায়। সংসারের কথা ভোলেনি, সেই সঙ্গে একটুখানি অঙ্গরাগও করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা গানের কলিও গুনগুন করে উঠেছে। কিন্তু আপাতত তার দিকে নজর নেই শুকলালের। বিশ্রামহীন ভাবে তার কুড়ুল চলছে, মড়মড় খটখট শব্দে ভেঙে পড়ছে গাছ আর গাছের ডাল। আর থেকে থেকে বাঁ হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলছে কপালে জমে ওঠা বড় বড় ঘামের বিন্দুগুলো।

এর মধ্যেই কখন উঠে গেছে অনেকখানি বেলা। শুশুনিয়া পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে সূর্য উঠে এসেছে আকাশের মাঝখানে। পাথর গরম হয়ে উঠেছে—চারদিক থেকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে একটা বাষ্পীয় উত্তাপ। এতক্ষণ পরে হাতের কুড়ুল নামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো শুকলাল—হাঁপাতে লাগল।

ওদিকে পিঠের বোঝাটাও বেশ ভারী হয়ে উঠেছে সোনার। রোদে টকটক করছে মুখ। দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

শুকলাল বললে, ভারী গরম।

শ্রান্ত গলায় সোনা জবাব দিলে, এখন থাক। ঝোরার কাছে চল।

ঝোরা! মনে পড়তেই যেন শান্তি আর তৃপ্তির একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি এসে সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিলে ওদের। ঝোরা। এই বিস্তীর্ণ নির্মম পাষাণের বুকের ভেতর থেকে উচ্ছলিত ফল্গুর প্রবাহ। পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা ভাঁজ পড়ে যেখানে ছোট একটা মালভূমির মতো সৃষ্টি হয়েছে—ওইখানে—ছোট অশ্বত্থ আর ছোট পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতর প্রকাণ্ড একখানা পাথরের তলা দিয়ে একটি ঝর্ণা নেমেছে এসে। এত বড় পাহাড়ে ওটা ছাড়া আর কোথাও একবিন্দু জল নেই। ওই জলটা কোথা থেকে নিঃশব্দ প্রবাহে যে বয়ে আসছে কেউ বলতে পারে না—কিন্তু মাটির তলা থেকে উৎসারিত ভোগবতীধারার মতোই ওর ঠাণ্ডা আর মিষ্টি জল কঠিন পাহাড়টার মর্মবাহী স্নেহের মতো উছলে পড়ছে।

হাতের কুডুল আর পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে পাথর বেয়ে বেয়ে ঝর্ণার পাশে এসে বসল দুজনে। চারপাশে নিবিড় ছায়া দুপুরের রোদে যেন ঝিমুচ্ছে। পাহাড়ে যে দু'চারটে বড় গাছ আছে—এখানেই যেন তারা সার বেঁধে রয়েছে। ইচ্ছে করেই ওদের গায়ে হাত দেয়নি কাঠুরেরা। রাঢ়ের আগুন-ঝরা দুপুরে পাথরের অসহ্য উত্তাপের ভেতর এখানে ওদের মরূদ্যান।

পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে নিচে যেখানে ছোট একটা গর্তের ভেতরে একটুখানি জল জমেছে, দুটো নীলকণ্ঠ পাখি পরমোল্লাসে সেখানে স্নান করছিল পাখা ঝেড়ে। মানুষের সাড়া পেয়েও তারা ভয় পেলো না, ধীরে সুস্থে তারা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের সদ্যঃস্নাত নরম পালকগুলোকে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর মিষ্টিগলায় কী একটা ডেকে উঠে লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে সোনা আর শুকলাল এসে বসেছে ছায়ার নিচে। মিঠে বাতাসে দুজনের ক্লান্তি যেন এক মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে। সোনার কাছে আরো ঘন হয়ে এসে শুকলাল বলল, দেখলি?

—কী দেখব?

—ওই পাখি দুটো।

—ওদের দেখবার কী আছে?

—এতক্ষণ ওরা এখানে এ ওকে সোহাগ করছিল—চান করছিল। তুই আমি এলাম দেখে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল।

মুখের ভঙ্গি করে সোনা বললে, যাঃ।

—হ্যাঁ—সত্যি!

—ওরা কি এসব বোঝে?

—বোঝে বইকি। সব বোঝে!

এবারে সোনা আরো কাছে ঘেঁষে এল শুকলালের। তার খোঁপা থেকে একটা ফুল তুলে নিয়ে শুকলাল খেলা করতে লাগল।

—বড় পিয়াস লেগেছে—জল খাই—

পলাশের পাতা ভেঙে নিয়ে দুটো ঠোঙা তৈরি করলে সোনা। ঠোঙা ভরে ভরে জল খেল দুজনে—ঠাণ্ডা জল—সুস্বাদু স্ফটিকের মতো জল। এই ঝোরা তাদের প্রাণ। যদি না থাকত তা হলে কোনো কাঠুরের সাধ্য ছিল না, এই পাহাড়ে এসে কাঠ কাটে। কাছাকাছি কোথাও জল নেই—শুধু এক মাইল দূরে একটা মরা নদী ছাড়া। দু' হাত বালি খুঁড়লে তা থেকে এক আঁজলা জল মিলতে পারে। নীরস অনুর্বরতার মাঝখানে এই ঝর্ণাটা একটা অপরিসীম বিস্ময়—যেন দৈবী করুণা। পাতালবাহিনী ভোগবতীর একটুখানি উদ্বেলিত স্নেহনির্যাস।

তৃপ্ত গলায় সোনা বললে, আঃ! ঠাকুরের দয়া দেখেছিস! পাথর ফুঁড়ে কেমন জল দিয়েছে?

এবারে আর ঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা করলে না শুকলাল। জলে ভিজে ভিজে সোনার একখানা ঠাণ্ডা হাত নিজের কড়া-পড়া মস্ত শক্ত মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে নিলে। গভীর স্বরে বললে, সত্যি।

—এবার উঠবি না মোড়ল? ওদিকে কাঠ আর কুড়ুল পড়ে রইল যে।

—থাক পড়ে, কেউ নেবে না। বোস, আর একটু জিরুই। যা রোদ, একটু হেলে .াক।

দুজনে চুপ করে বসে রইল। অশ্বত্থের পাতা কাঁপছে—পলাশের পাতা কাঁপছে। বেলোয়ারী চুড়ির বাজনার মতো শব্দ করে পড়ছে ঝর্ণার জল, পাতার দোলানিতে মাঝে মাঝে চিকমিকে রোদ তার ওপরে খেলা করে যাচ্ছে। একখানা পাথর থেকে আর এক খানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে হীরের গুঁড়ো। খানিক দূর গিয়ে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না—আবার কোন্ পাথরের তলা দিয়ে পাতালের ফল্গু পাতালেই ফিরে গিয়েছে হয়তো।

রোদে ঝিমঝিম করছে পাহাড়—ঝিরঝির করছে হাওয়া। পাখির ডাক আসছে, সেই নীলকণ্ঠ পাখি দুটোই হয়তো। বেলোয়ারী চুড়ির মতো শব্দ করে তেমনি বাজছে ঝর্ণার একতারা। সোনা একটা গান ধরেছে, হয়তো ঝর্ণার সঙ্গে সুর মিলিয়েই। এমন সময় একটা বিজাতীয় শব্দে পাহাড়ের দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল।

তলিয়ে গেল নীলকণ্ঠ পাখির ডাক, ঝর্ণা আর সোনার মিলিত ঐকতান। শিক্রে বাজের মতো বিশাল কালো একটা জানোয়ার আকাশে দেখা দিয়েছে। তার গর্জনে পাহাড়ের গুহা-গহ্বরগুলো একসঙ্গে গুম্ গুম্ করে উঠল—যেন সাড়া দিয়ে উঠল আকাশচারী বিশাল জন্তুটার ডাকে, গম্ভীর ক্রুদ্ধ স্বরে কী একটা প্রত্যুত্তর পাঠিয়ে দিলে একটা কুটিল জিজ্ঞাসার।

সোনা সোৎসাহে বললে, হাওয়াই জাহাজ।

শুকলাল বললে, তাই লাগছে পারা।

—আয় দেখি—

—ও আর কী দেখব। রোজই তো আসছে আজকাল. লড়াই বেধেছে কিনা।

—আয় আয় না—

ঝর্ণার পাশ থেকে বেরিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়াল ওরা। হাওয়াই জাহাজটা কোন্ খেয়ালে কে জানে ওই পাহাড়টার চারিদিকেই ঘুরে ঘুরে চক্র দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য—এত নিচে নেমে এসেছে যে ওর ভেতরের দু'-তিনটে মানুষের মাথা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে সোনা শুকলালের পেছনে সরে এল ঃ ওটা নামবে নাকি?

—কে জানে। ওদের মর্জি!

সোনা বিস্ফারিত চোখে এরোপ্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে নয়. ভয়ে। এই হাওয়াই জাহাজগুলো নাকি মানুষেরই কীর্তি। কিন্তু সোনার তা বিশ্বাস হয় না, তার আশংকা হয় ওর ভেতরে অস্বাভাবিক একটা কিছু লুকিয়ে আছে, একটা কিছু অলৌকিক এবং ভয়ংকর। ঝড়ের রাত্রে যে সব ভূত-প্রেত-পিশাচ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রচণ্ড উল্লাসে নেচে বেড়ায়, ওই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা যেন তাদেরই খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। ওটা মাটিতে নেমে এলে যে কত বড় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে ভাবতেও ওর রক্ত জল হয়ে যায়।

বিমানটা কিন্তু নামল না। বার কয়েক পাহাড়ের মাথায় ঘুরপাক খেয়ে সাঁ করে একটা তীরের মতো বার্নপুরের দিকে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। শুধু নির্মেঘ আকাশে

অনেকক্ষণ ধরে একটা ধূমপুচ্ছ দীর্ঘ রেখায় বিস্তীর্ণ হয়ে রইল—যেন ধূমকেতুর সংকেত।

দুদিন পরে পাহাড় থেকে কাঠের বোঝা নিয়ে নামবার পরে দেখা হরিকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে।

হরিকৃষ্ণ রায় এই পাহাড়ের মালিক পালবাবুর গোমস্তা। একটা হাড়-বের-করা টাট্টু ঘোড়াকে শায়েস্তা করতে করতে আসছিল। পাঁজরের ওপরে জুতোর ঠোক্কর খেতে খেতে ঘোড়াটা যেভাবে এগোচ্ছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যে কোনো সময় সে মুখ থুবড়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করবে।

ওদের দেখে হরিকৃষ্ণ রায় ঘোড়ার রাশ টানল। কিন্তু রাশ না টানলেও সেটা এমনিই থামত।

খড়ির বোঝাটার দিকে একটা তির্যক কুটিল কটাক্ষ করলে হরিকৃষ্ণ।

—বেশ মনের আনন্দে গাছ কাটছিস, অ্যাঁ?

—দুটো খড়ি নিলাম খালি—

—দুটো খড়ি! দুটো দুটো করে নিয়েই তো পাহাড়ের গাছপালাগুলো সব সাবাড় করে দিলি। বাবু ভালো মানুষ বলে করে খাচ্ছিস, কেমন?

জবাব না দিয়ে আপ্যায়নের হাসি হাসলে শুকলাল। তিরস্কারের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্নেহের সুর আছে হরিকৃষ্ণের। তার মুখটাই খারাপ, মনটা নয়।

—দাঁড়া, মিলিটারী আসছে। দু'দিনেই তোদের ঠাণ্ডা করে দেব।

—কে আসছে বাবু?

—মিলিটারী, মিলিটারী। মানে পল্টন। মাথার ওপর দিয়ে হাওয়াই জাহাজ গেল, দেখলি না? এখানে মাঠের মধ্যে আস্তানা গাড়বে—দেখিস তখন।

কথার শেষে হরিকৃষ্ণ ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক বসালো। চিড়চিড় করে লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা তিন পা দৌড়ে গেল, তারপর আবার গজেন্দ্র গতি।

সোনা পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করলে, আকাশ থেকে ওরা নেমে আসবে এখানে?

গম্ভীর চিন্তিত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালো শুকলাল। কয়েক মুহূর্ত পরে জবাব দিলে, হুঁ।

তারও পরে মাত্র একটা মাস।

সব কিছু অদলবদল হয়ে গেল। পৃথিবীর রূপ পাল্টে গেল, পাল্টে গেল সোনা আর শুকলাল। সেই বুড়ো টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালো হরিকৃষ্ণ রায়। ছড়ালে মিষ্টি কথা, ছড়ালে টাকা। চাষী সাঁওতালের লাঙ্গল খসে পড়ল, খেড়ে সাঁওতালের ধনুক আর রইল না, মরচে ধরল কাঠুরেদের কুড়ুলে। তার জায়গায় চকচকে হয়ে উঠল শাবল, ঝকঝকে হল কোদাল।

যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। সীমান্ত থেকে দুঃসংবাদ আসছে। পশ্চাদপসরণ যদি করতে হয়, তাহলে আগে থেকে তার ব্যবস্থা করা দরকার। সুতরাং এই অঞ্চলটাকে কেন্দ্র করে একটা সম্ভাব্য ডিফেন্স লাইন গড়ে তোলা হতে লাগল।

রাঙা কাঁকরের টানা পথ ঘুমিয়েছিল শাল পলাশের ছায়াকুঞ্জের ভেতরে। তাকে ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত করে এল জীপ, এল লরী। কাঠ এল, তাঁবু এল, বিচিত্র যন্ত্রপাতি এল আর

তার সঙ্গে সঙ্গে এল বিচিত্রতর মানুষ। রাঢ়ের অনুর্বর মাঠের ভেতর জাঁকিয়ে বসল কলোনী—একটা ছোট এরোড্রোম। দেশটা যেন হাজার বছরের একটানা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল যন্ত্রযুদ্ধের বাস্তবতম নির্মম পরিবেশের ভেতর।

সহজ হয়ে গেছে শুকলাল আর সোনার, অভ্যস্ত হয়ে গেছে বুনো সাঁওতাল, গৃহস্থ সাঁওতালদের। আজ আর ওদের ভেতরে জাতিগোত্রের ভেদ নেই। একটি মন্ত্র-বলে ওরা সবাই এক হয়ে গেছে—ওরা কুলি। নিজেদেরই ওরা এখন আর চিনতে পারে না। টাকা পায়, খেতে পায়—পায় বিস্কুট, টিনের দুধ আর চকোলেট। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে মাঝে মাঝে কারো কিট ব্যাগ থেকে এক-আধটা লাল রঙের বেঁটে চেহারার বিয়ারের বোতলও ওদের দিকে এগিয়ে আসে। মহুয়া আর ভাত-পচানো হাঁড়িয়ার চাইতে তার স্বাদ ঢের ভালো।

আর ওরা কাজ করে। আসানসোলের দিক থেকে বড় বড় মোটর গাড়ি যাতে নির্বিঘ্ন পাড়ি জমাতে পারে, তারই জন্যে পথ তৈরি করে ওরা। কঠিন লাল মাটিতে শাবল গাঁইতির ঘা পড়ে ঝনঝনিয়ে। মাটি সহজে আমল দিতে চায় না, তার তলায় তলায় ছোট বড় পাথর শাবলের ফলা দুমড়ে দেয়—কোদাল ছিটকে বেরিয়ে আসে। তবু মাটি কাটতেই হবে—পথকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে। শুকলালেরা ঘর্মাক্ত দেহে আসুরিক শক্তিতে মাটিকে কেটে নামায় আর সোনারা ঝুড়ি ভরে ভরে সেই মাটি নিয়ে ফেলে পথের পাশে।

মাথার ওপরে দুপুরের সূর্য জ্বলে। নিষ্ঠুর, করুণাহীন। পাহাড়ের পাথর আর পাথুরে মাটিতে তার উত্তাপের কোনো তারতম্য ঘটে না। সাঁওতালের কালো শরীর থেকে রক্ত-জল-করা সাদা ঘাম মাটিতে ঝরে পড়ে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যেন এক চুমুকে তা চোঁ করে শুষে নেয়। ওদের অনাবৃত পেশল সিক্ত পিঠগুলো রোদের আলোয় জ্বলতে থাকে, ঘাড়ে কপালে লবণের গুঁড়ো চিকমিক করে। অস্ত্রাহত পাথরের টুকরোগুলো ছিটকে ছিটকে এসে চোখে মুখে আঘাত দিয়ে যায়—অসহায় পৃথিবীর যেন ক্ষীণ সহিংস প্রতিবাদ। একটু দূরে খোলা তাঁবুর ছায়ায় টেবিল ফ্যান খুলে বসে নগ্ন-গাত্র সাদা সাহেব কাজের তদারক করে ওদের। নীল চশমা পরা চোখের ভেতর থেকে উগ্র দৃষ্টি ক্ষেপণ করে, গাল দেয়, আর একটার পর একটা বোতল শূন্য হয়ে টেবিলের নিচে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

কাজ করে সোনা—কাজ করে শুকলাল। রোদে চাঁদি পুড়ে যায়। পিপাসায় টাকরার ভেতর যেন পিন ফুটতে থাকে। সামনে একটা মরা দীঘির দুর্গন্ধ কাদাজল—সেই জল খেয়ে ওরা পিপাসা দূর করার চেষ্টা করে।

আর তখনি চোখে পরে দূরে ভৈরব পাহাড়।

মাটির বুক থেকে ঢেউয়ের মতো হঠাৎ সোজা উঠে নীলিম রেখায় দিগন্তের দিকে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। ওখানে রুক্ষ মাটি, কঠিন পাথর। কিন্তু সে মাটি—সে পাথর এ জাতের নয়। তাদের ঘিরে ঘিরে উঠেছে প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলতা— শতমূলী অনন্তমূলী থেকে শুরু করে ছোট আবলুশ আর পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়, সেখানে পাথরের আড়ালে আড়ালে বেগুনী ফুলে আকীর্ণ লজ্জাবতী সংকুচিত হয়ে আছে, সেখানে বেঁটে পলাশের ছায়ায় ফুটেছে ভুঁইচাঁপা, বাতাসে ভাসছে বন-গোলাপের গন্ধ। আর---আর---পাথর চুঁইয়ে নামছে একটি ছোট ঝর্ণা, বনের ভেতর যেন একটি সাঁওতাল মেয়ের হাতে ঠিন

ঠিন করে বেলোয়ারী চুড়ির সুর বাজছে। তার জলের রঙ জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল, তার স্বাদ দুধের মতো মিষ্টি আর তা বরফেব মতো ঠাণ্ডা। মরা দীঘির কাদাজলের মতো তা বুকটাকে পুড়িয়ে দেয় না—তার দিকে তাকালেই আর ক্লান্তি থাকে না কোথাও।

কিন্তু ভৈরব পাহাড় অনেক দূরে। এখানে মাটি কাটা হচ্ছে—পাথর জড়ানো রাঙা মাটি। পথ তৈরি হলে বড় বড় গাড়ি আসতে পারবে আসানসোল থেকে। তাই দু'হাত ভরে মিলিটারী ওদের মজুরী দিচ্ছে। এখন আর মহুয়া গাছের নিচে শিলাপটে খোদাই করা বাবাঠাকুর ওদের ইষ্ট দেবতা নয়—তার জায়গা দখল করেছে অতি চেতন এবং অতি সজাগ ওই সাদা চামড়ার লোকটা। নীল চশমার ভেতর দিয়ে শাণিত চোখে ওদের কাজ দেখছে আর বোতল টানছে!

—এই কুলি—ঠারো মৎ, ঠারো মৎ! ফুর্‌তিসে কাম চালাও—জলদি!

—বহুৎ ধূপ হুজুর—

—ওঃ—ধূপ! ধূপ! মরদ লোগ্‌কা ধূপ্‌সে কেয়া ডর হ্যায়? ডেভিল টেক্ ইউ লেজী ব্রুটস্—

গাল দেয় সাহেব, হাত ভরে পয়সা দেয়, মদ দেয়। কিন্তু কী দিতে পারে ভৈরব পাহাড়? কিছু খড়ি, কিছু ছায়া আর—আর—পাতাল ফুঁড়ে ওঠা ভোগবতীর ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। ঝর্ণার পাশে আজ আর কেউ বসে না, শুকলাল নয়, সোনা নয়, অন্য সাঁওতালেরাও নয়। সেখানে এখন নিশ্চিন্তে নীলকণ্ঠ পাখীরা স্নান করে, পাখা ঝাড়ে আর মিষ্টি গদ্‌গদ গলায় এ ওর সঙ্গে প্রেমালাপ করে হয়তো।

কিন্তু সাহেবের দেওয়া মদ ভুলিযে দেয় ভোগবতীকে। তার স্বাদ মিষ্টি নয়, তেতো, বিষের মতো তেতো। রক্ত জুড়িয়ে যায় না, জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে ভৈরব পাহাড় সরে যায় দৃষ্টির সামনে থেকে। পাগলের মতো কোদাল তুলে নেয় শুকলাল—ঝুড়ি মাথায় করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সোনা। দুপুরের রোদ আর মদের নেশা শরীরের ভেতরে একটা আসুরিক মত্ততা সৃষ্টি করে—অদম্য অন্ধবেগে যেন ওরা ভেঙে পড়তে চায়, টুকরো টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়। প্রবল বেগে অনিচ্ছুক মাটির বুকের ভেতরে কোদালের আঘাত নেমে আসে—পাথরের গায়ে ঘা লাগে—যেন শোনা যায় মাটির তলা থেকে মা বসুমতীর চাপা যন্ত্রণার গোঙানি।

তারপরে দিনান্তে শুকলাল আর সোনা ফিরে রওনা হয় ঘরের দিকে।

মদের নেশা তখন কেটে গেছে, শরীরে ঘনিয়েছে দ্বিগুণ শ্রান্তি আর অবসাদ। পা জড়িয়ে জড়িয়ে দুজনে মূর্ছিতের মতো এগিয়ে চলে। আকাশের প্রান্তরেখায় প্রথম প্রেমের মতো অপূর্ব কোমল মাদকতা নিয়ে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দিগন্তে কালো আর করুণ হয়ে আছে ভৈরব পাহাড়—যেন একটা অতিকায় ভালুক শিকারীর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে।

দু'জনে তাকায় সেদিকে। দু'জনেরই একসঙ্গে একই কথা মনে হয়।

শুকলাল বলে, সোনা, চল্, কাল থেকে আবাব আমরা কাঠ কাটব।

সোনা মাথা নাড়ে—জবাব দেয় না। অকারণে তার ইচ্ছে করতে থাকে মজুরীর টাকাগুলো পথের ওপর ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

শুকলাল বলে, মাটি কাটতে ভালো লাগে না। কাঠুরে ছিলাম—বেশ ছিলাম রে।

সোনা তেমনি নিরুত্তরে মাথা নাড়ে। অন্ধকার পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন ওটা অভিমানে ম্লান হয়ে আছে। লজ্জা হয় সোনার, অপরাধ-বোধ জাগে মনের মধ্যে। একটু পরে জবাব দেয়, ঠিক।

কিন্তু রাত্রি কাটে—দিন আসে। সন্ধ্যার সংকল্প মনে থাকে না কারো— শুকলালেরও নয়, সোনারও নয়। আবার শাবল গাঁইতির ঝকঝকে ফলা মাটির বুক কুরে কুরে বার করতে থাকে। মদের নেশা আর দুপুরের রৌদ্র বিষ হয়ে আবর্তন করে রক্তের ভেতরে। শুকলালের কোদাল পড়তে থাকে ঃ ঝন-ঝন—ঝনাৎ—

ওরা ভৈরব পাহাড়কে ভুলেছে—ভৈরব পাহাড় ওদের ভোলেনি।

তাই হয়তো মহুয়া গাছের নিচে একদিন জেগে উঠলেন শিলাপটে আঁকা বাবাঠাকুর তাঁর মাথার ওপরে গর্জন করে উঠল সিংহ—তাঁর হাতে ঝিকিয়ে উঠল তরোয়াল। নিজের শক্তির পরিচয় দিলেন।

রাস্তা অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছে—ভারী ভারী গাড়ির যাতায়াতের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। সেই গাড়িগুলোর একটা সেদিন বেসামাল হয়ে বসল।

ড্রাইভারের মদের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। হঠাৎ কোথা থেকে কী হল—হাত থেকে পিছলে গেল স্টিয়ারিং। পথের পাশে বড় একখানা বেলে পাথরের গায়ে আচমকা ধাক্কা খেল গাড়িটা, তারপর সোজা একটা ডিগবাজি খেয়ে পথের উল্‌টো দিকে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। কুলি মেয়েরা ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলছিল সেখানে।

এক মিনিটের মধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেল।

উল্‌টানো গাড়িটার সামনের চাকা দুটো আকাশের দিকে উদ্যত হয়ে বিষ্ণুচক্রের মতো ঘুরলে খানিকক্ষণ। একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মতো ঝুরো মাটি চারদিকে ছিটকে যেতে লাগল। তাঁবু থেকে সাহেবেরা ছুটে এল—চেঁচামেচি জুড়ে দিলে কুলিরা।

কিন্তু শুকলালের মুখে কথা নেই—যেন পাথর।

গাড়ির ভেতর থেকে বেরুল সাহেবের দেহ—মাথাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ঘিলু আর রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। হাত-পাগুলো বেঁকে দুমড়ে কচ্ছপাকার ধারণ করেছে সাহেব। আর গাড়ির তলা থেকে বেরুল সোনা। সোনা? না, ঠিক সোনা নয়। নাক মুখ শরীর সমস্ত চেপটে একটা অমানুষিক বীভৎসতা। রাঢ়ের তৃষ্ণার্ত রাঙামাটিও অত রক্ত শুষে খেয়ে ফেলতে পারেনি—থকথকে খানিকটা কাদার সৃষ্টি হয়েছে। কালো সাঁওতালের রক্ত যে অত লাল তা কে জানত? আশ্চর্য—ভারী আশ্চর্য, সাহেবের রক্তের রঙের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ নেই!

যুদ্ধের ক্যাজুয়ালটি। অমন কত হয়—অমন কত হয়েছে। কে তার খবর রাখে, কে তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত বোধ করে? ডিফেন্স লাইন তৈরি করতেই হবে— বৃহত্তর প্রয়োজনের জন্যে, অসুরদের নিপাত করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যে। একটা সাঁওতাল মেয়ের মৃত্যু। তার জন্যে মাটি কাটা বন্ধ থাকবে না—মাটি ফেলাও না।

*　　　*　　　*　　　*

ফিরে এল শুকলাল। এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠল না একবারও। ভৈরব পাহাড়ের দেবতা শোধ নিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ক্ষমতার, তাঁর দোর্দণ্ড দুরন্ত প্রতাপের।

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন হরিকৃষ্ণ রায়। দূরের গ্রামে আরো কুলি সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছিলেন তিনি। এ এক মন্দ ব্যবসা নয়—বেশ দু'চার পয়সা কমিশন আসছে হাতে। আনন্দে উৎসাহে বুড়ো ঘোড়াটাকে তাড়না করতেও ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি, ঘোড়াটা ইচ্ছেমতো থেমে থেমে চলছিল।

শুকলালকে দেখে কষ্ট হল হরিকৃষ্ণ রায়ের। আহা বেচারা! বৌটাকে সত্যিই বড় ভালবাসত। ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, কষ্ট করে আর কী করবি শুকলাল, কপালে যা ছিল তাই হয়েছে।

কথা বললে না শুকলাল, থেমেও দাঁড়ালো না। যেন হরিকৃষ্ণ রায়কে সে দেখতেই পায়নি। অলস শ্রান্ত গতিতে যেমন যাচ্ছিল, তেমনই চলে গেল। শুধু তার অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিটা দূরে আকাশের কোলে গিয়ে পড়তে লাগল, যেখানে লতাকুঞ্জে আচ্ছন্ন হয়ে ভৈরব পাহাড় স্তব্ধ একটা ধ্যানস্থ মূর্তি।

বহুদিন পরে মরচে-পড়া কুড়ুলটায় শান দিয়েছে শুকলাল। তারপর পাহাড়ে উঠে পাগলের মতো গাছ কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

পাহাড় তার ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে—সেও পাহাড়কে ক্ষমা করবে না। দু'হাতে সে ডাইনে বাঁয়ে যা পাচ্ছে কেটে চলেছে। পাহাড়টাকে আজ সে ন্যাড়ামুড়ো আর নির্মূল করে দেবে। একবার যাচাই করে দেখবে তার শক্তি বেশি, না দেবতার প্রতাপটাই বড়।

মাথার ওপরে তেমনি আগুন-ঝরানো সূর্য। পাহাড় তেমনি উত্তাপের বাষ্প-নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তৃষ্ণায় বুকের ভেতরটা তেমনি খাঁ খাঁ করছে। চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগল শুকলাল—কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

তখনই মনে পড়ল ভোগবতীকে। রুক্ষ পাহাড়ের বুক থেকে উচ্ছলিত স্নেহধারা। পলাশ আর পিয়াশাল গাছের নিচে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। ছোট গর্তের ভেতর যেখানে একটুখানি জল জমেছে, সেখানে পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে স্নান করছে নীলকণ্ঠ পাখি।

তার ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। বহুদিনের অনাস্বাদিত সুধার পাত্র। টলতে টলতে ঝর্ণার দিকে ছুটে এল শুকলাল। কিন্তু কোথায় ভোগবতী?

তার চিহ্নমাত্র নেই। নেই বেলোয়ারী চুড়ির হালকা ঝংকার—নেই নীলকণ্ঠ পাখি। যেখানে ঝর্ণা ছিল সেখানে কালো অজগরের মতো মোটা একটা লোহার নল—পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে সে নলটা ঘুরে চলে গেছে—কোথায় গেছে বুঝতে কষ্ট হল না শুকলালের।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো শুকলাল। ওই কালো লোহার সাপটা মাটির তলায় তার হিংস্র মাথাটা ডুবিয়ে দিয়ে তাদের ভোগবতীকে চুষে খেয়ে নিয়েছে। ভোগবতীর জল—ঠাণ্ডা মিষ্টি দুধের মতো জল তার সরীসৃপ দেহের বিষসঞ্চয়কে পুষ্ট করছে আজ। তার সেই বিষে সোনা মরে গেছে—শুকলাল মরবে, আরো অনেকে মরবে। কেউ বাঁচবে না, কেউ নয়।

কেউ বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। শুকলালের মাথার ভেতর সব কিছু যেন আতসবাজির ফুলঝুরি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। কুড়ুলটা তুলে নিলে হাতে—প্রচণ্ড শক্তিতে ঘা বসালো অজগরটার গায়ে।

ঝন ঝন করে একটা বিরাট শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠল। আর এক ঘা—আর এক ঘা। কুড়ুলের ফলা কুঁকড়ে এল কিন্তু লোহার সাপটা টোল খেল না।

—হু ইজ দেয়ার?

—পাহাড়ের মাথা থেকে প্রশ্ন। রাইফেল হাতে সেন্টি দেখা গিয়েছে।

—হু ইজ দেয়ার?

শুনতে পেল না শুকলাল—জবাব দিলে না। আরও এক ঘা—এইবার একটু দাগ পড়েছে মনে হচ্ছে। আর এক ঘা।

—স্যাবোটেজ!

পাহাড়ের মাথা থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটে এল রাইফেলের গুলি।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল শুকলাল। চেতনার শেষ বিন্দুটুকুও মুছে যাওয়ার আগে টের পেল—তার পিপাসাকাতর মুখে কে যেন জল দিচ্ছে। ভোগবতীর ধারা কি মুক্ত হয়ে গেল? কিন্তু সে জল তো এমন গরম নয়—এমন নোনতা নয়! নিজের রক্ত লেহন করতে করতে লোহার পাইপটার ওপরে মাথা রেখে স্থির হয়ে গেল শুকলাল।

মিলিটারী কলোনীতে ট্যাপের মুখে ভোগবতীর স্নিগ্ধ জল ঝরে পড়ছে শত ধারায়। সে জল তেমনি নির্মল, তেমনি স্বচ্ছ, শুকলালের রক্তের এতটুকুও লালের আভাস তাতে লাগেনি।

বন-তুলসী

টেলিগ্রাম এল বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠা হয়েছে। পত্নী এবং নন্দিনী দুইজনেই সম্পূর্ণ কুশলে আছে, সুতরাং বাবাজীবনের উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো হেতু নেই।

টেলিগ্রাম করেছেন পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়—আশা করেছেন কন্যালাভের সংবাদে জামাতাবাবাজী একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আসলে দেখাচ্ছিল একটা চতুষ্পদের মতো। অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে গেছে মুখের চেহারাটা, ঘোলা চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘানির জোয়াল ঘুরিয়ে সের তিনেক খাঁটি সর্ষের তেল বের করে এল। খুব সম্ভব আসন্ন কন্যাদায়ের সম্ভাবনাটাই বেচারার মানস-চক্ষে এসে দেখা দিচ্ছিল।

পুরো পাঁচ মিনিট পরে এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিমলেন্দু। বললে, গেল।

আমি বললাম, কী গেল?

—যৌবন। প্রেম। —কর্তিত-পকেট অসহায় পথচারীর গলায় বিমলেন্দু বলে যেতে লাগল : রোমান্স। ফ্রম এ ম্যান উইথ ফিউচার টু এ ম্যান উইথ পাস্ট।

আমি বললাম, যাওয়াই ভালো। বোকামির পালাটা চটপট মিটে গেলেই ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারবে।

হয় কথাটা বিমলেন্দুর কানে গেল না, অথবা কান দিলে না। নাটকীয় ভাবে বলে যেতে লাগল, এখন দেখতে পাচ্ছি প্রেমটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাই ভালো। প্রিয়া

গৃহিণী হলেই জীবন-স্বপ্নে বারোটা বেজে গেল। তার চাইতে কবিদের অশরীরী প্রেম, অতীন্দ্রিয় মিলন—

আমি মন্তব্য করলাম, ক্লীবের সান্ত্বনা।

বিমলেন্দু ক্ষেপে উঠল। নাটক ক্রমশ মেলোড্রামার রূপ নিতে লাগল : বৌ, ছেলেমেয়ে, বাঁধা রুটিনের চাকরি, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ, একটা অপার দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে—

হাসি চাপাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতার বাইরে জীবনে বিমলেন্দু কখনো পা বাড়িয়েছে কিনা জানি না। হয়তো বড় জোর মধুপুর, দেওঘর অথবা পুরী, কিংবা শ্রীশ্রীবারাণসীধাম। সুতরাং অবারিত দিগন্ত আর মহুয়া ফলের স্বপ্ন দেখাটা তার স্বাভাবিক অধিকার।

বললাম, ভুল করলে। মহুয়ার ফল অত মিষ্টি নয়, একটু তেতো। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, সে কথা যাক। আসলে প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস—ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। সোপেনহাওয়ের পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওই রকম সর্বগ্রাসা।

—আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছ?

—না। বাংলা দেশের মাঠঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত, তার বনতুলসীর ঝাড়—তার শরতের সোনা-ঝরানো আকাশ—

—কথাটা বিশদ করো।

আমি বলতে শুরু করলাম।

কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছে বাংলা দেশের একটুকরো পাড়াগাঁয়ে!

মনে রেখো, কৈশোরের কথা বলছি। যে বয়েসে মানুষের জীবনে প্রথম নেশার মতো প্রথম প্রেম আবির্ভূত হয়, যখন চোখের সামনে পৃথিবীটাকে আরব্য-উপন্যাসের মতো বলে মনে হতে থাকে। যখন জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, জলের ঝাপটায় চোখমুখ ভিজে গেলেও ভালো লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে। ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকে, সদ্য-ফোটা আনন্দের বুনো গন্ধ পর্যন্ত রক্তে রক্তে কথা কইতে চায়।

সেই বয়েসে বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে অনেকগুলো দিন আমি কাটিয়েছিলাম। জায়গাটা কোন এক অখ্যাত ব্র্যাঞ্চ লাইনের অখ্যাততর একটি স্টেশন। ঝিমিয়ে-চলা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো পর্যন্ত সেখানে এক মিনিটের বেশি দাঁড়াত না। তিন-চার মাইল দূরের গ্রামগুলো থেকে যেসব যাত্রী আসত বা যে দু-চারজন নামত, সারাদিন-রাত্রে সবসুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েকের বেশি তারা স্টেশনের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাত না।

তা ছাড়া বিপুল ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলায় তালবীথির মর্মর। বহু দূরে ধুলোর কুয়াশা বুনে চলা গরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরোধানের নিচু জমি। আকাশে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস আর এক ফালি মরা নদী। দুপুরের রোদে ঝকঝকে নুড়ির ওপর বিছানো চকচকে একটা মিটার-গেজের লাইন, ভুট্টা ক্ষেতের পাশে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে; তার এক প্রান্ত একটা জংশন স্টেশনে, আর এক প্রান্ত কোথায় গেছে জানা ছিল না, কল্পনা করা যেত দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর কারাকোরাম

ছাড়িয়ে হয়তো তুষার মেরুব পেঙ্গুইনদের দেশে গিয়ে ওর যাত্রা শেষ হয়েছে।

মেজমামা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। অকৃতদার লোক, একটা পয়েণ্টস-ম্যানকে নিয়ে তাঁর সংসারযাত্রা চলত। স্টেশনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে বিবেকানন্দের বই আর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ মুখে নিয়ে বসে যেতেন। রাশভারী মানুষ, নিতান্ত দরকার না হলে কথাবার্তার বড় বালাই ছিল না।

আমার দিন কাটে কী করে? পৃথিবী ডাক দিলে। ভুট্টার ক্ষেত, রেলের লাইন আর মরা নদীর ধারে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশফুলের বনে নানা রঙের প্রজাপতি। খোলা আকাশের সোনালি রোদ রক্তের মধ্যে যেন মদের মতো ক্রিয়া করত, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আর তৈরি করে নিয়েছিলাম একগাছা ছোট ছিপ, মাঝে মাঝে মৎস্য শিকারের আশায় নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। কাদা আর নুড়ির ভেতর দিয়ে তির তির করে রূপালি জল বয়ে যেত, নেচে উঠত ছোট ছোট মাছ, তাদেরই দুটো-একটাকে ধরবার প্রত্যাশায় অসীম ধৈর্য ধরে ছিপ ফেলে বসে থাকতাম।

সেখানকার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছিল নদীটা। মাঝে মাঝে কাশ, মাঝে মাঝে এক-এক গুচ্ছ বন-তুলসী। কেন জানি না, এই বন-তুলসীগুলোকে ভয়ানকভাবে ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি। লাল রঙের বড় বড় ডাঁটায় রুক্ষ চেহারার ছোট ছোট পাতা—ভঙ্গুর, নমনীয়। মেঠো বাতাসে সহজেই নেচে উঠত, দুলে উঠত, একটা মৃদু মর্মরে ডাঁটা-পাতাগুলো আকুল হয়ে উঠত একসঙ্গে। তার মঞ্জরী থেকে ছড়িয়ে পড়ত জংলা কষায় গন্ধ—ওই গন্ধটার ভেতর দিয়ে চারদিকের প্রসারিত পৃথিবীটার একটা অভিনব আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে দিত।

ওই বন-তুলসীর ঝাড়ের ভেতরে মাছ ধরবার জন্যে ছোট একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই চলত শিকার-পর্ব। শিকার তো ছাই—ছিপ ফেলে হয় রেল লাইনটার অথবা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকা। আর নয় তো ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দু'হাতে তার আরণ্য গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে সেদিন আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।

এমন সময় সেই বন-তুলসীর পটভূমিতে মানবিক প্রেমের আবির্ভাব হল।

ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর নয়। জায়গাটা ছিল নির্জন, লোকজনের যাতায়াত ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলাম একটি ছোট মেয়ে কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বোধ হয় তুরীদের মেয়ে। বছর বারো-তেরো বয়স হবে—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা থান ধুতি পরনে। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, নদী থেকে বালি নিতে এসেছে। সারা গা অপরিচ্ছন্ন, গালে মুখে কাদার দাগ। আমাকে বোকার মতো তার দিকে তাকাতে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল।

মনে আছে, ভারী মিষ্টি লেগেছিল হাসিটা। হয়তো তার অন্য কারণ আছে। আকাশে তখন শরতের রোদ সোনা ঝরাচ্ছিল, তখন ছোট নদীর জল চিকচিক করছিল, বাতাসে

বন-তুলসীর ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছিল—আমার রক্তে ছিল বন-তুলসীর গন্ধ। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রইলাম।

মেয়েটি বললে, কী মাছ পেলি বাবু?

আমি বললাম, কিছু পাইনি।

মেয়েটি বললে, তুই মাছ পাবি না, ব্যাঙ পাবি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে নায়িকার ভাষাটা ভদ্রজাতের নয়। আমি রূঢ়ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটা মিষ্টি করে মুখ ভেংচে বন-তুলসীর ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছিপ হাতে তারপর আরো অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। শরতের রোদ আর বন-তুলসীর গন্ধ স্নায়ুর ভেতরে ঝিমঝিম করছিল—বহুক্ষণ অকারণে ভেবেছিলাম মেয়েটার কথা। না, অনুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়িনি। মুখ ভ্যাংচানির কথাটা যখনি মনে পড়ছিল, তখনি ইচ্ছে করছিল একবার হাতের কাছে পেলে ফাজিল মেয়েটাকে গোটা দুই চড় বসিয়ে দেব।

তারপরে আরো অনেকদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছি ওখানে। প্রায়ই মনে হত ওই বাচ্চা মেয়েটা ভারী জব্দ করে দিয়েছে আমাকে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আর এক দিন ধরতে পারলে এর শোধ তুলব।

কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, তারপরে আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। আর একবার এলে নির্ঘাত ঠ্যাঙানি খেত, তার পরিণতি কী হত জানি না। প্রতিশোধের ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয়নি বলেই তাকে ভুলতে পারিনি, অচেতন মনের ভেতরে সে আমার প্রথম নায়িকা হয়ে বেঁচে রইল—বেঁচে রইল বন-তুলসীর পৃথিবীতে।

আমার নায়িকা হারিয়ে গেল, তারপরে হারিয়ে গেল সেই ছোট স্টেশন, সেই মকাই ক্ষেত, টিলার ওপরে তালের সারি, সেই রূপালি ছোট নদী আর সেই বন-তুলসী। চলে এলাম শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। ইস্কুল, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি-সাহিত্য।

হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ-রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লালরঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট রুক্ষ পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত-বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে কটু-কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

এই পর্যন্ত ছিল ভালো। আমি বন-তুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম, বন-তুলসীও যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলাম কোনোদিন। তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই—ওটা স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদেশের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সবে এম. এ. পাস করে বসে আছি। স্টেটসম্যান আর অমৃতবাজারের পাতা খুলে মাস্টারী, প্রোফেসারী যারই বিজ্ঞাপন দেখছি দু'হাতে দরখাস্ত

করে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য তাতে ডাক-বিভাগের পক্ষেই নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধিত হচ্ছে মাত্র। নিরাশ হয়ে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করব কিনা চিন্তা করছি এমন সময় ডাক এল বন্ধুর কাছ থেকে।

শিকারের নিয়ন্ত্রণ। ওদের বাড়ি উত্তর-বাংলার জংলা বিলের দেশে, বুনো হাঁস শিকারের অপূর্ব জায়গা। বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাকটিস করে বন্দুক পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম—এবারে সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া মনের দিক থেকেও খানিকটা আউটিংয়ের দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়লাম।

সত্যিই দেশটাকে ভালো লাগল। এত বড় একটা আকাশ যে আছে বহুদিন সে কথাটা মনেই ছিল না। মাঠ আর বিল। বিলে অজস্র বুনো হাঁস, হাড়গিলা, দুটো-একটা ফ্লোরিক্যান, কাগ, চীনে কাগ, বক, ছোট বড় স্নাইপ, এমন কি চখা-চখী পর্যন্ত। ছররা মারা শিকারীর স্বর্গ-বিশেষ।

বন্ধু সুধীররা গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক। পাড়াগাঁয়ের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তার সঙ্গে শিকার-পর্বও পরমোৎসাহে চলতে লাগল। শাপলা-কলমী আর পদ্মপাতার জগতে বালিহাঁসদের নিশ্চিন্ত সংসারে আমরা হাহাকার সৃষ্টি করে দিলাম। সকালের দিকে বেরিয়ে দিনান্তে যখন রক্তমাখা পাখির ঝাঁক নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম, তখন মনে হত যেন দিগ্বিজয় করে আসছি। অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ—শিকারের নেশা—আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুলি খেয়ে ক্ষীণপ্রাণ পাখি যখন ছটফট করত, তার রক্তে রাঙা হয়ে যেত বিলের কালো জল, তখন অমানুষিক বিকট জয়ধ্বনিতে আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতাম। আবার আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে হাঁসের দল যখন বন্দুকের পাল্লার বাইরে উড়ে পালিয়ে যেত, তখন একটা চাপা আক্রোশে সমস্ত মনটাই যেন কালো হয়ে যেত। এক কথায় আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন জল্লাদ-বৃত্তিটা তখন আত্মপ্রকাশের বেশ একটা ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এমন সময় একদিন সুধীর বললে, রঞ্জন, একটু হাঁটুতে পারবি?

—কেন রে?

—ছোট হাঁস মেরে আর সুখ নেই, বড় গেমের সন্ধান পেয়েছি।

—বড় গেম! বাঘ-ভালুক নাকি?

—দূর, বাঘ-ভালুক কেন। রাজহাঁস।

—রাজহাঁস!

—হাঁ, 'ইটালীয়ান ডাক'। কাল রাত্রে একটা খুব বড় ঝাঁক উড়ে গেছে, ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এ বছর এই প্রথম এল। কোথায় নেমেছে জানবার জন্যে সকালে লোক পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে এসেছে ঝাঁকটা পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরের কমলার বিলে। মস্ত ঝাঁক, প্রায় হাজারখানেক পাখি আছে।

—এর মধ্যে পালায়নি তো?

—না, না। কমলার বিল খুব ভালো জায়গা—মাইল তিনেকের মধ্যে লোকজন নেই, ডিস্টার্বড হবে না। তা ছাড়া রাজহাঁসগুলো এম্‌নিতেই একটু বেপরোয়া, সুবিধেমতো জায়গা পেলে সহজে নড়তে চায় না। যাবি কাল?

—বেশ, চল্,—

—কিন্তু মাইল পাঁচেক রাস্তা—হাঁটতে হবে। গরুর গাড়িতেও অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকটা ঘুরতে হবে. পাকা দশ মাইলের ধাক্কা। দিনটা কাবার হয়ে যাবে।

—তা হলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু তোর অভ্যেস নেই, হাঁটতে কষ্ট হবে—

মনের জল্লাদটা নেচে উঠেছিল। সোল্লাসে বললাম, না, না, কিছু কষ্ট হবে না। আরে রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কী চলে?

পরদিন ভোরের আবছায়া অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মাথায় হ্যাট, কাঁধে ফ্লাস্‌ক, চাকরের হাতে টিফিন-বাস্কেট আর বন্দুক। যাত্রা করলাম আমরা পাঁচজন।

কোমর সমান বিন্নার বন আর ধানক্ষেতের আল ভেঙে মাইল খানেক এগোতেই আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল। সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিনি, তার বর্ণনা শুনেছি; দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে দু-তিনদিন টাইগার-হিলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। শুনেছি পাহাড় আর সমুদ্রের সূর্যোদয়ের তুলনা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের বিশাল মাঠের ওপরে সূর্য ওঠা দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, জীবনে একটা অত্যন্ত দামী জিনিস হারিয়েছ।

মাঠের পারে সূর্য উঠল। আকাশে ছড়িয়ে গেল সাতরঙের বিচিত্র কিরণলেখা, হাঁসের ডিমের মতো চ্যাপটা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সে সূর্যোদয় আমি কখনো ভুলতে পারব না—সেই সূর্যের আলোয় বন-তুলসীর গন্ধ ছিল।

আমি ছিলাম সকলের পেছনে। পায়ের জুতোয় কাঁকর ঢুকেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখি ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তা যাক—সে জন্যে আমার চিন্তা ছিল না। মাঠের পথ, হারাবো বলে ভাবিনি। বিন্নার জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে দূরে ওদের হ্যাট আর বন্দুকের নল দেখতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে চলেছি। শরতের রোদ তখন সমস্ত মাঠ-ঘাটের ওপরে পাতলা একটা সিল্কের ওড়নার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট খালের পাশে চলে এলাম। তার ওপরে একটা বাঁশের পুল, সেইটে পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুলে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

চোখে পড়ল কালো পাথরের তৈরি ভেনাস। পূর্ণযৌবনা সাঁওতালের মেয়ে। বিন্নাবনের আড়ালে নির্জন খালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্র মার্জনা করছে। চারদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং একান্ত নিরাবরণ! কনক-চাঁপা রঙের রৌদ্রে উদ্‌ঘাটিত অপূর্ব দেহশ্রী।

কোনো বিবসনা মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো ভদ্ররুচির পক্ষে শুধু ন্যক্কারজনক নয়, কল্পনাতীত। কিন্তু সেই মাঠ আর সেই সূর্যোদয় সেদিন যে পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চির-পরিচিত শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি—সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। শুধু চেতনার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠছিল ঃ এ আশ্চর্য, এ অপরূপ। মনে হয়েছিল, খালের জল, সূর্যের আলো, গাছপালার গন্ধ, সবাই মিলে যেন কণা কণা সৌন্দর্য

দিয়ে ওকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছে—গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের মূর্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তিটা মিলে গিয়ে—গলে গিয়ে জলে আলোয় আকাশে হারিয়ে যেতে পারে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল ছিল না। তারপর দেখলাম একপাশ থেকে একখানা ময়লা কাপড় মেয়েটি কুড়িয়ে নিলে। সযত্নে আবৃত করলে দেহ, ওপাশের আলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলে। খানিকদূর এগিয়েই—হ্যাঁ বন-তুলসী, আমার কৈশোরের সেই বন-তুলসী, তারই নিবিড় বনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

আমার প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই মীড় মূর্ছনা। আমার দু'হাতের ভেতরে যেন ফিরে এসেছে একটা কটু কষায় উদ্ভিদ-গন্ধ। আমার পথ ভুল হয়ে গেল, আমার মাথার মধ্যে সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। কেন যেন মনে হল সেই হারিয়ে-যাওয়া নায়িকা আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বন-তুলসীর কুঞ্জে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে।

দিবাস্বপ্ন? সস্তা রোমাণ্টিসিজ্‌ম? তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি সেই সূর্যোদয়ের কথা, বলেছি আমার মগ্ন-চৈতন্যের ভেতরে সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ। হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল, চেতনা সত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপ; আমি বন-তুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

বহুদিন পরে শরতের রৌদ্র আর বাতাসের ঐকতান মিলল, পরে আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খস্‌খসে পাতাগুলো আমার গালে মুখে ভালবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার নায়িকার সন্ধানে কি? বোধ হয় তাও নয়। ডাঁটা-পাতার সেই স্পর্শ, দলিত মথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শিরশির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানেক বনের মধ্য দিয়ে চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নিচে মাটি নেই, এত ঘন হয়ে উঠেছে যে ওদেরই একরাশকে চেপে বসতে হল আমাকে। চারদিকে বন-তুলসী আমায় ঘিরে ধরছে—আমার মাথা থেকে প্রায় দু'হাত উঁচুতে উঠে ওরা আমাকে আড়াল করে রেখেছে। কোনোদিকে কিছু দেখবার নেই—শুধু ওপরে নীল নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেত-পদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে নিয়েছিলাম, অবগাহন করে নিয়েছিলাম বন-তুলসীর নিবিড় স্পর্শসান্নিধ্যে। পর পর যখন গোটা পাঁচেক সিগারেট শেষ করেছি তখন খেয়াল হল। তখন আমার মগ্ন-চৈতন্যের ওপরে বাস্তব চেতনার আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল, আমি সুধীরদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। ওরা হয়তো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে, হয়তো ভাবছে—

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি। সর্বনাশ, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দু পকেট ভরে বন-তুলসীর পাতা আমি ছিঁড়ে নিলাম, তারপর উঠে পড়লাম বেরিয়ে আসবার জন্যে।

কিন্তু আমার মতোই বন-তুলসীও বহুদিন বাদে আমাকে ফিরে পেয়েছিল। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে রাজী হল না, ঘন-নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরল।

বেরুতে চাই, আর বেরুতে পারি না। মোহভঙ্গের পরে বুঝতে পারলাম কত বড় বোকামি করে ফেলেছি আমি। একটু আগেই তুমি বলেছিলে প্রেমের প্লেটোনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।

এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বন-তুলসীর ঝাড় আদি অন্তহীন,—যেন কার একটা বিচিত্র যাদুমন্ত্রে এত বড় পৃথিবীটার পাহাড়-সমুদ্র-নগর-গ্রাম সব বন-তুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার আত্মীয়-স্বজন, সব মায়া, সব মিথ্যে। এ জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারব না।

কোনোদিন বেরুতে পারব না! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল-লাল ডাঁটাগুলোতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ওপরে শরতের রোদ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে আমার মাথার ভেতরে বিঁধতে লাগল, আমার চোখের দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে। দু'হাতে জঙ্গল ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম, কিন্তু বৃথা। এ বনের শেষ নেই—এর ভেতর থেকে কোনোদিন লোকালয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবো না আমি। মাথা উঁচু করে জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চারপাশের উঁচু-নিচু অসমতল জমির ওপরে আমার অভিশপ্ত প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই, কোনো কিছুর চিহ্নই নেই!

প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি—কিন্তু জঙ্গল ভেঙে ভেঙে আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সামনে এগোবার চেষ্টা করে বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এক পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে চলে গেল, টের পেলাম পকেট থেকে পড়ে গেল মানি-ব্যাগটা। কিন্তু সেগুলো খোঁজবার অবস্থা নয়, বেরুতে হবে, যেমন করে হোক বেরুতে হবে। মনে হতে লাগল কোথায় কতদূরে আমার কলকাতা, তার বাড়িঘর, তার ট্রাম-বাস, তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন! আজ এই বন-তুলসীর জঙ্গলের ভেতরে আমি মরে যাচ্ছি—কেউ আর কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবে না!

অসহায় গলায় বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু কে সাড়া দেবে? সেই আদিগন্ত মাঠের ভেতরে আমার অবরুদ্ধ আর্তনাদ শুনবে কে? কোনো আশা নেই, কোনো উপায় নেই। হয় এখানে দম আটকে মরে যাবো, নইলে সাপে কামড়াবে—আশেপাশে বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়!

একবার শেষ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করেই একরাশ গাছের সঙ্গে পা জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। বন-তুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আঁকড়ে ধরল। জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল ঃ এইখানে মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর, আরো একরাশ বন-তুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে—

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে আমার টুপিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল বলেই অজ্ঞান অবস্থায় সে-

যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সুধীর। রক্ষা করতে পেরেছিল আমার নায়িকার সেই উর্ণনাভ-প্রেম থেকে।

তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্য দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতর তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না।

জীবাণু

পাহাড়ী আকাশে দিব্যি রোদ ঝিলমিল করছিল—হঠাৎ সব ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। সারদাপ্রসাদ টের পেলেন নিবিড় ভাবে ফগ ঘনিয়ে আসছে। সামনে স্ট্যাণ্ডের গায়ে ফিট করা আয়নাটার দিকে তাকালেন, উজ্জ্বল কাচের ওপর জলের রেণু ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ফগ ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা খুশিতে মনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠল সারদাপ্রসাদের। বেশি আলো ভালো লাগে না তাঁর, ভালো লাগে না দিবালোকের অতি প্রগল্‌ভ উজ্জ্বলতা। কুয়াশার এই প্রায়ান্ধকার বিষণ্ণতার সঙ্গে তাঁরও মনের একটা অন্তরঙ্গ সংযোগ রয়েছে। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার মতো তাঁর চারদিকে সঞ্চিত হতে থাকে, তারপর ক্রমশ নিজের হাত-পাগুলো পর্যন্ত আর স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না। সারদাপ্রসাদের মনে হয় নিজের বিগত জীবনটা। এমনি করে যদি স্মৃতির সম্মুখ থেকে আবছায়া হয়ে যেত—মগ্নচৈতন্যের চারদিকে যদি আবর্তিত হতে থাকত এমনি একটা সীমাহীন ধূসরতা, তা হলে—

—আর একটা কম্বল দেব বাবু? ঠাণ্ডা লাগছে?—চাকরের প্রশ্ন এল।

—নাঃ, থাক।

ফগ আসছে—সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে প্রেমের মতো—রাশি রাশি শীতল চুম্বনের মতো। সারদাপ্রসাদ শুনেছেন প্রেমে উত্তাপ আছে, আছে মানুষের রক্তকে সজাগ সচেতন করে তোলবার নিবিড় একটা কবোষ্ণতা। কিন্তু মানুষের প্রেমের পরিমিতি থেকে তিনি আজ বহুদূরে। আজ যে পৃথিবীর উন্মুক্ত উদার প্রেমের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে বৃষ্টি, সেখানে ফগ, সেখানে বরফ গলা শীতল ঝর্ণা আর পাইন দেওদারের মর্মর।

কী হতে চলেছিল জীবন, কী হয়ে গেল।

ফগ এসেছে। বুকের ওপরে কম্বলে ঢাকা শরীরটা তার ভেতরে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে মনে হবে হারিয়ে যাচ্ছেন সারদাপ্রসাদ, তলিয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের নেপথ্যলোকে। এই কি মৃত্যু—একেই কি উপসংহার বলে? একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, যা কিছু দেনা-পাওনা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ হয়ে গেছে—শুধু শান্ত অনাসক্ত মনে হারিয়ে যাওয়ার, ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা। বাতাস যেমন করে ফুলের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভাবে যা কিছু

ভাব ভাবনা চিন্তা কল্পনাকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে পাপড়ির মতো ঝড়ে পড়া।

কিন্তু এই মৃত্যু কি চেয়েছিলেন সারদাপ্রসাদ? কখনো কি কল্পনা করেছিলেন এমন ভাবে ফুরিয়ে যাওয়াটা?

না, তা নয়। তিনি তো বরং পরিপূর্ণ জীবনেরই কামনা করেছিলেন—চেয়েছিলেন সূর্যালোকপ্রদীপ্ত উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ বাঁচাকে। আঘাত, ব্যথা, দুঃখ, ভুল আর গ্লানির মধ্য দিয়ে কামনা করেছিলেন এদের সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে যে জীবনসত্তা, তাকেই। কিন্তু কী হয়ে গেল। পথে নামবার আগেই হারিয়ে গেল পথ।

বারো বছর আগেকার কথা। সারদাপ্রসাদ তখন লণ্ডনে—সেইবারেই ডাক্তারীর শেষ ডিগ্রিটা পাবার কথা। কৃতী ছাত্র সারদাপ্রসাদ, পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কারো মনেই সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না। আর ছিল আশা, সামনে প্রসারিত ছিল অজস্র অতুল সম্ভাবনা। কলকাতায় ফিরে বাপের বিপুল প্র্যাক্‌টিস এবং প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরীটা নিয়ে তিনি অদম্য উৎসাহে কাজে লেগে যাবেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমন একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যাবেন যে মানুষে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করবে।

আর এই স্বপ্নকে যে আরো মধু-মদির করে তুলেছিল গ্ল্যাডিস্ তার নাম। গ্লাডিস্ থার্স্টন। সমুদ্রপারের নীলিমা ওর চোখে, ওর ঠাকুরমা নাকি জার্মান ছিলেন। আল্‌পসের তুষার ওর দেহবর্ণে—ওর রক্তে রক্তে ইয়োরোপের জাগ্রত যৌবন। সারদাপ্রসাদের জীবনে দুরন্ত মৌসুমী বাতাসের মতো ওর আবির্ভাব, স্নিগ্ধ-সজল অথচ উদ্দাম।

পরীক্ষার অতি পরিশ্রমেই বোধ হয় শরীরে ভাঙন ধরলো। গ্লাডিস্ এসে বললে, না না, এ চলবে না। দিন কয়েক বাইরে গিয়ে শরীরটা সারিয়ে এসো।

সারদাপ্রসাদ প্রতিবাদ করলেন, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এ তো এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। খুব বেশি পরিশ্রমের জন্যেই বোধ হয় এমনটা হয়েছে— পরীক্ষাটা মিটে গেলেই শরীর আবার সেরে উঠবে।

গ্ল্যাডিস্ বললে, না, সে হবে না। এবার পরীক্ষা দিতে না পারলে বেশি ক্ষতি হবে না, বেশি ক্ষতি হবে শরীরটা ভেঙে পড়লে। তোমাকে আর আপত্তি করলে চলবে না— কিছুদিনের জন্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ডাক্তার সারদাপ্রসাদও নিজের সম্বন্ধে একান্ত অচেতন ছিলেন তা নয়। নিজেও বেশ বুঝতে পারছিলেন শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা সাধারণ ক্লান্তি নয়, তার চাইতে আরো কিছু বেশি—কিছুটা পরিমাণে সন্দেহজনক। কাজেই দ্বিধা থাকলেও আপত্তি করতে পারলেন না—গ্ল্যাডিসের প্রচণ্ড তাগিদে এবং কিছুটা মানসিক অস্বস্তিতে তিনি শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেলেন।

প্রথম কিছুদিন চমৎকার কাটল। চারদিকের অবারিত সৌন্দর্যের মাঝখানে, লণ্ডনের শ্বাসরোধী কয়লার বাষ্পে বিষাক্ত বাতাসের বাইরে খোলা হাওয়ায় শরীরটা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যেই। তারপরেই সত্য আত্মপ্রকাশ করল, মৃত্যুর চাইতেও নিষ্ঠুর ভয়ংকর সত্য। এক মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে দপ করে পৃথিবীর সূর্যালোক নিবে গেল।

ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডে টিউবারকুলোসিস। মরণের নির্ভুল পরোয়ানা।

মিথ্যে হয়ে গেল পৃথিবী, মুছে গেল জীবনের সোনালি রঙ। ডাক্তারেরা বললেন,

অপারেশন করে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া আর কোনো আশাই নেই।

শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল না। সারদাপ্রসাদ বেঁচে উঠলেন, কিন্তু সে বাঁচা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। সে বাঁচা জীবনের প্রতি একটা মর্মান্তিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। শেষ পরীক্ষায় পাস করা আর হল না, প্র্যাক্‌টিস আর ল্যাবরেটরী হয়ে গেল একটা বেদনাবিদ্ধ মরীচিকা, আর গ্ল্যাডিস? ইংলিশ-চ্যানেলের নীল জলে কোথায় সে নীল চোখ দুটি যে হারিয়ে গেল—সারদাপ্রসাদ তা কি জানেন? সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল ওর জীবন—এই মেঘাচ্ছন্ন ধূসরতায় ও কল্পনার চাইতেও অবাস্তব।

ফগ কেটে গেছে। আবার রোদ ঝলমল করে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন সারদাপ্রসাদ। ভারী চমৎকার স্নো-ভিউ পাওয়া যাচ্ছে আজকে— কাঞ্চনজঙ্ঘা ওদিকের সম্পূর্ণ আকাশটাকে অধিকার করে রাজমহিমায় বিরাজ করছে। মনে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডকে, মনে পড়ে আলপ্‌সের সেই চিরশুভ্র তুষারবিস্তারকে। সে তাঁকে আশা দিয়েছিল, আশ্বাস দিয়েছিল; আর এই তুষারে আজ তাঁর চৈতন্য হিমশীতল আচ্ছন্নতার মধ্যে সমাহিত হয়ে যাচ্ছে।

চাকর এল ঃ বাবু পাইপ দেব?

—আচ্ছা, দে।

চাকর পাইপ এনে দিলে। সেইটে ধরিয়ে নির্নিমেষ ভাবে সামনের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন সারদাপ্রসাদ। সত্যি চমৎকার লাগছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে। ওপাশের জংলা কালো পাহাড়টার মাথার ওপরে তার রাজকীয় বিস্তার। এ পাহাড়গুলোর চাইতে সে কত স্বতন্ত্র, অভিজাত। বর্ণে, গৌরবে, ঔজ্জ্বল্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে সে এদের সগোত্র নয়।

এই ঔজ্জ্বল্য, এই গৌরব তো সারদাপ্রসাদের জীবনেও আসতে পারত। সাধারণের মাঝখানে মিশে জলবিন্দুর মতো তিনিও অনায়াসেই হারিয়ে যেতেন না। বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, প্রতিভায় তিনিও জ্বলজ্বল করতেন, হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা তাঁকে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই একটা একক মহিমা দিয়ে ভূষিত করে রাখত। কিন্তু—

কিন্তু সারদাপ্রসাদ উঠতে পারেন না। কাঁধ আর গলার মাঝামাঝি অনেকটা জায়গার হাড় একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা পেছনের দিকে ভেঙে পড়তে চায়। সুতরাং দিনরাত বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়। ইচ্ছেমতো মাথাটা ঘোরাবার উপায় পর্যন্ত নেই—বিছানায় একইভাবে চিত হয়ে পড়ে থাকাই হচ্ছে তাঁর দৈনন্দিন জীবন। মুখের সামনে স্প্রীংয়ের আয়না ফিট করা রয়েছে, চারদিকের দৃশ্য দেখবার জন্যে আয়নাটাকে তিনি যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাতে পারেন। সাদা চোখে সহজভাবে জগৎকে দেখবার অধিকার থেকে পর্যন্ত তিনি বঞ্চিত। তাও তাঁকে দেখতে হয় প্রতিচ্ছায়ার ভেতর দিয়ে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বেঁচে আছেন।

বেঁচে আছেন বইকি; এই বারো বছর ধরে এইভাবেই তো বেঁচে আছেন তিনি। যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর যে মানব-সমাজকে তিনি দু'হাতে দান করতে চেয়েছিলেন, আজ তাদেরই দানের ওপর তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। জীবনের কাছে তিনি অনিবার্য অপরিহার্য নন, জীবনের ওপরে একটা অসহ্য অহেতুক বোঝা মাত্র। চাকরদের অনুগ্রহে

তাঁর দিন কাটছে, ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে ওরা তাঁর গলা টিপে মেরে যথাসর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিতে পারে।

আশ্চর্য এই বেঁচে থাকা। পাহাড়ের মাথার ওপর নিঃসঙ্গ বাংলো বাড়ি। পাশ দিয়ে একটা শুকনো ঝর্ণা, বর্ষাকালে তাই দিয়ে নামে মুক্তা-গলানো জলের ধারা। আর চারপাশে পাইনের বন—এক-একটা রাত্রে যখন বৃষ্টিবাতাসের খেয়ালী ক্ষ্যাপা মাতামাতি শুরু হয়, তখন ওই পাইন গাছের ঘন-নিবদ্ধ সূক্ষ্মাগ্র কালো পাতাগুলোর ভেতর থেকে যেন অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন ওদের ভূতে পেয়েছে। আর সেই সব রাত্রে ভয় করতে থাকে সারদাপ্রসাদের— সজাগ হয়ে ওঠে মনের কাছে নিজের অসহায় একাকিত্বের অচেতন অনুভূতিটা। মনে হয় পাহাড়ের মাথার ওপর এই বাংলোটা বড় বেশি নির্জন, তিনি বড় বেশি নিঃসঙ্গ, কারো অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ ছাড়া এত পুরু আর দামী দামী পালকের লেপেও তাঁর শীত কাটছে না।

সেইসব রাত্রে সারদাপ্রসাদ যেন অসংযত হয়ে ওঠেন—মাথার মধ্যে যেন কেমন সব বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে নিজের হাতে নিজের গলাটাকে নিষ্পিষ্ট করে দিতে, ইচ্ছে করে মানুষ খুন করতে। কী অপরাধ করেছিলেন সারদাপ্রসাদ, কার কাছে করেছিলেন? কে এমনভাবে একটি ফুঁ দিয়ে তাঁর জীবনের যা কিছু আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেছে? বারো বছর কেটে গেল, অতিক্রান্ত হয়ে গেল একটা যুগ। তবু এখনো সময় আছে, এখনো যৌবন আছে তাঁর। সমস্ত শরীর তাঁর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, দুধে আলতায় মেশানো তাঁর গায়ের রঙ, রূপবান হিসেবে নিঃসংশয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন, তাঁর বিদ্যা আছে; অর্থের অপ্রাচুর্য নেই—প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁর সুস্থ, কর্মক্ষম। তবু তাঁর কিছু নেই। তাঁকে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে, তাঁকে চাকরের অনুগ্রহের ওপরে অসহায় শিশুর মতো নির্ভর করতে হবে, তাঁকে আয়নার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি দেখে খুশি থাকতে হবে, আর মৃত্যুর চাইতে অনেক ভয়ংকর, অনেক দুর্বিষহ যে জীবন—সেই জীবন বয়ে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে।

কোনোকালে ঈশ্বর মানেননি সারদাপ্রসাদ—আজও মানেন না। বস্তু-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে এসেই মনের ভেতর থেকে ওই সংস্কারটাকে তিনি সমূলে উৎপাটিত করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আজ মনের কাছে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারতেন, এর জন্যে তিনি দায়ী নন, এ তাঁর কৃতকর্মের প্রতিফল, এ তাঁর জন্মান্তরের পাপ, হয়তো বা কোনো গো-হত্যা ব্রহ্মহত্যার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। এবং এও হয়তো তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন যে ইহজন্ম এই দুঃখদুর্গতির শোচনীয় মর্মবেদনার মধ্যে কাটালেও পরজন্মে এবং পরকালে তাঁর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে হয়ে যাবে।

কিন্তু সে পথ তাঁর বন্ধ—তাঁর পায়ের তলা থেকে দাঁড়াবার সে মাটি সরে গিয়েছে। বস্তুবাদী হিসাবে তিনি জানেন, ঈশ্বর-কল্পনা মানুষের অজ্ঞান অবুদ্ধির পরিণাম, জন্মান্তরবাদ আষাঢ়ে গল্পের চাইতে একটু বেশি মুখরোচক এই মাত্র। তবু সারদাপ্রসাদের আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে, দার্শনিকের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে করে ঃ যদি ঈশ্বর নামে কেউ থাকো, তবে হে ঈশ্বর, বিচার করো, উদ্ধার করো আমাকে, আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও—

চাকর এসে দাঁড়াল।

—বাবু, চা এনেছি।

সারদাপ্রসাদ পাইপটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে হাত বাড়ালেন। একটা ফিডিং কাপে করে চাকর চা এগিয়ে দিলে। নিঃশব্দে সারদাপ্রসাদ কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

—ওরে, ডাক এসেছে?

—হ্যাঁ বাবু, এই দিয়ে গেল। আপনার টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।

—আচ্ছা যা, আমি দেখব'খন।

চায়ের পাত্র শেষ করে আবার পাইপ ধরালেন সারদাপ্রসাদ, তারপরে আগ্রহভরে তাকের দিকে হাত বাড়ালেন। চিঠিপত্র নেই, লেখ্বারও কেউ নেই। সপ্তাহে দু'খানা করে বাড়ির চিঠি আসে, কুশল নেওয়ার সহজ ভদ্রতাটুকুর আদান-প্রদান চলে। কুশল! সারদাপ্রসাদের হাসি পায়। তিনি ভালো আছেন কিনা এ খবরটা নিয়মিত না জানালে নাকি বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। দুশ্চিন্তাই বটে।

আজ চিঠি নেই—বাড়ির চিঠি আসবার দিন নয় আজকে। এসেছে দু-তিনখানা পত্র-পত্রিকা। একখানা খবরের কাগজ, আর বাকি দুখানা বিলিতি মেডিক্যাল জার্নাল। অন্ধকার জীবনের একফালি পিছলে-পড়া সূর্যের আলো।

খবরের কাগজটা ঠেলে সরিয়ে রাখলেন সারদাপ্রসাদ। খবরের ওপর কোন্ মোহ নেই তাঁর, কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। পৃথিবীতে কোথায় কোন্ যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় বোমার বহরের বর্ষণে জার্মানির আধখানা শহরকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথায় ধানের ক্ষেতে পঙ্গপাল নেমে ফসলের সর্বনাশ করে দিয়েছে, কোন্ নেতা গর্জন করে বলেছেন এক মাসের মধ্যে তিনি বক্তৃতা দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে নেবেন এবং কোন্খানে একটা গোরুর পাঁচপেয়ে বাচ্চা হয়েছে,.এসব মূল্যবান খবরাখবরের কোনো লোভ, কোনো আকর্ষণ নেই সারদাপ্রসাদের। ও পৃথিবী তাঁর কাছে রূপকথা, ও পৃথিবী তাঁর কাছে জন্মান্তরের মতো একটা আষাঢ়ে গল্পের অতিরিক্ত কিছু নয়। পাহাড়ের ওপরে এই ছোট বাংলোটিতে ওদের কোনো তরঙ্গই কলকল্লোলে এসে মুখরিত হয়ে পড়বে না—আন্দোলিত করে তুলবে না চারপাশের উদ্ধত পাইনের অরণ্যকে, প্লাবন নামিয়ে দেবে না শুকিয়ে মরে থাকা ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণার বুকে।

তার চাইতে—অনেক বেশি আগ্রহ, অনেক বেশি উত্তেজনা নিয়ে মেডিক্যাল জার্নাল দুটোর মোড়ক ছিঁড়লেন তিনি। শুধু নিজের রুচিগত কৌতূহল নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও নয়। ডাক্তার সারদাপ্রসাদ তার চাইতে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই, মির্যাক্‌লে আস্থা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ঈশ্বর ল্যাবরেটরীর টেস্ট-টিউবে স্বতঃপ্রকাশ, তার রাজ্যে যে-কোনো মুহূর্তে মির্যাক্‌ল ঘটে যেতে পারে।

সেই মির্যাক্‌লের স্বপ্নই দেখেন সারদাপ্রসাদ, সেই মির্যাক্‌লের জন্যেই তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন। কিছুই বলা যায় না, হয়তো এখন কল্পনাও করা যায় না; তবু পত্রিকার পাতা খুলেই হয়তো দেখতে পেলেন কোনো একটা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে, যার বলে তাঁর ঘাড়ের কাটা হাড়কে নতুন করে জোড়া লাগানো যায়! আর সেই মুহূর্তে? সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে নতুন করে প্রাণের সিংহদ্বার মুক্ত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই তিনি বলতে পারেন : এই পাহাড়ী বাংলো নয়, এই মেঘ আর কুয়াশার

বেদনাচ্ছন্ন নির্বাসন নয়, জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে এই শূন্যতার বিলাপ নয়। তিনি আবার মাথা তুলে দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়াবেন, এক আছাড়ে ভেঙে ফেলে দেবেন ছবি দেখানো এই আয়নাটাকে। তারপর বুক সোজা করে নেমে আসবেন ওই খবরের কাগজটার মধ্যে, ওই কাগজটার জাগ্রত চঞ্চল বহুবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর পটভূমিতে। শুধু ওইখানে তিনি থামবেন না—তারপর আবার নীল-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন সেই নীলনয়নার সন্ধানে; যদি তাঁকে খুঁজে পান, পুরুষের মতো—নীরোগ স্বাস্থ্যবান যে পুরুষ কাঁধের ওপর মাথাটাকে সোজা রেখে দাঁড়াতে পারে তার মতো সতেজ কণ্ঠে বলবেন ঃ আমি ফিরে এসেছি, তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।

কিন্তু স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন। মেডিকেল জার্নালের পাতায় সদ্য-আবিষ্কৃত দশ হাজার গুণ ম্যাগ্‌নিফাই করা ব্যাকটিরিয়ার ছবি আছে, তাদের প্রাণতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু মানুষের কথা নেই, তাঁর মতো একটা বলিষ্ঠ, শক্তিমান, কীর্তিমান মানুষকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি নেই কোনো। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো উজ্জ্বল মহীয়ান একটা মানুষের মৃত্যুর মতো বাঁচাকে আলোকিত করে তোলবার কোনো আশ্বাস নেই, আছে অতি শক্তিশালী মাইক্রোস্‌কোপের লেন্সেও যা ধরা পড়ে না, সেই অলক্ষ্যপ্রায় জীবাণুর জীবনের অতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা! ডায়াগ্রাম, ফোটোগ্রাফ, ক্যালকুলেশন!

কাগজ দুটোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সারদাপ্রসাদ।

আয়নার মধ্যে আলো ম্লান হয়ে এলো। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি নেমেছে। সারদাপ্রসাদ ভাবতে লাগলেন, নিজের হাতে গলা টিপে আত্মহত্যা করাটা সম্ভব কিনা?

—কে ওখানে?

আয়নায় ছায়া পড়ল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটি পাহাড়ী দম্পতি এসে আশ্রয় নিয়েছে বাংলোর বারান্দায়। স্বাস্থ্যে, যৌবনে টলমল করছে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে সেই আনন্দে দুজনে হেসেই আকুল। এতটা পাহাড় ভেঙে উঠেছে অথচ এতটুকু হাঁপাচ্ছে না, একবিন্দুও ক্লান্তি বোধ হয়নি।

সারদাপ্রসাদ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে উঠলেন : বীরু, বীরু?

চাকর বীরু ছুটে এল।

—কোথায় থাকিস, কী করিস হতভাগা? দুটো পাহাড়ী উঠেছে বারান্দায়— তাড়িয়ে দে এক্ষুণি।

হুকুম পালন করতে বীরু এক পায়ে খাড়া। এগিয়ে গিয়ে বললে, হটো, হটো।

—কেন বাপু? বৃষ্টিতে একটু দাঁড়ায়েছি—পাহাড়ী ভাষায় ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালে ওরা।

—না, না, ওসব চলবে না, বাবুর পছন্দ নয়। যাও হটো—

তেমনি হাসতে হাসতে ওরা নেমে গেল। দুঃখিত হয়নি, অপমানিতও না। সহজ স্বাভাবিক জীবনে এসব ধুলোবালি ওদের হাওয়ায় উড়ে যায়। বৃষ্টির ভেতরে ভিজতে ভিজতে ওরা খাড়াই পাহাড়ী পথটা দিয়ে অবলীলাক্রমে নিচে নামতে লাগল, স্বাস্থ্য আর যৌবনের নির্ভুল প্রতীক।

সারদাপ্রসাদ বললেন, এখুনি ফিনাইল ছিটিয়ে দে—লাইজোল স্প্রে করে দে। সাতজন্মে ব্যাটারা স্নান করে না, ওদের জামা-কাপড়ে দুনিয়ার যত জার্মের আস্তানা।

যা—যা, দেরি করিস নে—

জীবাণুকে ভয় করেন সারদাপ্রসাদ, ভয় করেন মৃত্যুকে। আশ্চর্য, সারদাপ্রসাদ বাঁচতে চান। কিন্তু সত্যিই কাকে ভয় করেন তিনি? ওদের জামাকাপড়ের ব্যাকটেরিয়াকে, না ওদের পাথুরে শরীরের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রবহমান যৌবনকে? জীবনকে, না জীবাণুকে?

আয়নার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার।

চারতলা

ম্যানেজিং এডিটার নিজের ছোট্ট ঘরটিতে চুপ করে বসেছিলেন। পর্ব উপলক্ষে আজ অফিস আর প্রেস সমস্ত ছুটি। কাল কাগজ বেরুবে না—তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের নিয়মিত নির্ভুল ধারাটিতে আজ ছেদ পড়েছে। প্রখর কর্মব্যস্ততায় সমস্ত অফিসটা আজ চঞ্চল হয়ে উঠছে না, এঘরে ওঘরে কলিং বেলের উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণ আহ্বান শোনা যাচ্ছে না, পাশের ঘরে তাঁর সেক্রেটারীর টাইপরাইটারটা বাঁধা জলদে বেজে চলছে না এবং নিচের তলার মেশিনঘর থেকে আসছে না রোটারীর গর্জন। একটা বিচিত্র অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় সব কিছু যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শুধু নিতান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনের দাবিতে যাদের অফিসে আসতে হয়েছে—সেই দু-তিনটে মানুষ হয়তো এখানে ওখানে পড়ে ঝিমুচ্ছে—কেউ টেবিলে মাথা রেখে, কেউবা টেলিপ্রিন্টারের ওপরে ঝুঁকে পড়ে।

কাজ নেই, তবু ম্যানেজিং এডিটার অফিসে এসেছিলেন। পত্রিকাটা যদিও লিমিটেড কোম্পানি, তবু এই কাগজের চৌদ্দ আনা অংশীদার তিনি—অর্থাৎ মালিক। নিজের সমগ্র জীবনের নিষ্ঠা আর সাধনা দিয়ে এই কাগজখানাকে তিনি গড়ে তুলেছেন—আজ এই কাগজ শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের গৌরব দাবি করতে পারে। এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপরে আজ দেশের জনমত গড়ে উঠছে—নেতাকে সিংহাসনে বসানো এবং সেখান থেকে ইচ্ছামতো তাঁকে ধুলোকাদায় টেনে নামাবার অসীম ক্ষমতাও এই কাগজেরই আয়ত্ত। ম্যানেজিং এডিটারের জীবন-স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—আজ তিনি চরিতার্থ, তিনি জয়ী।

নামকরা কাগজ—দেশের যোগ্যতম সম্পাদক সহ-সম্পাদকেরা তাঁর কাগজে কাজ করেন। তিনি এক বছর চোখ বুজে থাকলেও নির্ভুল নিয়মে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কাগজ আত্মপ্রকাশ করবে—অব্যাহত থাকবে তার ঐতিহ্য। তবু তিনি একটি দিনও অফিস কামাই করেন না। পঁচিশ বছর ধরে কাগজের সঙ্গে অস্থিমজ্জায় তিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে, দৈনন্দিন অভ্যাসের দাবিতেই অন্তত এক ঘণ্টার জন্যেও তাঁকে অফিস থেকে ঘুরে যেতে হয়।

বেলা চারটে বাজল। ওঠবার উপক্রম করেই তিনি আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। বৃষ্টি নেমেছে—বেশ জোর বৃষ্টি। গাড়িটা খারাপ বলে আজ তিনি ট্যাক্সি করে এসেছিলেন। এখন একটা ট্যাক্সির সন্ধান করতে হলে অনেকটা এগিয়ে যেতে হবে এবং ফলে ভেজাটা অবশ্যম্ভাবী। ছাতা বা রেনকোটও সঙ্গে নেই। অফিসে দু-একটা বেয়ারা এসেছে—ওদের বললে এখুনি ট্যাক্সি ডেকে দেয়; কিন্তু থাক—দরকার নেই। একটু বসাই

যাক বরং।

ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড হোয়াইটের টিন খুলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন এমন সময় চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে একটা পোড়া বিড়ি! এখানে বিড়ি! এখানে বিড়ি এল কী করে? তাঁর নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন তো ওঠেই না—এখানে এমন কোনো অনভিজাতেরও আবির্ভাব ঘটে না যাদের রুচিটা ওই স্তরে গিয়ে নেমেছে। খুব সম্ভব তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো কর্মচারী এখানে এসে বিড়ি টেনেছে। নাঃ, ছোকরা সাব-এডিটারগুলো আজকাল কিঞ্চিৎ বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। ওদের জনকয়েককে একটু পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

এক টুকরো পোড়া বিড়ি। বিতৃষ্ণভাবে তার দিকে বার কয়েক তাকাতেই হঠাৎ কী হল কে জানে। অফিসটা আশ্চর্যভাবে নিঃশব্দ, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি চলছে, ঘরের মধ্যে একটা শান্ত কোমল ছায়া নেমে এসেছে। নিঃসঙ্গ ম্যানেজিং এডিটারের চোখের সামনে যেন একটা মিলনান্তক কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ে ছিল—একটা দমকা বাতাসে তার অনেকগুলো পাতা সামনের দিকে ফরফর করে উলটে গেল। চলে এল একেবারে প্রথম অধ্যায়ে—যখন দ্বন্দ্ব, যখন দুঃখ, যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—যখন এই রকম একটা আধপোড়া বিড়িও অন্যের কাছ থেকে তাঁকে ধার করে নিতে হত—

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটা মেসবাড়ি। পুরনো বাড়ি—সস্তার মেস। আর সব চাইতে সস্তা নিচের তলার এই প্রায়ান্ধকার ঘরখানা। সামনেই স্নানের বড় চৌবাচ্চাটা, আটটা বাজতে না বাজতেই পাঁচ-সাতজন গামছা পরে পরমোৎসাহে স্নান-পর্ব শুরু করে দিয়েছে। তারই একদিকে ঝি নোংরা বাসনের ডাঁই নিয়ে বসেছে, ছাই আর উচ্ছিষ্টের মিলনে একটা বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ওখানে।

এরই মুখোমুখি ঘরখানা। সামনে দুটো দরজা ছাড়া তিনদিকের নোনাধরা দেওয়ালে ও-সবের আর বালাই নেই কিছু। চোখে যথেষ্ট জোর না থাকলে বেলা বারোটার ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরের সময়েও এঘরে বসে লেখাপড়া করা শক্ত। এই ঘরে দু-তিনটে খাট একসঙ্গে জড়ো করে নিয়ে চার-পাঁচটি যুবক প্রচণ্ডভাবে মেতে উঠেছে।

একজন বলছিল, সত্যিকারের অনেস্ট জার্নালিজম আমরা করবই, তার জন্যে যা হবার হোক।

অপরজন জবাব দিলে, মানে সিডিসন। জেল খাটতে হবে।

—বেশ তো, খাটব। সম্পাদক যখন হয়েছি তখন তার জন্যে তৈরিই আছি।

—আর ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি মুদ্রাকর ও প্রকাশক, প্রেস অ্যাক্টের পয়লা ফাঁসটা আমার গলাতেই এসে পড়বে?

—পড়ুক না। খবরের কাগজের ব্যবসা তো করতে নামোনি, নেমেছ দেশের সেবায়। না হয় জেল খাটলেই বা দু-এক মাস—সস্তায় শহীদ হতে পারবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক ভ্রূকুটি করে বললে, হুঁ। তা প্রাণ না দিয়ে শহীদ না হয় এক রকম হওয়া গেল, কিন্তু কাগজের অবস্থা কি খবর রাখো?

—কেন, আজ ক কপি বিক্রয় হয়েছে?

—সাতাশখানা।

মুহূর্তে ঘরের সবাই চুপ করে গেল। দুঃসংবাদ—সত্যিই অত্যন্ত শোচনীয় দুঃসংবাদ।

যে কাগজের পেছনে ওদের যা কিছু উদ্যম আর আগ্রহ ওরা নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েছে, যার প্রতিটি অক্ষরে ওরা সঞ্চার করতে চেয়েছে বিদ্রোহী যৌবনের বিপ্লবী আগ্নেয় মন্ত্র, তার আবেদন মাত্র সাতাশজন ক্রেতার কাছে গিয়ে পৌঁছুল! যতই আত্মবিশ্বাস থাক এ সংবাদ মনকে পীড়িত করে—স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে দেয়। মনে হয় বৃথা চেষ্টা, মনে হয় ওদের ক্রান্তিকারী বাণীকে গ্রহণ করবার জন্যে দেশ এখনো তৈরি হয়নি।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক ব্যঙ্গভরে বললে, ডোমিনিয়ান স্টেটাসের ওপরে তোমার অমন জ্বালাময় লীডারটা মাঠেই মারা গেল শশধর। কেউ পড়লে না।

আহত দৃষ্টিতে সম্পাদক শশধর একবার চারদিকে তাকালো। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে, চোখে পুরু চশমা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। সমস্ত চেহারার মধ্যে দৃঢ়তা, নিষ্ঠা আর সন্ন্যাসীর মতো তপশ্চারণের একটা ব্যঞ্জনা যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মৃদুকণ্ঠে শশধর জবাব দিলে, কাল বত্রিশ কপি বিক্রি হয়েছিল, আজকে পাঁচখানা কম। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি নিরঞ্জন—এ দিন আমাদের থাকবে না। কই হে পাবলিসিটি ম্যানেজার—তুমি কী করছ?

পাবলিসিটি ম্যানেজার শ্যামানন্দ একখানা খাটের ওপর সটান লম্বা হয়ে পড়ে নিরাসক্ত ভাবে বিড়ি টানছিল। সংক্ষেপে বললে, হবে—হবে—ঘাবড়াচ্ছ কেন? কনজারভেটিভ কাগজগুলো দেশটাকে করাপ্‌ট করে ফেলেছে, কিছুদিন সময় নেবে বইকি। ওজন্যে কিছু ভেবো না। তা মুদ্রাকর ও প্রকাশক, এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা চটপট করে ফেলো দিকি। শুকনো গলায় চ্যাঁচামেচিটা আর পোষাচ্ছে না।

নিরঞ্জন শুকনোভাবে হাসল ঃ আমার ট্যাঁক ভাই স্রেফ গড়ের মাঠ। যে যার পকেট ঝাড়ো—দ্যাখো কয়েক পেয়ালা হাফ কাপের বন্দোবস্ত হয় কিনা।

চার আনা চাঁদা উঠল—এল এক পয়সা দামের আট পেয়ালা চা, চার পয়সার সস্তা বিস্কুট আর চার পয়সার বিড়ি। হাফ কাপের সঙ্গে সঙ্গেই ফের চাঙ্গা হয়ে উঠল আসর।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিরঞ্জন ক্লান্তস্বরে বললে, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে প্রেসের কিছু টাকা অন্তত না মেটালে কাগজ আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে বলে রাখলাম।

—হবে—হবে—শশধর উঠে দাঁড়ালো ঃ আমি এখন চললাম, মেটেবুরুজে একটা জরুরী কাজ রয়েছে। আমি নিশ্চয় বলছি ভাই আজকের সাতাশখানা বিক্রি একদিন সাতাশ হাজারে নিশ্চয় গিয়ে দাঁড়াবে। এতবড় সত্যটাকে দেশের লোক গ্রহণ করতে পারবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

কথার শেষে শশধরের গলায় আবেগের সুর কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই অপ্রতিভ ভাবে দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শশধর।...

...বিশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু শশধরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই মিথ্যে হয়নি। দেশের লোক অকৃতজ্ঞ নয়, ঘুমন্ত নয়, নির্বোধ নয়। তারই প্রমাণস্বরূপ কাগজের বিক্রি আজ সাতাশখানা মাত্র নয়, সাতান্ন হাজারের কাছাকাছি। আজ কাগজের ম্যানেজিং এডিটার নিরঞ্জন চ্যাটার্জি ভাঙা তক্তপোষে বসে বিড়ি খায় না, অভিজাত অফিসের পুরু কুশনের ভেতর তলিয়ে গিয়ে সে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের ধোঁয়া ওড়ায়।

মানুষকে ভালবাসত শশধর, দেশকে ভালবাসত। সে ভালবাসার মধ্যে ছিল আবেগ,

ছিল নিষ্ঠা, ছিল দৃঢ়ব্রত সন্ন্যাসীর তপশ্চারণা। তাই কলমের মুখেই শুধু আগুন ঝরিয়ে শশধর ক্ষান্ত হয়নি, রিভলভারের মুখেও ঝরাতে চেয়েছিল। তার রাজনীতি শুধু বুদ্ধিজীবীর অলস মস্তিষ্কের সাজানো কথার মালাই ছিল না, নিজের জীবনের জ্বালা দিয়েই সে তা গ্রহণ করেছিল, শুধু কালিতে কলম ডুবিয়েই সে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে চলেনি—নিজের রক্তের অক্ষরে লিখে রেখে গিয়েছিল তার আদর্শ ও বিশ্বাসের বজ্রবাণী।...

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আরো জোরে নেমেছে—আকাশের কোন্ একটা অলক্ষ্য প্রান্ত থেকে গুম্ গুম্ করে ভেসে আসছে মেঘের ডাক। মনে পড়ল, অমনি করেই শশধরের পিস্তল সেদিন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল। পার্ক-সার্কাসের বাড়িটাকে ঘেরাও করেছে পুলিস—ভেতর থেকে বিপ্লবীদের পিস্তল আর বাইরে থেকে পুলিসের বন্দুক সমান তালে গর্জন করছে, চলছে দস্তুরমতো খণ্ডযুদ্ধ। এমন সময় পেছন দিককার একটা জলের পাইপ বেয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করেছিল শশধর। নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে এল পুলিসের বুলেট—প্রায় দোতলার ওপর থেকে নিচের বাঁধানো উঠোনে শশধর আছড়ে পড়ল। কিন্তু তখনো তার হাতের মুঠোতে পিস্তল শক্ত করে ধরা, আর সে পিস্তলের মুখ থেকে পিঙ্গল বর্ণের অল্প অল্প ধোঁয়া তখনো বেরিয়ে আসছে।

মারা গেল শশধর, কাগজও বন্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের জন্যে। জেলে গেল শ্যামানন্দ, শ্রীপতি, অজয়। শুধু নিরঞ্জনের গায়ে আঁচড় লাগল না—প্রমাণ ছিল না বলে। দালালীর চেষ্টায় ফাটকা বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগল নিরঞ্জন।

তারপরে আবার দৃশ্যপট বদলালো।...

দু-তিনটি ছেলে, উস্কোখুস্কো চুল। মুখে কর্মব্যস্ত ক্লান্তির ছাপ। দেখা হয়েছিল হ্যারিসন রোডের জ্ঞানবাবুর আদি চায়ের দোকানে।

—আপনি নিরঞ্জন চ্যাটার্জি, না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—'অগ্নিহোত্রী' কাগজের আপনিই তো প্রকাশক ছিলেন?

—ঠিক ধরেছেন। আপনারা?

—ভয় নেই, পুলিসের লোক নই।—ছেলেরা হেসে উঠল ঃ আসুন না কাগজটাকে আবার চালু করা যাক।

—ফিন্যান্স করবে কে?

—আমরা বন্দোবস্ত করব। অমন একটা কাগজ—বাংলা দেশের একটা সত্যিকারের সংবাদপত্র, ওকে অমন অকালে মরতে দেওয়া দেশ ও জাতির কলঙ্ক। আমরা ওকে রিভাইভ করব।

—আপনাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অগ্নিহোত্রীর মিলবে কি?

—কেন মিলবে না?—দলের যে ছেলেটি এগিয়ে এসে কথা বলছিল, উৎসাহে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ঃ আমরা মিলিয়ে নেব। এটা তো বুঝতে পারছেন, গরম গরম রাজনীতির যুগ চলে গেছে? বোমা পিস্তলের পথে অত সহজে স্বাধীনতা আসবে না। এখন পিপ্‌লের ভেতরে কাজ করতে হবে। রাজনীতির আদর্শ বদলে যাচ্ছে, দেশ এগোচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবের পথে। 'অগ্নিহোত্রী'ই বা পিছিয়ে পড়বে কেন?

ঠিক কথা। 'অগ্নিহোত্রী' পিছিয়ে পড়ল না। আবার একদিন বাংলার সংবাদপত্র জগতে মহাবিপ্লবের বাণী নিয়ে সে আবির্ভূত হল।

টাকা কোথা থেকে এল? সে একটা আশ্চর্য রহস্য। এরা বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু মন্ত্রবলে কোত্থেকে টাকা আসতে লাগল—অদ্ভুত! টাকা দিলে মজুরেরা, দিলে কুলিরা, দিলে কেরানীরা, দিলে দেশের নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষেরা। এই সমস্ত মূক-মানুষের রক্তরাঙা মর্মকাহিনী বয়ে 'অগ্নিহোত্রী' আবার দেশকে ডাক দিলে।

এবার কিন্তু অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গেল।

বেরোবামাত্র হু হু করে কাটতে লাগল কাগজ। ছেপে কুলিয়ে ওঠা যায় না এই রকম ব্যাপার। ছোট প্রেস, ছোট আয়োজন। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি ছাপা যায় না—কিন্তু চাহিদা পাঁচ গুণ। এবারে লাভ হতে লাগল।

এল রাজদ্রোহ—পাঁচশো টাকা জরিমানা হল কাগজের। কিন্তু ফলে কাটতির আর সীমা-সংখ্যা রইল না। ছোট প্রেস বড় হল—হাতে চালানো ফ্ল্যাট মেশিন হল ইলেকট্রিক মেশিন। দেশের প্রগতিপন্থী কাগজগুলোর মধ্যে 'অগ্নিহোত্রী' নিজের একটা যথাযোগ্য স্থান করে নিলে।

কিছুদিন বেশ চলল, আবার দেখা দিলে রাজদ্রোহ। এবার জরিমানা হাজার, তার সঙ্গে দশ হাজার টাকা জামানত।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নিরঞ্জন।

ধার করে টাকা দেওয়া হল বটে, কিন্তু কাগজ আর চলে না। লাভের অঙ্ক দূরে থাক—দেনা শোধ করতে গেলে মেশিনের স্ক্রু-বলটু সুদ্ধু নিয়ে টানাটানি পড়ে। উপায়?

সেই ছেলেটি—প্রবীর—সেই-ই এসে সামনে দাঁড়ালো। বললে, আমি ব্যবস্থা করছি।

পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল প্রবীর। —শ্রমিক ভাই মজুর ভাই, তোমরা সাহায্য করো। তোমাদের কাগজ, তোমাদেরই জিনিস। তোমরা না বাঁচালে একে কে বাঁচাবে?

কিন্তু কতটুকু তাদের শক্তি—কীই বা সামর্থ্য? কেউ দিলে একদিনের মজুরী, কেউ দিলে নিজের অত্যন্ত সখের পাঁচ-আনি সোনার আংটিটা। সাহারায় শিশির।

প্রবীর তবু বললে, ভয় করবেন না, আমরা ঠিক করে নেব।

আহার নেই, নিদ্রা নেই, কাগজের জন্য প্রাণপাত করতে লাগল প্রবীর। কিন্তু কোনোদিকে কিছুমাত্র আশার আলো অবশিষ্ট নেই। কাগজ ডুবল।

বেশ মনে পড়ছে, তখন সন্ধ্যা। অফিসে একা চুপ করে বসেছিল নিরঞ্জন। এমন সময়ে বাইরে মোটর থামল। নিরঞ্জন চমকে উঠল। ঘরে ঢুকলেন বাংলার একজন প্রসিদ্ধ ধনপতি। এঁর অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার ওপরে বহু অগ্নিবাণই বর্ষণ করছে 'অগ্নিহোত্রী'।

কী কী কথা হয়েছিল সবটা মনে নেই। তবে শেষের আলোচনাগুলো স্মৃতির পটভূমিকায় এখনো অগ্নিরেখার মতো জ্বলজ্বল করে।

—মাপ করবেন, আমাদের যে আদর্শ—

—আহা, আদর্শভ্রষ্ট হতে তো কেউ বলছে না। শুধু অধমের সম্পর্কে ও ধরনের কটু মন্তব্যগুলো না করলেই বাধিত হবো।

—দেখুন, সত্যের ভিত্তিতে আমাদের এই কাগজ—

—ব্যাস, থামুন থামুন। অত সত্যের গোঁড়ামি নিয়ে কাগজ চালাতে পারবেন না, পলিটিক্‌স তো নয়ই। আরে মশাই, দেনার দায়ে যদি কাগজই আপনার উঠে যায়, তা হলে সত্যের সেবা করবার সুযোগ পাবেন কোথায়?

—কিন্তু—

—আর কিন্তু কিন্তু করবেন না। আপনারা ছেলেমানুষ, বয়স কম। আপনাদের মতো রাজনীতি এককালে আমরাও ঢের করেছি, জানলেন? তার চেয়ে পথে আসুন। আমার কথা শুনুন—সব দিক দিয়ে ভালোই হবে—

চেকের অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমশ নিরঞ্জ ' যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছিল। ধনকুবের যখন উঠে গেলেন, তখন তার বোধ আর বিবেচনাশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছে। তার মাথার মধ্যে রক্তোচ্ছ্বাস সমুদ্রের ফেনিল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে চোখ-কান। মোটরের শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তখনও যেন তার শিরাপেশীর ভেতরে দূর-বিলীন সেই শব্দটার অনুরণন শোনা যাচ্ছে।

খবর পেয়ে ছুটে এল প্রবীর। প্রবীর নয়, একটা আগুনের হল্‌কা।

—এ আপনি কী করলেন?

—ভালোই করেছি। উপায় ছিল না এ ছাড়া।

—আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—আপনি বিট্রেয়ার।

—মুখ সামলে কথা কইবেন প্রবীরবাবু।

—মুখ সামলে কথা কইব! নিশ্চয় না, আপনাকে আজই কাগজ ছেড়ে যেতে হবে নিরঞ্জনবাবু।

—কেন?

—এ কাগজের যোগ্য নন আপনি। সুবিধাবাদীর জায়গা নেই এখানে। এ সর্বহারার কাগজ, এ দেশের লাঞ্ছিত মানুষদের কাগজ—

নিরঞ্জনের উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ মস্তিষ্কে শয়তান সাড়া দিয়ে উঠল।

—না, এ আমার কাগজ।

—আপনার?

নিরঞ্জনের মুখে শয়তান হাসতে লাগল। আমার কাগজ—আমার। কাগজে কলমে তার প্রমাণ আছে, আইন তার সাক্ষী দেবে। দরকার হলে আপনারা আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন।

বজ্রাহত প্রবীর পাণ্ডুবর্ণহীন মুখে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

—একথা আপনি বলতে পারলেন?

—পারলাম। এ আমার কাগজ, আমি এর মালিক। যা খুশি আপনারা করতে পারেন এখন।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর। তারপর আস্তে আস্তে নেমে গেল অন্ধকারের ভেতরে। একটি কথাও আর তার মুখে যোগাল না।

তারপর? তারপর আর একটা নতুন কাগজ চালাতে চেয়েছিল প্রবীর। চলেনি। 'অগ্নিহোত্রী' ফেঁপে উঠল, ফুলে উঠল—প্রখর আর প্রচণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল দাবাগ্নির

মতো, ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটা ক্রমে স্ফীতকায় হয়ে চলল। নিরঞ্জন জমি কিনলে বালিগঞ্জে। আর প্রবীর?...

...বৃষ্টি চলছে তেমনি ভাবেই। পথের ওপরে দেখতে দেখতে একহাঁটু ঘোলা জল জমে গেছে, পাশের বস্তি থেকে কয়েকটা নোংরা ছেলেমেয়ে বেরিয়ে সেই জলে খেলা করছে। নির্জন অফিস ঘরের পুরু কুশন-আঁটা চেয়ারে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে ম্যানেজিং এডিটার ভাবছিলেন—আর প্রবীর?

অমনি একটা বস্তির খোলার ঘরেই মুখে রক্ত তুলে মরে গিয়েছিল প্রবীর। ব্যাঙ্কে ফাঁপছিল 'অগ্নিহোত্রী'র টাকা, কিন্তু মরবার সময়ে তার একফোঁটা ওষুধ জোটেনি।

দৃশ্যপট আবার বদলে গেল।...

...দশ বছর পরের কথা।

রাজনীতির দলাদলি চূড়ান্ত রূপ ধরেছে বাংলাদেশে। খবরের কাগজগুলো পরস্পরের কুৎসা-প্রচারে মশগুল।

'অগ্নিহোত্রী' আপ্রাণ চেষ্টায় তার পৃষ্ঠপোষক ধনকুবেরটির জয়ঢাক বাজিয়ে চলেছে। এবার ইলেক্‌শনে তাঁর দলকেই যেমন করে হোক ঠেলে অ্যাসেম্বলিতে পাঠাতে হবে।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

ফারপো, ডিনার পার্টি! টেবিলে দামী বিলিতী-খাদ্যের সমারোহ।

—আপনি আমাদের জন্যে একটু ফাইট করলেই হয়ে যাবে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে নিরঞ্জন বললে, কিন্তু এতকাল উনি পেট্রোনাইজ করে আসছেন—

—করলেই বা। দেখুন, দেশের লোকে ওঁকে আর চায় না। তা ছাড়া, রিয়্যালি, he is a dead man in politics ! আপনি কি মনে করেন অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে ওঁরা কিছু করতে পারবেন?

—আপনাদেরই কি বিশেষ সুবিধা হবে?

—হবে না? কী যে বলেন।—উৎসাহের আধিক্যে বক্তা প্রখর হয়ে উঠলেন : আমাদের প্রোগ্রাম তো আপনি জানেন। শুধু হাত তোলবার দল আমরা নই, we know how to fight the diehard autocrats ! আমরা চাই লেবার আর পিজেণ্ট্রির সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে। বড় বড় গালভরা বুলি নয়—স্রেফ ডাল-ভাতের সমস্যার সমাধান!

—হুঁ।

—তা ছাড়া আরো কত দিক আছে দেখুন। এই বাজেট। এ নিয়ে এবার খানিকটা আন্দোলন তুলতেই হবে—এডুকেশন, ভিলেজ রিকনস্ট্রাকশন, রোড ডেভেলপমেণ্ট এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট—

বক্তার মুখে খই ফুটতে লাগল। নিরঞ্জন জানে কোন্ কথার পরে কোন্ কথা আসবে। সব বাঁধা গৎ, সব বাঁধা বুলি। ইলেক্‌শনের মুখে তোতাপাখির আবৃত্তির মতো ওগুলো নির্ভুল নিয়মে বেরুতে থাকে। কিন্তু একবার রিটার্নড হতে পারলেই বিচিত্রভাবে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে যায়,—তখনকার সমস্যা দলীয়, তখনকার সমস্যা ব্যক্তিগত, তখনকার সমস্যা প্রভুত্বের কায়েমি ব্যবস্থার।

সবাই—সবাই একদলের। যারা সত্যি কিছু করতে চায়, তাদের গলার জোর থাকে

না। তারা একঘরে—তারা জাতিচ্যুত। আর তা ছাড়া সত্যিই কিছু করবার দরকার আছে কি? কার সময় আছে, কার আছে মাথাব্যথা? যা হবার আপনা থেকেই হয়ে যাবে, যারা চাপের নিচে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে—আত্মরক্ষার কবচ-কুণ্ডল আর আঘাত করবার অমোঘ অস্ত্র তারাই তুলে নেবে নিজেদের হাতে।

দামী খাবারের টুকরো মুখে তুলতে তুলতে নিরঞ্জন বললে, দেখা যাক।

পরদিন এল একখানা নতুন মোটর। 'অগ্নিহোত্রী'র সম্পাদককে সশ্রদ্ধ উপহার।

তারপর রঙ বদলালো। কতরকম ভাবে, কতবার। লোকে বলে, পরম নিষ্ঠাভরে 'অগ্নিহোত্রী' দেশের সেবা করে আসছে। তার পাঠকসংখ্যা অগণ্য, তার মতামত স্বতঃপ্রমাণ। সাতাশখানা কাগজের বিক্রি আজ সাতান্ন হাজার—দুবার বি. এ. ফেল করা দশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশানি খুঁজে বেড়ানো নিরঞ্জন চ্যাটার্জি আজ কয়েক লাখ টাকার মালিক।...

ম্যানেজিং এডিটারের হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে চোখ পড়ল পাশের খোলার বস্তিটার উপরে। ভাঙাচুরো, জরাজীর্ণ, বীভৎস নোংরা। বিকৃত মনুষ্যত্বের ভগ্নাংশের প্রতীক। ওখানে যারা দিনের পর দিন অপঘাতের জন্যে, অপমৃত্যুর জন্যে প্রহর গুণছে, তাদের কথা—তাদের জীবনের বাণীকেই ঘোষিত করবার জন্যে একদিন 'অগ্নিহোত্রী'র আবির্ভাব হয়েছিল। সেদিন 'অগ্নিহোত্রী' যে দেশকে সেবা করতে চেয়েছিল—সে দেশ এখন বহু দূরে। আজ বস্তি নয়, কারখানা নয়, শ্মশান-বাংলার দুর্ভিক্ষদীর্ণ অজন্মার ধানক্ষেতও নয়। আজ 'অগ্নিহোত্রী'র দেশ তাদের মধ্যেই এসে সীমা পেয়েছে—রাজনীতি যাদের ব্যসন, যারা দামী মোটরে চড়ে, যারা স্বার্থের জন্যে রঙ বদলায়, যারা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট খায়। কিন্তু উপায় নেই, চারতলা বাড়ির রাজকীয় অফিসের কুশন-আঁটা চেয়ার থেকে আর বস্তির কাদায় নামতে পারে না নিরঞ্জন—সামর্থ্য নেই তার, উপায় নেই। ওখানে ছড়িয়ে আছে শশধর আর প্রবীরের রক্ত—ওখানে চিৎকার করে কাঁদছে প্রবীরের বিধবা মা আর শশধরের বিধবা স্ত্রী; কিন্তু এখানে বক্তৃতা— এখানে অ্যাসেম্বলি, এখানে—

রাজনীতির চারতলা—জীবনেরও চারতলা। বস্তি অনেক নিচে, অনেক ছোট। আজ আর তা চোখেও পড়ে না—নামার প্রশ্ন তো কল্পনাতীত।

ম্যানেজিং এডিটার উঠে পড়লেন, আর একটা ব্ল্যাক্ অ্যাণ্ড হোয়াইট সিগারেট ধরালেন। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে এতক্ষণে।

ডিনার

টেবিলটার সামনে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল রমাপতি। সামনে চায়ের পেয়ালাটা ধোঁয়া উড়িয়ে উড়িয়ে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। যে কেউ দেখলে মনে করতে পারত, হয় প্রেমের ব্যাপারে সে বুকে একটা নিদারুণ ঘা খেয়েছে, আর নয়তো সদ্য পুত্রশোকের বেদনায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমি জানি দুটোই অসম্ভব। একথা বরং বিশ্বাস করতে পারি যে সে রাতারাতি

পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাতেই একথা ভাবা চলে না যে সে প্রেমে পড়েছে। মাঝে মাঝে পথচারিণী বা ট্রামে-বাসে সহযাত্রিণী কোনো মেয়ের দিকে তাকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে-থাকা অবস্থায়ও দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সবাই যা ভাবে হয়তো আপনিও তাই ভাববেন। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এদিক থেকে রমাপতি একান্তভাবে খাঁটি—একেবারে শুকদেবের মতোই জিতেন্দ্রিয়। ওর দৃষ্টিটাকে আর একটু সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে সেটা নিবদ্ধ মেয়েটির দিকে নয়, তার গয়নাগুলোর দিকে। না-না, রমাপতি চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। এক ঝটকায় গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের অন্ধকার গলি দিয়ে দৌড় দেবে না—এ ক্ষেত্রেও সে আপনার-আমার মতোই একটি বিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক ভদ্রলোক। আসল কথা, রমাপতি স্পেকুলেশন করে। যুদ্ধের বাজারে এ সম্পর্কে তার ভূয়োদর্শন এবং ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করেছে। চলতি ট্রামে রমাপতির পেছনের সীটে বসে যখন আপনি তার বর্বরতায় রীতিমত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা অনুভব করছেন, ঠিক সেই সময়ে হয়তো রমাপতি তার আগ্রহব্যাকুল শানানো চোখ দুটো মেয়েটির ভারী লকেটটার ওপরে ফেলে ভাবছে ঃ সোনার দাম শীগগিরই আরো কিছু উঠবে কি না এবং যদি ওঠে তা হলে এই সময়েই—

এহেন রমাপতি বিরহী-কবির মতো অথবা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় জর্জরিত দার্শনিকের মতো দু'হাতে মাথা ঢেকে কী ভাবছে জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হল।

এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

ইলেকট্রিকের 'শক' লাগলে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি করেই চমকে উঠল রমাপতি। ডি-সি নয়, একেবারে এ-সি কারেন্টের শক। অদ্ভুত দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমি যেন একটা কবরখানা থেকে উঠে-আসা প্রেতাত্মা অথবা চিড়িয়াখানা ভেঙে পালিয়ে-আসা ক্যাঙারু।

আমি বললাম, ব্যাপার কি হে রমাপতি, তোমার হল কী?

এতক্ষণে যেন আমাকে চিনতে পারল রমাপতি ঃ কে, রঞ্জন নাকি? বোসো।

আমি ওর সামনের চেয়ারটাতে একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসলাম। রমাপতি চায়ের পেয়ালাটা তুলে একটা চুমুক দিলে, তারপর অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকাল জন-বিরল আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলন্ত একটা মিলিটারী কনভয়ের দিকে। চাপা-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল পর পর গোটাকয়েক উত্তেজিত এবং অনুচ্চার্য গালাগালি।

—ব্যাপার কি হে! কার এমন বাপ-বাপান্ত করছ?

—আর কার? ওই মিলিটারীর!

বটে! আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কথাটা অভিমানিনী শ্রীরাধার মতোই শোনাচ্ছে যে। যে জনি-টমি-হ্যারীর প্রেমে রমাপতি এতকাল হাবুডুবু খাচ্ছিল, হঠাৎ তাদের প্রতি এত বীতরাগ কেন? নাকি ভগবানকে শত্রুভাবে ভজনা করবার জন্যে ভক্তের এই লীলাবিলাস?

কিন্তু মুখ দেখে তা মনে হল না। সত্যিই বিপদে পড়েছে রমাপতি—সমস্ত চেহারাটার ওপরে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। চোখের পাতা দুটো দুশ্চিন্তার ভারে আচ্ছন্ন। এক চুমুকেই প্রায় এক পেয়ালা চা সে নিঃশেষ করে ফেলল। একটা সজোর দীর্ঘশ্বাসের শব্দও

যেন শুনতে পেলাম।

রমাপতি বললে, চা খাবে নাকি? আমার জন্যেও নিয়ো এক পেয়ালা।

দু'কাপ চায়ের ফরমাস করলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার হয়েছে কী?

এতক্ষণে সত্যটা আত্মপ্রকাশ করলে : রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরিটা গেল ভাই।

—তাতে কী হল? চাকরিতে তোমার আর কত আসত? যা ব্যবসা করেছ, ব্যাঙ্কে লাখ দুই তো জমিয়েছ নিশ্চয়ই?

রমাপতি ভ্রূকুটি করলে : লাখ দুই?—পরক্ষণে হাতটা ঢুকিয়ে দিলে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে। বার করে আনলে একরাশ বিল—মদের বিল।

বললে, হ্যাঁ, টাকা রোজগার করেছিলাম। পাঁচ লাখ টাকা জমাতে পারতাম আমি। কিন্তু এই এরাই সর্বনাশ করলে আমার—রমাপতির স্বর উত্তেজিত এবং অনুতপ্ত শোনালো ঃ টাকার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোড়ারোগটাও জুটিয়ে ফেলেছিলাম যে। ষোলো টাকার বোতল একশো টাকায় কিনে খেয়েছি—শালাদের খাইয়েছি। ফুটো কলসী দিয়ে জল গড়াতে গড়াতে কখন যে সব ফাঁকা হয়ে গেছে টেরও পাইনি।

আমি হাসব না ব্যথিত হয়ে উঠব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবু আশ্বাস দিয়ে বললাম, ট্রাই ইয়োর লাক এগেন—ঘাবড়াচ্ছ কেন?

রেস্তোরাঁর ছোকরাটা চা দিয়ে গিয়েছিল। রমাপতি এমন আগ্রহভরে তাতে চুমুক দিলে যে মনে হল যে এই এক কাপ চায়ের জন্যেই সে এতক্ষণ আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিল।

—আবার? না ভাই—আই অ্যাম এ ড্রাউনড্‌ম্যান! সে শক্তি আর নেই।

—কেন? বুড়িয়ে তো যাওনি এখনো। বুদ্ধি আছে—উৎসাহ আছে। বুলডগের মতো লেগে পড়ো—চোখ বুজে টাকা চলে আসবে।

—না, ভাই, আর হবার নয়।—সত্যিকারের জলে-ডোবা মানুষের মতোই অসহায় আর মুমূর্ষু মনে হল রমাপতিকে ঃ যুদ্ধ থেমে গেছে, সে মার্কেট আর নেই। কণ্ট্রোল ব্যবসার গলা টিপে ধরেছে। আমি আজ সব দিক থেকে পঙ্গু হয়ে গেছি।

রমাপতি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। দু'হাত দিয়ে পাগলের মতো মদের বিলগুলো উড়িয়ে দিলে হাওয়ায়। বিহ্বল ব্যাকুল গলায় বললে, বলতে পারো এখন আমি কী করব? হোয়াট ক্যান আই ডু! আই অ্যাম এ ডেড ম্যান, রঞ্জন—আমি আর বেঁচে নেই।

কথাটার কী জবাব দেব ভাববার আগেই তাকিয়ে দেখি রমাপতি দ্রুতপায়ে রাস্তায় নেমে গেছে, হাঁটতে শুরু করেছে দিশেহারার মতো। শেষ পর্যন্ত লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি।

আমি ভাবছিলাম রমাপতিকে নিয়ে একটা গল্প লিখব।

গল্প নয়—সত্যি ঘটনা। যুদ্ধের বাজারে এরকম অনেক গল্পই আপনারা জানেন।

কলেজে আমাদের সঙ্গেই পড়েছিল রমাপতি। পর পর তিনবার চেষ্টা করেও যখন আই. এ. পাস করতে পারল না, তখন চলে গেল ফিল্মে। অভিনয় করবার জন্যে অবশ্য নয়। কলকাতার তিন-চারটে স্টুডিয়োতে এক্সট্রা যোগাবার ভার সে নিয়েছিল।

সকালবেলায় বেরুত বাউণ্ডুলের মতো। তারপর সারাদিন প্রায় গোটা কলকাতা চষে বেড়াত। সোনাগাছি-রূপোগাছি থেকে পাঁচী-খেঁদী-পিয়ারীবালাকে এনে রাতারাতি

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সিনেমার অপ্সরী বানিয়ে তোলবার দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তখন পাঁচ আনা করে দিশী মদের বোতল পাওয়া যেত—সুতরাং যা রোজগার ছিল তাতে কখনো অকুলান ঘটেনি।

তারপর এল যুদ্ধ।

সামনে নতুন আলো দেখতে পেলো রমাপতি। দেখতে দেখতে দেশ জুড়ে ভানুমতীর কুহক লেগেছে। কাঁকর হয়ে গেল ভিটামিন 'বি', স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় হয়ে গেল বেনারসী; মানুষের জীবন হয়ে গেল রাস্তার কাঁকর আর মেয়েদের ইজ্জৎ হয়ে গেল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো! নিরামিষাশী গণেশ রক্ষাকালী হয়ে নরবলি নিতে লাগলেন। যুদ্ধের ধোঁয়ায় বিষণ্ণ বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে স্বাক্ষর দিয়ে গেল—সাল তেরশো পঞ্চাশ।

—জয় সিদ্ধিদাতা—বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রমাপতি। লেগে গেল বিনায়কের বলি সংগ্রহ করতে। গজমুণ্ড হেরম্বচন্দ্র ভক্তকে কৃপাবর্ষণ করলেন। পাঁচ আনার ধেনো একশো টাকার হোয়াইট লেবেলে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

কিন্তু একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প পরমহংস হতে না পারলে পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব রমাপতিরও পিছিয়ে থাকা চলল না।

রমাপতির এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত দাদা ছিলেন। এককালে ভালো চাকুরি করতেন, এখন অথর্ব আর অসহায়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে রমাপতি মাঝে মাঝে তাঁকে পাঁচ-দশ টাকা সাহায্য করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই সহায়তায় রমাপতির কপালে শিকে ছিঁড়ল।

সেই দাদা—অর্থাৎ রঘুপতিবাবুর একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল। মেয়েটি কিশোরী—নাম চম্পা। অনেকবার দেখেছি মেয়েটিকে—দরিদ্র বাঙালিঘরের করুণ আর ভীরু একটি ছোট মেয়েকে আপনারা কল্পনা করে নিতে পারেন। মা ছিল না, কাজেই সংসারের সব কাজ তাকেই করতে হত; ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করতে হত; ভাত না থাকলে ফ্যান খেয়ে মাঝে মাঝে পেট ভরাতে হত, রাতের পর রাত জেগে অসুস্থ পীড়িত বাপের পরিচর্যা করতে হত এবং ব্যাধি-জর্জর বিরক্ত বিতৃষ্ণ বাপের বীভৎসতম গালাগালিগুলো নীরব চোখের জলে তাকে সহ্য করে যেতে হত।

রঘুপতি অনেকবার মিনতি করে বলেছিলেন ঃ যে করে হোক মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করে দে রমা। আমি তো আর বেশিদিন বাঁচব না। মেয়েটার অন্তত দুটো মোটা ভাত আর দুখানা মোটা কাপড়ের সংস্থান করে দে।

রমাপতি ঘাড় চুলকোত। এড়িয়ে যাবার জন্যে বলত ঃ হবে, হবে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বিয়ের বয়স তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না—তারপর একটা জরুরী কাজের তাগিদে চটপট সরে পড়ত সামনে থেকে।

তারপর হঠাৎ একদিন রমাপতির খেয়াল হল : সত্যিই তার কর্তব্যে ভয়ংকর ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কারণ ছিল। একটা সাহেবকে কিছুতেই বাগানো যাচ্ছিল না—রমাপতি যতই তাকে সাপটে ধরবার চেষ্টা করছিল ততই সে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছিল পাঁকাল মাছের মতো। অথচ লোকটাকে একবার কায়দা করতে পারলে ভবিষ্যতের পথ একেবারে পরিষ্কার।

অনেক গবেষণার পরে রমাপতি জানতে পারল সাহেব সৌন্দর্যের পূজারী। তবে তার সৌন্দর্য-বিলাসটা একেবারে নিছক মানসিক নয়। বিউটি অব ইণ্ডিয়া তাকে যতটা বিচলিত

করে, তার চাইতে অনেক বেশি রোমাঞ্চিত করে তোলে ইণ্ডিয়ান বিউটি এবং কুসুম যত অনাঘ্রাত হয়, পাঁকাল মাছটা তত বেশি উৎসাহে লাফ দিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে আসে।

সুতরাং পরম স্নেহে রমাপতি একদিন চম্পাকে বিলাতী সিনেমা দেখতে নিয়ে গেল।

ফিরতে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একখানা একশো টাকার নোট যখন রমাপতি রঘুপতির বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিলে, তখন তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয়নি। তিনি শুধু বিস্ফারিত চোখে একবার তাকিয়েছিলেন নোটখানার দিকে—আর একবার রমাপতির মুখের দিকে।

সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারেনি রমাপতি। জীবনে এই প্রথম সে ভয় পেয়েছিল, দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল হত্যাকারীর মতো। আর সেই রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল চম্পা। খবরের কাগজে সে সংবাদটা হয়তো আপনারা পড়ে থাকবেন।

কিন্তু তারপরেই পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ওদিকে কলকাতার কাছাকাছি বড় একটা যুদ্ধের কারখানা বসেছিল। তিনশো টাকা মাইনেতে সেখানে একটা চাকরি মিলে গেল রমাপতির। কাজ বিশেষ কিছু নয়, মাঝে মাঝে এমার্জেন্সী ফায়ার ব্রিগেডকে প্যারেড করাতে হয়, অবসরসময়ে জনি-টমি-হ্যারির সঙ্গে ওড়াতে হয় বোতল আর সিগারেট। এদিকে ব্যবসা, ওদিকে চাকরি—বেশ ছিল রমাপতি।

আড়াই বছর কাটল এই ভাবে। তারপর রমাপতির সঙ্গে দেখা হল চায়ের দোকানে। রমাপতি বলছে : আই অ্যাম এ ড্রাউনড ম্যান রঞ্জন, আমার আর আশা নেই।

লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছিল এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কেন যেন আজ লোকটাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছিল না। নিজের জালে অসহায়ের মতোই সে জড়িয়ে গিয়েছে। এমন অন্যায় নেই যা সে করেনি। এমন পাপ নেই যা করতে তার হাত কেঁপে উঠেছে মুহূর্তের জন্যে। শুধু চেয়েছে টাকা। তাই আজ কেবল একটি মাত্র চম্পা নয়—শত শত চম্পার বিষনিঃশ্বাস অভিশাপ হয়ে এসে তাকে স্পর্শ করেছে। ঝড়ো হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো রাশি রাশি কারেন্সী নোট তার হাতে এসে পড়েছিল, আবার একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তা তেমনি করেই তার হাত থেকে উড়ে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি একটা বিচিত্র কণ্ঠস্বর ঃ আমার আর কোনো আশা নেই, রঞ্জন—আমি মরে গেছি। আই অ্যাম্ এ ড্রাউনড ম্যান! ফাঁপা বেলুন ফুটো হয়ে গেছে, হাজার টাকার নোটগুলো হয়ে গেছে মদের বিল।

আমি কল্পনা করছিলাম ঃ ইছাপুরের একটা জনহীন প্রান্তরের ভেতরে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে রমাপতি। দিকে দিকে দুর্দিন আর দুঃস্বপ্নের পুঞ্জীভূত রূপ নিয়ে নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার, বোবা-রাত্রির বুকের ভেতর থেকে যন্ত্রণার একটা চাপা গোঙ্রানির মতো শূন্য মাঠের ওপর বাতাস আর্তনাদ করছে। সামনে একটা ফ্যাক্টরীর ধ্বংসাবশেষ, অস্থায়ী টিন-শেডের ভগ্নাংশ অন্ধকারে অস্বাভাবিক রিক্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে একটা শ্মশানের পরিবেশ। দূরে ডাকছে শেয়াল, যেন রমাপতিকে ব্যঙ্গ করছে। এরপরে কী করতে পারে রমাপতি, কী তার করা উচিত? একটু দূরে খানিকটা জল অন্ধকার আর নক্ষত্রের আলো বুকে নিয়ে ছল ছল করে দুলে যেন রমাপতিকে ডাকছে ; তাকে ইশারায় আহ্বান করে বলছে—

এই পর্যন্ত আমি লিখেছিলাম। এমন সময় পিয়ন এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটা খুলে আমি বোকা হয়ে গেলাম। আপাতত আর যেখানেই থাক, রমাপতি অন্তত ইছাপুরের মাঠে যে দাঁড়িয়ে নেই এটা নিশ্চিত। চিঠিখানা আর কিছুই নয়—একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র। কাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় চৌরঙ্গী প্লেজার হোমে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে রমাপতি। কারণ অজ্ঞাত।

নিজের লেখা গল্পটার দিকে আমি হতাশ-দৃষ্টিতে তাকালাম।

কারণ যাই হোক, আয়োজনটা ভালই করেছিল রমাপতি।

নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম আমরা তিনজন। আমি, পট্‌লা আর হরেন। পট্‌লা রেশন আপিসের কেরানী আর হরেন স্কুলমাস্টার। জীবনে এমন একটা রেস্তোরাঁয় আমরা কেউ কখনো খাইনি। চারদিকের টেবিলে চুনকাম করা গৌরাঙ্গ মূর্তিগুলি কিছুটা অস্বস্তি না ঘটাচ্ছিল এমন নয়। তবু আমরা রাক্ষসের মতো খাচ্ছিলাম। এমন সুযোগ আর কবে আসবে কে জানে।

দাঁত দিয়ে প্রাণপণে একটা মোটা হাড় চিবুচ্ছিল পট্‌লা—তার চোখ দুটো জ্বলছিল একটা জৈবিক হিংস্রতায়। যেন ভবিষ্যতে মানুষ-খাওয়ার মহড়া দিয়ে নিচ্ছে। বড় একটা চামচেতে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে চক চক করে সুপ খাচ্ছিল হরেন। আমি একটা কাটলেটকে কায়দা করবার চেষ্টা করছিলাম আর রমাপতি কিছুই বিশেষ খাচ্ছিল না—শুধু অখণ্ড মনোযোগে নাইন নাইন্টি নাইন সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম, সেদিন সেই চায়ের দোকানটাতে তবে কাকে দেখেছিলাম! সে কি রমাপতি, না আর কেউ? নাকি পানের সঙ্গে দোক্তার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ায় আমি খেয়াল দেখেছিলাম?

হাড়টাকে কিছু পরিমাণে কায়দা করে পট্‌লা এই তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি রমাপতি, আজকের এই ডিনারটা কী উপলক্ষে? খাচ্ছি তো খুব, কিন্তু কেন যে খাচ্ছি সেটা বুঝতে না পারলে খাওয়াটা জুৎসই হচ্ছে না।

রমাপতি হাসলে ঃ আর কিছু না, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজন।

হরেন সুপ শেষ করে ঠোঁট চাটতে চাটতে বললে, ব্রাহ্মণে অত ভক্তি তোমার নেই বাবা, সে আমরা জানি। কারণটা বলেই ফেলো না—শুনে কান দুটোকে ঠাণ্ডা করি।

রমাপতি তেমনি রহস্যময় ভাবে হাসতে লাগল ঃ ক্রমশ প্রকাশ্য।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন রাত প্রায় নটা। পট্‌লা আর হরেন দুজনেই ভবানীপুরে থাকে, ওরা বাসে উঠে পড়ল। রমাপতি আমাকে বললে, তুমি ট্রামে যাবে তো? চলো তুলে দিয়ে আসি।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা ধরালে রমাপতি আর একটা দিলে আমাকে। দু'জনে নীরবে এগোতে লাগলাম।

কিন্তু অসহ্য কৌতূহলের পীড়ন। আর থাকতে পারছিলাম না।

—বলোই না হে, হঠাৎ এমন করে খাওয়ালে কেন? সেদিন চায়ের দোকানে দেখলাম তোমার ওই দশা, তারপরে আজকে একেবারে বেমালুম ভোল ফিরিয়ে ফেলেছ। এর মানেটা কী?

চৌরঙ্গী রোড ক্রস করে আসছিলাম আমরা। ট্রাফিক-পুলিসের উদ্যত হাতটার দিকে চোখ রেখে রমাপতি বললে, মানে—স্পেকুলেশন।

—বুঝলাম না।

—বুঝবে যথাসময়ে।

রাস্তা পেরিয়ে সবে এ ফুটপাতে এসেছি, হঠাৎ কানে গেল একটা উল্লসিত ধ্বনি : হ্যালো ডস্—ওল্ড রোগ!

রমাপতি চমকে উঠল। ঠিক পাশেই একটা জীপগাড়ি গতিবেগ সংযত করছে। তাতে তিনটি শুভ্র মূর্তি—রমাপতিকে দেখে আনন্দধ্বনি করছে!

—হ্যালো জনি! রমাপতির প্রত্যভিবাদন।

—কাম্ আপ্ ইউ লাকি গাই! ইট্স্ ইম্পর্ট্যাণ্ট!

—ইয়েস, কামিং—

মুহূর্তে রমাপতি জীপগাড়িতে লাফিয়ে উঠল। আমি কিছু বলবার আগেই বিলীয়মান জীপগাড়ি থেকে ভেসে এল ঃ গুড নাইট রঞ্জন—

রহস্য অতল। দিশেহারার মতো বোধ হয় মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল পায়ের কাছে একটা খাম পড়ে আছে—রঙীন খাম। নিশ্চয় রমাপতির পকেট থেকে পড়েছে।

খামটা তুলে নিলাম। খোলা খাম। ভেতরে খানকয়েক কাগজ।

কৌতূহলী মন বললে, রমাপতি হঠাৎ এমন করে খাওয়ালে কেন? ভেতরে নিশ্চয় কোনো ব্যাপার আছে। এই রঙীন খামে হয়তো তার হদিস মিলতে পারে।

খাম থেকে কাগজ বার করলাম—কিন্তু অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কিছুই বোঝা গেল না। খানকয়েক খবরের কাগজের কাটিং—সযত্নে লাল কালি দিয়ে দাগানো। বড়লাট বলেছেন ঃ দেশে দুর্ভিক্ষ আসবে। অ্যাটম বোমার ব্যাপার ও ইরানের তেল নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই লাগাটা অসম্ভব নয়। আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের আশংকায় ভারতবর্ষের সর্বত্র সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রস্তুতি চলেছে।

ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখি একজন মিলিটারী গোরার বাহুবন্ধনে সালোয়ার পরা একটি ভারতীয় মেয়ে। খুব সম্ভব বাঙালি।

মনের ভুলে আচমকা বোধ হল ঃ মেয়েটি চম্পা নয় তো?

প্র্যাকটিস্

শেষ পর্যন্ত গুলিই চালাতে হল।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা তো ছিলই, জনতাও শান্ত ছিল না। উনিশশো বিয়াল্লিশের পর থেকে কী যে হয়ে গেছে, মানুষগুলো গুলিগোলাকে ভয়ই করে না আজকাল। একবার মরলে দ্বিতীয়বার যে আর মরা যায় না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই একবার মরাটাও যে খুব একটা কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়—কী করে লোকে এই সত্যটাকে বুঝে ফেলেছে, আশ্চর্য! একদিন লাল পাগড়ী দেখলে ছুটে পালাতে পথ পেত না, আজ মেশিনগান সুদ্ধু

গাড়ি বোঝাই ফৌজ দেখলেও দূরে থেকে টিট্‌কারী দেয়। ওঃ ক্রাইস্ট—দিনে দিনে হচ্ছে কী এসব! সত্যিই কী কুইট্‌ ইণ্ডিয়াটা একেবারে কথার কথাই নয়!

রাগে গা নিস্‌পিস্‌ করছিল মেজর সাহেবের। বার বার বাঘের থাবার মতো কঠিন মুষ্টিতে সাপটে ধরছিল কোমরের বেল্টে ঝুলানো রিভলভারটাকে, চাপা বিশ্রী গলায় উচ্চারণ করছিল ভয়ংকর একটা শপথ। ভাগ্যিস সভ্য সাদা জাতিদের মধ্যে মানুষের মাংস খাওয়ার রেওয়াজ নেই, নইলে কী যে হয়ে যেত বলা যায় না।

কিন্তু 'হোলি ফাদার' অন্তর্যামী। "পিতা যীশু প্রেম করিলেন" মেজর সাহেবকে। কোথা থেকে ছটাক খানেক ওজনের একটা ঢিল এসে মেজর সাহেবের ভারী মিলিটারী বুটের কাছে ঠিকরে পড়ল। অবশ্য ঢিলটার গুরুত্ব কিছু নেই—একটা পিঁপড়েরও মাথা ফাটত কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'ভায়োলেন্স ইজ অল্‌ওয়েজ ভায়োলেন্স'। অতএব—অতএব মেজর সাহেব গর্জে উঠলেন ঃ ফায়ার।

কয়েকটা বেসুরো ভয়ংকর শব্দে আকাশ পাতাল ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন। খানিক আর্তনাদ, খানিকটা রক্ত। এমন অনেক রক্তই ভারতবর্ষের মাটিতে ঝরেছে—আজও ঝরল। শুধু চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি কিশোরের কঠিন মুঠিতে আঁকড়ে ধরা তে-রঙা পতাকাটা তার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে গেল।

তারিখটা ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারী। ভারতবর্ষের জীবন-পঞ্জীতে একটা লাল তারিখ।

ব্যারাকে ফিরে আর্মড কনস্টেবল অচ্ছয়লাল প্রসাদ ক্লান্ত ভাবে লোহার খাটটার ওপরে বসে পড়ল। ভারী হয়রানি গেছে আজ। ইচ্ছে করছে খাটিয়াটার ওপর গড়িয়ে পড়ে। জীবনে আজ প্রথম গুলি ছুঁড়ল অচ্ছয়লাল। গুলি ছুঁড়ল কংগ্রেসওয়ালা শয়তানদের ওপর, সরকারের দুশমনের ওপর। প্রথম হাতে খড়ি।

কিন্তু গর্ব বোধ হচ্ছে না, গৌরবও নয়। অথচ চাঁদমারী করবার সময়ে ঠিক এই শুভলগ্নটির কল্পনা করে কত রোমাঞ্চিত হয়েছে অচ্ছয়লাল। টিনের চাক্‌তি ফুটো করে তার সুখ নেই, একটা জলজ্যান্ত তাজা মানুষের প্রসারিত হৃৎপিণ্ড ভেদ করে রাইফেলের রিভল্‌ভিং শেল চলে যায়, ফোয়ারার মতো ধারার আগুন-রাঙা রক্তস্রোত উছলে উছলে বেরিয়ে আসে, একটা উৎকট অমানুষিক উল্লাসে ভরে ওঠে মন। আজ সেই শুভদিনটি এসেছিল অচ্ছয়লালের। কিন্তু তবু—তবু!

এ কী হল—কাদের ওপর গুলি চালালো সে! খদ্দরের টুপি পরা, তে-রঙা পতাকা হাতে একদল ছাত্র। তাদের চোখে মুখে আর যাই থাক, দুশমনীর কালো পঙ্কিল ছায়াটা তো চোখে পড়েনি কোথাও! বরং একটা অদ্ভুত আলো, একটা অপরূপ শুচিতায় কচি কিশোর মুখগুলি ঝলমল করছিল। মুহূর্তের জন্যে অচ্ছয়লালের কী একটা মনে পড়েছিল—কী একটা কথা; ঠিক ধরতে পারছিল না, অস্পষ্ট অস্ফুট একটা ছায়ার মতো সঞ্চরণ করছিল তার চেতনার মধ্যে। মুহূর্তের জন্যে কেমন আচ্ছন্ন আর অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অচ্ছয়লাল।

কিন্তু কেটে গেল সেটা। বেখাপ্পা বিসদৃশ একটা গর্জন শোনা গেল ঃ ফায়ার।

প্রতিক্রিয়াটা হল বিদ্যুতের চমকের মতো। রাইফেলের মস্তিষ্ক নেই, সেই রাইফেল দিয়ে যারা মানুষ মারে, তাদেরও বোধবৃত্তি থাকাটা অবান্তর এবং অসঙ্গত। কী ভাবছিল,

ভুলে গেল অচ্ছয়লাল। যান্ত্রিক হাতে ঝড়াং করে যন্ত্রটা উঠে এল। এবং তারপর—

পর পর তিন রাউণ্ড। খানিকটা ধোঁয়া, খানিকটা বারুদের গন্ধ, খানিক রক্ত, খানিক আর্তনাদ এবং প্রবল কোলাহল। কিন্তু যান্ত্রিক মুখে একটা রেখাও ফুটে উঠল না।

লেফট্—রাইট্—লেফট্—রাইট্—

যন্ত্রের মতো তালে তালে পা পড়তে লাগল। অনেক রক্ত ঝরা ভারতবর্ষের জমিতে রাঙা কাঁকর গুঁড়ো করে দিয়ে সবুট পদযাত্রা। কুইট ইণ্ডিয়ার একটা মৃদু প্রত্যুত্তর।

কিন্তু ব্যারাকে ফিরে এসে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে অচ্ছয়লালের। যেমনটি আশা করেছিল, তেমন হল না। কোথায় সুর কেটে গেছে। জয়ের গর্বে নয়, একটা কালো গ্লানির অপচ্ছায়ায় নিজেকে বিতৃষ্ণ এবং অবসন্ন বলে বোধ হচ্ছে। এতদিন লক্ষ্য ছিল সোজা, পরিণতির ইঙ্গিত ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরিচ্ছন্ন। নিমকের গুণ রাখতে হবে—শেষ করে দিতে হবে অন্নদাতা সরকারের দুশমনকে। আজ যেন লক্ষ্যটা কেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, কেবলই মনে হচ্ছে যেমন কল্পনা করেছিল ব্যাপারটা তা ঠিক নয়।

শিবসহায় ঘরে ঢুকল।

—কী দোস্ত, অমন মনমরা হয়ে বসে আছ কেন?

—না, কিছু না।

—শরীর খারাপ?

—না, তাও নয়।

—তা হলে কী? হাবিলদার গাল দিয়েছে?

—উঁহু।

—তবে হল কী?

পাশে বসে শিবসহায় বিড়ি ধরালো একটা, বললে, ওঃ, বুঝতে পেরেছি। বৌয়ের চিঠি পাওনি বুঝি?

—না দোস্ত, ওসব কিছু না—তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলে অচ্ছয়লাল ঃ কেমন খারাপ লাগছে।

—খারাপ লাগছে? তারও দাওয়াই আছে। লছমন সিং অনেকখানি সিদ্ধি বাটছে, এক লোটা খাবে চলো।

সন্ধ্যা নামছে পুলিস ব্যারাকে। সামনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে পাশে জ্বলছে ইলেকট্রিকের আলো। আকাশের কোণে জ্বলছে একফালি চাঁদ। কাঁকরের ওপর কর্কশ আর্তনাদ তুলছে সেন্ট্রির পদচারণা। বাতাসে কয়লার ধোঁয়া ভাসছে, ভাসছে রুটি সেঁকার গন্ধ। ঢোল আর করতালের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে উচ্চণ্ড সঙ্গীত। সীতাহরণের জন্যে শোক করা হচ্ছে :

"যোগী বন্‌কে আয়ে রাবণোয়া
পঞ্চবটী যঁহা সিয়া রহে—"

পুলিস ব্যারাক। কিন্তু এই সন্ধ্যায় ওরা শুধু আমর্ড ফোর্স নয়, ওরা মানুষ। বুট নয়, পটি নয়, পাকা ইস্পাতে তৈরি রাইফেলের নলটাকে ঘষে মেজে আরো পরিষ্কার করাও নয়। এই সন্ধ্যায় ওদের হয়তো মনে পড়ে বিহার অযোধ্যার সেই সব গ্রামের কথা, যেখানে

রাঙা মাটির ওপরে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে অড়হরের ফিকে সবুজ বিস্তার, টুকরো টুকরো জলের ওপর সিঙাড়ার ছোট ছোট পাতা কাঁপছে মেঠো বাতাসে, দূরে একটা পাহাড়ের আনীল ছায়ামূর্তি; রহট্টা ঘুরছে কুয়োর ওপরে—ক্ষেতে ক্ষেতে জল দেওয়া হচ্ছে, মোষে চেপে চলেছে ন্যাংটো ছেলে, টাট্টু হাঁকিয়ে চলেছে তিন বিঘে জমির 'জমিন্দার', চালে চালে দেওয়ালে দেওয়ালে ঘেঁষাঘেঁষি করে ওদের ছোট ছোট গাঁব; সেখানে লাল নিশান উড়ছে কবীরপন্থী সাধুদের আখড়ায়। আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে লীলাচঞ্চলা একটি তরুণী বধূর মুখ—যাঁতায় গম ভাঙতে ভাঙতে 'পরদেশিয়া'র জন্যে যার উদ্বেল মন থেকে থেকে বিষণ্ণ আকুল হয়ে উঠেছে।

লছমনের সিদ্ধি ঘোঁটাটা হয়েছিল ভালো। বেশ আমেজ এসে গেল অচ্ছয়লালের। কিন্তু গুলাবী মৌজে মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল না, সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না সঙ্গীদের অসময়ে জুড়ে দেওয়া একটা অশ্লীল হোলীর গানে। বরং মনে পড়ল সেই তে-রঙা পতাকাটাকে, একটি কিশোরের বুকের রক্তে যেটা টকটকে রাঙা হয়ে গেছে।

আর মনে পড়ল সেই কথাটা,—যে কথাটা তখন সে মনে করতে পারেনি, যে কথাটা একটা বুদ্বুদের মতো ভাবনার কালো স্রোতের ওপরে ফুটে উঠতে গিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল...

...তালুকদার সূরযনারায়ণ। জাতে রাজপুত, রাজপুত্রের মতো মেজাজ। তার দোর্দণ্ডপ্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। দেহাতী মানুষরা তাকে ভয় করত যমের মতো। জঙ্গলে যে সব ময়ূর আর হরিণ বসবাস করে, এ অঞ্চলের লোক পারতপক্ষে তাদের শিকার করে না, কাউকে শিকার করতে দেয়ও না। কিন্তু এ সব সংস্কারের অনেক উর্ধ্বে সূরযনারাণ। বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে শিকার করতে যায় সে, দিনান্তে রক্ত-রাঙানো হাতে কড়া চাবুক চালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসে।

এ হেন সূরযনারাণের অকৃপা হল জগলালের ওপর।

অপরাধের মধ্যে জগলালের একটা রাত-চরা ঘোড়া ছিল। বেশ তেজী জোয়ান ঘোড়া। জোর কদমে ছুটতে পারত, দল বেঁধে সবাই মিলে গঞ্জের হাটে কলাই বিক্রি করতে যাওয়ার সময় সে ছুটত সকলের আগে আগে। আদর করে জানকী— জগলালের মেয়ে জানকী তার নাম দিয়েছিল 'বাহাদুর'।

জানকী! আজ পনেরো বছর হতে চলল, কিন্তু অচ্ছয়লাল জানকীকে ভোলেনি। ভোলবার উপায় নেই। প্রথম প্রেম—কিশোর প্রেম।

তখন প্রায় বছর বারো জানকীর বয়েস। ওদের দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী অরক্ষণীয়া কন্যা। কিন্তু সব দিক থেকেই কেমন একরোখা মানুষ ছিল জগলাল। সে সোজা জবাব দিত, কী রকম ছেলের হাতে মেয়ে তুলে দেবো, বড় হয়ে হয়তো চোয়াড় হবে—বাটপাড় হবে। তখন তো তোমরা আমার মেয়েকে দেখতে আসবে না। তার চাইতে সময় হলে ভালো ছেলে দেখেশুনে বিয়ে দেব, আমার একমাত্র বেটি ভবিষ্যতে কোনো কষ্ট যেন না পায়।

গাঁয়ের লোক ছি ছি করেছে বটে, কিন্তু তার বেশি কিছু বলবার সাহস পায়নি। নামজাদা কুস্তিগীর জগলাল। ল্যাঙট পরে, সারা গায়ে ধুলোমাটি মেখে যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখায় যেন মহিষাসুরের মতো। অমন পালোয়ান আশপাশের ভেতরে

তারই মেয়ে জানকী। বেশ শ্রীমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। সুগঠন শ্যামবর্ণ শরীর প্রাণের উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চুলগুলো মাথার ওপরে ঝুঁটির মতো বাঁধা, ছুটাছুটি করবার সময় পুরুষের মতো মালকোঁচা এঁটে কাপড় পরে।

ক্ষেতে তখন মহিষ চরায় অচ্ছয়লাল। বাঁশি বাজায়। রামলীলায় সীতা সেজে গান করে। আর দুরন্তপনা করে জানকীর সঙ্গে। জল কাদার ভেতরে মাতামাতি করে সিঙাড়া তোলে, বুড়ী রসিয়ার মা'র গালাগালি উপেক্ষা করে তার গাছ থেকে মুসম্মা চুরি করে আনে। দরকার হলে চুলোচুলিও করে জানকীর সঙ্গে।

সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে আজও। শীতের দুপুরের ঠাণ্ডা রোদে কেমন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল অচ্ছয়লালের। মোষটা একটা জলার মধ্যে নেমে জোলো ঘাস খাচ্ছিল আর তার পিঠের ওপরে বসে ঝিমুচ্ছিল অচ্ছয়লাল।

—ঠক্—

কোথা থেকে ছোট একটা ঢিল উড়ে এল, লাগল অচ্ছয়লালের কপালে। ঘুমের চটকাটা ভাঙতে চোখে পড়ল অদূরে একটা মোটা শিশু গাছের আড়ালে একখানা লাল শাড়ির প্রান্ত, বাতাসে ভেসে এল এক ঝিলিক মিষ্টি হাসি।

মোষ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল অচ্ছয়লাল। তারপর অপরাধিনীকে ধরতে এক মিনিটও সময় লাগল না।

ধরা পড়ে জানকী বলল, আমি—মারিসনি বলে দিলাম।

—কেন মারব না? কার ভয়ে?

—ভয়ে আবার কার? বন্ধুকে কেউ মারে নাকি?

—বন্ধু!

—হ্যাঁ। বাবা বলছিল তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে।

মনে আছে দিনের রঙটা বদলে গিয়েছিল সেদিন, বদলে গিয়েছিল আকাশের রং। রহট্টার শব্দের সঙ্গে সেদিন গানেব সুর মিশে গিয়েছিল, বাঁশি বেজে উঠেছিল বাতাসে শিরশির করা গহুমের শিসে শিসে।

এল তালুকদার সূরযনারায়ণ। গানের সুর কেটে গেল, বাঁশি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁকর মেশানো রাঙা মাটিতে।

সেই ঘোড়া—সেই রাত-চরা বাহাদুর। দড়ি ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল—পেট ভরে ফলার করলে সূরযনারাণের পাকা গহুমের ক্ষেতে।

অসুরের মূর্তি ধরলে সূরযনারাণ। জগলালকে কিছু বললে না, বাঁধলে বাহাদুরকে। তারপর সমস্ত গাঁয়ের লোকের সামনে নিজের হাতে বাহাদুরকে চাবুক মারতে শুরু করলে।

সে দৃশ্য ভোলবার নয়।

সূরযনারাণ যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল—প্রচণ্ড রকমে নেশা করেছিল বোধ হয়। একটা হিংস্র সংকল্পে চোয়াল দুটো এঁটে বসেছিল এক জোড়া খিলের মতো। আর শাঁই শাঁই করে চলছিল তার হাতের চাবুক—বাতাসের বুক চিরে শিসের মতো উঠছিল একটা তীব্র নিষ্ঠুর শব্দ।

কিসের চাবুক সেটা কে জানে। সরু একটা লম্বা ল্যাজের মতো—সারা গায়ে তার কাঁটা। চাবুকের প্রতিটা আঘাত ছুরির আঁচড়ের মতো পড়ছিল বাহাদুরের সর্বাঙ্গে। দরদর করে ঝরছিল রক্ত, চিকণ মসৃণ লোমের ভেতরে ঘামের চূর্ণ বিন্দু এসে জমছিল—যন্ত্রণার প্রতীক।

আর লাফাচ্ছিল ঘোড়াটা—চিৎকার করছিল অস্বাভাবিক ভাবে, চাঁট ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। সূরযনারাণের মুখে ফুটে উঠছিল শয়তানের একটা কুটিল সরীসৃপ হাসি।

সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের লোকের মুখ দিয়ে আর কথা ফুটছিল না।

কিন্তু আর পারল না জগলাল। একটা হিংস্র চিৎকার করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল— করে বসল একটা কল্পনাতীত দুঃসাহসিক ব্যাপার।

মুহূর্তে সূরযনারাণের চাবুকটা চলে এলো জগলালের হাতে। বাতাস চিরে উঠল পরপর কয়েকটা তীব্র শিসের শব্দ। রক্তাক্ত মুখটা দু'হাতে চেপে সূরযনারাণ বসে পড়ল।

সারা গায়ে একটা মুঠো ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে কুস্তিগীরেব মতো উরু চাপড়াতে লাগল জগলাল। জগলাল? না মহিষাসুর। গর্জন করে বলতে লাগল ঃ আও আও, চলা আও—

কিন্তু সূরযনারায়ণ সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

পরক্ষণেই হতভম্ব জনতার মুখের ওপর দিয়ে বাহাদুরকে ছুটিয়ে চলে গেল জগলাল।

সকলে আশঙ্কা করছিল, ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। থানা পুলিস হবে, পাঁচ বছর জগলালকে হাজত ঘুরিয়ে আনবে সূরযনারাণ। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই হল না। জগলাল বুক ঠুকে বলতে লাগল ঃ কেয়া করে গা শালা? উসকো জান লে লেঙ্গে—

কিন্তু জগলালের চওড়া বুকটাও একদিন ভাঙল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুরি হয়ে গেল জানকী। জানকী—অচ্ছয়লালের প্রথম প্রেম—কিশোর প্রেম। নীল আকাশ থেকে বাজ পড়ল।

সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন ঢের দেরি হয়ে গেছে। তখন সূরযনারাণের খোঁড়া চাকরটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে জানকীর। তার সমস্ত মুখটা মেটে সিঁদুর আর চোখের জলে একাকার হয়ে গেছে।

বন্দুক বাগিয়ে সূরযনারাণ বললে—নিকালো।

জগলাল মামলা করতে চাইলে, কিন্তু সূরযনারাণের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি ছিল না কেউ। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদটা কেউ পছন্দ করেনি। তাদের অপরাধ ছিল না।

অচ্ছয়লালকে সঙ্গে করে থানায় গিয়েছিল জগলাল। সে তখন বদ্ধ উন্মাদ। খালি চিৎকার করেছিল ঃ জান্ লে লেঙ্গে, উস্‌কো জান লে লেঙ্গে—

থানার দারোগাও জবাব দিয়েছিল সূরযনারাণের ভাষায়। সেও কালো একটা বন্দুকের নল জগলালের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—নিকালো।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রেখেছিল জগলাল। সত্যিই জান নিয়ে নিয়েছিল সে। তবে সূরযনারাণের নয়, সেই খোঁড়া চাকরটার। আরা জেলে জগলালের ফাঁসি হয়েছিল।

আর জানকী? তার খবর আর কোনোদিন এসে পৌঁছয়নি অচ্ছয়লালের কাছে।...

...হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে শিবসহায়।

—কী দোস্ত, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চটকা ভেঙে কেমন বিহুল দৃষ্টিতে অচ্ছয়লাল তাকালো।

—খুব নেশা ধরেছে বুঝি? চলো, চলো, শুয়ে পড়বে চলো।

রাত্রে ক্রমাগত আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখতে লাগল অচ্ছয়লাল। সূরযনারাণ আর থানার দারোগার মুখ বারে বারে একাকার হয়ে যাচ্ছে—আর কেন কে জানে, ভেসে উঠছে মেজর সাহেবের মুখখানা।

শেষ রাত্রে যখন অচ্ছয়লাল উঠে বসল, তখন ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আর অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনার পীড়নে ক্রমাগত কাঁপছে হাতের আঙুলগুলো। কাঁচের জানালা দিয়ে হালকা চাঁদের আলো পড়েছে তার ঘরে, সে আলোয় তার রাইফেলটা ঝকমক করে উঠছে। এইটেই কি সে দেখেছিল সূরযনারাণের হাতে, সেই দারোগার হাতে?

তে-রঙা পতাকাটা লাল হয়ে গিয়েছিল বুকের রক্তে। সেই রক্তের সঙ্গে জানকীর কপালের মেটে সিঁদুরের প্রলেপটার কোথাও কোনো সাদৃশ্য আছে কি?

* * *

ঘটনাটা ঘটল তার পরের দিন, সকাল বেলায়।

চাঁদমারী হচ্ছিল। পেছনে ছোট একটি মাটির পাহাড়—সামনে চাঁদমারির চাক্‌তি। আর্মড্ ফোর্স প্র্যাক্‌টিস করছে। ওই চাকতি ফুটো করে হাত তৈরি করতে হবে। জলজ্যান্ত মানুষের তাজা হৃৎপিণ্ড ভেদ করবার লক্ষ্য। সরকারের দুশমনকে নিপাত করে দিয়ে নিষ্কণ্টক করে দিতে হবে শাসন-ব্যবস্থা।

—গুড়ুম—গুম্-গুম্—

গুলি ছুটছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা—ভাসছে উৎকট বারুদের গন্ধ।

রাইফেল তুলে নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে যাচ্ছিল অচ্ছয়লাল। হঠাৎ কেমন করে একটা বিশ্রী হোঁচট খেল সে। পরক্ষণেই একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা হতে হতে রক্ষা পেয়ে গেল।

হাতের থেকে ছুটে গিয়েছে রাইফেলের গুলি। আর গিয়েছে একেবারে মেজর সাহেবের কানের পাশ দিয়ে। একটু হলেই খুলিটা সুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যেত।

খুব খানিকটা হৈচৈ হট্টগোল। মেজর সাহেব তখনো কাঁপছিল। কাঁপুনি থামলে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দিলে অচ্ছয়লালের গালে।

শালা উল্লু, ক্যায়সা প্র্যাকটিস কিয়া এত না রোজ? আভিতক ঠিক্‌সে ঠহ্‌রানে নেহি জানতা? থোরেসে মেরা জান বচ্ গিয়া—

কিন্তু যেটা হঠাৎ হয়ে যায়, সেটা নিতান্তই হঠাৎ। ওজন্যে বেশি গণ্ডগোল করে লাভ নেই। শিবসহায় সান্ত্বনা দিয়ে বললে, গোলাগুলির ব্যাপার—একটু হুঁসিয়ারীর সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে হয় ভাই—নইলে সব গড়বড় হয়ে যেতে পারে—

ঠিক কথা—সব গড়বড় হয়ে গেছে। অচ্ছয়লালের হাত এখনো প্র্যাক্‌টিস হয়নি।

ধন্বন্তরি

চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্সারী।

দাতব্য চিকিৎসালয় বলেই দাতার হস্ত অকৃপণ নয়; রিমাইণ্ডার দিতে দিতে ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ.-এর কলমটার নিব অর্ধেক হয়ে এসেছে। লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইলগুলোর ওপর ধুলোর স্তর জমছে দিনের পর দিন—সেগুলো খুলে ঘাঁটবার মতো সময় নেই কারো—উৎসাহও না।

ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ. কিন্তু দমবার পাত্র নন। শেষ পর্যন্ত হুঙ্কার ছাড়লেন, কম্পাউণ্ডারবাবু?

পাশের কম্পাউণ্ডিং রুম থেকে বিবর্ণ কাটা দরজাটা ঠেলে কম্পাউণ্ডার যতীন সমাদ্দার প্রবেশ করলে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় মাসে আটাশ টাকা মাইনে পায় লোকটা। বাদুড়চোষা শরীর, মাথার শাদা-কালো চুলগুলো সমান মাপে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটাই করা—যেন শুয়োরের গায়ের রোঁয়া। কপালে একটা মস্ত আব, তার ওপর দু-তিনগাছা চুল গজিয়েছে। তোবড়ানো গাল, চোখের কোটরে কালির পোঁচড়া। গায়ের ময়লা ফতুয়ার দুটো বোতাম ছেঁড়া, হাঁটু পর্যন্ত তোলা কণ্ট্রোলের ধুতির নিচে বকের মতো সরু সরু দুটি পা ক্যাম্বিসের ফিতেহীন জুতোয় অলঙ্কৃত হয়ে আছে।

কম্পাউণ্ডার যথানিয়মে বিনয়াবনত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—ডাকছিলেন আমাকে?

—হ্যাঁ, দেখুন তো মশাই একবার কাণ্ডটা। এত লেখালেখির পরে জবাব দিচ্ছে ঃ our attention is drawn to the matter ! রসিকতারও একটা সীমা তো থাকা দরকার।

উত্তরে কী বলা উচিত ভেবে পেল না কম্পাউণ্ডার।

টেবিলে একটা কিল মেরে খগেন ডাক্তার বললেন, চালিয়ে যান ওই সিঙ্কোনা আর কার্মিনেটিভ মিক্‌শ্চার। কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার, ম্যালেরিয়া, নিমোনিয়া—যাতে লাগে। যেটা বাঁচে বাঁচুক, বাকিগুলো মরে হেজে ডিস্‌পেন্সারীর ভিড় হালকা করে দেবে।

জীর্ণ চেহারার মতো জীর্ণ গলায় আটাশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডার বললে, আজ্ঞে।

—আর শুনুন। ছোট আলমারির চাবিটা আমাকে দিয়ে দেবেন।

কম্পাউণ্ডার চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। ভীরু দুটো চোখের সঙ্গে মিলল কুটিল তীক্ষ্ণ চোখের সন্ধানী দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে সিগারেট দুলিয়ে এক ধরনের বিচিত্র চাপা গলায় ডাক্তার বললে, শুনছি ভালো দু-চারটে ওষুধ যা আছে সেগুলো নাকি ইঁদুরে খাচ্ছে।

কথাটা রূপক হলেও ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে কম্পাউণ্ডারের ঘোলা চোখ দুটো পর্যন্ত ক্ষণিকের জন্যে চকচক করে উঠল। যেন ওষুধ একাই চুরি করে বিক্রি করে কম্পাউণ্ডার—ডাক্তার একেবারে দেবতার মতো নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। কম্পাউণ্ডারের শীর্ণ স্নায়ুগুলো এক মুহূর্তের জন্যে ধনুকের ছিলের মতো দৃঢ় হয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু আটাশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডার কোনো কথা বললে না, নিঃশব্দে কোমর থেকে চাবিটা খুলে এনে

ডাক্তারের টেবিলে রাখলে, তারপরে কাটা দরজাটা ঠেলে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা এমনভাবে চলে যে পায়ের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না। যেন পৃথিবীকে নিজের অস্তিত্বটুকু জানাতেও সংকোচ বোধ করে সে।

অর্থপূর্ণ গলায় ডাক্তার শুধু বললেন, হুঁ।

ডিস্‌পেন্সারী ছোট—আয়োজনও প্রচুর নয়। কিন্তু ডিস্‌পেন্সারীর দিকে তাকিয়েই মানুষের আধি-ব্যাধিগুলো অপেক্ষা করে থাকে না। ঋতুতে ঋতুতে মহাকবি কাল নির্ভুল নিয়মে তাঁর ঋতুসংহার কাব্য রচনা করে চলেন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত, আমাশয়। ঠোঁটের কোণে সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার দ্রুতগতিতে প্রেসক্রিপসন লিখে যান—একই মিক্‌শ্চার কম্পাউণ্ডারের হাতের গুণে বহুরূপীর মতো রঙ বদলায়। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ—রোগমুক্তি না হোক, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঠেকাবে কে!

ওরই ফাঁকে ফাঁকে রোগী পরীক্ষাও চলে।

—দেখি, জিভ দেখি। আঃ—অতটুকু কেন—লজ্জায় যেন জিভ কাটছে! আরো বার কর, একটুখানি, আর একটু—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এদিকে এসো তো বাপ, পেটটা একবার দেখাও। ওরে বাপরে—পিলে তো নয় যেন দেড়মনী একটা কচ্ছপ। অতবড় পিলে বয়ে ব্যাটা হাঁটিস কী করে?

কথা চলে, লেখাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। কলমটার সুর বাঁধাই আছে—চোখ বুজে কাগজের ওপর ধরে দিলেই নির্ভুল প্রেসক্রিপসন বেরিয়ে আসবে, এমন কি ডাক্তারের দস্তখতটা পর্যন্ত। যেমন ডিস্‌পেন্সারী, তেমনি ওষুধের ব্যবস্থা। দানের উপযোগী দক্ষিণা। আড়াই পয়সায় অক্রূর সংবাদ হয় না।

সার্ভিং রুমে কম্পাউণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের সামনে। এক হাতে মেজার গ্লাস, এক হাতে কাঁচি। টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ, এক শিশিতে গঁদের আটা। মেজার গ্লাসে করে ওষুধ মাপে, কাঁচি দিয়ে দাগ কাটে, কেটে আটা দিয়ে আঁটে। প্রেসক্রিপসনগুলোও আর পড়বার দরকার হয় না আজকাল।

তবু ওরই ভেতরে নিচু গলায় রোগীদের সঙ্গে কথা জমাতে চেষ্টা করে কম্পাউণ্ডার।

—কি রে, তোর ছেলে কেমন আজকাল?

—জ্বর তো ছাড়ে না বাবু। আজ যদি একটু ভালো করে ওষুধ দেন—

—ওষুধ—ওষুধ! আরে ওষুধে কি আর অসুখ সারে! বাড়িতে ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখা, তবে তো?

রোগীর অভিভাবক ম্লান হয়ে যায়। বিষণ্ণ ক্লান্ত মুখের ওপরে স্পষ্ট হয়ে বেদনার নিবিড় ছায়া পড়ে। ক্ষীণ গলায় বলে, দু'টাকা করে ডাক্তারবাবুর ভিজিট লাগবে। কোথায় পাব বাবু?

কম্পাউণ্ডারের খোলা চোখ দুটো অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোভের রেখায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে সমস্ত মুখাবয়ব। একটা অবজ্ঞাবাচক ভঙ্গি করে কম্পাউণ্ডার বলে, আরে চেয়ারে বসে খালি সই করলেই যদি ডাক্তার হওয়া যেত তাহলে তো আর কথাই ছিল না। এ হল হাতে কলমের কাজ। ডাক্তারবাবু তো লিখেই খালাস—কিন্তু ভেবেচিন্তে হিসেব করে ওষুধ কে দেয় শুনি?

—আজ্ঞে আপনি।

—তবে?—কম্পাউণ্ডারের সর্বাঙ্গে বিজয়গর্ব ফুটে ওঠে। লোকটা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে, কম্পাউণ্ডার কী বলতে চায় বোঝবার চেষ্টা করে।

একটা ঢোঁক গিলে কম্পাউণ্ডার তেমনি নিচু গলায় বলে, আর তা ছাড়া দেখছিস তো—একেবারে চামার। চোখের পর্দা বলে বালাই নেই। গরীবের ঘরে ভাত নেই, কিন্তু দু'টাকার কমে উনি কোনো কথা কইবেন না। কাগজে সই করেই দু' দুটো টাকা—এ মামাবাড়ির আবদার নাকি!

বোকা লোক তবুও বুঝতে পারে না, তেমনি তাকিয়ে থাকে।

—একটা টাকা দিতে পারবি? তাহলে আমিই যেতাম।

—আপনি!

মেজার গ্লাসটা টেবিলের ওপরে ঠক করে নামিয়ে রাখে কম্পাউণ্ডার। শিরাসর্বস্ব হাতের গাঁট বেরুনো আঙুলগুলো অশান্ত চঞ্চলতায় নড়ে ওঠে।

—হ্যাঁ—আমি। কেন—ওই সই করা ডাক্তারের চাইতে বিদ্যেটা আমার কম বলে ভাবিস বুঝি? বেশ তো, টের পাইয়ে দেব একদিন। আমার হাত দিয়েই তো যায়, রুগীকে পটল তুলিয়ে দিতে এ শর্মার এক মিনিট।

আতঙ্কে চমকে ওঠে লোকটা। বলে, আজ্ঞে না না, তা নয়। গরীব মানুষ— একটা টাকা—

মুখের কথা লুফে নেয় কম্পাউণ্ডার ঃ তা হলে বারো আনা? কী, পারবি না? না হয় দু' আনা কম দিস। আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় ওই আট আনাই হল। এক সের ধান নয় বেচে দিস, অত ভাবছিস কেন?—ছুরির ডগায় দ্রুত বেগে মলম তৈরি করতে করতে কম্পাউণ্ডার বলে, বুঝলি, আমি সই করা ডাক্তার নই। লোকের রক্ত শুষে ভিজিট নেওয়া আমার পেশা নয়। নেহাত তোদের ভালবাসি বলেই—

মুখস্থ করা বুলির মতো অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসে বক্তৃতাটা। প্রেসক্রিপসন সার্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোও অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে। রেলগাড়ির ক্যানভাসারদের মতো একটানা ক্লান্ত গলায় বলে যায় কম্পাউণ্ডার; মাঝে মাঝে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে থামে, গলার শ্বাসনালীটা ঢেউয়ের মতো ওঠাপড়া করে, কপালের আবটার ওপরে ঘাম জমে উঠে চিকমিক করে রাজটীকার মতো।

কেউ রাজী হয়, কেউ হয় না। খুশি হয়ে ওঠে না কম্পাউণ্ডার, দুঃখিতও না। মরা নদীতে জোয়ারের জল আসা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। আটত্রিশ বছরের শিরাস্নায়ুর রক্তধারাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে আটাশ টাকার জগদ্দল পাথর।

বেলা আটটা থেকে বারোটা। ডাক্তার মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়—সাইকেল করে দুটো-চারটে রোগী দেখে ঘরে আসে। কিন্তু বিশ্রাম নেই কম্পাউণ্ডারের, অবকাশও নেই। হাত চলে, মুখও চলে সমানে। পুরোনো যন্ত্রের মতো একটানা— অবসন্ন ছন্দে। যেদিন দুটো-চারটে এমার্জেন্সী কেস আসে, ড্রেস করতে হয়, সেদিন আরো বেলা হয়ে যায়। দেড়টা দুটোর সময় মাতালের মতো টলতে টলতে কোয়ার্টারে ফিরে আসে কম্পাউণ্ডার।

কোয়ার্টারই বটে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের মর্যাদা রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাঁকারির বেড়ার ওপরে মাটি লেপা, ওপরে খড়ের চাল। মেটে দাওয়ার এদিক ওদিকে মাঝে মাঝে এক-একটা কালো কালো গর্ত ফুটে বেরোয়—রোজ সেগুলোর ওপর মাটি চাপাতে

হয়—সাপের ভয়ে। দু'খানা ঘর, একটুকরো রান্নাঘর, একটা পাতকুয়ো আর তিনটে পেঁপে গাছ। তার ভেতরে কম্পাউণ্ডারের জমজমাট সংসার।

স্ত্রী, পাঁচ-ছটা ছেলে মেয়ে। দিবারাত্র স্ত্রীর ভাঙা কাঁসরের মতো গলা ক্যান্ ক্যান্ করে পেত্নীর কান্নার মতো বাজতে থাকে। স্ত্রীর রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডার ভাবে ভিটামিন 'বি' দরকার। ছেলেমেয়েগুলোর হাতে পায়ে এক্‌জিমা, —ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সিতে ভুগছে ওরা।

রাঙা চালের ভাত আর পেঁপের তরকারী খেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করে কম্পাউণ্ডার। কিন্তু ঘুম আসে না। স্ত্রীর গর্জন চলতে থাকে, ছেলেমেয়েগুলোর চিৎকারে কানের পোকা বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে। নাঃ— মসম্ভব!

স্ত্রীকে খানিকটা কটু গালিগালাজ এবং ছেলেপিলেদে৲ দু-একটা চড়-চাপড় বসিয়ে বিরক্ত বিতৃষ্ণ কম্পাউণ্ডার বাইরের বারান্দায় এসে বসে। একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয়, তারপরে অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে সম্মুখে প্রসারিত অবারিত দিগন্তের দিকে।

একটা ধু ধু করা মাঠ। বছরে একমাত্র ফলন হয় এদেশে—আমন। ধানকাটা শেষ হয়ে গেলেই চক্রবাল-বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠটা পড়ে থাকে একটা বিপুল ব্যাপ্ত শ্মশানের মতো। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রোদে পোড়া খেজুর গাছগুলো ডাইনির মতো মাথা নাড়ে—চিৎকার করে উড়ে যায় শঙ্খচিল। কোথাও হয়তো বা একটা মরা কুকুরের চারদিকে গোল হয়ে বসে সভা করে শকুনেরা—মাঝে মাঝে সাঁড়াশির মতো লম্বা গলা বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি খায়।

খরিস গোখরোর ছেঁড়া খোলসের মতো এবড়োখেবড়ো মেটে রাস্তাটা মাঠের ভেতরে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে। ছোট ছোট ঘূর্ণি তার ওপরে এক-একটা প্রেতচ্ছায়ার মতো অবয়ব নিয়ে উঠতে গিয়ে মিলিয়ে যায়। ধুলোর গন্ধ বয়ে গরম বাতাস এসে কম্পাউণ্ডারের মুখে চোখে ঝটকা মারে।

কম্পাউণ্ডার ভাবে স্ত্রীর ভিটামিন 'বি' দরকার, ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়াম। কিন্তু শ্মশানের মতো ফাঁকা মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ভাবনাও বিস্তীর্ণ হয়ে যায়—ছাড়িয়ে যায় সাপের গর্তে ভরা দু'খানা মেটে ঘরের সীমানা। চৈত্রের আগুনঝরা আকাশ আর মাঠের ওপরে ইতস্তত ছড়ানো গোরুর হাড় হঠাৎ একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর সত্যকে পরিস্ফুট করে তোলে তার কাছে। মৃত্যু আসছে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অলক্ষ্য হয়ে আসছে তার নিশ্চিত পদপাত। শুধু তার ঘরেই নয়—তারই পরিবারে নয়। সমস্ত দেশটাই অপমৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে। চারদিক থেকে হাত বাড়িয়ে আসছে কালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ম্যাল-নিউট্রিশন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সিঙ্কোনার জল আর কার্মিনেটিভ মিকশ্চার তারই পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে মাত্র।

ঢিলে রগগুলো হঠাৎ টান টান হয়ে উঠতে চায় কম্পাউণ্ডারের—মরা রক্তে হঠাৎ যেন জোয়ার নেমে আসতে চায়। একটা অসহ্য অস্থিরতা হাত দুটোয় নিস্‌পিস্ করতে থাকে। কিছু একটা করা চাই, কিছু একটা করতেই হবে। তবে ডাক্তার খগেন দাস এল. এম. এফ-এর মতো বসে বসে সই করা নয়—রোগীর বুকে স্টেথিস্‌কোপ ঠেকিয়েই দুটো টাকা আদায় করে নেওয়া নয়। সে হাতে-কলমে কাজ করে, কাজের মানুষ। বই পড়া বিদ্যা নিয়ে ডাক্তারী করা হয় না—তার জন্যে চাই সাধনা—চাই নিষ্ঠা।

সাধনা—নিষ্ঠা। আটাশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডার হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কী সব এলোমেলো ভাবছিল সে—স্বপ্ন দেখছিল নাকি! কী করতে পারে সে, কী করবার ক্ষমতা আছে তার? তার ঘরে মৃত্যুর ছায়ানৃত্য পরিষ্কার চোখে সে দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে নিজের শরীরের মধ্যে ঘনিয়ে আসছে অনিবার্য ভাঙন। তার রক্তের ভেতরে বালির ডাঙা জেগে উঠছে—সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন ঐ গোরুর হাড়ে পরিকীর্ণ ফসলহীন মাঠটার মতো ধূ ধূ শূন্যতা এসে দেখা দেবে। সাধনা—নিষ্ঠা! ওই ভালো ভালো কথা দুটো কবে ছেলেবেলায় সে পড়েছিল, কোন্ বইতে, আর তা মনে করবারও উপায় নেই।

—কমপাউণ্ডারবাবু!

কম্পাউণ্ডার মুখ ফেরায়। সকালের সেই লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি রে, খবর কী?

—ছেলেটা বড় ছটফট করছে বাবু। ওষুধ খেতে পারছে না, গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার বিড়ি ধরায় আর একটা। অনাসক্ত গলায় বলে, তবে আর কি, এবার কাফনের ব্যবস্থা করগে। তোর ছেলের হয়ে এসেছে।

লোকটা কেঁদে ফেলে, দোহাই বাবু একবারটি চলুন। যদি কিছু করতে পারেন—

মাঠের গরম বাতাসে একমুখ কড়া বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয় কম্পাউণ্ডার ঃ বারো গণ্ডা পয়সা লাগবে। তখন আট গণ্ডায় রাজী হয়েছিলুম—সে তো ভালো লাগল না। গরীবের কথা বাসি হলে ফলে। বারো আনার কমে এখন পারবো না— কম্পাউণ্ডারের গলার স্বর গম্ভীর হয়ে আসতে থাকে—খগেন দাস এল. এম. এফ-এর ধরনটা সে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছে।

—তাই না হয় দেব বাবু, মেহেরবানি করে একবার চলুন।

কম্পাউণ্ডার উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে একটা ময়লা সার্ট আর পুরনো স্টেথিসকোপ নিয়ে এসে বলে, চল্।

ক্রমে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হল ডাক্তারের। কম্পাউণ্ডার তাঁর পসার মাটি করছে। দু'টাকার রোগী আট আনায় দেখে আসছে। আর আট আনা হলেও বা একটা কথা ছিল, যেখানে পয়সা পায় না, সেখান থেকে লাউটা কুমড়োটা যা পারে সংগ্রহ করে আনছে। বেশ জুৎসই প্র্যাকটিস জমিয়ে নিয়েছে কম্পাউণ্ডার।

প্রথম প্রথম ডাক্তার ব্যাপারটা তেমন লক্ষ্য করেনি। বরং কৌতুক বোধ করেছে, হাসাহাসি করেছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। কম্পাউণ্ডারও প্র্যাকটিস্ করছে, আরশুলাও পাখী হয়ে উড়তে চায়! যেমন সব রোগী জুটেছে, তাদের ডাক্তারও জুটেছে তেমনি! এল. এম. এফ. খগেন দাস ঠাট্টা করে কম্পাউণ্ডারের নাম দিয়েছে ধন্বন্তরি।

—এই যে ধন্বন্তরি, কী রকম চিকিৎসাপত্তর চলছে?

উত্তরে তোবড়ানো মুখে একটুখানি চরিতার্থতার হাসি হেসেছে কম্পাউণ্ডার।

ডাক্তার আরো রসান দিয়ে বলেছে, চিত্রগুপ্তের সঙ্গে ধন্বন্তরির বেশ বন্ধুত্ব দেখা যাচ্ছে। তা বেশ, তা বেশ। আজ কটি রোগী ভবপারে যাত্রা করল?

কম্পাউণ্ডার এবারে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে, আপনাদের আশীর্বাদ।

টেবিলের ওপরে পা দুটো তুলে দিয়ে উচ্চাঙ্গের হাসি হেসেছে ডাক্তার। উপদেশ দিয়ে

বলেছে, এ কাজ এত সোজা নয় মশাই, তা হলে লোকে আর এত খরচ-পত্তর করে ডাক্তারী পড়তে যেত না, হাতুড়ে বিদ্যে নিয়েই করে খেতে পারত। লোকের জীবন মরণের ব্যাপার—ইয়ার্কি নয়। ছাগল দিয়ে কি কখনো হালচাষ হয়? নিজের ওজন বুঝে কাজ করবেন। সহস্রমারী হয়ে পটাপট রুগী মারতে শুরু করলে শেষে প্র্যাকটিস চালাবেন কাদের নিয়ে?

কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই উচ্চাঙ্গের হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল ডাক্তারের। ভীষণ সত্যটা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কম্পাউণ্ডারের অত্যাচারে ডাক্তারের প্র্যাক্‌টিস্‌ বন্ধ হবার উপক্রম।

খগেন দাস এল. এম. এফ-এর অবস্থাও যে খুব সমৃদ্ধ তা নয়। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কাটা গিয়ে মাইনে মেলে বাষট্টি টাকা বারো আনা। সুতরাং প্র্যাক্‌টিসের ওপরই তারও নির্ভর। কিন্তু কম্পাউণ্ডার অক্টোপাসের মতো যেভাবে চারদিকে বাহু বাড়াচ্ছে তাতে চিন্তিত হবার কারণ ঘটছে। আট আনার ডাক্তার ডাকবার আগেই ছুটে যায়, সুতরাং বিস্তর সাধাসাধি করে দু'টাকার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই—আশপাশের লোকের মনে এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এ ঝড়ের সংকেত।

অবস্থার গুরুত্বটা কল্পনা করতেই রাগে ডাক্তারের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। আচ্ছা বেকুব এই পাড়াগেঁয়ে হতভাগাগুলো। ভেবেছে ওই কম্পাউণ্ডারই তাদের ত্রাণকর্তা। যে লোকটা ডাক্তারীর 'ক' অক্ষরটা অবধি জানে না, মিক্‌শ্চার, মলম তৈরি করে আর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাত পাকিয়েছে খালি—তাকেই ওরা ভবার্ণবের কাণ্ডারী ঠাউরে বসল শেষটাতে! অকৃতজ্ঞ—অপদার্থের দল যত! পৃথিবীতে ভালো লোকের আর জায়গা নেই দেখা যাচ্ছে!

ক্রোধের উত্তেজনায় মাথার দু'গাছা কাঁচা চুল ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরটা থেকে উপড়ে আনলেন ডাক্তার। কম্পাউণ্ডারের ওপরে একটা বিষাক্ত বিদ্বেষে এক মুহূর্তে সমস্ত মনটা কালো হয়ে গেছে। নাঃ—বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এর আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—এবং সেটা অবিলম্বে।

পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করে খগেন দাস আত্মস্থ হলেন খানিকটা। ইচ্ছে করলে একটা কলমের খোঁচাতেই তিনি কম্পাউণ্ডারের চাকরি খেয়ে দিতে পারেন—দিতে পারেন সমস্ত লম্বাইচওড়াই বন্ধ করে। কিন্তু অতটা অবিবেচক নন তিনি, একটা লোকের অন্ন মারবার মতো অভিপ্রায় তাঁর নেই। আগে একটু ওয়ার্নিং দেওয়া দরকার, তারপর—।

কিন্তু ওয়ানিংটাই বা দেওয়া যাবে কেমন করে? আসল কথাটা কম্পাউণ্ডারকে বলা যাবে না—আত্মসম্মানে বাধে। ডাক্তারের মনে হল সেটা করুণা-ভিক্ষার সামিল। সুতরাং অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

পাড়াগাঁয়ের ডিসপেন্সারী। সাতটায় খোলবার আইন আছে, কিন্তু পৃথিবীতে আরো অসংখ্য আইনের মতোই এটাকেও কেউ কখনো মনে রাখে না। আটটার সময় কম্পাউণ্ডার এসে চাবি খোলে, চা খেয়ে ডাক্তারের পৌঁছুতে পৌঁছুতে নটা বেজে যায়। আবহমানকাল থেকে এই রীতিটাই চলে আসছে।

হঠাৎ এর ব্যতিক্রম হয়ে গেল।

ডিস্‌পেন্সারী খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এসে ঢুকলেন। ডাকলেন, কম্পাউণ্ডার বাবু?

কম্পাউণ্ডার আশ্চর্য হয়ে গেল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আজ এত সকাল সকাল এলেন যে?

—সকাল সকাল!—বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাক্তার বললেন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

দেওয়ালে ঘড়িটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কম্পাউণ্ডার জবাব দিলে—এই তো আটটা বাজল।

—আটটা, কিন্তু কটার সময় খোলবার রুল আছে, সেটা জানেন কি?

কম্পাউণ্ডার বিহ্বল দৃষ্টি ফেলল ডাক্তারের মুখের ওপর ঃ বরাবরই তো—

—বরাবর! বরাবর এমনি বে-আইনী কাজ করেই মাসে মাসে মাইনে গুনে নেবেন! ডিসপেন্সারী আপনার 'ইয়ে'র নয় যে নবাবের মতো যখন খুশি এসে অনুগ্রহ করে দোর খুলবেন। এটা পাব্‌লিকের ব্যাপার। কাল থেকে ঠিক নিয়মমতো যদি ডিসপেন্সারী খোলা না হয় তাহলে আপনার নামে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হবো।

তেমনি বিহ্বলভাবে কম্পাউণ্ডার বললে, কিন্তু আপনি তো আগে আমাকে—

—আমি বলতে যাব কেন? আপনার ডিউটি নিজে বোঝেন না আপনি? আপনার নিজের একটু রেসপনসিবিলিটি নেই?—ডাক্তারের কণ্ঠ যেন বিষ হয়ে ঝরে পড়তে লাগল ঃ ওদিকে তো দিনরাত এ-পাড়া ও-পাড়া খুব রুগী দেখে বেড়াচ্ছেন, কাঁচকলা আর চালকুমড়ো যোগাড় করছেন। অত চাল-কুমড়ো খাওয়ার শখ হয়ে থাকলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ডিসপেন্সারী খুলে বসুন!

অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেছে কম্পাউণ্ডার। একটা কথাও তার মুখে যোগাচ্ছে না। ওদিকে ডাক্তারের চোখ দুটো হিংস্রতায় দপ দপ করছে, সমস্ত মুখটা কুটিল হয়ে গেছে ক্ষিপ্ত ঈর্ষায়, তাঁর গলা চড়ছে পর্দায় পর্দায়। ওযুধ নেবার জন্যে যারা দোরগোড়ায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছে ডাক্তারের কটু-কঠোর মন্তব্যগুলো!

—ডাক্তার হয়েছেন—প্র্যাকটিস করা হচ্ছে! একটা প্রেস্‌ক্রিপশন রিপীট করতে পর্যন্ত ভুল করেন—লজ্জা হয় না আপনার? আজ সরকারী কাজ ফেলে ধন্বন্তরি হওয়ার চেষ্টায় আছেন! যদি মন দিয়ে কাজ না করেন তাহলে আপনার নামে রিপোর্ট আমাকে পাঠাতেই হবে—এ কথা আর একবার জানিয়ে যাচ্ছি।

গর্জনে ঘর কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। বাইরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জুতোর শব্দ বাজতে লাগল।

কম্পাউণ্ডারের ঘোলা চোখে এতদিন পরে সত্যিকারের আগুন ঝিকিয়ে উঠল, বাঁকা মেরুদণ্ডটাকে আশ্রয় করে বয়ে গেল পৌরুষের দীপ্তি। ডাক্তারকে সে বুঝতে পেরেছে। ঈর্ষা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা! এ এক নতুন অস্ত্র সে-হাতে পেয়েছে। এতদিন সে ডাক্তারকে ভয় করে এসেছে—এইবার ডাক্তার ভয় করতে শুরু করেছে তাকে। তার প্র্যাক্‌টিসের ফলে আজ ডাক্তারের প্রেস্‌টিজ এবং পসার বিপন্ন হতে বসেছে।

ভয় হল না কম্পাউণ্ডারের—দুঃখও না। বহুদিন পরে পিঠটাকে সোজা করে—দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো সে। এতগুলো লোকের সামনে ডাক্তার তাকে অপমান করে গেছে, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে একটা কঠিন লৌহবর্মের অস্তিত্ব অনুভব করেছে

কম্পাউণ্ডার—যে বর্মে লেগে তুচ্ছতার সমস্ত আঘাতগুলো অতি সহজেই প্রতিহত হয়ে যায়। এতদিন পরে স্বীকৃত হয়ে গেছে তার জীবনের,—তার স্বাতন্ত্র্যের দাবি। এইবার নিজেকে প্রমাণ করবার সময় এসেছে তার। আটত্রিশ বৎসর বয়সে আটাশ টাকার পাথর চাপা পড়েই তার মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু হয়নি। এইবার কাজ করতে হবে তাকে—কিছু একটা করতেই হবে।

কম্পাউণ্ডিং রুমে ঢুকে পাশের আলমারিগুলোর দিকে তাকালো সে। খালি শিশি বোতলগুলো স্তরে স্তরে সাজানো। ওখানে কিছু করবার নেই, উপায়ও নেই কিছু করবার। নিজেকে প্রমাণ করবার শক্তি নেই তার। ছোট আলমারির চাবি আগেই হস্তগত করেছে ডাক্তার—দু-চারটে ভালো ওষুধপত্র যে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে—সে পথও বন্ধ।

কিন্তু—তবু, তবু চেষ্টা করতে হবে। অস্তিত্বের দাবি আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভিটামিন 'বি'র অভাবে তার স্ত্রীর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের ওপরে ছড়াচ্ছে মৃত্যুর ছায়া—ছেলেমেয়েগুলোর সর্বাঙ্গে সংক্রামক অস্বাস্থ্যের কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ। শুধু তার ঘরে নয়—দিকে দিকে, যতদূর চোখ যায় ততদূর—রৌদ্রদগ্ধ শূন্য প্রান্তরের মতো একটা শ্মশান আকীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিছু কি করবার নেই, কিছুই না?

দাঁতে দাঁত চেপে কম্পাউণ্ডার ভাবতে লাগল। আঙুলগুলো অধৈর্যভাবে আঁকড়ে ধরতে লাগল মলম-তৈরি-করা ছুরিটার হাড়ের বাঁটটা। আর কিছু না হোক—এইটে দিয়ে একটা মানুষও তো খুন করতে পারে সে!.....

কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে ঠোকাঠুকির আর বিরাম নেই।

—কী করে রেখেছেন টেবিলগুলো—দেখুন দেখি একবার। একটা কাগজ মানুষে খুঁজে পায় এখানে!

কম্পাউণ্ডার নিরুত্তর।

—বলেছিলাম প্রেসক্রিপশনের বইটা ফুরিয়ে গেছে, একটা নতুন প্যাড বার করে রাখবেন। কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ্যই নেই আপনার। খালি ভাবছেন, কখন কোন ফাঁকে বেরিয়ে লাউ-কুমড়োর ব্যবস্থা করে আসবেন। নাঃ—আপনাকে দিয়ে আমার পোষাবে না মশাই। হয় আপনাকে ট্রানসফার করুক, নয় আমাকে। এছাড়া আর তো কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না।

সার্ভিং টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার ভাবতে লাগল, ঠিক কথা। আর কোনো পথ নেই। এক আকাশে দুই সূর্য শোভা পেতে পারে না। আজ তার নবজন্ম হয়েছে, সে শুধু ডাক্তারের সমকক্ষ নয়, তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কাগজের বিদ্যাই বড় নয়, হাতের বিদ্যা তার চাইতে ঢের বেশি। এই সত্যকে সে প্রচার করবে—সে প্রতিষ্ঠা করবে।

গতানুগতিক বাঁধা নিয়মে একই ওষুধ নানা শিশিতে ঢালতে ঢালতে কম্পাউণ্ডার তার নতুন রোগীর কথা চিন্তা করতে লাগলো। পুরানো অসুখ—বহুদিন থেকে ভুগছে। ডাক্তার খগেন দাস তিন মাস নিয়মিত ভিজিট গুনে নিয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। এবার তার পালা।

কিছু করা চাই—কিছু করতে হবে। অথচ ওষুধ নেই—উপায় নেই! কম্পাউণ্ডারের দাঁতে দাঁত আবার চেপে বসতে লাগল ঃ উপায় নেই! ওষুধ চাই—ভালো ওষুধ। একবার

সুযোগ পেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে তারও ক্ষমতা আছে। কম্পাউণ্ডারের মাথার ভেতরে রক্তের উচ্ছ্বাস যেন ফেটে পড়তে লাগল। কিছু তাকে করতেই হবে—যেমন করে হোক, যে উপায়েই হোক—

ছোট আলমারিটা খুঁজলে কিছু মিলতে পারে। কিন্তু তার চাবিটা আগেই হাত করেছে ডাক্তার। সব দিক থেকে তার পথরোধ করে দাঁড়াতে চায়। বেশ—এই ভালো। এ বাধা ভেঙে সেও এগিয়ে যেতে জানে, সেও—

--বলি ও কম্পাউণ্ডারবাবু, ও সহস্রমারী ধন্বন্তরি মশাই!

কুৎসিত কটুগলায় ডাক্তার তাকে ডাকছে। কম্পাউণ্ডারের কপালের রেখাগুলো কুঁচকে উঠল একবার, তারপর সহজ স্বাভাবিক ভাবে সাড়া দিলে, ডাকছেন আমাকে?

—হ্যাঁ—ডাকছিলাম তো অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু আপনি তা শুনতে পাননি বোধ হয়—বিকৃত স্বরে ডাক্তার বলে যেতে লাগলেন : আজকাল আপনি একেবারে স্যার নীলরতন সরকার হয়ে উঠেছেন, এসব গরীবের ডাক আপনাদের মতো বড় বড় ডাক্তারের কানে পৌঁছুবে কেন!

কম্পাউণ্ডারের জীর্ণ হাতে দুর্বল মাংসপেশী আর রক্তহীন শিরাগুলো যেন অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রচণ্ড বেগে একটা ঘুষি সে ডাক্তারের মুখের ওপরে বসিয়ে দেবে নাকি! কিন্তু কিছুই করলে না কম্পাউণ্ডার, শুধু তেমনি শান্ত নিষ্কম্প গলায় বললে, কী করতে হবে?

—অধমকে একটু অনুগৃহীত করতে হবে—সিগারেটের ধোঁয়াটা একেবারে কম্পাউণ্ডারের মুখের ওপরেই ছেড়ে দিলেন ডাক্তার : এই উণ্ডটা একটু ড্রেস্ করে দিতে হবে। ধন্বন্তরির মূল্যবান সময়টা একটু নষ্ট হবে, কিন্তু এ দুর্ভাগা নিতান্তই নাচার—

ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা দুলতে লাগল।

কম্পাউণ্ডার নীরবে সেলফ থেকে তুলোর প্যাকেট গজকাঠি আর আইডিনের শিশিটা তুলে নিলে।

ফাঁকা মাঠের ওপরে ঘনিয়েছে কৃষ্ণা রাত্রি। আকাশে তারার রোশনাই তেমন জ্বলছে না, লঘু বিচ্ছিন্ন মেঘ তাদের ওপর দিয়ে আবরণ টেনে দিয়েছে। কালো অন্ধকারের মধ্যে সামনের মাঠটা থেকে যেন প্রেতলোকের সন্ধান দিচ্ছে এলোমেলো আলেয়া। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে গরম বাতাস, দিনের প্রখর উত্তাপের রেশটা জুড়িয়ে যায়নি এখনো। শেষরাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি বাদল হবে কিছু—বহুদূরের দিগন্তে মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে বিদ্যুতের রক্তদীপ্তি। ডিস্‌পেন্সারীর চারদিকে নিশ্ছেদ স্তব্ধতা।

অন্ধকারে চাবি ঘোরাবার শব্দ হল—খুট্।

হাওয়ার সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে দরজাটাও খুলে গেল। কালো রাত্রির সঙ্গে একাকার হয়ে কম্পাউণ্ডারের ভৌতিক মূর্তিটা প্রবেশ করলে ডিস্‌পেন্সারীতে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে হৃৎপিণ্ড। কপালের আবটার ওপরে ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে।

কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না—পিছোলেও চলবে না। তার শক্তির পরীক্ষা—তার আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার। যেমন করে হোক তার রুগীকে সারিয়ে তুলতে হবে—তার প্রথম আত্মোপলব্ধির মূল্য বিচার করে দেখতে হবে। বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে এগোতে

লাগল কম্পাউণ্ডার—ওষুধের বহু বিচিত্র মিশ্র গন্ধে ভরা থমথমে অন্ধকার যেন তার দম আটকে আনতে লাগল। কিছু জোর করে একটা নিশ্বাস ফেলতেও ভরসা পাচ্ছে না সে। —পাছে বেশি করে শব্দ হয়, পাছে এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হয়ে যায় রাত্রির এই সমাহিত স্তব্ধতা!

তারপর—তারপর—কম্পাউণ্ডারের কম্পিত হাত স্পর্শ করলে ছোট আলমারির ডালাটা। কব্জাটা ধরে একটা মোচড় দিলেই—

টর্চ লাইটের তীব্র ঝাঁকালো আলো কম্পাউণ্ডারের গায়ে এসে পড়ল বন্দুকের গুলির মতো। তড়িদ্বেগে লাগিয়ে উঠল কম্পাউণ্ডার। অন্ধকারের ভেতরে ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল—যেন একটা গোখরো সাপ প্রবল বেগে ছোবল বসিয়ে দিলে কোথাও।

ডাক্তার বললে, চমৎকার! ভাগ্যিস ঘুম আসছিল না বলে বারান্দার অন্ধকারে চুপচাপ পড়েছিলাম, সেইজন্যই তো ধন্বন্তরির এ দেবলীলাটা দেখতে পেলাম! চুরি-চামারিতে প্র্যাক্‌টিসটা বেশ জমে উঠেছে তা হলে!

কম্পাউণ্ডারের বিবর্ণ মুখের ওপর টর্চের আলো আগুনের জ্বালার মতো জ্বলতে লাগল।

—ভালো, ভালো।—ডাক্তার শান্ত স্বরে বললে, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেকে আমি জেলে পাঠাতে চাই না। তবে কাল থেকে ডিস্‌পেন্সারীর চাবিটাও আমার কাছে থাকবে আর একটা চৌকিদারেরও বন্দোবস্ত হবে। তাহলেই তার ওষুধ চুরির ভয় থাকবে না—কী বলেন কম্পাউণ্ডারবাবু?

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল কম্পাউণ্ডার। শরীরটা একচুল নড়ল না—একটা নিশ্বাস পড়ল না পর্যন্ত।

* * * *

পরদিন দুপুরে কম্পাউণ্ডারের বাড়ি থেকে একটা বিশ্রী মড়াকান্নার শব্দে ডাক্তার ছুটে এলেন।

—কী হল? ব্যাপার কী?

কম্পাউণ্ডার কোনো জবাব দিলে না। সামনে মেঝের ওপর কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। বড় বড় শ্বাস উঠছে পড়ছে, চোখ দুটো ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে তার। সমস্ত গাল মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে—রক্তবমি করেছে সে!

ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কম্পাউণ্ডারকে একটা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, কথা বলছেন না যে? ব্যাপার কী?

অর্থহীন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কম্পাউণ্ডার বললে, পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল—ঠিক ডায়গোনাইজ্‌ করতে পারিনি। ওষুধ দিয়েছিলাম।

—ওষুধ! কী ওষুধ!

—তা তো জানি না। আপনার ছোট আলমারিতে তো হাত দেবার উপায় নেই। তাই সামনে যা পেয়েছিলাম—আইডিন, মরফিয়া, রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট, কার্বলিক অ্যাসিড, স্ট্রিকনিন, সিন্‌কোনা—সব মিলিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করবার চেষ্টা করেছিলাম।

ডাক্তার পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, আপনি মার্ডারার—আপনার স্ত্রীকে

নিজের হাতে আপনি খুন করেছেন! আপনার ফাঁসি হওয়া উচিত—Yes, you deserve it ! এক্সপেরিমেণ্ট! কেন আপনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, একবার ডাকলেন না—

ঘষা চোখে, জীর্ণ গলায় আটাশ টাকার কম্পাউণ্ডার জবাব দিলে, আপনাকে ভিজিট দেবার পয়সা ছিল না।

পিতরি

বাজারের থলিটা একপাশে ফেলে হাঁপাতে লাগল সখানাথ। ভালো মাছ পাওয়া যায় বৈঠকখানা বাজারে, হাঁটতেও হয় অনেকখানি। বয়স হয়েছে এখন, তা ছাড়া অভাবের বোঝা টানতে টানতে মেরুদণ্ডটায় ভারবাহী জন্তুর শিথিলতা এসেছে। কপাল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এক ফোঁটা নোনা ঘাম মুখে এসে পড়ল। ময়লা টুইল শার্টটার আস্তিনে সখানাথ কপাল আর মুখ মুছে নিলে একবার।

উঠোনে কল, তার পাশেই চট ঘেরা 'বাথরুম'। কিন্তু চট দেওয়া থাকলেও সেদিকে চট্ করে তাকানো চলে না। বৃষ্টিতে পচে গেছে এখানে ওখানে। একটু মনোযোগ দিলেই ভেতরটা লক্ষ্য করা যায়। তবুও যেন তেন উপায়ে আত্মরক্ষা বা আব্রুরক্ষা, নিম্নবিত্তের মনুষ্যত্বের মতো।

চৌবাচ্চা থেকে ছড়ছড় করে জল ঢালবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—ভাঙা ড্রেনটা দিয়ে ভেসে চলেছে সুগন্ধি সাবানের ফেনা। গুন্ গুন্ করে গানের সুর আসছে, জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য থেমে যাচ্ছে গানটা। সত্যভামা গান করছে।

বাজারের থলিটা সরিয়ে রেখে সখানাথ দীর্ঘ প্রসারিত রেখায় আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু আকাশটা খণ্ডিত, বস্তির খোলার চালাগুলোর ওপারেই তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের মস্ত চারতলা বাড়ি। রেলিঙে রঙীন শাড়ি ঝুলছে, দাঁড়ের ওপর শাদা রঙের বড় একটা কাকাতুয়া পাখা ঝেড়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করছে কী একটা অভিযোগ নিয়ে। কোথা থেকে আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে কাকাতুয়ার ল্যাজ ধরে হালকা একটা টান দিয়ে গেল। রেডিয়োর চিৎকার ছড়াচ্ছে বাতাসে। তেতলার বারান্দাতে ডোরাকাটা পাজামাপরা চশমা চোখে একটি তরুণ পায়চারি করতে করতে কী একখানা মোটা বই পড়ছে। ওরা সব আলাদা জগতের জীব, ওরা বড়লোক। ওখানে যারা থাকে সখানাথ তাদের চিরদিন ভয় করে এসেছে, সম্মান করে এসেছে।

এখানে ঘরের মধ্য থেকে গিরিবালার গোঙানি। সখানাথের স্ত্রী। একটা ছেলে হয়ে মরে যাওয়ার পর থেকেই নানারকম অসুখে ভুগছে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না, তার অপটু আর অসুস্থ শরীরটা গরীবের সংসারে চেপে রয়েছে বিশ মণ ভারী একখানা পাথরের মতো। নিজে কিছুই করতে পারে না গিরিবালা, তাই সমস্ত উৎসাহ শান্ত করে অকারণ খিটিমিটিতে, অহেতুক গালাগালি দিয়ে, আর নয়তো কাঁদতে শুরু করে দেয় অস্ত্রাহত একটা বন্য পশুর মতো। সখানাথকে দেখলেই তার মেজাজ আরো বিগড়ে যায়, মনে হয় যেন তেড়ে এসে কামড়ে দেবে।

—যাও, যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। লজ্জা করে না কাছে আসতে! তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, আমাকে মেরে ফেলেছ তুমি। কিন্তু এমন দগ্ধে দগ্ধে মারতে চাও কেন? দাও, দাও, তা হলে গলা টিপেই শেষ করে দাও।

কথার শেষটা কান্নায় গলে গিয়ে একাকার হয়ে যায়—অমানুষিক আর অর্থহীন খানিকটা গোঙানি। নিজের অপরাধ সখানাথ ঠিক বুঝতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত বোকার মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সবিস্ময়ে চিন্তা করে। তার পরেই মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে যায়। সেই ভালো—সেই ভালো। গলা টিপেই সে গিরিবালাকে শেষ করে দেবে এযাত্রা। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো পরস্পরের প্রতি ওরা হিংস্র দৃষ্টি বিনিময় করে তারপর সখানাথ চোরের মতো বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে সেতু রচনা করেছে সত্যভামা। দেখতে কালো, রূপ-বিচারের মানদণ্ডে কিছু স্থূল, অর্থাৎ অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ—টানা-টানা, গভীর কৃষ্ণতারায় মাতৃত্বের স্নেহচ্ছায়া। চমৎকার চুলের গোছা স্তবকে স্তবকে তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙে পড়ে মাজা পর্যন্ত। আচমকা দেখলে কিছুই মনে হয় না, কিন্তু ভালো করে তাকালে কোথা থেকে একটা অপরূপ রূপের উচ্ছ্বাস এসে চোখ নয়, মনকে প্লাবিত করে দিয়ে যায়। হয়তো স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরের সমুচ্ছল যৌবনশ্রীর জন্যেই।

স্নান শেষ করে চটের পর্দা সরিয়ে সদ্য ধোয়া অপরাজিতার মতো বেরিয়ে এল সত্যভামা। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুলের গোছাটা ঘাড় আর বুক থেকে সরিয়ে দিলে, শাড়িটাকে ফেলে দিলে তাদের ওপর। তারপর এদিকে ফিরতেই দেখল সখানাথকে।

—বাবা কখন ফিরলে?

—এই তো। এক গ্লাস জল দে সতী।

—দিচ্ছি—একটা ছন্দের ঘূর্ণি সমস্ত শরীরে খেলিয়ে দিয়ে জলের সন্ধানে গেল সত্যভামা। যাওয়ার সময়ে একটা অপাঙ্গ দৃষ্টি ফেলে গেল বাজারের থলিটার ওপরে। একটা বড় বাঁধাকপির একরাশ সরস পাতা দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে আছে গলদা চিংড়ির দাঁড়া আর দাঁড়ি। মস্ত একটা পাটনাই পেঁয়াজ গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। বেশ বড়লোকের মতো বাজার করে এনেছে সখানাথ। সত্যভামার মনটা খুশি হয়ে উঠল।

ঘরের ভেতরে গোঙাচ্ছে গিরিবালা, উঠোনে ছেঁড়া প্যান্ট পরে ছোট ভাই মণ্টু মার্বেল খেলছে। বাতাসে দুলছে বাথরুমের ছেঁড়া চটটা। আর ওদিকে রান্নাঘর থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে আনতে গিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে সত্যভামা। ওর গানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ অন্তরটা যেন আত্মপ্রকাশ করছে ঃ 'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।' সমস্ত পারিপার্শ্বিকটার সঙ্গে কী আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য, আশ্চর্য কী স্বতন্ত্রতা। যেন কী একটা বিচিত্র-মন্ত্রে বাবলাতলী বস্তির টালির ঘর থেকে সত্যভামা উড়ে চলে গেছে—সে যেন আজ নিজের একাত্মতা খুঁজে পেয়েছে ওই লাল রঙের চারতলা বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে।

সখানাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলে একবার। কথাটা ঠিক। সত্যভামা বাবলাতলী বস্তির সীমা ছাড়িয়ে সত্যি সত্যিই দূরে সরে চলেছে আজ। গরীবের মেয়ে কর্পোরেশনের স্কুলে পড়তে পড়তে স্কলারশিপ পেল। তারই জোরে সে চলে গেল বড় ইস্কুলে, সংসারে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত প্রতিকূলতাতেও তার পড়া বন্ধ হল না, ম্যাট্রিক পর্যন্ত এগিয়ে গেল। তারপরে

সেদিন খবর এসেছে ম্যাট্রিকেও খুব ভালো করে বৃত্তি পেয়েছে সে। তিন-চারটে কলেজ থেকে তার সাদর আমন্ত্রণ এসেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ধীরেন। বড়লোকের ছেলে, বি. এ. পাস। বস্তি থেকেই সে রত্ন কুড়িয়ে নিতে চায়—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'।

—বাবা জল।

সত্যভামা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চুলের গন্ধ, সাবানের গন্ধ। কালো শরীর লাবণ্যে অপরূপ। একবার মেয়ের দিকে তাকিয়েই গর্বে ভরে উঠল সখানাথের মন। কে বলে তার মেয়ে কালো, এমন অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী আছে ক'জনের? বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী, কাগজে কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে, কত কলেজ থেকে বিনয় করে কত চিঠি। সখানাথ সগর্ব চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুখের ওপর লজ্জার আভা দেখা দিলে সত্যভামার।

—তুমি জলটা খাও, আমি তামাক দিচ্ছি। বেশি দেরি করতে পারবে না, তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও। অফিস ছুটি বলেই অবেলায় খাবে, এ চলবে না।

সখানাথের বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

—কিন্তু আর কদিনই বা খবরদারী করবি তুই। ধীরেন বলেছে দেরি করতে পারবে না। আজকেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে।—আর একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে সখানাথ বললে, রাতে ধীরেন খাবে এখানে, বলে দিয়েছি। তাই বৈঠকখানা বাজার ঘুরে মাছ তরকারী নিয়ে এলাম। দ্যাখ্ তো হবে কিনা।

—আমি জানি না কিছু—সত্যভামা আরো লজ্জিত আর সংকুচিত হয়ে চলে গেল।—পুলকিত জড়িত স্বরে বলে গেল, তামাক সেজে আনছি তোমার।

চল্লিশ টাকার মাইনের ফিটার সখানাথ এক চুমুকে জলের গেলাসটা নিঃশেষ করলে। বুকের ভেতরে কেমন একটা অসহ্য তৃষ্ণা—সব যেন মরুভূমির মতো জ্বলে যাচ্ছে। নিজেকে বড় বেশি ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে—বড় বেশি অসহায়!

বাপকে তামাক দিয়ে সত্যভামা ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালো। বস্তির চিরাচরিত জীবন। রাস্তার কলে জলের শেষ ধারা ঝির ঝির করে পড়ছে, অথচ এখনো তিন-চারটে কলসী পড়ে আছে প্রতীক্ষায়। জলের জন্য কলহ। পানওয়ালার দোকানের সামনে সাপখেলা হচ্ছে, ছেলে বুড়োর ছোট একটা ভিড় জমেছে ওখানে। তুব্‌ড়ি বাঁশী নামিয়ে রেখে উড়ে সাপুড়ে টানা সুরে গান জুড়েছে ঃ

তখনো কৃষ্ণ গিলা কালীদহে কালীয়ো নাগকো মারিবরে,
আ—রে—

এপাশে গোয়ালাদের ঘর, তার সামনেই পর্বতাকার ঘুঁটের স্তূপ। দুটো কালো আর ন্যাংটো ছেলে গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা মহিষের পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। মাটিউলী করুণ সুরে হেঁকে যাচ্ছে ঃ মিটি লেবে গো, মিটি—

সত্যভামার চোখ পড়ে আছে এদের ওপর, কিন্তু মন ভেসে গেছে অনেক দূরে। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে বিহ্বল স্বপ্ন। আজ সন্ধ্যায় ধীরেন আসবে! অনেকদিনের স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র। কুমারী জীবনের কারাগার থেকে তাকে স্বপ্নের চৌদোলায় চড়িয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নতুন রাজ্যে। ধীরেন তাকে ভালোবাসে। কেমন লোভীর মতো কাছে আসে, কেমন আগ্রহ করে আঁকড়ে ধরতে চায় তার আঙুলগুলো। মনের মধ্যে

গ্রামোফোনে শোনা গানের কলি এসে দোলা দেয় ঃ প্রেম বুঝি এল জীবনে। তন্দ্রাভিভূতের মতো সত্যভামা নিজে নিজেই একবার আউড়ে নিলে ঃ আজ রাত্রেই ধীরেন আসবে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। চারতলা বাড়ির তেতলায় ডোরাকাটা পাজামা পরা সেই ছেলেটা চোখ দিয়ে তাকে যেন গিলছে—একবার যেন কী একটা ইঙ্গিত দিয়ে হাসলও একটু। কটাক্ষে খানিক অগ্নিবর্ষণ করে সত্যভামা সরে এল জানলা থেকে। ধীরেনও তার দিকে তাকায়, নির্নিমেষ অর্থপূর্ণ ভাবেই তাকায়। কিন্তু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। এ যেন রাক্ষসের লোলুপতা।

ঘরের মধ্যে তার লঘু পায়ের শব্দ শুনে গিরিবালার গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। কোটরগত চোখ দুটোকে সম্পূর্ণভাবে মেলবার চেষ্টা করলে একবার। চিঁ চিঁ করে বললে, কে, সতী? কাছে আয় মা, আমার পাশে বোস।

সত্যভামা এগিয়ে এসে মা'র বিছানায় বসল। বিবর্ণ ছিন্ন শয্যায় কালো একটা কঙ্কাল অবলীন হয়ে আছে। রুক্ষ চুলের গোছা প্রতিমার পাটের চুলের মতো ছড়িয়ে রয়েছে বালিশ জুড়ে। এককালে মেয়ের মতোই চুল ছিল মায়ের—হয়তো রূপও ছিল। কিন্তু এ যেন প্রেতিনীর মূর্তি।

মেয়ের পরিপুষ্ট নিটোল হাতখানা মা টেনে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপর। চেপে ধরলে প্রাণপণে। হাড়ের কঠিন স্পর্শে হাতটা যেন ব্যথা করে উঠল সত্যভামার। তেমনি চিঁ চিঁ করে গিরিবালা বললে, মা সতী?

—কী বলছ?

—আজ ধীরেন আসবে, না?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় সত্যভামা বললে, তাই তো শুনেছি।

—তোর বাবা আসেনি বাজার থেকে?

—এসেছে।

—ধীরেন খাবে রাত্রিতে, কী বাজার করে এনেছে কে জানে। বুদ্ধিসুদ্ধি তো নেই, ভালোমন্দ জ্ঞানও কিছু নেই। আমি নিজে এইভাবে পড়ে রইলাম, একটু যে দেখাশোনা করব, সে সুখও কপালে নেই। ভগবান সব দিক দিয়েই এমন অথর্ব করে দিলেন! এখন মরতে পারলেই বাঁচি।

গোঙানি আর কান্না একসঙ্গে মিশিয়ে আবার খানিকটা অমানুষিক শব্দ করতে লাগল গিরিবালা। কংকালসার বুকের ভেতরটা যেন ঢেউয়ের মতো দুলে উঠতে লাগল, হাতের তলায় সত্যভামা অনুভব করলে নির্জীব হৃৎপিণ্ডের স্তিমিত স্পন্দন।

—কাঁদছ কেন তুমি? ভালো হয়ে ওঠো, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—সত্যভামা ব্যতিব্যস্ত হয়ে মায়ের বুকটা ডলে দিতে লাগল। মা'র কান্না দেখলে তারও অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, মনে হয় এর চাইতে মা-র মরে যাওয়াই ভালো।

গিরিবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, তুই সুখী হ, রাজরানী হ তুই। ধীরেন সোনার মত ছেলে, কোনো দুঃখই তুই পাবি না এই আমার আশীর্বাদ রইল।

মায়ের বুকের মধ্যে সুখে আর আনন্দে মুখ লুকোলো সত্যভামা। বুকের শুকনো হাড়ের স্পর্শটা এখন আর তত কঠোর বনে মনে হচ্ছে না। বাইরে বসে সখানাথ তামাক টানছে, সেই তামাক টানার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার হৃৎপিণ্ড যেন তাল দিতে

লাগল।

ডাকপিয়ন এসে একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল সখানাথের পায়ের কাছে। আরো একটা কলেজ থেকে সত্যভামাকে ডেকে পাঠিয়েছে। বিনা পয়সায় পড়তে দেবে, কলেজ থেকে স্কলারশিপ দেবে কুড়ি টাকা করে। সখানাথের চোখ ছলছল করে উঠল। অফিসের বন্ধু হারান বলছিল, এ ভালোই হল, বুড়ো বয়সে মেয়েই এবার তোমার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। ছেলে তো তোমার নেই—মেয়েই সে দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখানাথ হুঁকোতে টান দিলে। কিন্তু ধোঁয়া এল না। তামাকটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

সারা বিকেলটা বসে বসে রান্না করলে সত্যভামা। ধীরেন বড়লোকের ছেলে, কী খেতে ভালোবাসে কে জানে। থেকে থেকে মনটা আসে উৎকর্ণ হয়ে। এখনো ছায়া নামেনি বস্তির ওপর, সূর্যের আলো রাঙা হয়ে ওঠেনি চারতলা লাল বাড়িটার মাথায়। সময় চলছে অসম্ভব শ্লথ আর মন্থর গতিতে। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল দিন। ঘরে গিরিবালার গোঙানিটা কমেছে একটু। মেয়ে সুখী হবে—এ কল্পনা যেন মায়ের মনকেও পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।

মাছের তরকারীটা নামিয়ে রেখে গা ধুতে গেল সত্যভামা। প্রেম বুঝি এল জীবনে। সন্ধ্যা নামতে আর দেরি নেই। সাতটার সময় ধীরেন আসবে।

বাইরে জুতোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সখানাথের সাদর অভ্যর্থনা। এসো বাবা, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

ধীরেনের গলা কানে এল ঃ কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে গিয়েছিলাম তাই আসতে দেরি হয়ে গেল একটু। মা কেমন আছেন আজকে?

—ওই একই রকম। এসো বাবা, বোসো। কই, সতী গেল কোথায়? ওরে, ধীরেন এসেছে—চটির শব্দ করে ভেতরে এল সখানাথ ঃ ধীরেন এসেছে। সতী, চা করে দিয়ে যা ধীরেনকে।

—'আমার হিয়া উছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে'—সত্যভামা বেরিয়ে এল কল থেকে। গিরিবালা ডেকে বললেন, একটু ভালো করে দেখাশোনা করিস মা। আমি তো থেকেও নেই। এমনই কপাল যে—

—গিরিবালা এবার আর আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল না। ধীরেন এলে খানিকটা সংযত হয়ে যায় সে। মায়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে সত্যভামা ঃ তোমায় কিছু ভাবতে হবে না মা।

স্বপ্নের মতো দিন, ভালোবাসার মতো সন্ধ্যা। রূপকথার রাজপুত্র এসে দেখা দিয়েছে দুয়ারে। রং বদলে গেছে সমস্ত পৃথিবীর। বাবলাতলী বস্তিকে কে যেন মায়াপুরীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। এখানকার যা কিছু কুশ্রীতা, যা কিছু গ্লানি, কিসের স্পর্শে আজ তারা সব সোনা হয়ে গিয়েছে। ফাটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার ভালো করে দেখে নিলে সত্যভামা। বার বার করে বিশ্লেষণ করে দেখতে ইচ্ছে করছে নিজেকে, নিজের মধ্যে প্রশ্ন জাগছে ঃ এমন কী আছে তার ভেতরে, যে জন্যে ধীরেন তাকে ভালোবাসলো?

—সতী কই রে! ধীরেন ডাকছে তোকে।—সখানাথের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—যাচ্ছি—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে সত্যভামা। কী মানুষ বাপু, একটুখানি তর সয় না। সবুজ শাড়িটা কিছুতেই যেন মনের মতো করে গুছিয়ে তোলা যাচ্ছে না ঃ যাচ্ছি, যাচ্ছি।

হাওয়ার ওপর পা ফেলে দিয়ে প্রজাপতির মতো ঘরের মধ্যে ভেসে এল সত্যভামা। খাওয়াদাওয়ার পরে একখানা চেয়ারে নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে ধীরেন। শ্যামবর্ণ মার্জিত চেহারা, ওলটানো চুল। সমস্ত চোখ মুখ প্রত্যাশায় উদগ্র হয়ে আছে।

—উঃ, এতক্ষণ পরে! তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আমার চোখ প্রায় কানা হওয়ার যোগাড়।

ঘরে সখানাথ নেই। সময় বুঝেই সেখান থেকে সরে গেছে সে। উঠে ধীরেন সত্যভামার একখানা হাত ধরবার চেষ্টা করলে।

—থামো, পাগলামি করো না। বাবা এসে পড়বেন এখুনি।

—তুমি ভয়ানক নিষ্ঠুর।—ধীরেনের চোখের পাতা অভিমানে ভারী হয়ে এল।

—অমনিই রাগ হল? কী ছেলেমানুষ!—আদর করে ধীরেনের চিবুকটা একবার নেড়ে দিলে সত্যভামা ঃ কী এনেছ আমার জন্যে, দেখি।

সেদিক দিয়ে রুচি আছে ধীরেনের। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের খানকয়েক কাব্যগ্রন্থ। ছোট মখমলের বাক্সে পার্কারের সুন্দর একটা লেডীজ পেন।

—কী চমৎকার কলমটা! সত্যভামা খুশি হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, ওই কলমটা দিয়ে আই. এ.-তে তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে।

—ফার্স্ট না আরো কিছু। সত্যভামার আয়ত কালো চোখে একটা লীলায়িত ভঙ্গি মুখর হয়ে উঠল ঃ যে পাগল তুমি! বিয়ের পরে আমাকে কি আর পড়তে দেবে একটুও? পরীক্ষায় ফেল করতে হবে নির্ঘাত।

—কক্ষণো না। আমি? কিছুতেই না—হাতে-নাতে কথাটার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার জন্যেই যেন ধীরেন উঠে এল সত্যভামার দিকে।

—কী আরম্ভ করলে তুমি! দাঁড়াও, বাবা কোথায় আছেন দেখে আসি— লঘুপায়ে সত্যভামা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মা-র ঘরের দরজায় এসেই সে চমকে থেমে গেল অকস্মাৎ। বাবা মা কথা বলছে ঘরের ভেতরে। আজ দু বছরের মধ্যে এমন মিষ্টি গলায় সে মাকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শোনেনি, ভারী বিস্ময় বোধ হল তার।

—কী হল, কাঁদছ তুমি! এত ছেলেমানুষের মতো করছ কেন! মেয়ে তো পরের জন্যেই জন্মায়—তা ছাড়া এমন ভালো ছেলে ধীরেন। আমাদের মতো গরীবের ঘরে এমন জামাই আনা আমরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারি কখনো!

সখানাথের ধরা গলা কানে এল।—না, না, তা নয়। ভাবছি সংসারের অবস্থা। তোমার তো এই দশা। তা ছাড়া—সখানাথ খানিকটা শুষ্ক হাসি হাসল ঃ হারাণ বলছিল মেয়ে তো তোমার ছেলের কাজ করবে, বুড়ো বয়সে খেতে দেবে—ছেলে তো আর নেই তোমার। তা ছাড়া যা তোমার শরীর, আর বেশিদিন তো খাটতে পারবে না, এখন মেয়ের ওপরেই নির্ভর করো। আমি বললাম, তা কেন? আমি কি এতই স্বার্থপর যে—

বাকিটা সত্যভামা আর শুনতে পেল না, হয়তো বলতেই পারলো না সখানাথ। কিন্তু

মুহূর্তের মধ্যে একটা বিদ্যুতের চমক এসে যেন জাগিয়ে দিল সত্যভামাকে। বুঝেছে, সখানাথকে সে বুঝতে পেরেছে। এত অসহায় এত বিপন্ন। মেয়ে জীবনে কৃতী হয়ে উঠবে, বুড়ো বয়সে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দেবে, পিতৃঋণ শোধ করবে। এই আশাতেই এত দিন সখানাথ বুক বেঁধে বসে আছে।

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল, সমস্ত চেতনা যেন অসংলগ্ন আর শৃঙ্খলাহীন হয়ে গেল মুহূর্তে। স্বপ্নের সন্ধ্যা ভেঙেচুরে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে। বস্তির ওপর কালো কালো কয়লার ধোঁয়া জমে উঠে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে বায়ুস্তরকে, যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আরো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দশ বছর বয়সের সময়েই বুড়ো হেড্‌ম্যানের হাতে তাকে গৌরীদান করে মস্ত একটা লিফ্‌ট পাওয়ার কল্পনা করেছিল তার বাবা। শুধু মা'র বাধাতেই এমন পুণ্য সংকল্প সেদিন সার্থক হয়নি, অবশ্য তার জন্যে অনেকগুলো পদাঘাতই বর্ষিত হয়েছিল গিরিবালার পিঠে। সেদিন সখানাথ যা ছিল আজো ঠিক তাই আছে, এতটুকু পরিবর্তন হয়নি কোনোখানে।

পিতৃঋণ? এই ঋণ তাকে শোধ করতে হবে।

দরজার গায়ে মাথা রেখে সে নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। এক পা চলতে পারল না, কিছু আর ভাবতে পারল না। তবে তাই ভালো। ঋণই সে শোধ করবে।

ঘরের মধ্যে ধীরেন শিস দিচ্ছে অধৈর্যভাবে। ঝড়ের মতো সত্যভামা তার সামনে এসো দাঁড়াল।

—ক্ষমা কোরো, আমি পারব না।

ধীরেন চমকে উঠল।

—কী পারবে না? কী বলছ তুমি?

—তোমাকে বিয়ে করতে।

আঘাতের আকস্মিকতায় ধীরেন বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

—কী বলছ পাগলের মতো?

—ঠিক কথাই বলছি। তোমার বই, কলম সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি পারব না। —বিদ্যুৎগতিতে তিরোহিত হয়ে গেল সত্যভামা, বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে গেল চাপা-কান্নার একটা বিলীয়মান শব্দ।

ধীরেন আরো কিছুক্ষণ মূঢ়ের মতো বসে রইল। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে নেমে গেল অচেতন পায়ে। বই আর কলম টেবিলের ওপর তেমনি রইল ছড়িয়ে। ঘরের মধ্যে গিরিবালা তখনো সখানাথকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

উঠোনে নেমে আকাশের দিকে বোবা চোখ মেলে দাঁড়ালো সত্যভামা। জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবী মিথ্যে হয়ে গেছে। বাব্‌লাতলী বস্তির প্রেতাত্মা এসে ভর করছে তার চেতনার ওপর। দাবি, দাবি আর ঋণ। মিথ্যের দাবি,—যার লালসায় তার জন্ম, তার স্বার্থপরতার কাছে আত্মবলি দেবার ঋণ।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। সে এর প্রতিশোধ নেবে, জগতের ওপর, নিজের ওপর, সখানাথের দেওয়া এই দেহটার ওপর। কিন্তু কেমন করে?

খস্‌-স—। বারান্দার আলোতে দেখা গেল ঢিলের সঙ্গে বাঁধা নীল রঙের পুরু একখানা লেফাফা তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। আর আধো অন্ধকারের মধ্যে সে

দেখতে পেল তেতলার বারান্দায় সেই ডোরাকাটা পাজামা পরা তরুণটি রেলিংয়ে ভর দিয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এ চিঠি তারই বার্তাবাহী।

এক মুহূর্ত সত্যভামা অনড় আর অনিশ্চিত হয়ে রইল। সে প্রতিশোধ নেবে—সমস্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রতিশোধ নেবে। তারপরে লোকে যেমন করে বিষের পাত্র হাতে তুলে নেয়, তেমনি করেই সেই সুগন্ধ নীল খামখানাকে তুলে নিয়ে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

তরফদার

জীবনে তিনবার আমি তরফদারকে দেখেছি।

প্রথম যখন দেখি তখন আমি মফঃস্বল কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। ছোট মাসিমার বিয়েতে তিনদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম। কলকাতা সম্পর্কে তখন পরিচয় ছিল অল্প, আর সেইজন্যেই কৌতূহলটা ছিল প্রবল। বিয়ের হট্টগোলের বাইরে ফাঁক পেলেই পথে বেরিয়ে পড়তাম। ইচ্ছে করত দু চোখ ভরে দেখে নিই কলকাতাকে—পান করে নিই আকণ্ঠ। অলিতে গলিতে খেয়াল খুশি মতো ঢুকে পড়তাম—বড় রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করতাম লক্ষ্যহীনের মতো। তিনদিন আমার সময়—মাত্র তিনদিন। এই ছোট পরিসরটুকুর ভেতরে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে কলকাতাকে গ্রাস করে নিতে হবে—এতটুকু বাদ দিলে চলবে না আমার। লেকের ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখেছি মাছের খেলা, আবার কার্জন পার্কের নরম ঘাসের ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেছি আলোকিত চৌরঙ্গীর প্রাসাদ শিখরে শিখরে 'নিয়নে'র অপরূপ বর্ণরাগ।

সেই বিশেষ বয়সে তার বিশেষ সেই ক্ষুধার্ত মনটাকে নিয়ে আমি প্রথম তরফদারকে দেখেছিলাম।

গোলদীঘির একটা বেঞ্চেতে বসে সাঁতারুদের বিচিত্র ডাইভিং দেখে পুলকিত হচ্ছি, এমন সময় নজর গেল পেছনের ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের দিকে।

লোহার গেটে টাঙানো হয়েছে একখানা রাঙা টকটকে শালু কাপড়। তার ওপরে তুলোর লেখাগুলো খুব স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল ঃ অস্পৃশ্যতা নিবারণ সভা। দ্বিতীয় বিপুল অধিবেশন। তারও নিচে লেখা ঃ স্বাগতম্।

মনে হল ওই স্বাগতম্ অক্ষরগুলো আর কাউকেই নয়—বিশেষভাবে আমাকেই যেন আহ্বান জানাচ্ছে! কলকাতায় সভাসমিতিগুলো কী জাতীয় ঘটনা এ বিষয়ে বরাবরই সজাগ একটা কৌতূহল ছিল। সে কৌতূহলের হাত এড়ানো গেল না— যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে আমি উঠে পড়লাম, তারপর ভীরু সংকুচিত পায়ে প্রবেশ করলাম লোহার গেটের ভেতরে।

দরজায় যিনি ছিলেন, তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।—আসুন, আসুন, ভেতরে যান।

ভারী সম্মানিত বোধ হল নিজেকে। নিতান্তই মফঃস্বল শহরের তথা মফঃস্বল

কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র আমি। কলকাতার একটা বিশিষ্ট সভাগৃহে এমন করে আমন্ত্রিত হলাম, কী সৌভাগ্য? তা হলে কি আমার আকারে প্রকারে এবং বেশে বাসে এমন একটা কিছু আছে যাতে আমাকে একটা বিশিষ্ট কিছু বলে মনে হতে পারে? অথবা কলকাতার সভা সম্মেলনের রেওয়াজই এইরকম?

কিন্তু 'হলে' ঢুকে অভ্যর্থনার কারণটা বোঝা গেল। অত বড় হলে গোনাগুন্‌তি চল্লিশটিরও বেশি লোক হয়েছে কিনা সন্দেহ। সামনের ডায়াসের ওপর সভাপতির চেয়ার টেবিল—তার আশেপাশে আরো খান কয়েক চেয়ার। চেয়ারগুলো সবই অধিকৃত—ওখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা সবাই বোধ করি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত এবং বক্তা।

আমি এসে বসবার মিনিট কয়েক বাদেই সভা আরম্ভ হল। কী একজন অ্যাডভোকেট সভাপতির আসন সমালংকৃত করলেন। মাল্যদান হল, চল্লিশটি হাতে বাজল সংক্ষিপ্ত এবং সোৎসাহ করতালি। সগৌরবে শুরু হল অস্পৃশ্যতা নিবারক সমিতির দ্বিতীয় বিপুল অধিবেশন।

দুটি তরুণ এবং দুটি তরুণী অর্গ্যান বাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলে ঃ

'জলে হরি, স্থলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি,
হরিজনে আছেন হরি
হরিময় ভূমণ্ডল—'

সময়োপযোগী সঙ্গীতের পরে শুরু হল বক্তৃতা পর্ব। একের পর এক বক্তা দাঁড়িয়ে উঠে জ্বালাময়ী ভাষায় অস্পৃশ্যতার ভয়াবহ কুফল বর্ণনা করে যেতে লাগলেন। শম্বুক বধ করে রামচন্দ্র যে কুকীর্তি করেছেন এবং এখনো মাদ্রাজে পারিয়াদের ওপরে যে ভয়ানক বীভৎস সামাজিক অত্যাচার সংঘটিত হয়ে থাকে—তার কোনোটাই বাদ গেল না। অবিলম্বে অস্পৃশ্যতা নিবারণ না করলে হিন্দুধর্ম বিশ বাঁও জলের নিচে ফুটো নৌকোর মতো টুপ করে তলিয়ে যাবে—অকাট্য যুক্তিতর্কে সেটা সপ্রমাণ করে দিলেন তাঁরা।

তাই আমাদেরই শাস্ত্র বলেছে ঃ 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ'—সগর্জনে শেষ কথাটি ঘোষণা করে এবং টেবিলে সেই অনুপাতে ভয়ংকর একটি কিল বসিয়ে তৃতীয় বক্তা যখন ঘর্মাক্ত দেহে বসে পড়েছেন আর অডিটোরিয়াম সাধুবাদে রীতিমতো মুখরিত হচ্ছে, এমন সময় এক কোণ থেকে একটি উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ সভাপতি মশায়ের অনুমতি পেলে আমি দু'চারটে কথা বলতে চাই।

আশ্চর্য গম্ভীর সে গলা। কাছাকাছি কোথাও প্রবল বেগে বাজ পড়লে যেমন তার শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে থাকে—তেমনি সেই আওয়াজে সমস্ত ঘরটা যেন গমগম করে উঠল। পূর্ববর্তী বক্তার ভয়াল গর্জনটাও তার কাছে ফিকে মনে হল, মুহূর্তে চল্লিশ জোড়া চোখ চকিত হয়ে ঘুরে গেল সেদিকে।

আর সেই আমার প্রথম দর্শন। পূর্বরাগও বলা যায়।

আমার পাশের ভদ্রলোক অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, অতুলন তরফদার।

আর একজন মন্তব্য করলেন ঃ সেরেছে। এখানেও জ্বালাতে এসেছে লোকটা?

সভার ভেতরে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন সূচিত হচ্ছিল, এমন সময় অতুলন তরফদারের

সেই অতুলন গলা আবার সব কিছুকে ছাপিয়ে বেজে উঠল ঃ সভাপতিমশাই, আমি কিছু বলতে চাই।

বেশ বোঝা গেল সভাপতি বিপন্ন বোধ করছেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, বক্তা আমাদের অনেকেই আছেন—সময়ও অল্প—

—আমিও আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না—অতুলন তরফদার উঠে দাঁড়ালেন। নিতান্তই আনকোরা মফঃস্বলের ছেলে আমি, তবু আমার মনে হল তরফদার যেন জোর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন—এ সভায় দু'কথা বলবার অধিকার নিজের শক্তিকেই আদায় করে নিলেন তিনি।

নিজের শক্তিতে ছাড়া আর কী! এতক্ষণে সম্পূর্ণভ'বে তরফদারকে দেখতে পেলাম আমি--ইংরেজীতে যাকে বলে ম্যান ইন এ মিলিয়ান। এমন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারা কোনো বাঙালীর যে হতে পারে এ কোনোদিন কল্পনাতেও ছিল না। লম্বা বোধ হয় সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাতের কাছাকাছি যাবে লোকটি। পেশল ঋজু শরীরে যেন ডায়নামোর মতো শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রকাণ্ড মাথাটার চুলগুলো কুস্তিগীর পালোয়ানের ঢঙে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটাই করা, তার ভেতর থেকে খর্বকায় একটি টিকি উঁকি মারছে। আর চুলের স্বল্পতার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখখানায়—জাঁদরেল একটি মানানসই গোঁফে। ছবিতে কাইজার আর হিণ্ডেনবার্গের গোঁফ দেখেছি, কিন্তু এ গোঁফ তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে। তার দৈর্ঘ্য যেমন, প্রস্থও সেই অনুপাতে।

বেশবাসেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ জ্বলজ্বল করছে অদ্ভুতভাবে। টকটকে ঘোর লাল রঙের একটা বেনিয়ান গায়ে, তার ফিতেটা গাঢ় সবুজ। অমন একটা ছেলেমানুষি জামা আর কারো গায়ে নিশ্চয় বেখাপ্পা আর বেমানান ঠেকত, কিন্তু অতুলন তরফদারের সঙ্গে ওর যেন কোথায় একটা নিবিড় আর গভীর সাদৃশ্য ছিল। লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বড় বড় মোটা আঙুলে তরফদার তাঁর গোঁফের দুই প্রান্তটা একবার পাকিয়ে নিলেন, বোধ হয় উদ্দীপনা সঞ্চার করে নিলেন নিজের ভেতরে। তারপর সেই আশ্চর্য গম্ভীর গলায় তিনি বলতে শুরু করে দিলেন।

বলবার ক্ষমতা আছে লোকটির—আর সেই ক্ষমতার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে তাঁর অসাধাবণ আত্ম-প্রত্যয়। তাঁর সব কথাগুলো ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না, কিন্তু যেটুকু বুঝেছিলাম তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর।

তরফদার বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ টিবারণ নিতান্ত বাজে কথা। যাদের কাজ নেই, তারাই ওই সব নিয়ে খানিকটা হৈ চৈ করতে ভালোবাসে। অস্পৃশ্য যারা হয়েছে, তারা নিজেদের অযোগ্যতার জন্যেই হয়েছে। এঁটো পাতা কখনো স্বর্গে যায় না, তাদের উন্নতির চেষ্টা পাগ্‌লামি মাত্র। ছোটলোক ডোম না থাকলে আমাদের মড়া পোড়ানো চলবে কী করে? ছোটলোক মেথর না থাকব্যর অবস্থাটা একদিনও কি আমরা ভাবতে পারি? সুতরাং এসব নিয়ে গণ্ডগোল করবার কোনো মানে হয় না। এ বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান যা বলে গেছেন তা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমি শ্রদ্ধেয় সভাপতি মশাইকে প্রশ্ন করতে পারি কি যে, কাল যদি একজন রাস্তার বেলদার এসে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাকে তিনি জামাই করতে রাজী আছেন কিনা?

কথাটা শেষ করে নিস্তব্ধ সভার ভেতর দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন তরফদার। বাইরের করিডোরে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বিলীয়মান ভারী জুতোটার শব্দ বাজতে লাগল।

প্রায় দু-তিন মিনিট পরে ধাতস্থ হল সভা। আট-দশজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ শেম্ শেম্! কিন্তু ততক্ষণে তরফদার বহুদূরে চলে গিয়েছেন।

আমার পাশের ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, লোকটার সব সময় ওরিজিন্যাল হবার চেষ্টা। সবাই জানে যে অস্পৃশ্যতা দূর করাটা আজকে একান্ত দরকার, তাই তার স্বপক্ষে সাফাই গেয়ে মৌলিকতা প্রমাণ করে গেল। আশ্চর্য লোক!

সভায় তখন পঞ্চম বক্তা উঠে যুক্তির ধারালো ছুরি দিয়ে তরফদারের কথাগুলোকে কেটে একবারে কুচি কুচি করে ফেলছিলেন। কিন্তু আমার কেমন ভালো লাগল না—মনে হল তরফদার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সব কিছু আকর্ষণ যেন আমার নষ্ট হয়ে গেছে। আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পথে জ্বলেছে বিদ্যুতের রোশনাই আর লোকের ভিড় চলছে বেড়ে। আমার মনের সামনে তরফদারের সেই অপূর্ব মূর্তিটা যেন ছবির মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। ক্রমাগত ইচ্ছে করতে লাগল পথে যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই, তা হলে সাহসে ভর করে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করে নেব। বলব আপনি যা বলেছেন সব সত্যি, আপনার মতের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিল আছে।

কিন্তু কলকাতার জনারণ্যে তরফদারের চিহ্নও আমি আর খুঁজে পেলাম না।

মনস্তত্ত্বে এমন কথা কি কিছু বলে যে, মানুষ একান্ত করে যা কামনা করে একদিন সে তা পাবেই? অথবা এমন একটা কিছু কি সাইকিক ফোর্স আছে যা কারো আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে তার কাছে টেনে আনে? এ সবের সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু তরফদারের সঙ্গে দেখা হওয়ার যে উদগ্র কামনা আমার মনের ভেতর প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সেই কামনার বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে গেলাম।

ততদিনে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। প্রথম যৌবনের সেই মফঃস্বলবাসী নির্বোধ মনটি আর নেই—তার রূপান্তর হয়েছে, তার উন্নতি হয়েছে। চাকরির তাগিদে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছি কলকাতার। খবরের কাগজের অফিসে উদয়াস্ত এবং অস্তোদয় পরিশ্রম করতে হয়। সস্তা ভাড়ার স্যাঁৎসেঁতে একতলা বাড়ি, ট্রামে বাসে জীবন-সংগ্রাম, ভিড়, হট্টগোল আর অভাবের পাপচক্রে পড়ে কলকাতার রূপটাই বদলে গেছে। সে কৌতূহল নেই, সে চোখও নেই। এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কলকাতা থেকে ছিটকে বাইরে চলে যাই কোনো অবারিত দিগন্তে, কোনো নির্মেঘ নীলাঞ্জন আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মুক্তি আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি একটা। যন্ত্রের ঐশ্বর্য সমস্ত চিন্তা চেতনায় আর চমক দেয় না, যন্ত্রপুরীর বাঁধ-ভাঙা মুক্তধারার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে।

ছিলাম বউবাজারে, ওখান থেকে বাড়ি বদলে এলাম পটলডাঙ্গার এক গলিতে। আর প্রথম দিন বিকেলেই পাশের বাড়ির নেমপ্লেটের ওপর আমার নজর গেল ঃ অতুলন তরফদার।

অতুলন তরফদার! আমার রক্ত ঝনঝন করে উঠল। পাঁচ বছর আগেকার সেই

সন্ধ্যাটি আমার মনের সামনে নতুন করে ফিরে এল। টকটকে লাল বেনিয়ানের ওপরে সবুজ রঙের ফিতে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহধারী অসাধারণ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত একটি মানুষ। গম্ভীর গমগমে গলায় সমস্ত হলটা যেন কেঁপে উঠেছিল। পাঁচ বছর ধরে আমার চিন্তার ভেতরে যে লোকটির ছায়ামূর্তি অপরূপ একটা ইন্দ্রজাল নিয়ে খেলা করে গেছে—সেই লোক, সেই আশ্চর্য লোকটি আমার পাশের বাড়িতেই বসবাস করছেন।

.একটা বিচিত্র অনুভূতি আমার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া করতে লাগল। বহু কামনা এবং প্রতীক্ষার পরে বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের পূর্বক্ষণে নায়িকার মনের ভেতর যেমন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে, আমারও যেন তাই হতে লাগল। দুবেলা অফিস এবং অফিস-ফেরত যাতায়াতের সময় উদ-গ্রীব চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে যাই। কিন্তু কোনোদিন কাউকে দেখতে পাই না। সামনের সদর দরজাটা যেন দৈত্যপুরীর ফটকের মতো অনন্তকাল ধরে রুদ্ধ হয়ে গেছে—যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে বাইরে ঠেলে সরিয়ে রেখে ওর ভেতরে অ্যালকেমিস্টদের মতো কী একটা সাধনা চলেছে। ওখানে যারা আছে তারা বোধ হয় সৃষ্টির আদিকালের বাসিন্দা—আজকের দিনের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোনোখানে কিছুমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য নেই। কোনোদিন ও বাড়ির দরজা খোলে না—কোনোদিন ডাকপিয়ন এসে ওখানকার সদরে কড়া নাড়ে না। কলকাতার কল্লোলিত সমুদ্রে কালো গ্র্যানাইটের পাঁচিলে ঘেরা একটা দুষ্প্রবেশ দ্বীপ-দুর্গের মতো ও বাড়িটা যেন কনান ডয়েলের প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো স্তব্ধ হয়ে আছে।

সেদিন রবিবারের ছুটি। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে নিজের বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছিলাম। কাগজে মন ছিল না—ওই অদ্ভুত বাড়িটা আমার মনোজগৎকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হাজারবার চেষ্টা করেও কাগজের একটি ছত্র আমি পড়তে পারছিলাম না।

দুত্তোর, এ কী ব্যাধি আমাকে পেয়ে বসল! আমি খবরের কাগজের স্বল্প-বৈতনিক কেরানী তারকনাথ গাঙ্গুলী, রয়টার এ-পির খবর বাঙলায় অনুবাদ করি, দিন আনি, দিন খাই। আমার মাথার ভেতরে এসব কী বিদ্‌ঘুটে রোমান্স এসে কায়েমি বাসা বেঁধে বসল। পাঁচ বছর আগে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে দেখা বিচিত্র সেই অতুলন তরফদার আর আশ্চর্য রহস্যময় এই চির নীরব বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আমি কি পাগল হয়ে যাবো! না—না. আমি ছা-পোষা মানুষ, পাগল হতে গেলে আমার চলবে না—ওসব বড়লোকের শখ।

বসে থেকে থেকে ক্রমে যেন খুন চেপে যেতে লাগল আমার, কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। নাঃ—আর পারা যায় না। এ কৌতূহলের পীড়ন আমার অসহ্য। আজ একটা এস্‌পার ওস্‌পার করে ফেলতে হবে। ওই বাড়ির ভেতরে কী আছে এবং কে আছে আমি দেখব।

মনটাকে স্থির করে ফেললাম। খবরের কাগজ নামিয়ে উঠে পড়লাম—তারপর সোজা এসে এ বাড়ির দরজার কড়াতে হাত দিলাম।

কিন্তু কড়াতে হাত দিতেই কেমন চমক লাগল। মরচে পড়ে গেছে কড়া দুটোয়—দরজার পাল্লার গায়ে তারা শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। বহুদিন কেউ ওতে হাত দেয়নি। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা প্রশ্ন করে উঠল বাড়িটা খালি নয় তো? কিন্তু তাই বা

কী করে হবে? তাহলে, সদরে নিশ্চয়ই তালা থাকত। তাছাড়া রাত্রে এ বাড়ির বন্ধ দরজা জানলার ফাঁকে ফাঁকে আমি যে আলো দেখেছি সেও তো চোখের ভুল নয়!

আমি কড়া নাড়লাম। খট খট করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ বেজে উঠল— আমার নিজের কানেই যেন বিশ্রী লাগল সেটা। আবার কড়া নাড়লাম—তেমনি অস্বস্তিকর শব্দ উঠল। কিন্তু ভেতর থেকে কারো সাড়া এল না।

আমি যেন মরীয়া হয়ে উঠেছি। দু'হাতে আবার সজোরে কড়াটাকে ঝাঁকুনি দিলাম। প্রবল শব্দে সমস্ত পাড়াটা অবধি চমকে উঠল।

দরজা খুলে গেল।

যে দরজা খুলে দিল, তাকে দেখবামাত্র আমার শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল মুহূর্তে। তরফদার—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তরফদার। সেই বিশাল দীর্ঘ শরীর—পাঁচ বছরেও তার কিছুমাত্র রূপান্তর ঘটেনি। মাথাটা একেবারে পরিষ্কার, কানের দু পাশে গাছকয়েক চুল ছাড়া সবটাই টাক পড়ে গেছে। সে দশাসই গোঁফজোড়া আর নেই—তার জায়গা অধিকার করেছে দুর্ভেদ্য নিবিড় দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল। পরনে পা পর্যন্ত একটা আলখাল্লা—তার রঙ কুচকুচে কালো। চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে।

এইবারে আমার হঠাৎ মনে হল লোকটা বোধ হয় পাগল। নিজের অজ্ঞাতেই আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

গম্ভীর প্রশান্ত গলায় তরফদার বললেন, কে আপনি?

—আমি, আমি পাশের বাড়িতে থাকি।

—নতুন ভাড়াটে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও, সেই জন্যেই। তা কী চাই আপনার?

আমতা আমতা করে বলে ফেললাম। অনেকদিন আগে একবার তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার একটা ইচ্ছে ছিল, তাই—

—ওঃ!—নির্বিকার গলায় তরফদার বললেন, ভেতরে আসুন।

আমি ঢুকতেই পেছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা অনিশ্চিত আশংকায় পীড়িত হয়ে উঠল আমার মন। আশ্চর্য, এই বেলা সাড়ে আটটার সময় কলকাতার একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকতে আমি ভয় পাচ্ছি!

আদেশের গলায় তরফদার বললেন, আসুন।

সম্মোহিতের মতো আমি নীরবে তাঁর অনুসরণ করলাম।

দোতলার একটা প্রায়ান্ধকার ঘর। দরজা জানালা শক্ত করে আঁটা, ভগবানের পৃথিবীকে যেন অস্বীকার করে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপরে বোধ হয় একটা পাখা ঘুরছে—তার আভাস পেলাম। আর ঘরের এক পাশে একটা লাল আলো—কেমন একটা আলো আঁধারে যেন সব থমথমে করে রেখেছে।

ঘরে চেয়ার টেবিল ছিল না। মেঝেতে একটা ফরাস পাতা আছে বুঝতে পারলাম। তরফদার বললেন, বসুন।

বসলাম। তরফদারও বসলেন। তারপর কেমন মিষ্টি করে হেসে বললেন, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, না?

সত্যি বলতে কি, এতক্ষণে আমার ভয় করছিল। বেশ বুঝতে পারছি এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি যা তরফদারের মতোই দুর্বোধ্য আর রহস্যাবৃত। বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে এমন একটা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করবার মানে কী?

আমি শংকিত গলায় বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—

—মনে হয়েছিল লোকটা একটু অদ্ভুত, তাই নয়? কিন্তু কেন বলুন তো? অদ্ভুত বলতে আপনারা কী বোঝেন?

অদ্ভুত বলতে কী বুঝি! এ কথার চট করে একটা জবাব দিই কী করে! আমি তো তো করতে লাগলাম।

তরফদার নিজেই আমাকে সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। বললেন, তার কারণ আপনারা যাদের দেখতে অভ্যস্ত আমি তাদের মত নই। আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষগুলোকে সব গড্ডলিকা-প্রবাহ বললেও বেশি বলা হয়—তারা যেন পিঁপড়ের সার। সব এক রকম রঙ, এক রকম চেহারা—কোনোটাকে কোনোটা থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না, চেনাও যায় না।

—কী বলতে চান আপনি?

—আমি বলতে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা। এদিক থেকে আপনি আমাকে উগ্র ইনডিভিজুয়ালিস্টও মনে করতে পারেন। বহুর মধ্যে আমি মিলিয়ে যেতে চাই না, সবার রঙে রঙ মেশানোতে আমার রুচি নেই। তা কখনো হয় না, তা হতে পারেও না। আমি এমন একটা কিছু করছি যা একান্তভাবে আমার—যেখানে আমি একচ্ছত্র।

আমি আস্তে আস্তে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বললাম, আপনার প্রচুর শক্তি আছে। আপনি যে কোনো কাজে নামলেই তো প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য—

—ব্যাস্ ব্যাস্, থামুন।—অধৈর্যভাবে আমাকে থামিয়ে দিলেন তরফদার ঃ আপনি না বললেও আমি জানি আমার প্রচুর শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি আমি কিসের পেছনে ব্যয় করব বলছেন? রাজনীতি? ও কথাটার কোনো মানে হয় না—অ্যানিম্যাল ওয়ার্লডে যা ঘটছে, মানুষের রাজনীতিও সেই যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। সুতরাং ওখানে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? সমাজনীতি? পিঁপড়ের কথা বলছিলাম—দেখুন গে তারাও মানুষেব মতো সমাজবদ্ধ। সাহিত্য? পাগলের প্রলাপ! ধর্ম? চিরকেলে জোচ্চুরি—রিলিজিয়নের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে দেখবেন প্রিমিটিভ অজ্ঞতা থেকেই ওর সূত্রপাত এবং মানুষের স্বার্থবুদ্ধিতে ওর বিকাশ।

কথাগুলো সম্বন্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করবার ইচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু তরফদারের এই প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সে ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আধা-অন্ধকারে কালো আলখাল্লাঢাকা শরীরটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, শুধু জেগে আছে একটা মাথা—হঠাৎ মনে হতে পারে যেন শূন্যে একটা কাটামুণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। আর দুটো উজ্জ্বল চোখ নির্নিমেষভাবে আমার ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে—যেন একটা অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, তা হলে আপনি কী করতে চান?

—যা করছি তা একটা নতুন জিনিস। বিজ্ঞান আর দর্শন যা কখনো করতে পারবে না, সেইটেকে আয়ত্ত করছি।

—কী রকম?

—প্রেততত্ত্ব।

—প্রেততত্ত্ব?

—হ্যাঁ। পরলোকের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই। মানুষ যা কখনো জানতে পারেনি, অথচ চিরকাল যা জানবার জন্যে তার আকুলতা সেটাকেই আমি আবিষ্কার করব। বুঝতে পারছেন, এই ঘরটা এমন অন্ধকার কেন? এই বাড়িটাকে কেন আমি কলকাতার বাইরে রেখে দিয়েছি? কারণ—এই নির্জনতা আর অন্ধকার না থাকলে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হবে কেমন করে?

আমার গা ছম ছম করে উঠল, কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। বলে কী লোকটা! এই রবিবারের ছুটির দিনে, বাইরের ঝকঝকে শানানো রৌদ্রে আর এতবড় কলকাতার এমন প্রচণ্ড জীবনাবর্তের ভেতরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভৌতিক সাধনা যে কেউ করতে পারে এ কারো কল্পনাতেও আসে নাকি? তবু আমার ভয় করতে লাগল—আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা বড় বেশি সজাগ আর সচেতন হয়ে উঠল। অসম্ভব নয়—কিছু অসম্ভব নয়—হয়তো এখুনি দেখব আমার সামনে এসে তিন-চারটে অমানুষিক মূর্তি বিকটভাবে নৃত্যোল্লাস শুরু করে দিয়েছে।

কালো আল্‌খাল্লা পরা অদৃশ্যপ্রায় তরফদারও যেন আর পৃথিবীতে নেই। আধা অন্ধকারে তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল যেন তিনিও কোনো একটা অতীন্দ্রিয় জগতেরই অধিবাসী। শরীর নেই—শুধু একটা ছিন্নমুণ্ড আর তা থেকে দৃষ্টির আগুন এসে আমাকে বিদ্ধ—বিদীর্ণ করে ফেলছে!

তীব্র অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। লোকটা হয় পাগল, নইলে সত্যি সত্যিই ভূতগ্রস্ত। এখানে আর বসা উচিত নয়। বাইরে জনতাসংকুল সুস্থ স্বাভাবিক রৌদ্রোজ্জ্বল কলকাতা আমাকে ডাকতে লাগল। আমার চেনা জগৎ, আমার পরিচিত পরিবেশ। যেখানে আমি পিঁপড়ের সারির মধ্যে একটি, যেখানে সবার মধ্যে আমিও আমার রঙ মিশিয়ে দিয়েছি। এই অসাধারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—লোকোত্তর হয়ে আমার দরকার নেই!

যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। আমি উঠে পড়তে চাইলাম।

সেই গভীর নাদধ্বনির মতো গলায় তরফদার বললেন, দাঁড়ান।

সম্মোহিতের মতো দাঁড়ালাম।

—আপনি ভূত মানেন না, না?

বললাম, মানি।

তরফদার যেন জবাবটার জন্যে তৈরি ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর ফুটে বেরুল ঃ না না, আমার মন রাখা কথা বলবেন না। এই বিজ্ঞান আর মেটিরিয়ালিজমেব যুগে আপনারা নিশ্চয়ই ভূত মানেন না?

বললাম, মানি বইকি!

—আপনিও ভূত মানেন!—'আপনিও' কথাটার ওপরে বেশ খানিকটা জোর দিলেন

তরফদার ঃ আপনিও?

—শুধু আমি কেন, অনেকেই মানেন।

—কেন মানেন?—তরফদার যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তাঁর গলার স্বরে আমি চমকে উঠলাম।

—মানি, তাই মানি।

—অঃ! —তরফদার এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ঃ কখনো দেখেছেন কিছু?

—ঠিক দেখেছি বলতে পারব না, তবে প্ল্যাঞ্চেটে কতগুলো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখেছি।

—প্ল্যাঞ্চেট্!

—হ্যাঁ—প্ল্যাঞ্চেট্। তাতে আমি প্রেতাত্মার লেখা দেখেছিলাম।

—আপনি একাই?

—না, অনেকেই আজকাল প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার চেষ্টা করছে। কাজেই এতে আপনার অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারলেন না মিস্টার তরফদার, পারবেনও না।

আমার কথাটার ভেতরে বোধ হয় একটুখানি তিক্ত বিদ্রূপেরই আভাস প্রচ্ছন্ন ছিল। তরফদার কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ভয়ংকর গম্ভীর গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ বেরিয়ে যান—এক্ষুণি বেরিয়ে যান। আপনাকে এখানে ঢুকতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। গেট আউট—

নক্ষত্রবেগে আমি বাইরে ছিটকে পড়লাম। খোলা আকাশ, রৌদ্রোদ্ভাসিত রবিবারের কলকাতা। যেন বেঁচে গেলাম—যেন মুক্তি পেলাম আমি! আমার মনের ওপর থেকে পাঁচ বছরব্যাপী একটা ইন্দ্রজাল যেন সরে গেল—ওই ভূতুড়ে বাড়িটা সম্বন্ধে কৌতূহলের যে ভারটা আমাকে প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত পীড়িত করে তুলেছিল সেটাও কার মন্ত্রবলে নেমে গেল যেন।

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

কিন্তু তখনো শুনতে পাচ্ছি বন্ধ বাড়িটার ভেতর একটা চাপা গোঙানির মতো শব্দ। তরফদার তখনো চিৎকার করে বলছেন ঃ গেট আউট, গেট আউট, গেট আউট—

দিন পনেরো পরে ইচ্ছে করেই বাড়ি বদলালাম। তরফদারের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্যটা যেন আর বরদাস্ত করতে পারছিলাম না—যেন অনুভব করছিলাম ওই ভূতুড়ে বাড়ি থেকে একটা অশরীরী অস্বস্তির ছায়া আমার বাড়িতেও সব সময় ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই বাড়ি বদলাতে হল।

কিছুদিন পরেই কেন জানি না—তরফদার আমার মন থেকে মুছে গেলেন। পাঁচ বছরের পুরোনো ছবির ওপরে কে যেন মোটা তুলির একটা কালো পোঁচড়া দিয়ে চিরদিনের জন্যে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে দিলে। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' মনে পড়ল ঃ আকস্মিক মোহভঙ্গের পরিণতি বোধ হয় এই রকমই হয়।

কিন্তু আর একবার তরফদারের সঙ্গে আমার দেখা হল; সেটাও এইরকম আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত।

আরো তিনটি বছর কেটে গেছে। পূজোর ছুটিতে উত্তরবঙ্গে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রেল স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে নিরিবিলি একটি গ্রাম। কলকাতার বীভৎস শ্বাসরোধী জীবনের বাইরে অনাবরণ পৃথিবী।

ছুটিটা চমৎকার কাটল। টাটকা মাছ, নির্জলা দুধ, মাঝে মাঝে বন্দুক নিয়ে বিলে বিলে ঘুরে বেড়ানো। এই সময় থেকেই দুটো চারটে বুনো হাঁস পড়তে শুরু হয়—নদীর চরে চখা-চখীর সাক্ষাৎ মেলে। অফুরন্ত বিশ্রাম আর সহজ সুস্থ আনন্দের মধ্যে কটা দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে চলেছিলাম।

সন্ধ্যায় ট্রেন, তাই সকাল সকাল খেয়েদেয়েই গোরুর গাড়িতে চড়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছি। দুপুরের রোদে চক্রবালবিসারী দিক-প্রান্তর ধু ধু করছে—যেন সমস্ত পৃথিবীটাই বিচিত্রভাবে ঝিমিয়ে পড়ছে। আমিও ঝিমুচ্ছি। গাড়োয়ানটা হাঁকাচ্ছে প্রাণপণেঃ ডাহিন বাঃ ডাহিন! কুন্‌ঠি যাইছে হে ভৈসা—ডাহিন্—

শরতের সোনা-ঝরানো রোদ। তবু বেলা দুপুরে এই মাঠের ভেতর সেটা রীতিমতো প্রখর হয়ে উঠছিল। ছইয়ের ভেতর দিয়েও গায়ে এসে বিঁধছিল একটা ভ্যাপসা চাপা গরম। হঠাৎ ভারী তৃষ্ণা বোধ হল।

গাড়োয়ানকে বললাম, এখানে খাওয়ার জল পাওয়া যাবে রে?

গাড়োয়ান মহিষকে বাপ-বাপান্ত করবার ফাঁকে ফাঁকে জবাব দিলে, থোরা আগিলাত পানি মিলিবে বাবু, চলেক্। গাড়ি একঘেয়ে গতিতে তেমনি চলতে লাগল, আর আমি ঝিমুতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা থেমে গেল। গাড়োয়ান ডেকে বললে, এইঠে পানি আছে জী, পিবেন?

তাকিয়ে দেখলাম সামনেই একটা আমের বাগান। তার পেছনে একটা সাদা একতলা বাড়ি—মন্দিরের মতো লম্বা একটা চুড়ো তুলেছে আকাশে। আর বাগানের ভেতরে বড় একটা ইঁদারা, তার কাছে দড়ি-বাল্‌তি পড়ে আছে। মরুভূমির মতো শস্যবিরল মাঠের অবাধ বিস্তৃতির মাঝখানে একটা চমৎকার বিশ্রামের জায়গা—একট অপূর্ব মরূদ্যান।

গাড়োয়ান বাল্‌তি ভরে ইঁদারার জল তুলে নিয়ে এল। জল খেয়ে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কার বাড়ি রে?

গাড়োয়ান জবাব দিলে, বাড়ি নয় হুজুর, গীর্জা।

—গীর্জা! এখানেও পাদ্রী এসেছে নাকি?

হ্যাঁ—পাদ্রী এসেছে বইকি। চার পাশের সাঁওতাল আর ওঁরাওঁদের তারা সুসমাচার শুনিয়ে আলোকে টেনে আনছে। না, আগে সাহেব পাদ্রী ছিল বটে, কিন্তু এখন তার জায়গায় এসেছে একজন বাঙালী। একটা সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করে সে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করছে।

কথাটা শেষ করে গাড়োয়ান মহিষের ঘাড়ে জোয়াল চড়াতে চড়াতে বললে, ওই তো পাদ্রী সাহেব ওইঠে খাড়াই আছে—

আমি তাকিয়ে দেখলাম অদূরেই পাদ্রী সাহেব দাঁড়িয়ে। প্রথম বিশ্বাস করতে পারিনি, তারপর নিঃসন্দেহে চিনতে পারলাম। তরফদার—অথবা ভূতপূর্ব তরফদার। এখন হয়তো নাম হয়েছে ইজেকিয়েল কিংবা ইমানুয়েল।

পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়ি কোথায় যাবে?

সজোরে মহিষ দুটোকে হাঁকিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান জবাব দিলে, একলাখী ইষ্টিশন।

গাড়ি চলেছে। বরেন্দ্রভূমির মাঠে ঝলকাচ্ছে রোদ। গাড়ির চাকায় রাঙা ধুলো উড়ছে—মাঠে ঘুরছে ঘূর্ণি। পাদ্রী সাহেবের গীর্জা পেছনে মিলিয়ে গেছে— চিহ্নহীনভাবে মিশে গেছে ফেলে-আসা দিগন্তের বীথিরেখার ভেতরে।

আমি ভাবছিলাম ঃ ব্যাপারটা কী হল? অসাধারণ হওয়ার চেষ্টার ঐকান্তিক ফলস্বরূপই কি তরফদারের এই পরিণতি? এই গ্রামের মধ্যে তিনি একচ্ছত্র এবং একক—বৃহত্তর পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করতে পেরে এই ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই তিনি সীমাস্বর্গ রচনা করেছেন? অথবা একান্ত হতাশ এবং অসহায় হয়ে পিতা যীশুর শান্তিময় ক্রোড়েই সমস্ত উচ্চাশার পরিনির্বাণ খুঁজে পেয়েছেন তিনি?

একটি শত্রুর কাহিনী

বড় পাদ্রী ডোনাল্ড্‌স্‌ বুড়ো হয়ে গেছেন। চুল পেকেছে, দাড়ির রঙ হয়েছে ধবধবে সাদা। আগে তিরিশ মাইল টাট্টু হাঁকাতেও কষ্ট হত না, আজকাল দু পা হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়েন। একবার শহরে গিয়ে সিভিল সার্জেনকেও দেখিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বলেছেন, ব্লাডপ্রেসারের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, সুতরাং সতর্ক হওয়া দরকার।

সতর্ক হওয়া দরকার তো বটে, কিন্তু সুযোগ কই? এ দেশটাই যে সৃষ্টিছাড়া। দশ মাইলের ভেতরে রেল লাইনের কোন বালাই নেই। আর শুধু রেল লাইন কেন, পথঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। মাইল আষ্টেক দূর দিয়ে জেলাবোর্ডের একটা রাস্তা চলে গেছে; বোধ হয় ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তনের যুগে ওই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তারপরে ওর গায়ে কেউ আর হাত দেয়নি। দু'পাশ দিয়ে রাস্তা ভেঙে নেমে গেছে, গরুর গাড়ির অনুগ্রহে একেবারে সহস্রদীর্ণ। গরমের সময় চলতে গেলে পায়ে পায়ে হোঁচট লাগে, ধুলোয় একেবারে কোমর অবধি গেরুয়া রঙ ধরে যায়; আর বর্ষাকালে মহাপঙ্ক—হাতীর পা ডুবলে টেনে তুলতে পারে না।

তাছাড়া মাঠ আর মাঠ। দু-এক ফালি ফসলের ক্ষেত, বাকি সবটাই বন্ধ্যা— অহল্যা পৃথিবীতে লাঙলের আঁচড় পড়ে না—পাষাণ-মূর্তি পড়ে আছে হতচেতন হয়ে। তারই ভেতরে পায়ে পায়ে কতগুলো লিকলিকে পথের রেখা পড়েছে—এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যাকর্ষণ।

অথচ এই সব পথ ভেঙেই যাতায়াত কবতে হবে। ভৌগোলিক শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই এ অঞ্চলে—টুকরো টুকরো এক একটা গ্রামের মধ্যে অসঙ্গত ব্যবধান, সেই ব্যবধানকে আরো দুর্গম করেছে এবড়ো খেবড়ো জমি, টিলা, বিল, জলা, জঙ্গল আর অজস্র বিষাক্ত সাপ।

কিন্তু জ্ঞানের আলোয় অন্তর যার বিভাসিত হয়ে গেছে এবং এই জ্ঞানের পুণ্য কিরণ বিতরণ করাই যার ব্রত, তার এসবকে কিছুমাত্র পরোয়া করলে চলে না। এতকাল ডোনাল্ড্‌স্‌ও করেননি। তখন মুখের চাপদাড়ির রঙ ছিল কুচকুচে কালো; মেরুদণ্ডটা ছিল লোহার ডাণ্ডার মতো, ওজন ছিল দুশো পাউণ্ডের ওপরে, ধৈর্য ছিল অমানুষিক এবং

গলার জোর ছিল অসাধারণ। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন তিনি শুরু করতেন, "এই যে মহাপ্রলয় আসিল, পৃথিবী জলে ডুবিয়া গেল, ঘন ঘন বজ্র পড়িল ও সর্বনাশ হইল", তখন সে কণ্ঠস্বরে হাটের বিপুল হট্টগোল পর্যন্ত চাপা পড়ে যেত। মুহূর্তে তাঁর চারিদিকে ভিড় জমে উঠত, নগদ এক পয়সা মূল্যে মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যেত তাঁর ক্রেতাদের ভেতরে।

সে ডোনাল্ড্‌স্‌ এখন অতীত বস্তু। এই কুড়ি বছরে গরম বাতাস আর রুক্ষ রাঙা মাটি তাঁর বয়েস চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দু পা হাঁটলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে—হাটে হাটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবিশ্বাসীদের আলোর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। তা ছাড়া ব্লাড্‌প্রেসারের আতঙ্কটা মনের মধ্যে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে, ওই অদৃশ্য শত্রুটির অলক্ষ্য মৃত্যুবাণের কথা ডোনাল্ড্‌স্‌ কোন মুহূর্তেই ভুলতে পারেন না।

সুতরাং ঘটনাস্থলে হ্যান্‌সের আবির্ভাব হল।

জাতে জার্মান। সোনালি চুল, নিবিড় নীল চোখ; দৈর্ঘ্যটা খাঁটি আর্যজাতির পক্ষেও একটু অতিরিক্ত, তাই খানিকটা কুঁজো বলে মনে হয়, বয়েস তেইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে, চঞ্চল, চটপটে, উৎসাহী। দেখলে পাদ্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় ইউনিভার্সিটি ব্লু, খেলার মাঠ থেকে ধরে এনে পাদ্রী সাজিয়ে তাকে এই অজগর-বিজেবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীর পোশাকটা তার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, যে কোনো মুহূর্তে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমানন্দে হো হো করে হেসে উঠতে পারে।

ডোনাল্ড্‌স্‌ তবু খুশি হলেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে বলে মনে হয়।

হ্যান্‌স্‌ অসংকোচে জবাব দিলে, আমারও তাই বিশ্বাস।

—তাই নাকি?—ডোনাল্ড্‌স্‌ হাসলেন ঃ খুশি হলুম। তা দ্যাখো, এই পেগান আর হিদেনগুলোকে ম্যানেজ করা বড্ড শক্ত ব্যাপার। এই কুড়ি বছর চেষ্টা করেও আমি এগুলোকে মানুষ করতে পারলুম না। এবার তুমি চেষ্টা করো।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না—সোৎসাহে হ্যান্‌স্‌ উত্তর দিলে।

এতবড় মাঠের ভেতরে বেশির ভাগই মরা জমি। মাটিতে রাশি রাশি কাঁকর। বর্ষায় প্রায় সমস্ত মাঠ ভেসে যায়, দু-চারটে উঁচু ডাঙা আর তাদের কোনো কোনোটার ওপরে আধখানা সিকিখানা গ্রাম কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে থাকে। দুর্গম এই খেয়ালী পৃথিবীর বেশির ভাগ বাসিন্দা হচ্ছে তুরী, মুণ্ডা, আর সাঁওতাল। যাযাবরের দল এসে মরা মাটিকে দখল করেছে—গড়েছে ছোট ছোট ক্ষেত খামার আর নগণ্য সব লোকালয়। তাদেরই প্রেমধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে এখানে খৃষ্টান পাদ্রীদের আবির্ভাব।

এই কুড়ি বছরে অবশ্য তাদের সকলেরই অন্ধকার থেকে আলোকে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমত সকলের আত্মা থেকে শয়তানকে তাড়ানো সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, এই চালচুলোবিহীন লোকগুলোর মতিগতি বোঝা প্রেমময় পিতারও অসাধ্য, আজ এখানে আছে, কাল দল বেঁধে মাদলে ঘা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে কোথায় কে অদৃশ্য হল কেউ বলতে পারে না; আর তৃতীয়ত, আজকে ব্যাপ্‌টাইজড্‌ হয়ে কালকেই পরমোল্লাসে বোঙ্গার পূজো করতে এদের নীতিজ্ঞান আর্তনাদ করে ওঠে না। তাই কাজের

কখনোই বিরাম নেই।

তাছাড়া মরা মাটি বলেই মানুষের স্রোত মরা নয়। সে স্রোত অবিরাম গতিতে বয়ে চলছে। তাই আজ তিনঘর বাসিন্দা বাড়ি ভেঙে উধাও হয়ে গেল তো কালকেই পাঁচঘর নতুন পত্তনি করে বসল। খাজনার লোভে জমিদার হাত বাড়ালে একদিন এরাও হয়ত অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু নতুনের আসবার বিরাম থাকবে না এবং কাজেও ছেদ পড়বে না কোনোদিন। সুতরাং কুড়ি বছর ধরে ডোনাল্ড্স্ নিত্য নতুন কর্মক্ষেত্র পেয়েছেন তাঁর—মরা জমিতে জীবন্ত মানুষের তরঙ্গ তাঁর চারদিকে প্রত্যেকদিন নতুন করে প্রতিহত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে এ জলের গায়ে ঘা দেবার মতো, একটুখানি ঢেউ উঠবে বটে, কিন্তু দাগ থাকবে না, এ চেষ্টার কোনো মূল্য নেই। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি ছেলেকে আলোকমন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি তাঁদের শহরের ইস্কুলে পাঠাতে পারেননি; কিন্তু মিশনারীর ধৈর্যচ্যুত হতে নেই, অপেক্ষা করো সুফল ফলবেই এ তাঁদের মূলমন্ত্র।

তোমার পতাকা যারে দাও। ডোনাল্ড্সের অসমাপ্ত কাজের বোঝা সুতরাং হ্যান্স্‌কে ঘাড়ে তুলে নিতে হল। তারপর যথানিয়মে একদিন তেঠেঙ্গে টাট্টুতে আরোহণ করে হ্যান্স্ বেরুল ধর্মপ্রচার করতে। তার পথপ্রদর্শক হল ভূতপূর্ব ডোঙা সাঁওতাল, বর্তমানে জোসেফ ইম্যানুয়েল এবং লোকের কাছে জোসেফ ডোঙা। অবশ্য ডোঙা নামের লেজুড়টা জোসেফ ইমানুয়েলের পছন্দ হয় না এবং পছন্দ হয় না বলেই লোকে তাকে কিছুতেই ওটা ভুলতে দিচ্ছে না! দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা ডোঙা সাহেব বলে চিৎকার করে এবং মুহূর্তে ডান-গাল বাঁ-গালের নীতিবাক্যটা ভুলে গিয়ে জোসেফ তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য তাদের ধরতে পারা যায় না এবং রোষ-কষায়িত নেত্রে ফিরে আসতে আসতে জোসেফ ইম্যানুয়েল স্মরণ করতে থাকে ঃ প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো, কারণ এরা জানে না এরা কী করিতেছে।

তেঠেঙে টাট্টুতে চড়ল হ্যান্স্ এবং তার সঙ্গে চলল জোসেফ। গন্তব্যস্থল রামগোপালপুরের হাট। শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবিশস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে—সোনালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক —শীতের রোদের মতোই তার রঙ। সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা, সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা। সুতরাং সঙ্গে চলতে জোসেফের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারি খুশি মনে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল হ্যান্স্। নতুন জগৎ—নতুন পরিবেশ। শহরে থেকে ভারতবর্ষকে একরকম চেনা যায়, কিন্তু এর রূপ আলাদা! এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—এর সঙ্গে কোথায় যেন ইউরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে। হ্যান্স্ আনন্দিত কণ্ঠে বললে, মিস্টার জোসেফ, তোমার দেশটা ভারী চমৎকার।

জোসেফের মনে কাব্য নেই। এদেশের চমৎকারিত্বটাও তাকে যে খুব রোমাঞ্চিত করে তোলে তাও নয়। তবু স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষার জন্য জোসেফ ইংরাজি ভাষায় জবাব দিলে, ইয়াশ্।

—ম্যাক্সমূলারের বই পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারী মোহ ছিল আমার, এখন দেখছি ঠকিনি।

জোসেফ আবার বললে, ইয়াশ্ শার্।

কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফের কান খাড়া হয়ে উঠেছে, বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। মাঠের ওদিকটাতে যেখানে বিলের জল মরে গিয়ে এক কোমর কাদা আর আধহাত ঘোলা জল থক থক করছে আর যেখানে একদল কালো কালো নেংটিপরা ছেলে জিওলমাছের সন্ধানে দাপাদাপি করছে, ওখান থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই, এ ব্যাপারে ভুল হতেই পারে না। পরিষ্কার নির্ভুলভাবে চিৎকার উঠছে ঃ ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি!

ঠোঙাটা হচ্ছে ডোঙার সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস, আর ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি ডোঙা সাহেবের ইংরেজি বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত! মুহূর্তে জোসেফের মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে গেল, বিড় বিড় করে অশ্রাব্য এবং অখৃষ্টানোচিত গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—কী হল মিস্টার জোসেফ?

—নাথিং শার্।

—ওরা ওখানে চিৎকার করছে কেন?

—গ্রামের সব তঁ্যাদোড় ছেলে শার্। মাছ ধরছে।

—মাছ ধরছে? ওঃ লাভলি! চলো, মাছ ধরা দেখব।

মনে মনে জোসেফ শিউরে উঠল। তবে একমাত্র ভরসা সাহেবের বাংলা জ্ঞানটা টনটনে নয়, তা ছাড়া ডোঙা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু ডোঙা সাহেব শেষ চেষ্টা করলে একবার।

—ও দেখবার কিছু নেই শার্, নোংরা ব্যাপার।

—নোংরা? নোংরা কেন? নেভার মাইণ্ড, চলো।

সাহেবের গোঁ আর বুনো শুয়োরের গোঁ—এদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এতদিনে সে অভিজ্ঞতাটা আয়ত্ত হয়েছে ডোঙা সাহেবের। কিন্তু ওদিক থেকে সমানে সোল্লাস চিৎকার আসছে ঃ ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—এস্পার কিংবা ওস্পার। মনটাকে বহু কষ্টে আয়ত্ত করে নিয়ে জোসেফ বললে, চলুন—

কিন্তু ওরা সেদিকে এগোতেই ছেলের দল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলে।

—কী ব্যাপার জোসেফ, ওরা পালালো কেন?

—জানি না শার্।

—বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই নয়?

—ইয়াশ্ শার্।

—কিন্তু কেন? আমরা বাঘ না ভালুক? ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতে হলে আগে তো ওদের ভয় ভাঙানোটা দরকার—কী বলো?

জোসেফ বললে, সে পরে হবে শার্। এখন চলুন, নইলে হাটে পৌঁছুতে বেলা ডুবে যাবে।

—নেভার মাইণ্ড।—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল হ্যান্‌স্‌। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল তেঠেঙে টাট্টু থেকে, তারপর ছেলের পালকে লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ভেতরে ছুটতে শুরু করে দিল।

—ও কি হচ্ছে শার্‌!

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই হ্যান্‌সের। ততক্ষণে সে প্রাণপণে ছুটেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। ছেলেরা পরিত্রাহী চিৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর হ্যান্‌স্‌ তাদের অনুসরণ করছে। টাট্টুর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে জোসেফ ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষ, সেই অনুপাতে লম্বা লম্বা তার ঠ্যাং; তাছাড়া লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু, দৌড়ে তাকে হারানো অসম্ভব। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহেব দু'হাতে দুটো ছেলেকে ধরে ফেলল। ছেলে দুটো আর্তনাদ করে উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে হ্যান্‌স্‌ বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি শ্বেত জাতি—ইউরোপ হইতে আসিয়াছি। আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসি নাই, নরমাংস খাই না।

ছেলে দুটো কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু চোখের ভাষা বুঝতে পারল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত। দেখতে দেখতে ছেলেরা এসে হ্যান্‌সের চারিদিকে জড়ো হয়ে গেল।

নিজের চোখকে কি বিশ্বাস করতে পারে জোসেফ? বিশ্বাস না করার অবস্থাই বটে। এ দেশের লোকের সঙ্গে মেশাটা মিশনারীদের কাছে নতুন কথা নয়, বরং তাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাই বলে এতটার জন্যে কেউই প্রস্তুত থাকতে পারে না, জোসেফও নয়।

গায়ের সাদা সারপ্লিসটা খুলে ফেলেছে হ্যান্‌স্‌, খুলেছে জুতো মোজা। তারপর পায়জামাটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরমোল্লাসে সেই এককোমর কাদায় মাছ ধরতে নেমে পড়েছে। পোশাকের অবস্থা তার অবর্ণনীয়, সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে —এমন কি গালে মুখে পর্যন্ত ছোপ লেগেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হ্যান্‌সের— একটা সৃষ্টিছাড়া আনন্দে সে মশগুল হয়ে গেছে।

টাট্টু ঘোড়ার লাগাম ধরে ডোঙা সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; একটা রেভারেণ্ড ফাদারের এই ব্যবহার! এমন করলে কি সম্মান থাকবে না লোকেই কদর করতে চাইবে! মুড়ি মিছরি রামাশ্যামার সঙ্গে সাহেব যে একদর হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত!

সাহেব যখন উঠে এল মাঠের ওপর দিয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পেছনে ছেলের দল চিৎকার করছে, ও সাহেব, কাল আসবে তো?

সাহেব সোৎসাহে সাড়া দিয়ে বললে, হাঁ, আসিব।

এতক্ষণ পরে গম্ভীর থমথমে গলায় কথা বললে জোসেফ: সন্ধ্যা হয়ে গেল— আজ আর যাওয়া যাবে না।

—আমি বাস্তবিক ভারী দুঃখিত—লজ্জিত স্বরে হ্যান্‌স্‌ জবাব দিলে, লোভ সামলাতে পারলাম না। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় কাদার ভেতরে বল নিয়ে আমরাও রাগবী খেলেছি। তারপর বিশপদের কাছে গিয়েই ওসব ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু ওদের দেখে আমার পুরোনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল—

—ইয়াশ্ শার্—তেমনি জলদগম্ভীর গলায় জোসেফ বললে, এবার ঘোড়ায় উঠুন, রাত হয়ে গেল। মাঠের রাস্তাঘাট বড় খারাপ, ভয়ংকর সাপের ভয়।

—সাপ? ওঃ—লাভলি! আই অ্যাম ভেরি ফণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ান স্নেকস্—

মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে মাতৃভাষা সাঁওতালীতে বিড়বিড় করে ডোঙা সাহেব বললে, এবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে।

জোসেফের মুখে সব শুনে ডোনাল্ড্স্ একটু হাসলেন মাত্র।

—এখনো বয়েস অল্প, তাই—

—ইয়াশ্ শার্, কিন্তু আপনি বুঝছেন না—এরা সব ছোটলোক, ব্ল্যাক প্যাগান—

ডোনাল্ডের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল, অপাঙ্গ দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল জোসেফের ওপরে; ট্যান করা চামড়ার ওপরে ঘোর কালো রঙের বার্নিশ লাগানো, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো নিগ্রয়েড্ চুল। মোটা আর আড়ষ্ট জিভে অশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ। তবু দু বছরের মধ্যেই কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে জোসেফের। 'ব্ল্যাক প্যাগান্'দের সঙ্গে তার নিজের সীমারেখাটা একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ঘৃণা করতে শিখেছে ছোটলোকদের। ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা আছে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলব এখন।

—ইয়াশ্ শার্। উনি তো নতুন লোক, কিছুই জানেন না—

—আচ্ছা।

জোসেফ চলে গেল, ডোনাল্ড্স্ চুপ করে বসে রইলেন। হ্যান্সের উদ্দামতা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলেনি, চিন্তিতও না। মনের দিক থেকে একটা বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছেন ডোনাল্ড্স্। এক-একটা শান্ত সন্ধ্যায় বসে বাইবেল পড়তে পড়তে এই শূন্য দিগন্তবিসারী মাঠটা তাঁর মনকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্ট করে তোলে। আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তটা, উঁচু উঁচু টিলা, এলোমেলো জঙ্গল নিরবয়ব হয়ে আসছে ক্রমশ, তার ভেতরে চোখে পড়ছে দূরে কতগুলি অস্পষ্ট মূর্তি—দেহাতী মানুষগুলো দিনান্তে তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

তখনই মনে হয়। মনে হয়ঃ এমনি অস্পষ্ট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে, এমন সংশয়বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন মানবপুত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আরো তেরোজন শিষ্য, তাদের একজন জুডাস্ ইস্ক্যারিয়ট। সঙ্গে তাঁদের অস্ত্র নেই, জয়বাদ্য নেই। চারদিকে অন্ধকারে ইহুদীদের কুটিল হিংসা সরীসৃপের মতো তাঁকে ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু সত্যের আলো তাঁর মন থেকে মুছে নিয়েছে সমস্ত সংশয়, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ভয়ের অণুতম বিন্দুটুকুকেও। তিনি এগিয়ে চলেছেন, মাথার ওপরে তাঁকে পথ দেখাচ্ছে বেথেলহেমের শিয়রে জাগ্রত সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি।

ডোনাল্ড্সের মনে হয় এ প্রচার অর্থহীন, এই উপদেশের ঝুলি কাঁধে বয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সত্য মূল্য নেই কণামাত্র। এই মন্ত্র যিনি প্রচার করেছিলেন তুরী ভেরী পটহ তাঁর ছিল না, পাদ্রীর দল ছিল না। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে সূর্য উঠেছিল, তার কিরণ আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল; তাঁর কণ্টকজর্জরিত দেহের প্রতিটি রক্তকণা ঘোষণা করেছিল তাঁর বাণী। আজ এই অন্ধকারে এই যে ছায়ামূর্তি মানুষেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে একদিন নিজের প্রয়োজনেই ঐ দরিদ্র—ওই নির্বাকের মধ্যে

তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে। এই অজ্ঞাত অনাদৃত গ্রামগুলির মধ্যে কোনটি যে নতুন কালের বেথেলহেম সে কথা কে বলতে পারে। যিনি আসবার নিজের প্রয়োজনেই তিনি আসবেন, অনর্থক কেন আর—

কিন্তু সৌভাগ্য এই যে মনোভাবটা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে প্রবলভাবে ধমকে দেন ডোনাল্ড্স্। এ অন্যায়, এমন ভাবে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ভারতবর্ষের জলমাটি তাঁর রক্তের মধ্যেও দুর্বলতা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাকি? নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, নিরুৎসাহ আর অদৃষ্টবাদী করে দিচ্ছে এ দেশের ইন্‌ফিডেলদের মতো? চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না রাখলে ঈশ্বরপুত্রের রিসারেক্সন হবে কেমন করে, কেমন করে সার্থক হবে মিলেনিয়ামের ভবিষ্যৎ বাণী?

—শুভ সন্ধ্যা, ফাদার।

—শুভ সন্ধ্যা—মুখ ফিরিয়ে ডোনাল্ড্স্ তাকালেন ঃ এসো, বোসো।

হ্যান্‌স্ এসে নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটাতে বসল।

—কেমন লাগছে এখানে?

—চমৎকার। এ একটা আশ্চর্য দেশ।

—প্রথম প্রথম তাই মনে হবে—ডোনাল্ড্স্ স্নিগ্ধভাবে বললেন ঃ কিন্তু তারপরেই মত বদলে যাবে তোমার।

—আমার তা মনে হয় না—জোরের সঙ্গে জবাব এল।

—বেশ, তাহলেই ভালো। ডোনাল্ড্স্ আর কথা বাড়ালেন না, বললেন, বিস্তর কাজ আছে, এতদিনে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ভালো করে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—তা নেব, কিন্তু—হ্যান্‌স্ হঠাৎ থেমে গেল।

—কী বলছিলে?

—মাপ করবেন ফাদার, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

—কী কথা?

—জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ কী ভাবলে হ্যান্‌স্। অন্যমনস্ক ভাবে কামড়াতে লাগল বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা।

—এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে?

—কিসের?

—এই প্রিচিংয়ের?

ডোনাল্ড্সের দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল।

—হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

—আমার মনে হয়—একটু থেমেই হ্যান্‌স্ বলে চলল—আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করে কারুকে ভালো করতে পারি না। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ভালো হতে পারে, আর সেইটেই সব চাইতে ভালো।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখ হ্যান্‌সের মুখের ওপর ফেলে ডোনাল্ড্স্ বললেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না।

—আমি বলছিলাম—হ্যান্‌স্ আবার আঙুলটা কামড়ে নিলে ঃ জোসেফ ইম্যানুয়েলের

মতো কতকগুলো জীব তৈরি করে ক্রিশ্চিয়ানিটির মর্যাদা বাড়ানো যায় না। ওরা যেমন আছে তেমনি থাকলেই ওদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে।

—এসব কী বলছ তুমি!—ডোনাল্ড্‌স্‌ আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ এই তো আমাদের কাজ! অন্ধকারের মানুষকে আলোর পথ তো আমাদেরই দেখাতে হবে। তুমি কি বলতে চাও এই পৌত্তলিক হিদেনগুলো চিরকাল শয়তানের শিকার হয়ে থাকুক?

—ঠিক বুঝতে পারছি না—

আলোচনাটায় আকস্মিক একটা ছেদ টেনে দিয়ে হ্যান্‌স্‌ উঠে দাঁড়ালো। কোথায় যেন অনিশ্চিত একটা অস্থিরতা পীড়ন করছে তাকে। তারপর সোজা সম্মুখের প্রায়ান্ধকার মাঠটার ভেতরে সে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

পাকা ভ্রূ জোড়াকে একটা সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো একত্র করে ডোনাল্ড্‌স্‌ তাকিয়ে রইল। নতুন এ পথে এসেছে, এখনো ফিলানথ ফি আছেই খানিকটা। কিন্তু ডোনাল্ড্‌স্‌ হাসলেন ঃ বেশিদিন এসব থাকবে না। আস্তে আস্তে রোমান্স কেটে যাবে—যেমন করে ডোনাল্ড্‌সেরও একদিন কেটেছিল।

কিন্তু জার্মান জাতির রক্তে কোথায় উদ্দামতা আছে একটা, নিহিত আছে একটা উন্মাদ প্রাণচাঞ্চল্য। ইংরেজের মতো রক্ষণশীলতার স্থিরবিন্দুর চারপাশে সে আবর্তিত হয় না। হয়তো এটা ভালো, হয়তো এটা পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ। কিন্তু আঁদাড়ে পাঁদাড়ে জীবের কল্যাণের জন্য যাকে গলা ফাটিয়ে বাইবেল আওড়াতে হবে আর বুক অব জন ব্যাখ্যা করতে হবে, তার পক্ষে এটা শুধু অসুবিধাজনক নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌স্‌ প্রচণ্ড একটা অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

ঘটনা যতটুকু তার বিবরণী ছত্রিশগুণ লম্বাচওড়া হয়ে এসে পৌঁছুতে লাগল ডোনাল্ড্‌সের কানে। সব চাইতে যে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল সে জোসেফ ইম্যানুয়েল। তার মনে হতে লাগল এই নতুন পাদ্রীটির আবির্ভাবে ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা বিপন্ন হয়ে উঠছে।

হাটে হাটে প্রচার করতে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু যা হয় তাকে প্রচার বলা চলে না। তেঠেঙে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে হ্যান্‌স্‌ হয়তো খাবারের দোকানে তেলেভাজা জিলিপি খেতে বসে যায়। খুশি হয়ে বলে, হাউ নাইস্‌ দিজ্‌ ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স!

কিংবা হয়তো কারো হাত থেকে থাবা দিয়ে তুলে নেয় হুঁকোটা। কড়া দা-কাটা তামাকে একটা টান দিয়ে খক্‌ খক্‌ করে কাশতে শুরু করে, রাঙা হয়ে ওঠে চোখ মুখ। তারপর হুঁকো ফিরিয়ে দিয়ে বলে, একটু কড়া। তা হোক, ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো ভার্জিনিয়ার চাইতেও ভালো।

ওদিকে নিজের আভিজাত্য বজায় রেখে দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ডোঙা সাহেব, দাঁড়িয়ে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। একটা প্রচণ্ড হিংস্রতায় শরীরের ভেতরে যেন জ্বলে যায় তার। এ কী হচ্ছে—এর নাম প্রচার! রাজার জাতির সগৌরব অধিকার এতকাল তারা ভোগ করে আসছিল, হ্যান্‌স্‌ যেন সে অধিকারের অমর্যাদা করছে, এতকালের সম্মানটাকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে পথের নোংরা ধুলোতে। এ বাড়াবাড়ি, এতটা কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।

কিন্তু লাভ নেই—বলে কোন ফল হবে না। ইণ্ডিয়ান বলে নিজের পরিচয়টাকে

ডোঙা সাহেব ভুলে যেতে চায়; তার কাছে এ পরিচয় চরম অগৌরবের, পরম লজ্জাব। *কিন্তু কী আশ্চর্য—সেই ইণ্ডিয়ার প্রতি একটা অহেতুক প্রীতি আর অনুরাগ জেগে উঠেছে* এই সাদা সাহেবের মনে। এই হতভাগা দেশ—এই উঁচুনিচু টিলা জমি, এখানকার অশিক্ষিত বর্বর মানুষ, এই ভারতবর্ষকে সে ভালবেসে ফেলেছে। মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ একেই বলে!

ডোনাল্ড্সের কাছে নালিশ করে ফল হয়নি। বুড়ো পাদ্রীও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছেন। বেশি কথা বলেন না, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তারপর শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেন, এখনো ছেলেমানুষ, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

অভ্যস্ত নিয়মে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো আলোড়িত করে একটা বিচিত্র প্রতিধ্বনি করে জোসেফ ঃ ইয়াশ্ শার্, আর মনে মনে মাতৃভাষায় বলে, তোমার মুণ্ডু হবে।

স্বগতোক্তিটা কখনো কখনো একটু সরব হয়ে ওঠে। কানের ওপর একটা হাত দিয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্স্ জিজ্ঞাসা করেন, বেগ ইয়োর পার্ডন?

—নাথিং শার্—

কিন্তু মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

দিব্যি নিরিবিলি পথ, বকুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা। নিজের মনেই একটা প্রার্থনা স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে নিষ্ঠাবান খৃষ্টানের মতো পথ চলেছে জোসেফ আর মাঝে মাঝে বিরক্ত আড়চোখে পায়ের ঝকঝকে পালিশ করা জুতোটার দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে কেমন করে নোংরা ইণ্ডিয়ার ধূলোতে তার জুতোটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নাঃ—এদেশে আর নয়। বড় পাদ্রীর তোয়াজ করে যে ভাবেই হোক এবার তার মাতৃভূমি ইয়োরোপে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে। ভারতবর্ষ তার সুকোমল পরিচ্ছন্ন সভ্যতাকে আহত আর মলিন করে তুলছে।

—ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—

যেন আকাশবাণী! কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা ঘটল বোধ হয় এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগের মধ্যে। মুখ থেকে উবে গেল হোলি বাইবেল, সমস্ত শরীরটা শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেল জোসেফ সাহেব। দু'হাতের রগগুলো কোনো অদৃশ্য শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে একেবারে টান টান হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় কে! নির্জন নিরিবিলি পথ, জনমানুষের চিহ্নই নেই কোনোখানে। তবে কি এ ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

—ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—

তারপরেই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার! আরে, শুধু ঘাস খেয়েই তো ডোঙা সাঁওতাল জোসেফ সাহেব হয়নি। ঘটে কিছু কিছু বুদ্ধিও সে রাখে বইকি! দৃষ্টিটা ঠিক চলে গেল ওপরের দিকে। হ্যাঁ যা ভেবেছে, ঠিক তাই। গাছের মাথায় একদল কালো কালো ছেলে—একদল ডার্টি প্যাগান!

—ন্যাস্টি ইম্প্স্ (Nasty Imps)!

ডান-গাল বাঁ-গালের সারগর্ভ তত্ত্ব বাখ্যাটা ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জোসেফ ইমানুয়েলের রাজকীয় আভিজাত্য বোধটা। আদি এবং অকৃত্রিম ডোঙা সাঁওতাল জেগে উঠল, পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে তড়াক করে গাছে উঠে পড়ল সে।

কিন্তু ছেলেরা অনেক বেশি চালাক। চক্ষের পলকে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়েছে গাছ থেকে। তারপর ইমানুয়েল তাদের তাড়া করবার আগেই মাঠের মধ্য দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। দিগন্ত থেকে একটা রেশ তখনো পাওয়া যাচ্ছে ঃ ইঞ্জিরি—মিঞ্জিরি—

খানিকটা এলোপাথাড়ি দৌড়ে জোসেফ ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আর ফিরে এসে দেখল এই ফাঁকে গাছের তলা থেকে তার জুতোজোড়া বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে!

—উঃ ডেভিল্‌স্ চিলড্রেন—

রাগে ফুলতে ফুলতে খালি পায়ে খানিকটা এগিয়েছে জোসেফ, এমন সময় চমকে উঠল একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে। একটু দূরেই রাস্তার পাশে কোমরে হাত দিয়ে ছোট পাদ্রী হ্যান্‌স্ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসির একটা মৃদু রেখা, চোখে কৌতুক পিট পিট করছে।

—কী ব্যাপার, অমন করে ছুটছিলে কেন?

একটা কুটিল সন্দেহে জোসেফের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। হ্যান্‌সের চোখে মুখে কিসেব একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারও কিছু যোগাযোগ আছে নাকি! অসম্ভব নয়।

তবু অভ্যস্ত স্বর বেরুল . ইয়াশ্ শার্—নাথিং শার্।

—আমার বড় ভালো লাগল। ইয়োব রানিং ইজ ভেরী ইণ্টারেস্টিং মিস্টার ঠোঙা!

ঠোঙা! তা হলে সন্দেহের আর অবকাশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খুন চড়ে গেল জোসেফের মাথায়. ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোতে ঝকমক করে উঠল নরহত্যার অনুপ্রেরণা। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেই। তারপর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে সে সোজা হন্‌হন্ করে হেঁটে চলে গেল।

দিনের পর দিন এমন অবস্থা দাঁড়াতে লাগল যে শান্ত নির্বিরোধ বুড়ো পাদ্রীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তা ছাড়া একথা সত্যি যে কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু জোসেফের মুখে নয়, নানা ভাবেই ডোনাল্ড্‌স্ খবর পাচ্ছিলেন যে এই খামখেয়ালী জার্মান ছেলেটা বড্ড বেশি বাড়িয়ে তুলছে। আজকাল জোর করে ঠেলে-ঠুলেও তাকে প্রচারে পাঠানো যায় না, তাই মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্‌স্‌কেই বেরুতে হচ্ছে। আবার বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তেমনি করে চ্যাঁচাতে হচ্ছে : "আইস, তোমরা আলোকে আইস। আমরা মেষের দল, মেষপালক স্বর্গীয় পিতা আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।" কিন্তু ভাঙা গলায় ধর্মপ্রচারটা তেমন জমে ওঠে না, ডোনাল্ড্‌স্ বেশ বুঝতে পারেন এ নিতান্তই পণ্ডশ্রম হচ্ছে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌সের মেজাজ বিগড়ে গেছে। কোনো কাজই যদি না হবে তা হলে এ ছোকরাকে এখানে আমদানি করা কেন? দু'দণ্ড যে ঘরে বসে থাকবে তাও নয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে কে জানে। এর বাড়িতে তামাক খায় ওর বাড়িতে মুড়ি চিবোয়, ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে জলায় নেমে সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি করে। তারপর সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে বলে, ইণ্ডিয়া ইজ এ বিউটি। আই লাইক ইণ্ডিয়া—আই লাভ ইণ্ডিয়া।

পাদ্রীরা বিশ্বপ্রেমিক বটে, কিন্তু এতটা বিশ্বপ্রেম হজম করা তাদের পক্ষেও শক্ত!

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একটু জ্বর এসেছিল ডোনাল্ড্সের। ভারতবর্ষে প্রেমের ধর্ম প্রচার করতে এসে এইটি নগদ লাভ হয়েছে—এই ম্যালেরিয়া। বিস্তর কুইনাইন, বহু ইন্‌জেকসন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে মাঝে জ্বর আসে। কপালের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে থাকে, মাথার ভেতর অনুভব করা যায় রক্তের একটা অশান্ত চাঞ্চল্য। আর শান্ত নিরীহ বুড়ো পাদ্রীর মেজাজের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে একটা। বিশ্রী খিট্‌খিটে—ভারতবর্ষের প্রতি অমানুষিক একটা ঘৃণা যেন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জল, চক হিল, মর্মরিত পপলারবীথি, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল ইংল্যাণ্ড। মনে হয় এ নির্বাসন—একটা অসহ্য অনিচ্ছ'কৃত নির্বাসন। আর এর জন্যে দায়ী এই ইণ্ডিয়ানেরা—এই ডার্টি আইডোলেটারের দল।

ডেকচেয়ারে একটা রেজাই দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে ডোনাল্ড্স্ চুপ করে শুয়ে ছিলেন। পাশেই বসে ছিল জোসেফ ইমানুয়েল। তার কালো মুখ আজ আলকাতরার চাইতেও কালো।

অর্থাৎ নতুন একটা কবিতা শ্রুতিগোচর হয়েছে। প্রাদেশিক ভাষাটা সংশোধন করলে মোটামুটি সেটা দাঁড়ায় এই রকম :

বুড়ো পাদ্রী নেহাৎ পাগল,
ঠোঙ্গা সাহেব আদত ছাগল।

ছড়াটা শুনে ডোনাল্ড্স্ বললেন, হুঁ!

জোসেফ বললে, আপনাকে অনেকবার বলেছি শার্, সব ওই ছোট সাহেবের দোষ। ওঁরই জন্যে লোকগুলো এতটা প্রশ্রয় পেয়েছে। ঘরের লোকই যদি এ ভাবে শত্রু হয়ে ওঠে শার্, তা হলে এসব বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ কি? সোজা জেরুজালেমেই চলে যাওয়া ভালো।

ডোনাল্ড্স্ আবার বললেন, হুঁ!

নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ বাতাস-থেমে-যাওয়া উষ্ণতার মতো একটা চাপা গরম যেন চারিদিকে আবর্তিত হতে লাগল। ডোনাল্ড্সের মনের কাছে ইংলিশ চ্যানেলের সফেন-কাকলি বার বার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ার মশার অভিশপ্ত গুঞ্জনে। আর জোসেফের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল বিরক্তিতে জ্বলে যেতে লাগলেন ডোনাল্ড্স্, ইচ্ছে করতে লাগল একটা নোংরা কুকুরের মতো এই নিগারটাকে এক লাথি দিয়ে দূরে ছিটকে ফেলে দেন তিনি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। সামনের রাস্তায় শোনা গেল দ্রুত জুতোর আওয়াজ আর পুলকিত শিসের শব্দ। হ্যান্স্ ফিরে আসছে। জোসেফ একটু নড়েচড়ে স্থির হয়ে বসল।

আনন্দোচ্ছল স্বরে হ্যান্স্ বললে, কী হয়েছে ফাদার, সব এমন চুপচাপ কেন?

কারো কোনো সাড়া এল না।

হ্যান্স্ বললে, দেখুন ফাদার, কী চমৎকার একটা মুরগি এনেছি। ইণ্ডিয়ান হেন্স্ আর লাভলি।—

হ্যান্সের হাতের মুরগিটার দিকে তাকালেন ডোনাল্ড্স্ : কোথায় পেলে ওটা?

—ওরা কী যেন পূজো করছিল, তারই বলি। আমাকে এটা প্রেজেন্ট্ করলে। রিয়্যালি—আই লাভ—

—ড্যাম্‌ড্ আইডোলেটারী!—সমস্ত সংযমের মুখোশ হারিয়ে কদর্যভাবে গর্জে উঠলেন ডোনাল্ড্‌স্ : হ্যান্‌স্, আমি খুব দুঃখিত। তোমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই, কালই তুমি এখান থেকে চলে যাবে।

দু চোখ বিস্ফারিত করে হ্যান্‌স্ বললে, ব্যাপার কী?

—কিছু না।—তিক্ত তীব্র স্বরে ডোনাল্ড্‌স্ বললেন, চার্চ তোমার জন্যে নয়। ইউ ট্রাই ইয়োরসেল্‌ফ এল্‌সহোয়্যার।

জোসেফ নিশ্চিন্তে বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছে—যেন অনাসক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ। তার দিকে একটা বক্রদৃষ্টি ফেলে হ্যানস বললে, বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এই ডোঙা চ্যাপ্—

ডোঙা চ্যাপ্! সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াটা ঘটে গেল জোসেফের শরীরে। তীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে ঃ আই ওয়ার্ন ইউ শার্—আই অ্যাম নো ডোঙা!

শব্দ করে হ্যান্‌স্ হেসে উঠল—তার গভীর স্বচ্ছ হাসি লহরে লহরে মুখরিত করে তুলল তরল অন্ধকারকে।

—নিশ্চয় ডোঙা! শুধু ডোঙা নয়, ঠোঙা ঠোঙা—

পরের ঘটনাটা ঘটল চক্ষের পলক ফেলবার আগেই। বুনো একটা রক্তলোলুপ জানোয়ারের মতো ভয়াবহ হুঙ্কার করে জোসেফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হ্যান্‌সের ওপরে। কিন্তু লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক একটা সরীসৃপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল; তারপর পুরু একতাল লোহার মতো প্রচণ্ড একটা স্ট্রেইট কাটের আঘাত এসে নামল জোসেফের চোয়ালে। ঠিকরে একটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল জোসেফ, সেখান থেকে কুমড়োর মতো ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে।

ক্রোধে, জ্বরের উত্তেজনায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ডোনাল্ড্‌স্। অমানুষিক কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইউ বোথ! এটা চার্চ—গুণ্ডামির জায়গা নয়।

—সত্যিই চলে যাবো ফাদার?

—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে। ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিস্‌ওনস্ ইউ। বেরিয়ে যাও—

নিজের চিৎকারে নিজের মাথাটা বোঁ করে পাক খেয়ে গেল ডোনাল্ড্‌সের। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে—শিরাগুলোতে ব্লাড-প্রেসারের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ তুলে তাকাবার মতো স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এল, তখন দেখলেন পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোসেফ; পুরু ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, আর সেই রক্তাক্ত মুখে একটা বিগলিত হাসির রেখা! এ অবস্থায় হাসা শুধু ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব!

কিন্তু হ্যান্‌স্? তার চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু অভিশপ্ত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে খাঁ-খাঁ করছে অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকার। সে অন্ধকারে এতটুকুও দৃষ্টি চলে না!

* * *

ছ'মাস পরে—পনেরো মাইল দূরের হাটখোলায়।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছের তলায় লোকে লোকারণ্য। ঢোল আর কাঁসরের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। শিবের গাজন চলছে ওখানে।

"বুঢ়া শিবের নাচ নাগিলে
নাচ নাগিলে ভোলানাথের—"

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভোলানাথের নৃত্য। মাথায় লাল চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পাকানো পাটের জটা। রঙ দিয়ে আঁকা বাঘছাল শিবের শরীরে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ শিবের আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে পরমোল্লাসে ঢোল আর কাঁসর সঙ্গত রক্ষা করে চলেছে।

"প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব,
গোলাতে নাই ধান,
কী দিয়া বাঁচাব ও শিব
ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া করো—"

নাচতে নাচতে শিবেব চোখে জল এল। পেটে ভাত নেই, গোলায় ধান নেই। একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই এর ভেতরে—এই ছ'মাসেই নিজের চোখেই সে তা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিল সে—জানতে চেয়েছিল। কিন্তু যা দেখলে তা না দেখলেই ভালো হত। শিব ভাবতে লাগল। এই অভাব—এই রিক্ততার সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে বুড়ো পাদ্রী ডোনাল্ড্‌সের আর যোগ আছে পবিত্র ক্রিশ্চিয়ানিটির। সে যোগসূত্রের রেখাটা ক্ষীণ, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া—

—ও শিব, নাচের তাল কাটল যে!

অপ্রতিভ হয়ে শিব আবার নাচতে শুরু করল। কিন্তু কানের কাছে ক্রমাগত গুনগুন করছে 'প্যাটেতে ভাত নাই, গোলাতে নাই ধান।' ভারতবর্ষকে দেখতে না চাওয়াই ভালো। প্রেমধর্মের দোহাই দিয়ে বিবেককে নিষ্কণ্টক করা সহজ ; আর সহজ মনুষ্যত্বকে অন্ধ করে রাখা—

আচমকা শিবের ঘোর ভেঙে গেল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, উঠেছে একটা ভয়ার্ত কলরব। আর ডোঙা সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ঃ এই যে শার্—কাণ্ডটা একবার দেখুন! লোকটা নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

জোসেফের দৃষ্টি অন্ধকারেও ভুল করেনি। এদিককার অন্ধিসন্ধি তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে। তাই খোঁজ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তাঁর ফৌজকে সে এখানে এনে ফেলেছে।

শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ ক্রোধে আর বিরক্তিতে বিবর্ণ হয়ে উঠল। পেছনেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড্‌স্. ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে একবার তাকালেন।

ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ডোনাল্ড্‌স্—শব্দ করে থুথু ফেললেন মাটিতে। স্বগতোক্তির মতো শোনা গেল ঃ ইন্‌ফিডেল! এ নিউ জুডাস টু ক্রিশ্চিয়ানিটি!

—ইন্‌ফিডেল—জুডাস!—ম্যাজিস্ট্রেটও প্রতিধ্বনি করলেন। তারপর শিবের বুকের ওপরে বাগিয়ে ধরলেন রিভলবারের একটা কালো নল ঃ তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আশ্চর্য এই ছ'মাসের মধ্যে হ্যান্‌স্ একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েনি নাকি! না, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শিবের নাচ নেচে সে সাড়ে ষোলো আনাই বর্বর হয়ে গেছে। জোসেফ পর্যন্ত কৌতূহল বোধ করল। বড় বড় সরল চোখ মেলে হ্যান্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে,

অপরাধ? ইন্‌ফিডেল?

আগুন-ঝরা গলায় ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, শেম্! তোমার লজ্জা করল না? ক্রিশ্চিয়ানিটি আর ইয়োরোপের সমস্ত মর্যাদা তুমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছ। সেজন্যেই তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল—বাট দ্য ল ইজ টু লিবারাল!— রিভলভারটাকে তেমনি বাগিয়ে রেখে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কিন্তু সেজন্য তোমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তুমি শত্রু।

—শত্রু? কার? এই ডোণ্ডার?—হ্যান্‌স্ হেসে উঠল।

—না, ইণ্ডিয়ার। ইণ্ডিয়া ইজ নাউ অ্যাট ওয়ার উইথ্ জার্মানী। চলো, দেরি কোরো না।

—আমি ভারতবর্ষের শত্রু! হাউ লাভলি! হ্যান্‌স্ বিষণ্ণ হাসি হাসল ঃ থ্যাঙ্ক ইউ। চলো—

শিবের বেশেই হ্যান্‌স্ মোটরে এসে উঠল। ঘৃণায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেললেন ডোনাল্ড্‌স্, একটা বিচিত্র পিচ্ছিল হাসি খেলে যেতে লাগল জোসেফের পুরু পুরু কালো ঠোঁট দুটোতে।

অন্নহীন দরিদ্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে রইল বিলীয়মান গাড়িটার দিকে—নির্বাক বেদনায় তার দৃষ্টি অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পথে যেতে এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পাবে!

অপরাধের মধ্যে পথে গাড়িটা এক জায়গায় থেমেছিল। সেখানে খুব ঘটা করে কালীপূজো হচ্ছে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পূজামণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভক্তিভরে দাঁড়ালেন সেখানে।

হ্যান্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, এ কী?

পাশের সশস্ত্র গুর্খাটি বুঝিয়ে দিলে, যুদ্ধজয়ের কামনাতে এখানে কালীপূজো করা হচ্ছে। টাকা দিয়েছেন গভর্নমেণ্ট—ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

—তাই নাকি? লাভলি।—হ্যান্‌সের নীল চোখ দুটো একবার ঝকঝক করে উঠল ঃ তোমার জলের বোতলটা দাও তো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সরল মনে গুর্খা তার ফ্লাস্কটা তুলে দিলে হ্যান্‌সের হাতে। কিন্তু জল খেলো না হ্যান্‌স্, তার বদলে একটা কেলেঙ্কারি করে বসল। বোঁ করে তার হাত থেকে উড়ে গেল ফ্লাস্কটা—একবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিশ্রী শব্দ করে কালীমূর্তিটার মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে, ঘটে গেল একটা খণ্ডপ্রলয়।

নিমেষের মধ্যে একটা উল্কার মতো মোটর থেকে মাটিতে যেন উড়ে পড়ল হ্যান্‌স্। উন্মাদ ছন্দে শিবের গাজন নাচতে লাগল ঃ নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান। অ্যাম আই নট?

ইতিহাস

খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় মাঠের ওপারে ধূ ধূ বালুচর। সন্ধ্যার রোদ তার ওপরে রাশি রাশি রক্ত ছড়িয়েছে। আসন্ন শরৎ বালুচরের ওপরে কাশের বনে জাগিয়েছে প্রাণের সাড়া। শরতের লঘু মেঘ যেন মাটিতে ফুল হয়ে ফুটেছে।

নদী চোখে পড়ে না, কিন্তু মিষ্টি বাতাস দূর থেকে জলের ছোঁয়াচ বয়ে আনে। বাংলা দেশের গন্ধ—ভিজে মাটির গন্ধ। লিখতে লিখতে অমরেশ উন্মনা হয়ে গেলেন, কলমের ক্যাপটা বন্ধ করে তাকালেন দিগন্তের দিকে। বর্তমানে ছোট গণ্ডি পার হয়ে মনটা অবলুপ্ত অতীতের মধ্যে ফিরে চলে গেছে।

বাতাসে ফর্ ফর্ করে উড়ছে পাণ্ডুলিপির পাতা। ঐতিহাসিকের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টির কাছে বহুযুগের যবনিকাটা সরে গিয়ে ছবির মতো দেখা দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীর বাংলা। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস লিখছেন অমরেশ ঃ

''আজ আমরা নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছি। আজ বৃহত্তর আর্যাবর্ত গ্রাস করিয়াছে পঞ্চ গৌড়কে, গ্রাস করিয়াছে তাহার সংস্কৃতিকে, মুছিয়া দিয়াছে তাহার শৌর্যের জ্বলন্ত ইতিবৃত্তকে। একদিন ছিল যেদিন বাঙালী নিজেকে হারাইয়া আর্য-সভ্যতার তরঙ্গে ভাসিয়া যায় নাই। যে গৌড়েশ্বরের মস্তকে বরুণছত্র শোভা পাইত, সমুদ্র যাহাব সৈন্য ছিল, যাহার ঝাণ্ডা নিশানে মীনাঙ্ক-চিহ্ন, মহেশের শূলাঙ্ক লেখা, আর্য পুরাণে তাহার উল্লেখ কোথায়? যে গৌড়ীয়েরা কাশ্মীরে অভিযান করিয়া রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের অতুল বীরত্বের কথা আমরা কয়জনে মনে করিয়া রাখিয়াছি? 'গৌড়-ভুজঙ্গ' শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যের যে অজেয় কাহিনীর পদভরে একদিন তাম্রলিপ্ত—''

একটা দমকা বাতাসে পাণ্ডুলিপির তিন-চারটে পাতা একসঙ্গে উড়ে গেল।

কিন্তু অমরেশ ভাবছিলেন তাম্রলিপ্তের কথাই। এই তো তাম্রলিপ্তের দেশ। স্বাধীন বাঙালীর অশ্বক্ষুরের ধূলো এখনো এর বাতাসে বাতাসে মিশে রয়েছে। ওই নদী দিয়েই হয়তো একদিন রাশি রাশি সাদা পাল উড়িয়ে বীরগর্বে বাঙালীর নৌবহর ভেসে যেত। গৌড়ীয় বাহিনীর হাজার মশালের আলোয় চোখে ধাঁধা লাগত রাজ্যেশ্বর হর্ষবর্ধনের।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নদীর চরে হালকা মেঘ-বরণ সাদা কাশ ফুলে ঝোড়ো মেঘের কালো রঙ ধরল। একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রণতি।

অমরেশ চুপ করে বসেছিলেন। সমস্ত চেতনার ভেতর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মতো ভেসে আসছে অতীতের কণ্ঠস্বর। প্রণতির পায়েব শব্দে তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল।

—এখনো লিখছ বাবা?

অমরেশ হাসলেন ঃ না মা, লিখছি না। ভাবছিলাম।

টেবিলের উপরে লণ্ঠনটা রেখে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল প্রণতি। ক্ষুণ্ণ অনুযোগের স্বরে বললে, তুমি দিনরাত ভাবো বাবা, বড় বেশি ভাবো।

তেমনি শান্ত হাসিটুকু অমরেশের মুখে লেগে রইল।

—ভাবনা ছাড়া আর কী করব বল্। বাইরে যখন পথ বন্ধ তখন মনের মধ্যেই ইচ্ছে মতো চলে বেড়াই।

—না, এত ভাবতে হবে না। এমন করে তোমাকে লিখতেও হবে না বাবা। ভাবতে

ভাবতে এই তিন মাসের ভেতর চুলগুলো সব তোমার সাদা হয়ে গেল।

—চুল সাদা হয় বয়সের নিয়মেই, শুধু ভাবনার জন্যে নয়—স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অমরেশ তাকালেন প্রণতির দিকে। শুভ্র কপালে সবুজ রঙের টিপটি জ্বলজ্বল করছে। কালো চোখে সস্নেহ অনুযোগ। টেবিলের ওপরে রাখা ছোট হাতখানির সুকুমার আঙুলগুলিতে লালিত্যের ছন্দ। এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়েই মনে পড়ে গেল ওর মাকে। সেই চোখ, সেই কপাল, মুখের ডৌলটি হুবহু সেই রকম। অমরেশ আবার উন্মনা হয়ে গেলেন।

—আজ কতখানি লিখলে বাবা?—সাগ্রহে প্রণতি পাণ্ডুলিপিটা কাছে টেনে নিয়ে এল। উঃ, আর একটা অধ্যায় যে প্রায় শেষ করে ফেলেছ।—সশ্রদ্ধ প্রশংসায় প্রণতির চোখে যেন আলো জ্বলে উঠল ঃ দেখো বাবা, তোমার এই বই সমস্ত দেশে সাড়া জাগিয়ে দেবে।

—না, অতটা দুরাশা আমার নেই। খ্যাতির লোভে এ কাজে আমি হাত দিইনি। আমি শুধু চাই বাঙালী নিজেকে জানুক, বাংলা দেশের সত্য রূপ—

কিন্তু কথার মাঝখানেই অমরেশ চমকে থেমে গেলেন। দূরের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হঠাৎ ধ্বনি উঠল, 'বন্দেমাতরম্'। সন্ধ্যার অন্ধকার শিউরে উঠল, শিউরে উঠল অমরেশের জানলার সামনে উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারাটা। তাম্রলিপ্তের ফেনিল সমুদ্র সরে গেছে দূরে, কিন্তু জনসমুদ্রে উঠেছে গর্জন।

প্রণতি উঠে দাঁড়িয়েছে। ওই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে তার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে আশঙ্কার একটা কালো ছায়া। অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে প্রণতি দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল নিঃশব্দে। চেয়ারটাকে একটু পেছনে ঠেলে দিয়ে নড়েচড়ে বসলেন অমরেশ। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেশ ফেরেনি এখনো?

অন্ধকারে দৃষ্টি রেখেই প্রণতি বললে, ওই শুনতে পাচ্ছ না? সভা করছে।

অমরেশ বললেন, হুঁ।—মুখের ওপর তিন-চারটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল গাঢ় হয়ে। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাস। আসমুদ্র হিমালয়ে আগুন জ্বলে উঠেছে। খবরের কাগজে পাতায় পাতায় বিক্ষোভ আর উত্তেজনার বিবরণ, মৃত্যু আর রক্তপাতের কাহিনী। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছে এখানেও, আর লোকেশ—

প্রণতি বললে, দাদা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে বাবা। ভয়ানক খারাপ লাগছে আমার। ওকে একটু নিষেধ করে দিও তুমি।

সামনের শেল্‌ফ থেকে একটা মোটা বই টেনে নিলেন অমরেশ। পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে বললেন, কী হবে নিষেধ করে? যা করছে করুক।

—না বাবা, একটিবার নিষেধ করো তুমি—জানলার কাছ থেকে সরে এল প্রণতি ঃ এর ফল কখনো ভাল হবে না। মানুষগুলো এমনিতেই ক্ষেপে আছে, তার ওপরে—

—তোর কথাই হয়তো সত্যি। কিন্তু সে কথা আজ ওকে বলে লাভ হবে না মা। লেখাপড়া শিখেছে, নিজের ওপরে ওর বিশ্বাস এসেছে। আজ ওকে বাধা দিতে গেলে অনধিকার চর্চা হবে আমার।

—কিন্তু বাবা—

আবার সেই 'বন্দেমাতরম্'। বহুশত কণ্ঠে স্বাধীনতার অমর-মন্ত্র মুখরিত হয়ে উঠেছে।

এ ডাক শুধু মানুষের মুখ থেকে নয়—যেন বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কী বলতে যাচ্ছিল ভুলে গেল প্রণতি। মরা-সমুদ্রে জোয়ার নেমেছে। রক্তে রক্তে রাখীবন্ধন হয়েছে কঠিন সংকল্পের, দুর্জয় প্রতিজ্ঞার।

খোলা জানলা, দেখল প্রণতি, দেখলেন অমরেশ। মাঠের পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে, শত শত চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে তার লাল আলো।

আস্তে আস্তে মাঠ পেরিয়ে জনতা মিলিয়ে গেল- –বহুদূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল মশালের শিখায় শিখায় রক্ত-দীপালি, শুধু তখনো দূর থেকে ক্ষীণ রেশ আসছে ঃ 'বন্দে মাতরম্'।

প্রণতি নিজের টুলটাতে এসে বসল। চিন্তিত ম্লান মুখে বললে, আজকের কাগজ দেখেছ বাবা?

অমরেশ বললেন, দেখেছি।

—ট্রাম জ্বলছে, স্টেশন জ্বলছে, পুলিসের গুলি চলছে। এত রক্ত আর আগুন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর কখনো তো দেখা যায়নি। আমরা ভুল করিনি তো বাবা?

অমরেশ বললেন, কী জানি। কিন্তু ভেবে আর কী হবে। ভুলের মধ্যে দিয়েও সত্যকে খুঁজে পাবেই একদিন।

অমরেশ কলমটা তুলে নিলেন।

—আলোটা আরো একটু বাড়িয়ে দে তো মা, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

আলোটা উসকে দিয়ে প্রণতি বললে, দাদা তো এখনো ফিরল না, আমি তোমার চা-ই করে আনি।

অমরেশ ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। কলমের মুখে বিস্মৃত বাংলা রেখায় রেখায় ফুটতে লাগল :

"মহারাজ চক্রবর্তী অশোকের অজেয় বাহিনী যেদিন কলিঙ্গ জয় করিতে আসিয়াছিল, সেইদিনের সেই মৃত্যুযজ্ঞে কতজন বাঙালী রক্ত দিয়াছিল, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করে নাই। কিন্তু সেদিন এই মেদিনীপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সেদিন কলিঙ্গ সৈন্যের পুরোভাগে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বাংলারই সন্তান। কত বীরমল্ল, কত সহস্রমল্ল তাহাদের রায় বাঁশ লইয়া, তাহাদের বল্লম লইয়া সেই সংগ্রামে যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল—"

দূর থেকে তখনো শোনা যাচ্ছে 'বন্দে মাতরম্'। সেদিনের যুদ্ধোন্মাদনা সাড়া দিয়েছে বীরমল্ল-সহস্রমল্লদের উত্তর-পুরুষের রক্তে রক্তে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে। মীনাঙ্ক-চিহ্নিত ঝাণ্ডা নিশান নেই, ত্রিবর্ণ পতাকায় ঝড়ের হাওয়া এসে দোল দিয়েছে।

তিরিশ বছর হেডমাস্টারী করে আজ অবসর নিয়েছেন অমরেশ। কিন্তু অবসর নিলেও কাজ বন্ধ হয়নি। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পঞ্চগৌড়ের একখানা ইতিহাস তিনি লিখবেন এই তাঁর সংকল্প। এতবড় জাতি বাঙালী, এত তার শৌর্যবীর্য, অথচ বাংলা দেশের ভালো একখানা ইতিহাস নেই। বাঙালীর ছেলে বিজয়নগর রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্ণনা করতে পারে [illegible] তীত গৌরব সম্পর্কে একটি বর্ণও তারা জানে না।

কোটিবর্ষ, পৌণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থান—কোথায় সে সব, সে সব কাদের?

বাড়িতে বসে মনের মতো করে তিনি গড়ে তুলছেন লোকেশ আর প্রণতিকে। লোকেশ গতবছর ইকনমিক্সে এম. এ পাস করেছে। প্রণতি প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এই দুটি ছেলেমেয়ে নিয়েই অমরেশের সংসার। সন্ধ্যা-প্রদীপের মতো শান্ত আর স্নিগ্ধ মেয়ে প্রণতি। ঘরের কোণে বসে পড়তে ভালবাসে, ভালবাসে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে। কিন্তু লোকেশ তা নয়। ইকনমিক্সের বই পড়ে তার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে, খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়, বন্য বন্দী পশুর মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, উঃ, আমরা কি মানুষ!

উনিশশো তিরিশ সালে ইস্কুলের ছাত্র ছিল লোকেশ। এল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন, এল সত্যাগ্রহ। ইস্কুলের গণ্ডী ভেঙে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, তিন মাস জেল খেটে এল। তারপর থেকেই চলতি রাজনীতির ধারার সঙ্গে সে বরাবর যোগ রেখে এসেছে। পুলিসে বাড়ি সার্চ করেছে কতবার। কিন্তু অমরেশ কখনো কিছু বলেননি। তিনি বাপ, কিন্তু সেই অধিকারে ডিক্টেটারী করবার প্রেরণা তাঁর মনে জেগে ওঠেনি কোনোদিন। যে কাজ করতে চায় কাজ করতেই দাও তাকে।

কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। নেতৃহীন দেশের যা কিছু বিক্ষোভ ভেঙে পড়েছে সর্বনাশা মূর্তিতে। আগুন জ্বলেছে, রক্ত ঝরছে।

স্টোভ ধরিয়ে বারান্দায় চায়ের জল চাপিয়েছে প্রণতি। চটির শব্দ করতে করতে লোকেশ এসে দেখা দিলে।

—চা করছিস নতি? আমারও জল নিস।

পিঠের ওপর আঁচলটাকে তুলে নিয়ে প্রণতি উঠে দাঁড়ালো।

বললে, এত রাত অবধি কোথায় ছিলে দাদা?

লোকেশ নির্বিকার মুখে বললে, কাজ ছিল।

—কাজ? তাই বুঝি ওই 'বন্দে মাতরম্' শুনতে পাচ্ছিলাম?

—ঠিক ধরেছিস নতি। তোর মাথায় তাহলে অন্তত এক ছটাকও বুদ্ধি আছে।

—সত্যি দাদা, ঠাট্টা নয়।—প্রণতির কালো চোখ আশঙ্কায় ছলছল করে উঠল ঃ এসব কি ভালো হচ্ছে? কাগজে দেখলাম, যেখানে-সেখানে হরদম গুলি চলছে। আর—

গুলি?—লোকেশের চোখে কী একটা একবার দপ করে ঝলক দিয়ে গেল ঃ জানিস তো, 'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে!'

—কিন্তু দাদা, সত্যাগ্রহের দীক্ষা কি আমরা এইভাবেই নিয়েছিলাম?

কয়েক মুহূর্ত লোকেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দে যেন বহুদূর থেকে আসা ঝড়ের গর্জন। প্রণতির চোখে মুখে স্টোভের নীলাভ আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে। বাইরে ঘন হয়ে উঠেছে স্তরে স্তরে অন্ধকার। রাত্রির হাওয়ায় মাঠ থেকে ভেসে আসছে পাকা ফসলের গন্ধ। প্রণতির প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে লোকেশ জানাল, আমি বাবার ঘরে যাচ্ছি, তুই আমার চা নিয়ে আসিস।

কেটলিটার দিকে বোবা চোখ মেলে একা বসে রইল প্রণতি। সব দিক থেকেই তার হয়েছে মরণ। বাবা তো নিজের মধ্যেই তলিয়ে আছেন. স্বাধীন বাংলার, অতীত বাংলার

ইতিহাস লিখছেন তিনি। বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে না ঘটছে সে দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর, মনও নেই। মোটাসোটা বইগুলোর তত্ত্ব আর তথ্যের সমুদ্র মন্থন করে অমৃতের সাধনা করে চলেছেন তিনি।

আর লোকেশ চলেছে নিজে দুরূহ প্রতিজ্ঞার সংশয়াকীর্ণ বন্ধুর পথ দিয়ে। চারদিকের পৃথিবী ঘিরে একটা আসন্ন দুর্যোগ থম থম করছে, আর সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রণতির ভয় করছে—ভয়ানক ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে যে-আগুনে লোকেশ ইন্ধন দিচ্ছে, সে আগুন তাকেই এবারে গ্রাস করবে।

কয়েক বছর আগেকার কথা মনে পড়ল প্রণতির. মোটরে করে ওরা বেড়াতে গিয়েছিল হিমালয়ের বুকে। সেখানে দু'পাশের খাড়া পাহাড় কেটে তিস্তার তীক্ষ্ণগামী নীলধারা ছুটে চলেছে, সেখানে একটা ঝোরার পাশে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছিল ওরা। সামনে পেছনে কালো পাহাড়—ঘর অরণ্যে রোমাঞ্চিত। মাথার ওপর উপড়ে-পড়া শালের গাছ বিরাটমূর্তি পাথরের চাঙাড়ে আটকে আছে। পাহাড়ের চূড়োয় গাছের ডালে বসে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে ধনেশ পাখি। বীভৎস দুর্গম জঙ্গলে বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব।

সকলের নিষেধ না শুনেই শুকনো ঝোরার পাথর কাটা পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিল লোকেশ। বুনো পাহাড়ে ওঠা সহজ, কিন্তু নামা কঠিন। পায়ের তলা থেকে সর্ সর্ করে পাথর সরে যাচ্ছে, গুম্ গুম্ করে আছড়ে পড়ছে পাঁচশো ফুট নিচে। লোকেশ নামতে পারছিল না। তারপর একবার পা পিছলে গেল তার। সকলে আর্তনাদ করে উঠল, দারুণ ভয়ে আর্তনাদ করে চোখ বুজল প্রণতি।

কিন্তু কপাল-জোর ছিল লোকেশের। দশ-বারো ফুট গড়িয়ে একটা গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়িয়েছিল সেবারে। প্রায় দেড়-ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পরে যখন নিচে নেমে এসেছিল, তখন তার জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সারা গায়ে রক্তের ছোপ।

এতটুকু দমে যায়নি সে। প্রণতিকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বলেছিল, কাঁদছিস কেন বোকার মতো? মরতামই যদি, কী আর ক্ষতি হত তাতে? 'ফলেন্ এঞ্জেলে'র মতো ওপর থেকে নিচে আছড়ে পড়তাম, একটা গ্লোরিয়াস্ ডেথ দেখতে পেতিস। মরতে হয় তো অমনি করেই মরব। বিছানায় শুয়ে কাশতে কাশতে 'গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম'—ও আমার পোষাবে না।

সেই লোকেশ। 'ফলেন এঞ্জেলে'র মতো সে মরবে। ভালো হোক, মন্দ হোক, তার পথ সঙ্কটের দিকে। বিচার-নির্বিচারের প্রশ্নই ওঠে না। লবণ-অমান্য আন্দোলন, বোমার যুগ। 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবারে'র পথ ভেঙে সে এগিয়ে যাবে। সেদিন ঝর্ণার পথ বেয়ে পাহাড়ে ওঠবার সময় সে কারো নিষেধ শোনেনি, আজও শুনবে না।

কেটলির জলটা টগ্‌বগ্ করে ফুটছে—বাইরে এমনি করে ফুটছে উত্তেজিত ভারতবর্ষের প্রাণ। স্টোভের চাবিটা খুলে দিল প্রণতি—একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাসের মতো টানা শব্দ করে স্টোভটা নিবে গেল।

জানালার ওপারে সন্ধ্যাতারাটা ঝলমল করছে। অমরেশ লিখছিলেন ঃ

''অষ্টম শতাব্দী। অরাজক বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় চলিতেছে। ভারতবর্ষের চারিদিক

হইতে মাংসলোভী গৃধিনীর মতো শক্তিগুলি দেশের উপরে হানা দিতেছে। অবিচার, অত্যাচার ও নিপীড়নে মানুষ হাহাকার করিতেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের গণশক্তি জাগিয়া উঠিল, এই অরাজকতার অত্যাচার দূর করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। বপ্যটের পুত্র গোপালদেব জনগণের প্রতিনিধি হইয়া বাংলার সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইল ঃ প্রকৃতিপুঞ্জ রাজলক্ষ্মীর প্রসারিত কর তাঁহার হস্তে ধারণ করাইল, দিঙ্মণ্ডল-প্রসারিত তাঁহার যশ পূর্ণিমা-রাত্রির জ্যোৎস্নাতুল্য অম্লান শুভ্রতায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল—''

লোকেশ ঘরে ঢুকল। চটির শব্দে মুখ তুলে তাকালেন অমরেশ।

—কতখানি লেখা হল বাবা?

—বেশি আর এগোতে পারলাম কই। এত লেখবার আছে, এত ভাববার আছে—মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে অমরেশ খাতাটা বন্ধ করে ফেললেন। প্রণতির কণ্ঠে যে আন্তরিকতা আর আগ্রহের সুর লোকেশের মধ্যে তা নেই। যেন নিতান্তই বাপের সঙ্গে একটা সহজ ভদ্রতা রক্ষা করে চলে সে। অমরেশ জানেন, অতীতকে লোকেশ শ্রদ্ধা করে না। প্রত্নতত্ত্বের অরণ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান করে বেড়ানো তার কাছে নিছক আত্মবিলাস বলেই মনে হয়। ইকনমিক্সের ছাত্র সে, তার কাছে বর্তমানের দাবিটাই অগ্রগণ্য। নতুন আশা, নতুন আদর্শ, নতুন সংকল্প।

অমরেশ বললেন, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ছোট টুলটার ওপরে লোকেশ বসল। তারপর সঙ্কুচিত ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন অমরেশ। কয়েকবার নাড়াচাড়া করলেন পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করতে চাও তুমি?

—কিসের কথা বলছেন?

—রাজনীতির। যে ঝড় তুলছ, তার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে তোমার?

লোকেশ হাসল ঃ ঝড়ের কাজ সে করবেই। যার শক্তি আছে ঝড়ের সঙ্গেই চলবে, আর যে পারবে না সে হাওয়ায় উড়ে যাবে। আমার মতো এক-আধজনের কথা তো ভাবিনি।

—তা বলছি না—অমরেশ আস্তে আস্তে কলমটা টেবিলের ওপরে ঠুকতে লাগলেন ঃ সকলের কথা, দেশের কথা। যা করতে যাচ্ছ, তার কি এখন সময় হয়েছে?

—সময়?—লোকেশ তেমনি মৃদু হাসল ঃ সময় তো আপনা থেকে আসে না বাবা, তাকে তৈরি করে নিতে হয়। ভুল যদি করি, সেও ভালো। কিন্তু এই লজ্জা আর অপমানের মধ্যে স্থির থাকতে পারছি না।

—হুঁ—অমরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ঃ কিন্তু এই পথই তুমি বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত। আরো তো অনেক কিছুই করবার ছিল তোমার। লেখাপড়া, কাজকর্ম—

লোকেশের চোখের সামনে অমরেশের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে বলিষ্ঠ অক্ষর : ''সেই দারুণ দুর্দিনে দেশের গণশক্তি জাগিয়া উঠিল। এই অরাজকতার অত্যাচার দূর করিবার জন্য—''

লোকেশ বললে, সারাজীবন আপনি ইতিহাসের চর্চা করেছেন বাবা। আপনি তো জানেন, এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজের জন্যে যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে যায়, তার চাইতে ঢের বড় কাজের ডাক আসে। আমি জানি, এ কথা আপনি মনের থেকে বলেননি।

অমরেশের মুখের ওপর দিয়ে একঝলক রক্ত খেলা করে গেল। যা বলতে যাচ্ছিলেন, বলতে পারলেন না। লোকেশ ছোট্ট একটুখানি খোঁচা দিয়েছে তাঁকে। স্বার্থপরের মতো ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের কথা ভাববার দিন আর নেই ঃ বুড়ো হয়ে গেছেন অমরেশ, ক্লান্তি আর অবসাদের বোঝা এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আজ তিনি কামনা করেন একটি পরিপূর্ণ সংসার। গৃহী হয়েছে লোকেশ, ঘর বেঁধেছে, পরিজন মুখরিত একটি সংসারের মধ্যে সহজ হাসি আর আনন্দের আলোতে তাঁর অন্তিম দিনগুলো মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে মন লোকেশের নয়—বৃহত্তর জগৎ, বৃহত্তম সত্যের ইঙ্গিত এসেছে তার কাছে।

অমরেশ ক্লিষ্টভাবে বললেন, বেশ।

গভীর সহানুভূতিভরে লোকেশ বাপের মুখের দিকে তাকালো। অমরেশকে সে বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে কোথায় তাঁর ব্যথা। কিন্তু কী করতে পারে সে। আজ নীড়ের মোহ নেই, দিগন্তের দাবি এসেছে। ঘরের মঙ্গলশঙ্খ তার জন্য নয়, সন্ধ্যার দীপালোকও তার নিভে গেছে।

ঘরে একটা দুঃসহ স্তব্ধতা। কে কী বলবে বুঝতে পারছে না। অমরেশ মাথা নিচু করে টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে লাগলেন, যেন লোকেশের মুখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না তাঁর। লোকেশ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। একটা সুতীব্র অস্বস্তি দুজনকেই পীড়িত করে তুলছে—আর বাতাসে বাজছে খস খস করে কাগজ ওড়বার শব্দ।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রণতি। গুমোট একরাশ মেঘ যেন ঘরের মধ্য থেকে কেটে গেল।

নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন দুজনে।

প্রণতি বললে, তোমার চা ঠিক হয়েছে বাবা?

অমরেশ জবাব দিলেন না, যেন কথাটা তিনি শুনতেই পাননি।

এক নিঃশ্বাসে চা শেষ করে লোকেশ উঠে দাঁড়ালো।

—আমি একটু বেরুচ্ছি নতি।

—এখন? এত রাতে?—প্রণতির কালো চোখে আশঙ্কার পাণ্ডুর ছায়া ঘনালো ঃ কোথায় চললে তুমি?

—কাজে।—লোকেশ সস্নেহে হাসল ঃ 'ডু অর ডাই।' আমার জন্যে ভাবিসনি নতি।

প্রণতির বুকের রক্ত ছলছল করে উঠল মুহূর্তে ঃ কখন ফিরবে?

—জানি না। জানি না হয়তো আর ফিরব কিনা। আজ অনেককেই অনেক কিছু দিতে হবে, হয়তো আমার ক্ষতিও তোদের সইবে।

লোকেশ আর দাঁড়ালো না। ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল বাইরে, অন্ধকার মাঠের পথে তার চটির শব্দটা মিলিয়ে গেল।

প্রণতি আর্তনাদ করে উঠল ঃ দাদা কোথায় গেল, বাবা?

অসহায়ের মতো মাথা নাড়লেন অমরেশ—তিনি জানেন না। শুধু প্রণতির চোখে পড়ল, তাঁর আঙুলগুলো থর থর করে কাঁপছে—লিখতে গিয়ে কাগজের ওপরে একটা আঁচড় পড়ে গেল।

অনেক রাত্রে অমরেশের ঘরের আলো নিভে গেল। কিন্তু প্রণতির চোখে ঘুম নেই, অতন্দ্র চোখ মেলে উৎকর্ণ হয়ে জেগে আছে সে। কখন ফিরবে লোকেশ, দরজায় কড়া

নাড়বে, দরজা খুলে দিতে হবে তাকে। কিন্তু কোথায় গেল লোকেশ, কী করতে গেল?

কালপুরুষের অতন্দ্র পাহারায় রাত্রির ভারমন্থর প্রহরগুলো চলেছে বয়ে। বাতাসে পাকা ফসলের গন্ধ। দূর বনান্ত কালি মেখে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাতাস যেন কী একটা কথা অনবরত বলে চলেছে, আসমুদ্রহিমাচলের সমুদ্বেল প্রাণ-তরঙ্গ যেন বাণীমুখর হয়ে উঠেছে গাছের পাতায় পাতায়। চোখের জলের মতো শিশির পড়ছে টপ—টপ—টপ—

আর অমরেশ স্বপ্ন দেখছেন বিস্মৃত তাম্রলিপ্তের। স্তব্ধ বালুবেলার ওপরে আছড়ে পড়ছে ফেনায়িত নীল তরঙ্গ। 'গৌড় ভুজঙ্গ' শশাঙ্ক গুপ্তের রণতরীর মাথার উপরে উড়ছে শূলাঙ্ক-নিশান। বরুণছত্রধারী মহারাজার তলোয়ারের দীপ্তি সমস্ত আর্যাবর্তের ওপরে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা—বিজয়ী বাংলা। পায়ের নিচে চূর্ণ হয়ে গেছে মালব, জ্বলছে নালন্দার বিহার, আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বোধিদ্রুম। বেদ—ব্রাহ্মণ—রাজা। হিন্দুশক্তি সহস্র শিখায় গৌড়ের আকাশকে আলো করে দিয়ে জ্বলছে অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নির মতো।

—'বন্দে মাতরম্'—

চমকে জেগে উঠল প্রণতি—জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলেন অমরেশ। মাঠের ওপারে থানা, বন্দর। সেদিক থেকে সহস্র কণ্ঠে কোলাহল উঠছে। 'বন্দে মাতরম্'—'বন্দে মাতরম্'। কী হচ্ছে ওখানে? ওখানে কি প্রলয় চলেছে? আস্তে আস্তে আকাশটা লাল হয়ে উঠল—বন্দরে আগুন লেগেছে।

আগুনের শিখা আর চিৎকার—আকাশ-বাতাস-পৃথিবী কাঁপছে। দুম্ দুম্ করে বন্দুকের শব্দ।

ঘর থেকে পাগলের মতো ছুটে এল প্রণতি—আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল অমরেশের পায়ের কাছে ঃ বাবা, দাদা কোথায়, দাদা?

অমরেশের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—শুধু বন্দর নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁর কাছে রাঙা হয়ে গেছে আগুনের রক্তাভ শিখায়। নিঃশব্দে প্রণতিকে তিনি বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

দুর্যোগ আর দুঃস্বপ্নের রাত্রি ভোর হয়ে গেল। পরদিন এল দারোগা, এল পুলিস। বাড়ি সার্চ করলে, জবানবন্দি নিলে অমরেশের। লোকেশ ফিরল না।

লোকেশ এল তিনদিন পরে—শহর থেকে। গোরুর গাড়িতে করে তাকে আনা হয়েছে রাশি রাশি কলাপাতায় মুড়ে। সারা গায়ে কয়লার গুঁড়ো মাখা—যাতে পচে না যায়। একটা উৎকট গন্ধে তার কাছে এগোনো যায় না। শব-ব্যবচ্ছেদে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত, কালো রক্ত আলকাতরার মতো এখানে ওখানে শুকিয়ে রয়েছে। বুকের বাঁ দিকে বুলেটের প্রকাণ্ড ক্ষত-চিহ্নটা হাঁ করে আছে—রক্তহীন দেহের নীল রঙের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডটার আভাস।

নির্বাক শোক-ম্লান মুখে দু-একজন করে গাঁয়ের লোক এগিয়ে এল, কেউ দুটো ফুল ছড়িয়ে দিলে, কেউ আনল চন্দন কাঠ। স্বাধীন বাংলার সৈনিকদের দেহধূলির সঙ্গে লোকেশের চিতাভস্ম মিলিয়ে গেল।

লোকেশ বলেছিল, তার ক্ষতিও হয়তো সইবে। ক্ষতি সইল কিনা কে জানে, কিন্তু

দিনের পর দিন কাটতে লাগল অব্যাহত আর নির্ভুল নিয়মে। প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন, প্রতিদিনের ছোট বড় অসংখ্য দাবি-দাওয়া—সব মিথ্যে হয়ে যায় তবু বাঁচবার প্রয়োজন থাকে। সামনে যখন দেখা যায় কিছুই নেই, শুধু দুপুরের খররৌদ্রে কাঁপছে জ্বলন্ত মরীচিকা, দিকে-দিগন্তে অর্থহীন শূন্যতা, তখনো রক্তাক্ত-ক্লান্ত-চরণে পা ফেলে এগিয়ে চলে মানুষ।

কী আছে আর অমরেশের জীবনে, কিসের জন্যে তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর স্বপ্ন। লোকেশ আর ফিরবে না কোনোদিন। বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বান কেড়ে নিয়েছে তাকে, ছিনিয়ে নিয়েছে চিরদিনের মতো। অমরেশের পৃথিবী থেকে চলে গেছে লোকেশ, চলে গেছে শৃঙ্খলিত অপমানের গণ্ডিসীমার বাইরে।

কিন্তু সত্যই কি লোকেশ নেই? বহু লোকের জ্বলন্ত চোখে, বহু মানুষের দৃষ্টির দীপ্তশিখাতে তা হলে কাকে দেখা যায়? কার প্রতিজ্ঞা বহু পেশীতে আজও আলোড়িত হয়ে উঠছে? একবার হয়তো ভুল হয়েছে আমাদের, একবার হয়তো হার মেনেছি আমরা। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? বারে বারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই—আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করে জালিয়ানওয়ালার, সেবাগ্রামে, কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী-বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙা মাটিতে। ভাবীকালের পথনির্দেশ সেই রক্তলিপিতে।

অমরেশের বয়স বেড়েছে। ঝুলে পড়েছে চোখের চামড়া, মাথার চুলে আরো বেশি করে ছড়িয়েছে শুভ্রতার আভরণ। কিন্তু নতুন আশ্বাস ও আশায় বুক ভরে উঠছে তার। বাংলাদেশের ইতিহাস লিখে চলেছেন অমরেশ ঃ

"জয়-পরাজয়, দুঃখ-দৈন্য-মৃত্যুর মধ্য দিয়া আগাইয়া চলে বাংলার জীবন। পাল বংশের শেষ শিখা নিভিয়া আসে, কুমার পাল, গোবিন্দ পালের মূর্তি মহাকালের বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে তিরোহিত হয়। বিক্রমশিলা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া যায়, ওদন্তপুর ভুলিয়া যায় তাহার বর্ণগৌরব। স্ফটিক-মণ্ডিত জগদ্দল-বিহারের কোনো নির্দেশ বরেন্দ্রভূমির বুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দুর্দিন, দুঃস্বপ্ন, মাৎস্যন্যায় দাক্ষিণাত্যের সেনবংশ—"

প্রণতির মুখে হাসি নেই, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সারাক্ষণ কাঁদে লোকেশের জন্যে। তার লেখার টেবিল, তার পড়বার বইগুলো, ব্র্যাকেটে তার জামা কাপড়। তার ফাউন্টেন পেনের কালি এখনও শুকোয়নি। ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সে যে দম দিয়ে গিয়েছিল, তার জোরে ঘড়িটা আজও চলছে। সব আছে, লোকেশ নেই, 'ফলেন্ এঞ্জেলের গ্লোরিয়াস ডেথ' দেখেছে প্রণতি—দেশের জন্যে নিজেকে বলি দিয়েছে সে। তবু মনে এক মুহূর্ত শান্তি নেই, তবু প্রতিক্ষণ বুকের ভিতরের ক্ষত চুঁইয়ে রক্ত পড়ে।

কিন্তু প্রতিদিনের দাবি আছে—প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন আছে। চোখের জল মুছে চায়ের পেয়ালা নিয়ে যথাসময়ে সে এসে দাঁড়ায় অমরেশের সামনে ঃ

—তোমার চায়ে আর একটু চিনি দেব বাবা?

অমরেশ আস্তে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, না।

—কয়েকটা ফল কেটে আনব?

লেখার খাতার দিকে চোখ রেখে তেমনি অনাসক্ত ভাবেই জবাব দেন অমরেশ ঃ থাক এখন।

—আজ কতটা লিখলে বাবা?

জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকান অমরেশ ঃ পালযুগ প্রায় শেষ করে আনলাম। তুই শেলফ্‌ থেকে ওই বইটে দিয়ে যা তো মা, The Last Monarchs of the Pala Dynasty in Bengal—

সেই কথাবার্তা—সেই পুরোনো দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি। সব আছে অথচ কিছুই নেই। যান্ত্রিক জীবন, যান্ত্রিক মুহূর্ত। নিঃশব্দে চলে আসে নিজের ঘরে প্রণতি, তারপর টেবিলে বসে কাগজ আর তুলি টেনে নেয়। দিগন্তে অরণ্যময় কালো পাহাড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। বহু নীচে তিস্তার নীলধারা—মৃত্যুহিম প্রবাহ চলেছে পাথর কেটে, করকরে বালির মধ্য দিয়ে। আর শুকনো ঝোরার পথে একান্ত একখানা পাথরের চাঙাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকেশ। হাওয়ায় তার জামা উড়ে যাচ্ছে, তার মুখে ঝকঝক করছে দিনান্তের সূর্যকিরণ। 'দেবদূতের মৃত্যু'। হাতের তুলি থেমে যায় প্রণতির। চোখের জল পড়ে ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন কাটে। যে আগুন জ্বলেছিল তার শিখা আস্তে আস্তে নিভে যায়। অকালবোধনের পূজা শেষ হয় ব্যর্থ-বলিতে। বুকের মধ্যে ঘা মারে তীব্র আক্রোশ। কিন্তু কী যেন ভুল হয়ে গেছে, কী একটা অপরাধে ব্যর্থ হয়ে গেছে সমস্ত চেষ্টা। এত সংগ্রাম—এত রক্ত—ভাবীকালের পূর্ণতর সংশোধনের জন্যেই হয়ত প্রতীক্ষা করে আছে।

লোকেশের সঙ্গীরা জেল থেকে, শহর থেকে একে একে ফিরে আসছে। তিন মাস পরে এল নিতাই, প্রসন্ন আর জামাল। নিতাইয়ের হাঁটুর নিচে ঘা শুকিয়ে গিয়ে একটা কালো পোড়া চিহ্ন চকচক করছে। বন্দুকের দুটো গুলি—একটা লেগেছিল তার পায়ে, আর একটা লোকেশের বুকে। সেই কাল-রাত্রিতে লোকেশের পাশেই দাঁড়িয়েছিল নিতাই।

নিতাই গজরে ওঠে।

—দিদিমণি, সেই ফর্সা বেঁটে দারোগাটা—

প্রণতি বলে, থাক নিতাই। যে নিমিত্ত, তার উপরে রাগ করে লাভ নাই।

—দিদিমণি!

—মিথ্যে মন খারাপ করো না নিতাই। কত কাজ তো করবার আছে। আত্মহত্যা করো না।

নিতাই বোঝে, তবু বুঝতে চায় না। গুলি খেয়ে তারই বুকে আহত পাখির মতো লুটিয়ে পড়েছিল লোকেশ। দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে নিতাই অনুভব করেছিল, ফোয়ারার মতো ধারায় ধারায় গরম রক্ত তাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আবার বন্দুকের শব্দ। হাঁটুতে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তারপরে আর কী হয়েছিল মনে পড়ে না।

অমরেশ কোনো দিকে তাকান না—তাঁর ইতিহাস রচনা চলেছে অব্যাহত ভাবে। মাথার সাদা চুলগুলো আলোতে চিকচিক করে, কপালে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমে ওঠে, লিখতে লিখতে টনটন করে আঙুলগুলো। কিন্তু অমরেশের লেখার বিরাম নেই, যেন জীবনে এ ছাড়া কোথাও কোন উদ্দেশ্য নেই তাঁর। বাইরের পৃথিবী মুছে গেছে তাঁর দৃষ্টি থেকে অতীতের কঙ্কালাস্তীর্ণ শশ্মানের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট প্রদোষালোকে

এগিয়ে আসছে দলে দলে ছায়ামূর্তি—পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে, মহাস্থান থেকে, তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতট থেকে, পদ্মার পরপারে বিক্রমপুরের ভোজনবর্মদেবের রাজধানী থেকে। সেই সৈনিকদের দলে লোকেশকেও যেন চেনা যায়।

প্রণতি পড়ার বই নিয়ে থাকে, কখনও বা থাকে তার ছবি নিয়ে। 'দেবদূতের মৃত্যু' শেষ হলো না এখনো। একখানা কাগজ ছেঁড়ে, আর একখানায় নতুন করে রেখাপাত করতে হয়।

কালো পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে লোকেশ, মুখের ওপরে সূর্যালোক। এই জায়গাটাই কিছুতে ঠিক হচ্ছে না। বাটিতে সোনালী রঙের মধ্যে তুলি ডুবোতে গিয়েই প্রণতি চমকে গেল।

গুর—গুর—গুর—

জানলার বাইরে আকাশটায় কে যেন নিকষ কালো রঙ ঢেলে দিয়েছে। দূরে কাছে বনশ্রেণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, থমথম করছে পৃথিবী—তালগাছের পাতায় পাতায় বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যাচ্ছে।

দিগন্তে হঠাৎ কে হাহাকার করে কেঁদে উঠল। হাজার হাজার ডাইনী যেন একসঙ্গে মাথার চুল ছিঁড়ে অভিসম্পাত দিচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করবার আগেই হাওয়ায় প্রণতির ছবি উড়ে গেল, রঙের বাটিটা উপড়ে পড়ল মাটিতে।

নিজের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে প্রণতি ছুটে এল অমরেশের কাছে। বাইরে তখন কী যে চলছে কল্পনাও করা যায় না। হাজার হাজার ডাইনীর আর্ত চিৎকারে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তাদের কালো চুল আকাশে ঝড়ের পাল তুলে উড়ে যাচ্ছে ঃ রাশি রাশি ধুলোয় বৃষ্টির ছাটে, উপড়ে-পড়া চালে, গাছের পাতায়, দিকদিগন্ত একটা প্রলয় স্রোতের মতো ছুটে যাচ্ছে কী একটা সর্বনাশের অভিমুখে।

অমরেশের বুকের কাছে, মড়ার মতো পাংশু মুখ নিয়ে প্রণতি বসে রইল। বাইরে কী হচ্ছে? এ কি ঝড়? এমন ঝড় প্রণতি দেখেনি কোনদিন। তাদের এতবড় দালানের এপাশ ওপাশ থেকেও ঝুপ ঝুপ করে ইট খসে পড়ছে—খানিকটা চুন-সুরকির আবর্ত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে উড়ে গেল।

প্রণতি বললে, বাবা আমরা ঘর চাপা পড়ে মরব নাকি!

অমরেশ বললেন, কী জানি।

আস্তে আস্তে বাতাসের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে এল। জানালা খোলা হয় না, তবু একটু ফাঁক করে প্রণতি দেখলে পথঘাট কোথাও কিছু নেই—শুধু গাছের পাতা আর ডাল পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওপারের বন্দরটা মাটিতে শুয়ে আছে, কোথাও বা চালাহীন ঘরের কয়েকটা খুঁটো একটা নগ্ন-পরিহাসের মতো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু নদীর দিক থেকে ও কিসের শব্দ? হু হু করে ও কী আসছে? সামনের মাঠটা থই থই করছে জলে। তাম্রলিপ্তের সমুদ্র—মরাগাঙ কি আজ উতরোল হয়ে উঠল?

চারিদিক থেকে হৈ হৈ করে মানুষ ছুটে আসছে। গেল, গেল—সব গেল। ঝড় যা করবার করছে, বানে আর কিছু বাকি রাখবে না। পোঁটলাপুঁটলি যে যা পেরেছে কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে আসছে অমরেশের বাড়ির দিকেই। গ্রামে এই একমাত্র দালান। এই একমাত্র

বাড়ি, সেখানে হয়ত আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

হায় হায় করতে করতে মানুষ ছুটে এসে উঠেছে অমরেশের বারান্দাতে। এক নয়, দুই নয়, দুশো—আড়াইশো। চোখের দৃষ্টিতে উন্মত্ততা। সমস্ত দালানটা গিজগিজ করছে নানা স্তরের পুরুষ, নারী, শিশু, বালিকা, ভদ্র-অভদ্রে।

—রক্ষা করো, রক্ষা করো ভগবান!

সব ঘরগুলো খুলে দিলে প্রণতি। একতলা, দোতলা, কোনোখানে আর মানুষের দাঁড়াবার জায়গা নেই। কে নেই সেই দলে? নিতাই আছে, প্রসন্ন আছে, জামাল আছে। এক মাসের শিশুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এসেছে নতুন দারোগার স্ত্রী—তার পিছনে এসেছে দারোগা। তার ইউনিফর্মের নিচে খাপে ভরা পিস্তলটা বৃষ্টিতে ভিজে ঝকঝক করছে।

—হায় হায়, সব গেল! ভগবান রক্ষা করো!

তবু ওই দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও আড়াইশো জোড়া চোখ তীব্রভাবে এসে পড়েছে দারোগার পরিবারের দিকে। এরা কারা? এরা কেন এখানে? এখানে আসবার কী অধিকার এদের? নিতাইয়ের চোখে আকাশের বজ্রের ঝিলিক।

দারোগার ছেলেমানুষ শান্ত বউটি থরথর করে কাঁপছে। আর্তবিহ্বল তার চোখ, সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। ওদিকে আড়াইশো জোড়া দৃষ্টির আগুন যেন তার গায়ে এসে বিঁধছে বিদ্যুতের তীব্র জ্বালার মতো। বুকের মধ্যে এক মাসের শিশুটির শরীর ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে—এমন ভাবে থাকলে ও বাঁচবে না। দারোগার ভিজে পিস্তলটা কোমরের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা মূর্তির মতো বসে আছে সে।

প্রণতি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দারোগার স্ত্রীকে বললে, আপনি ভেতরে এসে কাপড়টা ছেড়ে নিন। খোকার ঠাণ্ডা লাগছে।

কৃতজ্ঞ বিহ্বল চোখ মেলে দারোগার স্ত্রী নিঃশব্দে উঠে এল। দারোগা একটি কথা বললে না। বসে রইল তেমনি নীরব আর অনড় হয়ে।

বাইরে কালো জলের স্রোত—প্রলয়ের তীক্ষ্ণ ধারা। বাড়ির মধ্যে অগণিত মানুষের কোলাহল। যা গেছে তার জন্যে বিলাপ, যে এসে পৌঁছুতে পারেনি তার জন্যে হাহাকার। এবার আর কিছু থাকবে না, যাবে যাবে সব যাবে। হায় ভগবান, এ কি সর্বনাশ তুমি পাঠালে!

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কেবল অমরেশের। ঘরে আলো জ্বলছে, আর সেই পাণ্ডুলিপির ওপর তাঁর লেখা ফুটছে ঃ

"কিন্তু এই হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত বাংলাও আবার প্রাণ পাইবে, আবার জাগিয়া উঠিবে নতুন শক্তি লইয়া, নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া! অন্ধকার বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য দেখা দিবে। চরম সর্বনাশের পটভূমিতে, চরম দুর্গতির পরমলগ্নে সমস্ত জাতি আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বজনীন ঐক্যের বেদীতে। যাহারা পরস্পরের বুকে আঘাত হানিতেছে—মোহে অন্ধ হইয়া, স্বার্থে আত্মবিস্মৃত হইয়া—সেদিন সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের হাতে হাতে রাখী বাঁধিতে হইবে। দেশে দেশে ইতিহাসের ইহাই শিক্ষা—"

বাইরে সুতীব্র জল-গর্জন। ভেতরে কি রাখী-বন্ধনেরই মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাচ্ছে?

লাল ঘোড়া

একটা ইংরেজি পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে বাঁ দিকে চোখ পড়ল। সবটা পাতা জুড়ে কী যেন টনিকের রঙীন বিজ্ঞাপন। এই টনিক খেলে কী পরিমাণ স্বাস্থ্য লাভ হতে পারে, সেইটে বোঝাবার জন্যে বিরাট একটা লাল ঘোড়ার ছবি। কেশর ফুলিয়ে আশ্চর্য উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে, সামনের একটা পা ভাঁজ করা, মাথাটা ওপরদিকে তোলা, সারা শরীরের প্রত্যেকটা পেশী থেকে তেজ আর শক্তি ঠিকরে পড়ছে। যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না—ছবিটা দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, যেন একটু পরেই এই পত্রিকাটার পাতা থেকে এক ঝলক ছুটন্ত লাল আগুনের মতো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে সে।

আমার জানালার বাইরে বর্ষণমুখরিত রাতের কলকাতা। বন্ধ কাচের শার্সির ওপর বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে থেকে থেকে—এক-একটা আলোর ঘোড়া মেঘের গুরু গুরু ধ্বনিতে ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে যেন। ফাঁকা পথের ওপর অতন্দ্র ইলেক্‌ট্রিকের সারি, অজস্র বৃষ্টিতে ঝাপসা, নিকষ কালো আকাশ আর ঘুমন্ত বাড়িগুলোর মাঝখানে তাদের কতগুলো সবুজ চোখের মতো মনে হচ্ছিল।

পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলুম টেবিলের ওপর। ওই লাল ঘোড়াটা—নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, কবরের মতো সারি দেওয়া অন্ধকার বাড়িগুলো, সবুজ চোখের মতো ইলেকট্রিক আলোর সার, আর—

আর, আমি কয়েক মুহূর্তের ভেতরে অনেক—অনেক বছর পেছনে চলে গেলুম। তখন আমার বয়েস তেরো বছরের বেশি নয়। তখন আমার জানালার বাইরে দূরে তালবনের মাথার ওপর সন্ধ্যাতারা উঠত আর সেই তারার দিকে চেয়ে চেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠত আমাদের তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখাটা। তখন চৈত্রের দুপুর ভরে যেত আমাদের বাগানের চাঁপার গন্ধে, তখন ভরা বর্ষায় করতোয়ার নীল জল ঘোলা হয়ে, ফেনা তুলে—আমাদের বাড়ির ঘাট ছাপিয়ে প্রায় আস্তাবল পর্যন্ত উঠে আসত।

সেই আস্তাবলে থাকত আমাদের লাল ঘোড়াটা।

একটা নয়—দুটো ঘোড়া। একটা কুচকুচে কালো, তার কপালে সাদা একটা দাগ—ঠাকুরমা তার নাম দিয়েছিলেন 'চাঁদকপালী'। আর একটা টকটকে লাল—ছোটবার সময় কেশরগুলো নেচে উঠত যখন, ঠিক মনে হত আগুনের শিখা কাঁপছে কতগুলো। তারও নামকরণ ঠাকুরমাই করেছিলেন খুব সম্ভব, 'লালু'।

প্রকাণ্ড দুটো ঘোড়া, অনেক দাম, বাবার খুব শখের জিনিস। আমাদের বুড়ো হিন্দুস্থানী সহিস রামযশ বলত ঃ 'একদম মিল্‌টারী।' যতদূর মনে আছে—নেকমর্দন ফকিরের মেলা থেকে ও-দুটোকে কিনে আনা হয়েছিল, উত্তর বাংলায় অত বড়ো মেলা তখন আর ছিল না।

ওই ঘোড়ায় চড়ে বাবা মফঃস্বলে যেতেন। রেকাবে পা দিয়ে জিনে উঠে বসতে না বসতেই উল্কার বেগ লাগত ঘোড়ার সর্বাঙ্গে। টকাটক্‌-টকাটক্‌-টকাটক্‌। চক্ষের পলকে থানার সামনের দেবদারু আর বকুলবন পার হয়ে ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে দূরের মেটে লাল পথ দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যেত, পেছনে পাক খেয়ে উঠতে থাকত

রাঙা ধুলোর ঘূর্ণি। আবার দূরের তালবনের মাথায় পড়ন্ত বেলা যখন শেষ আলো আর ছাড়া-ছাড়া মেঘ যেন শকুনের রক্তমাখা ডানা ছড়িয়ে দিত, তখন তেমনি করে ধুলোর ঝড় উঠত, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট হতে থাকত, তখন পরিষ্কার দেখতে পেতুম বাবা ফিরে আসছেন। চাঁদকপালী কিংবা লালু যেই হোক, বাড়ির সামনে পৌঁছেই দাঁড়িয়ে পড়ত লক্ষ্মী ছেলের মতো, বাবা টুপ করে নেমে আসতেন, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ল্যাজ নাড়ত ঘোড়া আর তার ঘামের একটা অদ্ভুত মাদক গন্ধে ভরে যেত জায়গাটা।

রোজ সকালে পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর স্কুলে যাওয়ার মাঝের সময়টুকু আমি এসে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে বসতুম আমাদের সেই মস্ত পেয়ারা গাছটার তলায়। একসঙ্গে দুটো কাজ হত। ছুতোর মিস্ত্রি তারিণী তার হাতুড়ি-করাত-র‍্যাঁদা নিয়ে ঠুক্‌ঠাক্‌ ঘসঘস করে কাজ করত সেখানে—আমাদের বাড়িতে প্রায় বারো মাসই বাঁধা ছিল সে; কখনো ঠাকুরমার পূজোর ঘরের সিংহাসন তৈরী করত, কখনো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করত হলদে রঙের কাঁটাল-কাঠের পিঁড়ি, কখনো গড়ত পিলসুজ, কখনো বা আরো জন-দুই লোক জড়ো করে আলমারী-টালমারী বানাতো; বাবা কাছাকাছি না থাকলে দা-কাটা কড়া তামাকে টান দিয়ে খক খক করে কাশত, আর আমাকে বকবক করে বোঝাত ঃ 'ছোটবাবু, ছুতোরের কাজ ভারী শক্ত—জাতগুণী না হলে এ-কাজে হাত আসে না। আরে র‍্যাঁদা ঘষতে জানলেই যদি মিস্তিরি হত, তা হলে দুনিয়ায় আর দুঃখু ছিল না।' আমি মধ্যে মধ্যে ওর যন্ত্রপাতি টানাটানি করলে হাঁ হাঁ করে উঠত ঃ 'হাত দিয়ো না—হাত দিয়ো না, ও-করাতে ক্ষুরের মতন ধার—আঙুলে একবার লাগলে ঘ্যাঁচ করে বেরিয়ে যাবেন!'

তারিণী আমার উপলক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল রামযশ। সামনের আস্তাবল থেকে সে তখন চাঁদকপালী আর লালুকে বের করে এনে প্রাণপণে দলাইমলাই করত। চটাস্‌ চটাস্‌ করে এমন জোরে চড় মারত যে আমি শিউরে উঠে ভাবতুম ও রকম একটা চাঁটি গায়ে লাগলেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব। অথচ ঘোড়া দুটোকে দেখতুম সম্পূর্ণ নির্বিকার—চোখ বুজে ঘাসটাস কী সব চিবিয়ে চলত—বরং খুব আরাম পাচ্ছে বলেই মনে হত তখন।

এমন কি তারিণী পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠত এক-এক সময়।

—কী আরম্ভ করলে হে রামযশ? চড়িয়ে চড়িয়েই বাবুর ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেলবে নাকি?

রামযশ জবাব দিত না। একবার অবজ্ঞাভরে চেয়ে দেখত কেবল।

তামাকে টান দিয়ে খক খক করে কাশতে কাশতে চোখে জল এসে যেত তারিণীর। এক হাতে চোখ মুছে নিয়ে আবার বলত ঃ অত যে মারধোর করছ ঘোড়াকে—একদিন এক চাঁটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেবেন—বুঝবেন তখন।

রামযশ বলত ঃ ঠকঠক করতেছো—কিয়ে যাও। ঘোড়েকা মতলব তুমি কী সমঝাবে?

—না, ঘোড়া তো আমরা কখনো দেখিনি। আজই তুমিই প্রেথম দেখালে! —তারিণী ব্যঙ্গ করত।

—আরে তুমি যা দেখিয়েসো, ওসব ঘোড়া নেহি—গাধ্‌ধেকা বাচ্চা। এমন ঘোড়া তুমি

কাঁহাসে দেখবে? এ-সব হোলো ওয়েলার ঘোড়া—একদম মিল্‌টারী! কামানের গোলীমে ভি কুছু হোয় না—দলাই-মলাইসে কী কোরবে--অ্যাঁ?

—সেই কবে ঘি খেয়েছিল—বলে থেমে যেত তারিণী, শিরিষ কাগজ ঘষে ঘষে কাঁটাল কাঠের হলদে পিঁড়েগুলোকে সোনার মতো চকচকে করে তুলত। কিন্তু আর কথা বাড়াতো না রামযশের সঙ্গে। বয়েসকালে রামযশ দমদমে ছিল, কলকত্তে-মে ভি, গোরা সাহেবলোগো কি ঘোড়া-উড়ার তত্ত্বাবধান করত সে। মিলিটারীর খবর—কলকাতার হালচাল তার নখদর্পণে। নিতান্তই পাড়াগাঁয়ের ছুতোর মিস্ত্রি তারিণী—যে কলকাতা দূরে থাক, দিনাজপুর সদর পর্যন্ত চোখে দেখেনি, সে আর ঘাঁটাতে সাহস পেতো না রামযশকে।

আমি কখনো কখনো রামযশের কাছে মিলিটারী ঘোড়ার গল্প শুনতুম। কেমন করে ব্যাণ্ডের তালে তালে তারা নেচে ওঠে, কেমন করে গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে তারা টগবগিয়ে ছুটে যায়, কেমন করে লাটসাহেবের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে গোরা ঘোড়সোয়ার—এই সব বিবরণ শুনতে শুনতে আমার ভাবনা অনেক দূরে ভেসে চলে যেত। তখন মধ্যে মধ্যে মনে হত—আমাদের বাড়ির আস্তাবলে ওরা যেন বেমানান, মিলিটারী বাজনার তালে তালে নাচতে না পারলে ওদের জীবনই যেন বৃথা।

তারিণী ঈর্ষাভরা চোখে তাকাত। গ্রামের নদীতে কুমির আসবার একটা রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়ে আমাকে অভিভূত করতে যাচ্ছিল, রামযশের ঘোড়া কুমিরের পিঠের ওপর টেক্কা দিয়ে চলে যেত দেখে তার বিরক্তির আর সীমা থাকত না।

—বুড়োর কথা শোনো কেনে ছোটবাবু! গপ্প মারে দই!

গল্প হোক আর যাই হোক, তারিণীর চাইতে রামযশের ওপরেই আকর্ষণ আমার ছিল বেশি। আস্তাবলের পাশেই একটা ছোট ঘরে বাঁশের মাচার ওপর ছিল রামযশের আস্তানা, কত ছুটির দুপুরে আমি পালিয়ে পালিয়ে যেতুম সেখানে—আর রামযশের গল্প শুনতুম। বয়েস বোধ হয় তখন পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে রামযশের, পাকা গোঁফ, মাথার ছাঁটা-ছাঁটা চুল কদমফুলের মতো সাদা। তবু আশ্চর্য ধারালো ছিল চোখ দুটো, কথা বলতে জ্বলজ্বল করে জ্বলত আর সেই চোখের আলোয় যেন আমি দিগ্‌দিগন্ত দেখতে পেতুম।

শুধু রামযশই নয়; তখন স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়িয়ে আরো কিছু দূরে এগিয়ে গেছি। পড়েছি সেই সব বর্ণনা—কেমন করে ঘাসে ভরা বিশাল মাঠের ভেতর দলে দলে বুনো ঘোড়া চরে বেড়ায়, কী করে নেতা হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে—কেমন করে হঠাৎ খেয়ালখুশির আনন্দে তীরের মতো ছুটে যায় তারা। পড়েছি সেই সব কাহিনী, কিভাবে রেড ইণ্ডিয়ানরা পালকের টুপি মাথায় পরে পোষা ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করে তাদের আর ল্যাসো ছুঁড়ে দিয়ে উল্কাগতি বুনো ঘোড়াকে বন্দী করে তারা।

আস্তাবলে ঘোড়ারা বড়ো বড়ো পাত্র থেকে ভিজে ছোলা খেত, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। মোটা মোটা নাকের ফুটো দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ত, প্রকাণ্ড চোয়ালের পাশ দিয়ে চিবুনো ছোলা গলে পড়ত কখনো কখনো, কী মনে করে অনেকগুলো দাঁত হাসির ভঙ্গিতে মেলে দিয়ে ইঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠত আর চামরের মতো ল্যাজ দুলিয়ে দিয়ে মাছি তাড়াত। সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠত চিবুনো ছোলা আর ঘোড়ার গন্ধে—আমি দেখতুম—স্পষ্ট দেখতে পেতুম, অস্ট্রেলিয়ার সেই অসীম-অশেষ তৃণপ্রান্তর দিয়ে ঘোড়ার পাল ছুটছে, শুকনো ছেঁড়া ঘাসের শিসের ঘূর্ণি উঠছে

তাদের পায়ে পায়ে, আর তাদের দলে একটা বিদ্যুতের চমকের মতো লালু আর চাঁদকপালীকে আমি দেখতে পেতুম এক একবার।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ কাণ্ড ঘটল একটা।

বেদের দল এল গ্রামে—এদেশের লোক যাদের বলত ইরানী। সেই পীর মুর্শিদের প্রকাণ্ড বটগাছটা—অনেকখানি জুড়ে ঠাণ্ডা নীলচে ছায়া ছড়িয়ে আর বড়ো বড়ো জট নামিয়ে যেটা দাঁড়িয়ে আছে, যার ঘুপচি পাতার আড়ালে কখনো কখনো মাঝরাতে শকুনের ছানা ডুকরে কেঁদে উঠে আমাদের ভয় ধরিয়ে দিত, যার তলায় কখনো কখনো শিরনী চড়াত গ্রামের মুসলমানেরা আর আমরা গিয়ে বাতাসার লোভে ভিড় করে দাঁড়াতুম, সেখানেই এসে তারা তাঁবু ফেলল।

পাজামা, কালো কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, কানে বীরবৌলি—পুরুষের দল, মেয়েদের পরনে মস্ত মস্ত রঙবেরঙের কুচি-দেওয়া ঘাগরা, গলায় পুঁতি আর পাথরের মালা, মাথায় রঙিন রুমাল। ছুরি-ছোরা, শেকড়-বাকড়, নানারকমের ওষুধ, আরো কী সব টুকিটাকি জিনিসপত্র বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়াত। অনেক রাত পর্যন্ত ঢোল-করতাল বাজিয়ে গানবাজনাও চলত তাদের।

একদিন কার সঙ্গে ছুরি-কাঁচির দরাদরি নিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল তাদের একজন, ফস করে একখানা ছোরা বের করে ফেলল—খুন করেই বসে আর কি! বাবা তক্ষুনি ইরানীদের ডাকিয়ে আনালেন, সেই লোকটাকে নাকে খত দেওয়ালেন, হুকুম করলেন, কাল ভোর হওয়ার আগেই ওদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শেষরাতেই চলে গেল বেদেরা।

কিন্তু পরদিন সকালে লালুকে জিন পরাতে গিয়েই এক বিপর্যয় কাণ্ড!

কথা নেই, বার্তা নেই—হঠাৎ চিঁ-হিঁ-হিঁ করে একটা বিকট চিৎকার ছাড়ল লালু—তার অমন বেয়াড়া বিদ্‌কুটে ডাক আমি কোনোদিন শুনিনি। তারপরেই তড়াক তড়াক করে লাফাতে আরম্ভ করল, লাথি ছুঁড়তে লাগল পাগলের মতো। 'আরে বাপ্‌রে',—বলে লাফিয়ে সরে গেল মিলটারী ফেরত রামযশ—আর একটু হলেই লাথি সোজা গিয়ে লাগত তার মাথায়।

তারিণী সেই পেয়ারা গাছটার তলায় বসে তুরপুন চালিয়ে কাঠ ছেঁদা করছিল। ঠাট্টা করে বলতে গেল ঃ কেমন—হল তো? আরো, আরো দলাই-মলাই করো ঘোড়াকে? এবার—

মুখের কথা মুখেই রইল তারিণীর। ঘোড়াটা এবার বোঁ করে তার দিকে ঘুরে গেল, উৎকট হাসির ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড মুখের সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে দিয়ে ইঁ-হিঁ-হিঁ করে এমন একটা ডাক ছাড়ল যে বুকের রক্ত চমকে গেল আমাদের।

—ওরে সব্বনাশ!

যন্ত্রপাতি ফেলে তিন লাফে উঠোন পেরিয়ে তারিণী এসে বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, এ ঘোড়া পাগল হয়ে গেছেন গো—একেবারে পাগল হয়ে গেছেন!

পাগল ছাড়া কী আর! রামযশ কাছে এগোতে পারল না, বাবাকে দেখলে যে ঘোড়ার চোখ পর্যন্ত খুশিতে ভরে ওঠে বলে মনে হত আমার—সে যেন কাউকেই আর চিনতে

পারছে না। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল, সেই রক্ত-জমানো বিকট চিৎকারে থেকে থেকে সারা পাড়া কাঁপিয়ে দিলে, দুই লাথিতে বাগানের বাঁখারির অর্ধেক বেড়া উড়িয়ে দিলে, তারপর হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। করতোয়ার পাশ দিয়ে, ঈশানীর কালীমন্দির ছাড়িয়ে যেন একটা লাল আগুনের ঝলক মিলিয়ে গেল—মনে হল, তার পায়ের নিচে এখন আর বাংলা দেশ নেই, অস্ট্রেলিয়ার সেই বিশাল তৃণপ্রান্তর দিয়ে কোন্ দূর-দূরান্তে সে ছুটে চলল।

বাড়িতে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেল। ঠাকুরমা হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, বাবা থমথমে মুখে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন তাঁর ইজিচেয়ারটায়। ঘোড়ার সন্ধানে লোক ছুটল, চৌকিদার ছুটল, কিন্তু লালুকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে—এমন আশাই করতে পারল না কেউ।

চোখ মুছতে মুছতে রামযশ সামনে এসে দাঁড়ালো। যেন সমস্ত অপরাধ তারই।

—হুজুর, আমার কিছু মালুম হচ্ছে না। কাল রাততক ঘোড়া একদম ঠিক ছিল—লেকিন—

প্রতিবেশী ওভারসিয়ারবাবু বললেন, এ নিশ্চয় ইরানীগুলোর কাণ্ড মশাই। আপনি ওদের তাড়ালেন গ্রাম থেকে, তাই শোধ নেবার জন্যে রাত্তিরে চুপিচুপি এসে ঘোড়ার খাবারে কিছু বিষ-টিষ মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বাবা বললেন, তাই সম্ভব।

ওভারসিয়ারবাবু আবার বললেন, ওই বেদেগুলোকে কনস্টেবল পাঠিয়ে ধরে আনান, আচ্ছা করে চাবকে দিন। দেখবেন—

বাবা বললেন, কী হবে?

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল।

যেটা বলবার আগে আর একটা কথা বলা দরকার। আমার বয়েস তখন তেরো। নতুন সাঁতার শিখে করতোয়ার জল তোলপাড় করি, গাছের ডালে ডালে পাকা ফল আর বুলবুলির বাচ্চা খুঁজে বেড়াই, মাঠ পেরিয়ে চণ্ডীর বিলে চলে যাই—সেখানে পেত্নী আর কেউটে সাপের ভয় আছে জেনেও শিঙাড়া তুলে আনি, আনি পদ্মচাকী। এ-সব দুরন্তপনায় বাবা পারতপক্ষে কখনো বাধা দিতেন না। খুব সম্ভব নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত তাঁর। ঠাকুরমার মুখে তাঁর অনেক বেপরোয়া কীর্তিকাহিনীই আমরা শুনেছিলুম।

শুধু একটা জায়গায় বাধা ছিল বাবার। তাঁর ওই বড়ো ঘোড়া দুটোয় কিছুতেই চাপতে দিতেন না আমাকে। রামযশ আমার হয়ে দু-একবার ওকালতি করতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এসেছিল।

বাবা বলতেন, ও ঘোড়ায় চড়বার মতো বয়েস হোক—তখন দেখা যাবে।

কিন্তু তেরো বছর কি বয়েস নয়? মন তখন গল্পের বই পড়ে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ আর গরিলা শিকার করে বেড়ায়, সাহারার মরুভূমিতে বেদুয়িনদের ছুটন্ত ঘোড়ায় মরুঝড় পেরিয়ে চলে যায়, ফেনাতোলা নায়েগ্রা প্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়, স্বেন হেডিনের সঙ্গে তিব্বতের গ্লেসিয়ার পাড়ি দেয়। অতএব বাবার ঘোড়া না পাই, ঘোড়ায় চড়া বন্ধ হত না। শীতের মাঠে যে-সব ছোট ছোট পাড়াগেঁয়ে নিরীহ আধমরা ঘোড়া ছোলা-শাক আর মটরশুঁটি খেয়ে বেড়াত, সুযোগ পেলেই তাদের ন্যাড়া পিঠে সোয়ার হতুম আমি।

কঞ্চির চাবুক চালিয়ে অনিচ্ছুক ঘোড়াগুলোকে যথাসম্ভব দৌড় করাতুম, আঁর ভাবতুম লালু কিম্বা চাঁদকপালীর পিঠে যদি কোনো দিন চাপতে পাই—তা হলে মরুভূমির বেদুয়িনদের মতো নীল নদীর ধারে ধারে—পিরামিডের ছায়ায় ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাই।

রামযশকে কতদিন বলতুম, আমাকে একদিন চুপি চুপি ঘোড়ায় চাপতে দেবে রামযশ?

রামযশ জিভ্ কাটত ঃ না ছোটবাবু—বড়বাবুর হুকুম আছে—আমি বেইমানি করবে না।

কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখতুম—লালু কিংবা চাঁদকপালীর পিঠে সোয়ার হয়ে আমি ছুটেছি। মরুভূমি, পাহাড়, বন—সব পার হয়ে একদিন ছাড়িয়ে চলে গেলুম পৃথিবীর সীমা, ঝাঁপিয়ে পড়লুম শূন্য আকাশে—নীল, নীল, অনন্ত নীল, পেরিয়ে ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে ছুটল, তারায় তারায় ক্ষুরের শব্দ বাজতে লাগল। এই গ্রাম নয়, স্কুল নয়, শুধু মাঠের ওপারে চণ্ডীর বিলটা নয়—যোগীন সরকারের 'বনে-জঙ্গলে' ছাড়িয়ে জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্রে'র অসীম জগতে। কী মুক্তি—কী মুক্তি।

লালু যেদিন তার রাঙা কেশরে আগুনের শিখা উড়িয়ে উল্‌কার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই দিন বিকেলে। তখন আমাদের খিড়কির দিকটায় কেউ ছিল না। তারিণী মিস্ত্রি তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে, রামযশ খুব সম্ভব লালুকে খুঁজতে বেরিয়েছে, বাবাকে কোথায় শালিসীর জন্যে ডেকে নিয়ে গেছে। আর সবাই বাড়ির ভেতরে। সেই সময় আমি খিড়কির বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

তখন ভরা করতোয়ার জলে নৌকোর পালে সোনালি রোদ—বকেরা ফিরছে, মাছরাঙা ফিরছে, কাকেরা ভাঙা গলায় ডাকাডাকি করছে। আমি নদীর দিকে চলেছিলুম বর্ষার জলে শুশুকের ডিগবাজী দেখতে—হঠাৎ পা থমকে গেল আমার।

ঠিক আস্তাবলের সামনে লালু দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, লালুই। কখন ফিরে এসেছে কেউ জানে না। একেবারে মাটির মূর্তির মতো স্থির। বিকেলের আলোয় লাল প্রকাণ্ড শরীরটা অপরূপ দেখাচ্ছে তার—মনে হল ওটা একটা আগুনের ঘোড়া।

কিসের আকর্ষণে জানি না—আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম তার দিকে। সকালে তার রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তি আমি দেখেছি, দেখেছি তার ক্ষুরে ক্ষুরে কিভাবে মাটি ঠিকরে উঠছিল—শুনেছি কী হিংস্র গর্জন করছিল সে। তবু আমার ভয় করল না। আমি তার কাছে গেলুম, তার লম্বা খরখরে গলায় হাত বোলালুম অনেক অনেকক্ষণ ধরে, তার মসৃণ পেটের স্পর্শ অনুভব করলুম, তার রোমকূপ থেকে ঘামের একটা আশ্চর্য মাদক গন্ধ ধীরে ধীরে আমাকে অভিভূত করতে লাগল।

জিন পরাই ছিল, সেই অবস্থাতেই সকালে ছুটে পালিয়েছিল সে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা অন্ধ উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসল, রেকাবটা আমার পক্ষে বেশ উঁচু হলেও খানিকটা চেষ্টা করতেই দেখলুম—কখন আমি সোজা লালুর পিঠে উঠে বসেছি।

তারপরেই লালুর পেটে পায়ের একটা ঠোকর দিয়ে বললুম, এই—চল্—চল্—

আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজ—যেন একটা পাগল আমার কানের কাছে তীক্ষ্ণ বিকট গলায় হি-হি করে হেসে উঠল। আর লালু ছুটল। লাল আগুনের হলকা ছুটল—মাটি দিয়ে নয়, আকাশ বেয়ে। যেন টান-করা ধনুকের ছিলে থেকে তীর উড়ল!

সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছি আমি কী ভুল করেছি, কী মারাত্মক ভয়ঙ্কর ভুল! এ

তো শীতের মাঠে-চরা নিরীহ বেঁটে বেঁটে টাট্টু ঘোড়া নয়—এ সেই শক্তির তরঙ্গ, যা সাহারার মরুঝড় পাড়ি দিয়ে ছুটে যায়, যার পায়ের নীচে অসীমেরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি থেকে শুকনো ঘাসের শিস্ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘূর্ণি হয়ে চলে। বাতাস এসে আমার দুই কানে ধাক্কা দিতে লাগল, মনে হতে লাগল যে-কোনো সময় একটুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো উড়ে যাব আমি। আর তার অর্থ যে কী তা-ও বুঝতে বাকী নেই আমার।

পেছন থেকে যেন অনেকগুলো গলার চিৎকার কানে এল ঃ খোকন খোকন—লালু—লালু—

অর্থাৎ লোকে দেখতে পেয়েছে—রামযশের স্বরও চিনতে পারলুম আমি। কিন্তু বর্ষার করতোয়ার জলে যেমন ভুস করে একটা শুশুক ভেসে উঠেই আবার অতলে তলিয়ে যায়, তেমনি করে কয়েক সেকেণ্ডের বুদ্বুদ তুলেই শব্দটাও নিশ্চিহ্ন হল—হারিয়ে গেল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ—ভেসে গেল হু-হু করা বাতাসের স্রোতে।

আমি তখন শুয়ে পড়েছি ঘোড়ার ওপর। লাগাম ছেড়ে দিয়ে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরেছি তার, মুখ গুঁজেছি সেই নেশাধরানো উত্তেজক ঘামের গন্ধের ভেতর। চেতনা আর অচেতনার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে সমস্ত মন মোটরগাড়ির স্পীডোমিটারের মতো কাঁপছে, দুলছে, শিউরে উঠছে। চেতনা বলছে, আমি পড়ব না, কিছুতেই পড়ব না; আর সেই খসখসে কেশরের ভেতর—সেই উগ্র গন্ধের নেশায় সব যেন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে—আমার মরা বাঁচার সব প্রশ্নই নিরর্থক সেখানে।

কোথায়—কতদূর চলেছি আমি? জানি না—জানবার উপায় নেই। চোখের দৃষ্টি আমার অন্ধ। একটা কালো আকাশ বেয়ে তারায় তারায় ছুটে চলেছি এখন, সময় নেই, সীমা নেই, বিরতি নেই। তবু ভয়—মৃত্যুর ভয় থেকে থেকে আমার ঝোড়ো হৃৎপিণ্ডে এক একটা বরফের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, এমন দুরন্ত হাওয়ার ভেতর দিয়েও সারা গা বেয়ে ঘামের স্রোত নামছে আমার।

লালু ছুটছে। ছুটছে তারায় তারায়। একবার চোখ চাইতে চেষ্টা করলুম—কয়েকটা ছায়ামূর্তির মতো কী পাক খেয়ে গেল পাশ দিয়ে। কারা যেন আবার চিৎকার করে উঠল। তারপরে সেই একটানা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ, সেই চেতন-অচেতনের কেন্দ্র-বিন্দুতে একটা স্পীডোমিটারের কাঁটার মতো কাঁপতে থাকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে রুখবার জন্যে দু'হাতে গলা জড়িয়ে কেশরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা, আর অনুভব করা ঃ বাতাস প্রতি মুহূর্তে দস্যুর মতো ঘোড়ার পিঠ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

তারপর হঠাৎ কিসের ঠোক্কর খেয়ে ঘোড়াটা আচম্‌কা শূন্যে লাফিয়ে উঠল, তার গলা থেকে দুর্বল হয়ে আসা হাতের বাঁধন ছিটকে খুলে গেল আমার, আর—

যখন চোখ চাইলুম, তখন মনে হল গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। আমি যেন একটা কুয়োর ভেতরে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। কী অসম্ভব, কী অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা আমার বাঁ পায়ে—আমার বুকের পাঁজরাতে। এমন যন্ত্রণা—জাঁতার ভেতরে শরীরটাকে ফেলে তিলে তিলে পিষে দেবার মতো এমন দুঃসহ শারীরিক কষ্ট যে বিশ্বসংসারে কোথাও থাকতে পারে, আমার এই তেরো বছর বয়েসের ভেতরে আমি তা কোনোদিন কল্পনাও করিনি!

আমি আর্তনাদ করতে গেলুম, গলা থেকে চাপা গোঙানির মতো কী একটা বিসদৃশ ধ্বনি বেরিয়ে এল। পেটের তলায় একটা হাত চাপা পড়েছে, সেটাকে টেনে বের করতে

চাইলুম, পারলুম না। কিন্তু এই শারীরিক চেষ্টা আর অনুভূতির ফলে আমার জমাট হয়ে যাওয়া স্তব্ধ মস্তিষ্কটা এতক্ষণে একটু একটু করে সক্রিয় হয়ে উঠল। তখন দেখলুম—অন্ধকার নয়, মেটে মেটে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সামনে অসংখ্য মাটির ঢিবি, ইতস্তত কয়েকটা ভাঙা বাঁশ। আর আমার বাঁ দিকে—হাত-তিনেক দূরে একটা নিশ্চল বিরাট ছায়া। এই বিবর্ণ জ্যোৎস্নাতেও তার উজ্জ্বল লাল রং—তার সিংহের মতো কেশর, তার পিঠের ওপর চকচকে বাদামী চামড়ার জিন। লালু!

লালু দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর রাঙা আগুন নয়—যেন পোড়া মাটির তৈরী একটা বিরাট ঘোড়া। নড়ছে না—ডাকছে না—ল্যাজটা পর্যন্ত দুলছে না এতটুকুও। একটা অটল, অচল মূর্তি।

সারা শরীরে আবার সেই যন্ত্রণা—সেই জাঁতার মধ্যে পিষে যাওয়ার দুঃসহতম উপলব্ধি! আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে গিয়েও থমকে গেলুম। সামনে ও কী জ্বলছে? ও কিসের চোখ?

এক নয়, দুই নয়, আট-দশ, হয়তো আরো বেশি। আধ ইঞ্চি এক ইঞ্চির ব্যবধানে জোড়ায় জোড়ায় সবুজ আগুন—কী নিষ্ঠুরভাবেই জ্বলজ্বল করছে। আমি বুঝতে পারলুম—আমিই ওই চোখগুলোর লক্ষ্য—দৃষ্টির ভেতর দিয়ে যেন কতগুলো লাল জিভ আর ধারালো দাঁতের ছোঁয়া আমার সারা শরীরকে স্পর্শ করতে লাগল!

সেই ঘোড়া ছোটবার সময় একটা ভয় আমাকে অচেতনার সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিল, এখন আর একটা ভয় আমার সর্বাঙ্গের যন্ত্রণার ভেতরে আরো দুঃসহ আতঙ্কের সঞ্চার করল। আমি বুঝতে পারলুম, ওরা শেয়াল। আমার মনে পড়ল বাবার মুখে শোনা সেই লোকটার কথা—হাট থেকে ফিরতে ফিরতে যার কলেরা হয়েছিল, রাতের বেলা পথের ধারে যে একটা বটতলায় পড়ে ছিল, আর জ্যান্ত অবস্থাতেই শেয়ালেরা যাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল!

ওরা আমাকেও খেতে আসছে। জোড়ায় জোড়ায় সবুজ চোখের ভেতর আমি কতগুলো ধারালো দাঁতকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

পলকহীন দৃষ্টিতে আমি দেখলুম—এক জোড়া সবুজ চোখ একটু একটু করে এগোচ্ছে আমার দিকে। চিৎকার করতে চাইলুম, স্বর ফুটল না। শুধু আমার স্থির চোখের তারার ওপর সেই হিংস্র সবুজ আলো দুটো স্থির হয়ে রইল—ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিকে গ্রাস করল, সেই সবুজের ভেতরে আমার চেতনা ডুবে চলল, আমার সমস্ত জগৎ সেই নিষ্ঠুরতম সবুজের ভেতরে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে লাগল!

তখন—সেই সময়, আবার সেই শব্দ। সেই পাগলের হাসির মতো একটা তীক্ষ্ণ ইঁ-হিঁ-হিঁ!

পোড়া মাটির ঘোড়াটা নড়ে উঠল। তিন লাফে এগিয়ে বিদ্যুৎবেগে পা ছুঁড়ল পেছনে। সবুজ চোখের সম্মোহন কেটে গেল আমার—দেখলুম অনেকখানি নিরাপদ দূরত্বে তারা সরে গেছে, লালুর পায়ের সীমানার কাছেও দাঁড়াবার সাহস নেই তাদের!

তারপরে সমস্ত রাত।

সামনের আকাশ দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভাসল, তারার পর তারা ডুবল, আমার কোন্‌পাশে কখন যেন মেটে আলো ছড়ানো চাঁদটা উধাও হল কোন্‌খানে। যন্ত্রণায় কখনো

কখনো আমি চিৎকার করতে লাগলুম, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে ভিজে মাটি কামড়ে নিলুম কতবার, থেকে থেকে মৃত্যুর মতো অবসাদ এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমার সব বোধ লুপ্ত করে দিতে লাগল। আর থেকে থেকে সেই ইঁ-হি-হি করে রক্তজমানো হাসির শব্দ, একবার লালু সামনে ছুটে যাচ্ছে, একবার পেছনে, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। সবুজ চোখগুলো যেন আমার চারদিকে ঘিরে ঘিরে লুকোচুরি খেলছে, আর লালু আমাকে বাঁচাচ্ছে—আমাকে বাঁচাচ্ছে সেই রাশি রাশি ধারালো দাঁতের অন্ধ আদিম হিংসা থেকে।

হঠাৎ লালুর ক্ষুরের ধাক্কায় কী একটা গড়াতে গড়াতে চলে এল আমার দিকে। ঠক্ করে লাগল আমার কপালে। আমি দেখতে পেলুম—আমার চোখে সেই সব সবুজ চোখের আলো প্রতিফলিত হতে হতে নিশাচরের মতো আমার দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল—আমি দেখলুম, সেটা সাদা একটা নরমুণ্ড। ভূতুড়ে গল্পের বইয়ের ছবিতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তাই!

আমার কপাল সেই নরমুণ্ডের ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শ অনুভব করে—শেষবার চিৎকার তুলে, আমি জ্ঞান হারালুম।

আর একটা বিকট শব্দে দ্বিতীয়বার চোখ চাইলুম আমি। সকালের রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। একটা কবরখানার মধ্যে পড়ে আছি আমি। অনেকটা দূরে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, রামযশকে দেখছি, দেখতে পাচ্ছি আরো আরো অনেক লোকজনকে। বাবার হাতের বন্দুকটা থেকে ধোঁয়া উঠছে তখনো, আর আমার পাশেই নিজের টকটকে লাল রঙটাকে শরীরের রক্তে আরো রাঙা করে দিয়ে—মাটিতে কাত হয়ে পড়ে পা ছুঁড়ছে লালু, প্রকাণ্ড মসৃণ পেটটা শেষ নিঃশ্বাসের টানে টানে ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে!

তিন মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। বুকের পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙে গিয়েছিল, খুলে গিয়েছিল বাঁ হাঁটুর জোড়টা। তবু তার মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বলেছিলুম, কেন মারলে—লালুকে কেন মারলে তুমি?

জবাব দেওয়ার আগে বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। ধরা গলায় বলেছিলেন, আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল যে! আমরা ভেবেছিলুম পাগল হয়ে বুঝি ও তোকে মেরেই ফেলেছে!

বাইরে বর্ষণমুখরিত রাতের কলকাতা। ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার, বাড়িগুলো যেন রাশি রাশি কবর। কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে রাস্তার সারবাঁধা ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলো নিশাচরদের সবুজ চোখের মতো জ্বলছে। আমার সামনের টেবিলে সেই বিলাতী পত্রিকাটা—একটা লাল ঘোড়া এক ঝলক আগুনের মতো ছুটে যেতে চাইছে আকাশের দিকে।

লালু কেন অমন করেছিল সেদিন? সত্যিই কি ইরানীরা বিষ খাইয়েছিল তাকে? অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি—না সাহারার ডাক শুনেছিল সে? কোন্ যুদ্ধের দামামা তালে তালে সেদিন বেজে উঠেছিল তারি বুকের রক্তে?

কিন্তু আজ যেন দুটি সত্য একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি তার ভেতর। মৃত্যু আর মুক্তি। মুক্তি আর মৃত্যু।

কিংবা দুই-ই এক।

শেষ চুড়া

তখন খোলা জানলা দিয়ে ভোরের হাওয়া। কালো পাহাড়ের মাথায় দপ দপ করছে শুকতারা। পাখিরা যখন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে, তখন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন ভূপেন সেন।

ভোরের বাতাসে অল্প অল্প শীত। ঘুমের ঘোরে পা দুটোকে বুকের কাছে গুটিয়ে আনতে আনতে ভূপেন সেন দেখছিলেন, তাঁর মাথার ওপরে—দুধারে—ঠাণ্ডা কালো দেওয়াল। অনেক দিনের শ্যাওলা জমে আছে তার গায়ে—মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে তা থেকে। দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট চৌকো ঘুলঘুলি—তাদের ভেতর থেকে কতগুলো সাদা সাদা আলোর হাত এসে ফাট-ধরা আর পেছল পাথরের সিঁড়িগুলোকে যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

ওই ঠাণ্ডা শ্যাওলা-ধরা দেওয়াল, এক-একটা আলো, পায়ের তলায় ফাটল-ধরা পাথুরে সিঁড়ি—এর মধ্য দিয়ে কোথায় চলেছেন ভূপেন সেন? কলকাতার মনুমেণ্ট? কুতুবমিনার? দেরাদুনের সেই টপকেশ্বর? নাকি ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গে সেই যে হাজার দেড়েক সিঁড়ি পেরিয়ে সিংহাচলমে উঠেছিলেন—এ সেই পথ? কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থাতেই নিজের সঙ্গে তর্ক করলেন ভূপেন সেন। সিংহাচলমে পাথরের দেওয়াল থাকবে কেন? কুতুব কিংবা মনুমেণ্টে শ্যাওলাধরা দেওয়াল নেই—তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়ায় না। টপকেশ্বরে এত অসংখ্য সিঁড়ি নেই।

স্বপ্নের ভেতরে যুক্তির বুদ্বুদ ফুটেই মিলিয়ে গেল। ভূপেন সেন দেখলেন, তাঁর বয়েস তখন সতেরো বছরের বেশি নয়, মনে হল, হাতে যেন একটা হকি স্টিকও রয়েছে তাঁর—তারপরেই দেখলেন সেটা ক্রিকেটের ব্যাট। সামনের দেওয়ালে হঠাৎ একটা স্কোর বোর্ড ভেসে উঠল—তাঁর নামের পাশে নিরানব্বুই উঠেছে, আর এক রান হলেই সেঞ্চুরী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্কোর বোর্ডটা ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি হয়ে গেল, তার আলোয় দেখলেন ভাঙা ভাঙা সিঁড়িগুলো সেখান থেকে একটা বাঁক নিয়ে যেন সোজা রওনা হয়ে গেছে আকাশের দিকে।

তার মানে আরো ওপরে উঠতে হবে। অনেক—অনেক ওপরে।

তখন মনে পড়ল একটা পাখির সন্ধানে চলেছেন তিনি। এই সিঁড়িগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হবে, সেখানেই বসে আছে পাখিটা। ধবধবে সাদা তার পালক, বুকের কাছে খানিকটা সোনালি, তার পা দুটো চুনীর মতো লাল, তার চোখ দুটো পান্নার মতো সবুজ। সেই পাখিটাকে ধরবার জন্যেই তিনি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে চলেছেন।

পাখিটার খবর কে দিয়েছিল মনে পড়ছে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি ওঠা দরকার। আরো আরো তাড়াতাড়ি।

সেই সময় হঠাৎ পা পিছলে গেল সিঁড়িতে। আর নিদারুণ চমক লেগে ভূপেন সেনের ঘুম ভাঙল।

ততক্ষণে কালো পাহাড়ের মাথায় শুকতারাটা সাদা হতে হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন। পূবে সূর্য ওঠবার আশায় পশ্চিমের ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে পদ্ম-পাপড়ির রং। হাওয়ায় তখন শিশির-ঘাস-মাটির গন্ধ, ফুলের গন্ধ, বাগানের ওধারে সাজানো পালা থেকে নতুন খড়ের

গন্ধ আর পাখিদের ডানার গন্ধ।

পায়ের কাছ থেকে পাতলা চাদরটা টেনে নিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকলেন, কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন চুপ করে, মাথার ভেতরে স্বপ্নটা ঝিমঝিম করছে তখনো। কোনো মানেই নেই এ-সবের। স্বপ্নের জগৎটা অদ্ভুত।

তারপর ভূপেন সেন উঠলেন। ঘরে আলো এসেছে তখন। দেওয়ালের একমাত্র ছবি—হালকা রঙে আঁকা ল্যাণ্ড্স্কেপটা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাথর আর নুড়ির ভেতর দিয়ে ফেনিয়ে চলেছে নদী, দুটো সাদা ভেড়া জল খেতে এসেছে, পেছনে পাহাড়ের চূড়া মেঘ ছুঁয়েছে। সব আর্টিস্টই পাহাড় আঁকতে ভালোবাসে। হয়তো একটা অচেতন কামনা আছে কোথাও, হয়তো অমনি করে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাধ যায়।

মেজের দড়ির কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে পায়ের রবারের চটি টেনে এসে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। বাগানের ডালিয়াগুলো শুকিয়ে এসেছে—এখন বুগেনভিলিয়ায় দোলের রং। কিছু গোলাপ—ক'টা রজনীগন্ধা। পাশের খড়ের পালায় সোনার ঝিলিমিলি। কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে চোখ এগিয়ে গেল সামনে। পাহাড়ের সারি সেখানে।

গয়া জেলায় পাহাড় থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু স্বপ্নটার সঙ্গে কোথাও একটা যোগ আছে মনে হল। ভূপেন সেন ভুরু কোঁচকালেন। শ্যাওলাধরা কালো দেওয়াল যেন এখনো দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর।

জানলা থেকে সরে আসতে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের ছায়া পড়ল। পঞ্চাশ পেরিয়েছেন কিন্তু এখনো দীর্ঘ ঋজু শরীর। চোখের কোণে কি ক্লান্তির রেখা আছে কিছু? না—নেই। শুধু কপালটা চওড়া হয়েছে আরো, মাথার চুলে কেউ যেন একমুঠো ছাইয়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, তার প্রমাণ। তবু এখনো বাইশ-চব্বিশ বছরের যে কোনো স্বাস্থ্যবান বাঙালীর ছেলেকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন তিনি। আসুক পাঞ্জা লড়তে। কব্জীর জোরেই বোঝা যাবে—যৌবনের দরবারে এখনো তিনি বাতিল হয়ে যাননি।

কিন্তু কেন এ-সব কথা মনে হচ্ছে তাঁর? আবার ভুরু কোঁচকালেন ভূপেন সেন। তিনি যে বুড়ো হননি, এখনো যে তাঁর শরীর লোহার মতো শক্ত—এ-সব কথা এত স্বতঃসিদ্ধ যে ভাববারও দরকার পড়েনি এতদিন। মনে করিয়ে দিল ডাক্তার।

মাস দুই আগে। মাঝরাতে এক গ্লাস জল খেতে উঠেছিলেন। গ্লাসটা মুখের কাছে তুলতে যাচ্ছেন ঠিক তখুনি বোধ হল বুকের তলা থেকে কিসের একটা প্রচণ্ড চাপ ক্রমশ ঠেলে উঠছে হৃৎপিণ্ডের দিকে। প্রাণপণে সেটাকে রুখতে চাইলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন সেই অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে—তারপর সব অন্ধকার। শুধু হাত থেকে কাচের গ্লাসটা মেজেতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাওয়ার কর্কশ শব্দ করে একটা তীক্ষ্ণ হাসির মতো কানের কাছে বেজে উঠল একবার।

চোখ মেলে দেখলেন, সামনে ডাক্তার। অনেকদিনের পরিচয়, কিন্তু কোনোদিন ওষুধ আনতে হয়নি। যৌবনে ডাক্তারেরও খেলাধূলোর বাতিক ছিল, অবসর পেলে তাঁর ডিসপেন্সারীতে বসে ক্রিকেট নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করেছেন বহুবার। ডাক্তার তর্ক করতেন, কিন্তু কোনোদিন জিততে পারেননি।

কিছুক্ষণ চুপ করে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ভূপেন সেন। মনে হল যেন

একটুখানি জয়ের হাসি ফুটে উঠেছে ডাক্তারের ঠোঁটের কোণায়, অল্প অল্প জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

—ব্যাপার কী ডাক্তার?

—বিশেষ কিছু নয় দাদা।—ডাক্তারের জ্বলজ্বলে চোখে যেন কিসের একটা ঢেউ দুলল ঃ এতদিন পরে আপনাকে আমার পেশেন্ট হতে হল।

—পেশেন্ট?—ইলেকট্রিক শকের মতো মস্তিষ্কে ঘা মারল কথাটা। ভূপেন সেন উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

—না দাদা, এখন উঠে-বসা চলবে না—ডাক্তারই জোর করে আবার শুইয়ে দিলেন তাঁকে ঃ এখন অন্তত পনেরো দিন কম্‌প্লিট রেস্ট্।

—রেস্ট্? কাল থেকে ক্লাবের ছেলেদের ক্রিকেট তালিম দেবার কথা।

—তালিম দেবার অন্য লোক খুঁজে নিতে হবে তাদের—ডাক্তার হাসলেন।

হাসিটার ভেতর এমন একটা আত্মপ্রসাদ আছে যে, ভূপেন সেনের শরীর যেন জ্বালা করতে লাগল। যেন তাঁকে নিয়ে খেলাচ্ছে ডাক্তার, কী একটা মজা পাচ্ছে মনে মনে।

—খুলে বলো ডাক্তার—আমার কী হয়েছে। আই ডোন্ট্ বিলিভ দ্যাট্ আই অ্যাম্ এ সিক্ ম্যান।

ডাক্তারের হাসি থেমে গেল, ছায়া পড়ল চোখের তারায়।

—আপনার হার্টটা একটু জখম হয়েছে দাদা, একটা অ্যাটাক্ হয়ে গেল।

সাবালক হয়ে ওঠবার পর এই প্রথম ভয় পেলেন ভূপেন সেন—এই পঞ্চাশ বছর বয়েসে। চোখের সামনে ডাক্তারের মুখ যেন একটা দড়িবাঁধা বেলুনের মতো দুলতে লাগল।

—হার্ট অ্যাটাক্! আমার!

—ভাববেন না দাদা। সাবধানে থাকুন, এক্‌সাইটেড্ হবেন না, বেশি পরিশ্রম করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাত্র দু মাস আগেও নিজের শরীর সম্বন্ধে কোনো কথা ভাববার দরকার ছিল না। কখনো কখনো হয়তো ক্লান্তি বোধ করেছেন, মাথা ঝিম ঝিম করেছে এক-আধবার, কিন্তু ব্লাড্-প্রেসার পরীক্ষা করাবার প্রশ্ন মনেও আসেনি। ব্যাচেলার মানুষ, ছোট ভাইয়ের সংসারে জ্যাঠামশাই হয়ে নির্ভাবনায় চমৎকার দিন কেটেছে, শ-তিনেক টাকার চাকরিটা দরকারের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়েছে।

এই দু মাসের মধ্যে বদলে গেছে সব।

বসন্ত এসেছে। কলকাতায় এখন হকির পালা, ক্রিকেটের মরসুম শেষ হয়নি। তবু এক মাসের ছুটি নিয়ে গয়া জেলার এই আধা-গ্রাম আধা-শহরে বিশ্রাম করতে এসেছেন ভূপেন সেন। বাড়িটা ডাক্তারেরই। ছোট সুন্দর বাংলো—বাগান আছে, মালী আছে, মালীর গোটাতিনেক গোরুও আছে। সেবা যত্নের ত্রুটি নেই, ঘরে বসেই খাঁটি দুধ মেলে। ট্রাঙ্ক-ভর্তি করে ইংরেজি বাংলা বই এনেছেন, রেল-স্টেশন কিংবা পোস্ট অফিসে গেলে গল্প করবার লোক জোটে। পাশের বাড়িতেই একজন স্থায়ী প্রতিবেশী আছেন—তাঁর পরিবারের সঙ্গেও আলাপ জমে গেছে। সে ভদ্রলোকও ডাক্তার—ডাক্তার ঘোষ। আর বিদেশে ডাক্তার প্রতিবেশী থাকার মতো এমন সুবিধে আর কী আছে।

কিন্তু অসুখের কথা ডাক্তার ঘোষকে বলেন নি ভূপেন সেন। সেই প্রথম অ্যাটাকের পর দিনকয়েক একটু ক্লান্ত মনে হয়েছিল নিজেকে, তারপর আজ দেড় মাসের মধ্যে আর কোনো উপসর্গ টের পান নি। ফ্রেশ্ লাইক এ ইয়াং হর্স। কলকাতা থেকে এসেছিলেন পরাভূতের মতো কিন্তু এখানে পনেরো দিন অফুরন্ত খোলা বাতাসে ঘুরে, ভোরবেলা বাগানের ফুলের গন্ধ, মাটির গন্ধ, নতুন খড়ের পালার গন্ধ আর পাখিদের ডানার গন্ধ হৃৎপিণ্ডে ভরে নিয়ে এখন যেন আরো সজীব আর সতেজ বোধ হয় নিজেকে। ডাক্তার ঘোষের যে তরুণী মেয়েটি গত বছর এম.এ. পাস করে এখন এলাহাবাদে কী রিসার্চ করছে—সে এখানে এসেছে দিন সাতেক আগে। মেয়েটি কলেজে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ছিল—স্পোর্টসম্যান ভূপেন সেনের সে মুগ্ধ শ্রোত্রী।

সব ভালো চলছিল, কেবল পরশু থেকে একটু বিরক্তির কারণ ঘটেছে। কোত্থেকে স্কুটারে করে এসে হাজির হয়েছে এক ছোকরা, সে নাকি পাটনায় প্রফেসারী করে। ডাক্তার ঘোষের বন্ধু-পুত্র। ছোকরার চেহারা মন্দ নয়, স্বাস্থ্যও ভালো, চাল-চলনে অসম্ভব স্মার্ট। তাতে ভূপেন সেনের আপত্তি ছিল না—কিন্তু একটা মস্ত দোষ—অসম্ভব বক বক করে। সব জিনিসেই তার কথা বলা চাই—একেবারে সবজান্তা হয়ে বসে আছে। প্রফেসার জাতটাই এই রকম।

কাল সন্ধ্যেতেই ও-বাড়িতে খেলার আলোচনা করছিলেন ভূপেন সেন। একটু নিজের কথাও এসে পড়েছিল—কী করে একটা ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচে এক ওভারে তিনটে উইকেট উড়িয়ে দিয়েছিলেন কেবল বলতে শুরু করেছিলেন সেটা। এমন সময় ঘরে ঢুকল প্রফেসার—অর্থাৎ অরুণ দত্ত। ঘর্ ঘর্ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে একেবারে বসে পড়ল ভূপেন সেনের গা ঘেঁষেই। এই মাত্র বাইরে থেকে সিগারেট টেনে এসেছে, মুখের তামাক পোড়া বিশ্রী গন্ধে ননস্মোকার ভূপেন সেনের শরীর গুলিয়ে উঠল।

এই ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সেই এত সিগারেট খায়। এর পরে নিকোটিনের ব্রাউন লেয়ার জমবে শ্বাসনালীতে, ক্রনিক কাশি দেখা দেবে, তারপরে হয়তো ফুটে বেরুবে ক্যানসার। ভূপেন সেন একবার বিরূপ চোখে চেয়ে দেখেছিলেন অরুণের হাতের দিকে। তর্জনী আর মধ্যমার আধা-আধি পর্যন্ত গাঢ় কালচে বাদামী রঙ—যেন খানিকটা টিংচার আয়োডিন মেখে এসেছে।

আধ মিনিটের জন্যে থেমেছিলেন ভূপেন সেন, সেই ফাঁকে কথা জুড়ে দিল অরুণ দত্ত।

কাকা, এতবার করে বলছি একটা গান-লাইসেন্স নিন, আপনি কানেই তোলেন না।

ডাক্তার ঘোষ বলেছিলেন, আমার তো রিভলবার আছেই, বন্দুক দিয়ে কী হবে।

—রিভলভার তো পোশাকী জিনিস, রিনিউয়ালের সময় বছরে একবার বার করতে হয় কেবল। ও একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। অথচ হাঁটতে হাঁটতে দেখে এলুম, মাইল দেড়েক দূরে একটা জলায় অজস্র বড়ো সাইজের স্নাইপ পড়েছে—লালশরও রয়েছে এক ঝাঁক। দেখে হাত নিশ্‌পিশ্ করতে লাগল। বন্দুক থাকলে এক ঝুড়ি শিকার করে আনা যেত। নুড়ি ছুঁড়ে তো পাখি শিকার করা যায় না।

আশ্চর্য—ঘরশুদ্ধ সকলের চোখ গিয়ে পড়েছে এখন অরুণ দত্তের ওপর। যে

ব্যাডমিন্টন-চ্যাম্পিয়ন এণাক্ষী এতক্ষণ কালো চোখের তাপ ছড়িয়ে দিয়ে ভূপেন সেনের হ্যাট্‌ট্রিকের গল্প শুনছিল, হঠাৎ তার সমস্ত অনুরাগ গিয়ে পড়েছিল পাখি শিকারের ওপর।

—সত্যি বাবা, নাও না একটা বন্দুকের লাইসেন্স। অরুণদা খুব ভালো শিকারী—আমিও ওঁর কাছ থেকে বন্দুক ছোঁড়া শিখে নেব।

হঠাৎ একটা বিশ্রী বিরক্তিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল ভূপেন সেনের। পাখি শিকার। চোরের মত গুঁড়ি মেরে গিয়ে ছর্‌রা ছুঁড়ে সব চাইতে দুর্বল কতকগুলো অসহায় প্রাণীকে খুন করা। বাহাদুরি বটে!

বিস্বাদ গলায় বলে ফেলেছিলেন, প্রফেসার দত্ত বুঝি কেবল পাখিই শিকার করেন?

অরুণ দত্ত একবার তাকিয়ে দেখেছিল তাঁর দিকে। একটা দুর্বিনীত কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল ঠোঁটের কোণায়। কিন্তু আরো অসহ্য লেগেছিল যখন তার হয়ে জবাব দিয়েছিল এণাক্ষী।

—না জ্যাঠামশাই, অরুণদার বড়ো গেমও আছে। বাঘ-হরিণ এই সব।

বাঘ! মুখের ওপর ছোট হাতের একটা আলগা চড় পড়েছিল যেন। আরো কানে লেগেছিল সম্বোধনটা—জ্যাঠামশাই। এতদিন মিস্টার সেন বলেই ডেকে এসেছে, হঠাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে গুরুজনের মর্যাদায় তুলে দিয়েছে তাঁকে। ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে জ্যাঠামশাই হওয়াতে কোনোদিন তাঁর আপত্তি ছিল না, কিন্তু এণাক্ষীর ডাক শুনে—অত্যন্ত অকারণেই—ভূপেন সেনের মনে হয়েছিল—মেয়েটা যেন হঠাৎ তাঁকে ঠাট্টা করে উঠল।

কপালে খানিকটা রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। নিচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে একবার চেপে ধরেছিলেন ভূপেন সেন। তারপর যথাসম্ভব শান্ত গলায় জিগ্যেস করেছিলেন, বাঘও মেরেছেন বুঝি প্রফেসার দত্ত?

যেন সিগারেট খাওয়ার মতোই অত্যন্ত সহজে ঘটেছে ব্যাপারটা, এমনি ভাবে অরুণ দত্ত বলেছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—গোটা-তিনেক।—আর এণাক্ষীর দিকে চোখ রেখে বলতে শুরু করেছিল, জানেন কাকা—থার্ড বাঘটা মারবার সময় সে এক কাণ্ড। আমার যে বন্ধুটি স্পটিং করছিল—এর আগে সে কখনো বাঘের সামনে পড়েনি। হঠাৎ স্পটের আলোয় মাত্র পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে আগুনের মতো চোখ দুটো দপ করে উঠতেই সে নার্ভাস। স্পট সরে গেল—তারও দাঁতকপাটি লাগে আর কি! আমার হাতে তখন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময়। যা থাকে কপালে—দিলুম ট্রিগার টেনে। লাক ফেভার্ড—এক গুলিতেই পড়ল। কিন্তু বন্ধুটিকে ইন্‌ হিজ্‌ সেন্স ফিরিয়ে আনতে আমাকে এক ফ্লাস্ক গরম চা তার মাথায় ঢেলে দিতে হয়েছিল।

—এক ফ্লাস্ক গরম চা!—হাসির রোল উঠেছিল ঘরে।

—কী করি বলুন। ওর অবস্থা দেখে আমিও নার্ভাস হয়ে গেছি তখন। তাড়াতাড়িতে ওয়াটার-বটলের বদলে—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার হাসির ঝড় ভেঙে পড়েছিল ঘরে।

হাসেন নি ভূপেন সেন, নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে চুপ করে বসে ছিলেন। এম.এ. পাস, রিসার্চ-করা মেয়ে—ব্যাডমিণ্টন-চ্যাম্পিয়ন এণাক্ষী যে এত তরল—এমন তুচ্ছ

জিনিস নিয়ে সে যে এমনভাবে হাসিতে গড়িয়ে পড়তে পারে, এ-কথা এতদিন তিনি কল্পনাও করেন নি!

হাসি থামলে ভূপেন সেন বলেছিলেন, স্পট ফেলে জানোয়ারকে ডেজ্ করে শিকার! এ তো মার্ডার!

তাঁর গলার স্বরে কী যে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুর কেটে গিয়েছিল ঘরটার। আর অরুণ দত্তের চোখ চকচক করে উঠেছিল একবার।

—শিকার মাত্রেই মার্ডার। সে স্পট্ ফেলে হোক আর মাচানে বসেই হোক। বাঘের বন্দুক নেই—তাকে গুলি করাও সেদিক থেকে মার্ডার। আপনার মতে বোধহয় খালি হাতে বাঘের সঙ্গে ফ্রি-স্টাইল কুস্তি লড়ে তাকে ঘায়েল করাই শিকার?

আবার হাসির ঢেউ উঠল।

আজ দশ বছরের ভেতরে কড়া মেজাজের লোক, জাঁদরেল স্পোর্টসম্যান ভূপেন সেনকে নিয়ে হাসি তৈরী করবার মতো সাহস কারো হয়নি। নিজের চেয়ারে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে থেকেছিলেন তিনি। ঠিক তাঁর পাশেই টেবিলে হাত রেখেছে অরুণ দত্ত—তর্জনী আর মধ্যমায় গাঢ় কাল্চে নিকোটিনের রঙ। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, শক্ত মুঠোয় প্রফেসারের হাতখানা চেপে ধরেন একবার, মড় মড় করে আঙুলগুলোকে গুঁড়িয়ে দেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জা হল। একটা অর্বাচীনের কথায় রাগ করে ধৈর্য হারাবেন এমন খেলো মানুষ ভূপেন সেন নন।

ততক্ষণে চা আর গরম কাটলেট এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু ভূপেন সেন উঠে পড়েছিলেন। যে-কথা কোনোমতেই বলতে চান না, সেইটেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল ঃ আমি খাব না, শরীর ভালো নেই।

ডাক্তার ঘোষ কান খাড়া করেছিলেন ঃ কী হল, পেটের গোলমাল নাকি?

কিন্তু ভূপেন সেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন। বুকটাকে চওড়া করেছেন যথাসম্ভব—মেরুদণ্ড শক্ত করে মাথাটাকে যেন সকলের ওপরে অনেকখানি তুলে ধরেছেন। কর্কশ পুরুষ গলায় বলেছিলেন, না—শরীর আমার লোহা দিয়ে তৈরী, পেটের গোলগাল জীবনে কখনো হয়নি। বিকেলে অনেকটা খেয়ে বেরিয়েছি, তাই এখন আর খিদে নেই।

বলতে বলতেই বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে। বসন্তের শালপাতা ওড়ানো এলোমেলো হাওয়ার ভেতর দিয়ে নিজের বাংলোর দিকে এগোতে এগোতে শুনেছিলেন ডাক্তার ঘোষের বসবার ঘর থেকে আর একবার হাসির ঝঙ্কার উঠল। একবারের জন্যে পেশল পা দুটো থেমে দাঁড়ালো—তাকে নিয়েই রসিকতা করছে না তো অপোগণ্ড প্রফেসারটা? আর হঠাৎ মনের ভেতরে একটা অকারণ স্মৃতি জেগে উঠল—মাঠে নেমে কোনো রান করবার আগেই একটা ইয়র্কার বলে তাঁর উইকেট ছিটকে পড়েছে—নিদারুণ শত্রুর এই আকস্মিক অপঘাতে পেছনে হা-হা করে আনন্দে হেসে উঠেছে উইকেট-কীপার।

চাকর ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল, সেই সঙ্গে এক গ্লাস গরম দুধ। দুধ খেলেন, এক টুকরো রুটি চিবোলেন, কিন্তু বেশির ভাগ খাবারটাই পড়ে রইল। কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না, মুখের ভেতরে সব যেন বিস্বাদ হয়ে আছে।

শেষরাত্রের সেই স্বপ্নটা।

কোনো মানে নেই, অথচ মনে হয় ওর একটা মানে আছে। ছোট ছোট ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে এক-একটা আলোর বল্লম এসে বিঁধেছে ফাটল-ধরা পাথুরে সিঁড়িগুলোতে। সিঁড়িগুলো সেই আলো-আঁধারির ভেতরে ঘুরপাক খেতে খেতে কতদূরে যে উঠে গেছে তা তাঁর জানা নেই। শুধু এইটুকু জানা আছে—একেবারে মাথার ওপর বসে আছে সেই আশ্চর্য পাখিটা। ধবধবে সাদা তার পালক, বুকের কাছটা সোনালী, পা দুটো চুনীর মতো লাল, চোখ দুটো পান্নার মতো সবুজ। কিন্তু সে কতদূরে? এখন শুধু কালো শ্যাওলা-ধরা দেওয়াল, ফোঁটায় ফোঁটায় জল চুঁইয়ে পড়ছে তা থেকে। আর একটা ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিয়ে—

ভূপেন সেন উঠে পড়লেন। পাগলামো। স্বপ্ন—স্বপ্নই। তাই নিয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না। তার চাইতে বাইরের খোলা হাওয়ায় অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে আসা যাক। এ কদিন সকালে বেড়ানোই হয় না বলতে গেলে, এণাক্ষী আসবার পর থেকে ডাক্তার ঘোষের ওখানে গিয়ে আর একবার চা খান, খবরের কাগজটা একটু দেখেন, গল্পগুজব করেন বেলা দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত। আজ ও-বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবতেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। প্রফেসার কাল চলে যাবে শুনেছেন। ওই বাক-সর্বস্ব ছোকরাটা বিদেয় হোক—তারপর দেখা যাবে!

আজ একটুখানি হেঁটেই আসা যাক বরং।

শেষরাত থেকে এখানে ঠাণ্ডা পড়ে—শীতের আমেজটা থাকে নটা-দশটা পর্যন্ত। তাই সকালের নরম রোদে অনেক দূর পর্যন্ত চমৎকার বেড়িয়ে আসা চলে। কোটটা গায়ে চড়িয়ে ভূপেন সেন বেরিয়ে পড়লেন। রোদ এখনো লাল, বাতাসে এখনো ফুল মাটি নতুন খড় আর পাখির ডানার গন্ধ, পথের ধারে ধারে গাছপালার নতুন পাতা এখনো শিশিরে ছলোছলো। চলতে চলতে ভূপেন সেন শুনলেন পাপিয়া ডাকছে। অনেক দিন এই পাখিটার ডাক শুনতে পাননি, কলকাতা শহরের কাক-চিলের দলই তাঁর দু কান ভরে রেখেছে।

ভালো লাগা উচিত ছিল, একেবারে মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল এই আলো-হাওয়া, এই পলাশের থোকা থোকা ফুল, বাদাম গাছের এই তামাটে কচি পাতার দোলা, এই লাল কাঁকরের আঁকা-বাঁকা পথটির ভেতর। কিন্তু ভূপেন সেন কিছুতেই নিজের মধ্যে ডুবতে পারছেন না। সেই স্বপ্নটা যেন এখনো মাথার মধ্যে জমা হয়ে আছে, যেন নতুন রোদে নিজের ছায়ার ভেতরে সেই শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, যেন এক-একটা পড়ে থাকা পাথরের কোলে সেই সিঁড়ির ধাপগুলো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভূপেন সেন চলার গতি বাড়ালেন। কলকাতার কথা ভাবতে চাইলেন, মনে আনতে চাইলেন তাঁর ক্লাবের কথা, যে স্কুলের ছেলেটির এর মধ্যেই চমৎকার ফর্ম দেখা দিচ্ছে তার ফুট-ওয়ার্ক আরো কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় তাই নিয়ে চিন্তা করতে চাইলেন। তারপর ছাড়া-ছাড়া কাটা-কাটা ভাবনার ভেতরে একসময় দেখলেন একেবারে দুর্গা পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

অনেক ওপরে—প্রায় শ-পাঁচেক ফুট হবে—চিনির মঠের মতো ছোট একটা সাদা মন্দির দেখা যায়। শ-খানেক বছর আগে কোন্ সাধু ওটা তৈরী করিয়েছিল। সারা বছর পড়েই থাকে, শুধু দেওয়ালীর পর একদিন ওখানে নাকি পূজো হয়, মেলাও বসে।

তারপর নির্জন। মেঘ ঘনায়, বৃষ্টি পড়ে, ঝড় বয়। এর আগে দু-একবার ভেবেছেন ওখানে উঠে মন্দিরটা একবার দেখে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে কলকাতার ডাক্তারের শাসন ঃ হার্টটা একটু জখম হয়েছে, সাবধানে থাকবেন, বেশি স্ট্রেন করবেন না।

আজও পাহাড়ের গোড়ায় এসে ভূপেন সেন থেমে দাঁড়ালেন। সামনে একটা ছোট্ট নদীর শুকনো খাত, এখন কেবল বালি আর পাথর ছড়িয়ে আছে। বর্ষার সময় ওতে জল নামে। আশপাশে কয়েকটা শাল-শিমুলের গাছ—তাদের তলায় তলায় এখনো পাথর সাজানো কালিমাখা ক'টা উনুন, ইতস্তত কয়েকটা ভাঙা হাঁড়ি। পাঁচ মাস আগেকার মেলার স্মৃতি-চিহ্ন।

ফিরে যাবেন ভাবছিলেন, এমন সময় চোখ পড়ল। একটা গাছের পেছনদিকে ঠেসান দেওয়া কী একটা জিনিসের লাল-রূপালী রঙের ওপর রোদ জ্বলছে। স্কুটার। প্রফেসারের স্কুটার।

প্রফেসার বেড়াতে এসেছে এখানে। কাছাকাছি যখন তাকে দেখা যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয় উঠেছে দুর্গা পাহাড়েই। দ্বিগুণ বিরক্তিতে উলটো দিকে পা বাড়িয়েই থমকে গেলেন ভূপেন সেন।

একা এসেছে অরুণ দত্ত? একাই? না আরো কেউ সঙ্গে আছে তার?

আর কে হতে পারে সে-কথা স্পষ্ট করে ভাবতে পারলেন না। কিন্তু একটা হিংস্র ক্রোধ, একটা দুর্বোধ উত্তেজনা মাথার প্রত্যেকটি শিরার মধ্যে জ্বলে উঠল। চুলোয় যাক কলকাতার ডাক্তার, ভুল করেছে সে। স্পোর্টসম্যান ভূপেন সেনের হার্ট লোহা দিয়ে তৈরী। পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও তাঁর শরীরে বাইশ বছরের যৌবন। আজ ওই দুর্গা পাহাড়ের চূড়োয় না উঠে যদি তিনি ফিরে যান—ইহজীবনেও সে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, মনে হল মুঠোর মধ্যে অরুণ দত্তের নিকোটিনের রঙ মাখানো আঙুলগুলোকে বজ্রের মতো চেপে ধরেছেন তিনি। আর অপেক্ষা করলেন না ভূপেন সেন। পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলেন।

পঞ্চাশ ফুটও উঠতে হল না। তার আগেই দেখতে পেলেন।

একটা ছাতিমের মতো গাছ গোল করে ছায়া ছড়িয়েছে। তারই তলায় বড় একটা পাথরের চাঙাড়ের ওপর পাশাপাশি দুজন। অরুণ দত্ত আর এণাক্ষী। অরুণ সিগারেট ধরিয়েছে, এণাক্ষী একটা নীল সিল্কের রুমাল জড়াচ্ছে আঙুলে। আর তাদের মাথার ওপরে ছাতির মতো সেই গাছটার ডালে পাপিয়া ডাকছে।

ভূপেন সেনকে দেখে দুজনেই চমকে উঠল। সিগারেটটা পিঠের দিকে ফেলে দিলে অরুণ দত্ত, এণাক্ষীর ফর্সা মুখ লাল টকটকে হয়ে গেল, সোজা উঠে দাঁড়ালো পাথর ছেড়ে।

এণাক্ষী বললে, জ্যাঠামশাই!

আবার জ্যাঠামশাই! মাথার চুলে এক মুঠো ছাইয়ের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে বলেই? ভূপেন সেনের মনে হল যেন তাঁর গলা চিরে উৎকট চিৎকার বেরিয়ে আসবে একটা। কিন্তু অত সহজেই ধৈর্য হারালে স্পোর্টসম্যানের চলে না।

ভূপেন সেন হাসতে চেষ্টা করলেন।

—পাহাড়ে উঠছিলে—দু পা উঠেই বসে পড়লে?—চোখের তীব্র দৃষ্টি এবার অরুণ দত্তের মুখে গিয়ে পড়ল।

অরুণ দত্ত জবাব দিল না! এণাক্ষীই কথা কইল।

—বড্ড খাড়াই, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলুম।

—হুঁ! পাহাড়ে ওঠা আর স্পট ফেলে বাঘ মারা তা হলে এক জিনিস নয় প্রফেসর! —ভূপেন সেন আবার কঠিন হাসি হাসলেন, তা হলে এসো আমার সঙ্গে—দেখি কে আগে উঠে যেতে পারে।

বলেই উঠতে আরম্ভ করলেন। ওরা আসছে কিনা পেছনে তাকিয়ে একবার দেখলেন না পর্যন্ত।

বাঁকের পর বাঁক, খাড়াইয়ের পর খাড়াই। পায়ে চলা বন্ধুর পথ, জুতোর তলায় নুড়ি পিছলে যেতে লাগল। বাঁক ধরতে লাগল বুকের ভেতরে। প্রথমে সোজা হয়ে উঠছিলেন, তার পরে কুঁজো হলেন ভূপেন সেন। সেই স্বপ্নে দেখা সিঁড়িটার মতো যেন অনন্তের দিকে উঠে যাচ্ছেন—মনে হচ্ছে এ পথ তাঁর আর কোনো দিন ফুরুবে না।

উঠতে উঠতে কখন রোদ চড়া হয়ে উঠল, দু-পাশে গাছপালা কতবার রূপ বদলালো, কত রকমের পাখি ডাকল। কিন্তু ভূপেন সেন তাকিয়ে দেখলেন না কোনো দিকে। শুধু বুকের ভেতর কিসের একটা নিষ্ঠুর চাপ বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমশ, পেশল পায়ের শিরাগুলোর মধ্যে যন্ত্রণার ছুরি চলতে লাগল, শুধু দু কান ভরে শোঁ-শোঁ করে একটা আওয়াজ ক্রমেই জোরালো হতে হতে শেষে ঝড়ের গর্জনের মতো ভেঙে পড়তে লাগল।

তাঁরই নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

সেই সাদা নির্জন মন্দিরটার সামনে এসে যখন পৌঁছুলেন, তখন শরীরটা কুঁজো হতে হতে ধনুকের মতো হতে বসেছে—নিচের মাটি দু-হাত বাড়িয়ে তাঁকে টানছে হিংস্র শক্তিতে। তবু মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ভূপেন সেন। দুই কানে তখন একটানা ঝড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছু নেই।

চোখ ঝাপসা—তবু দেখতে পেলেন। অনেক নিচে পথের একটা বাঁক দেখা যায়। দুটো ছোট ছোট রঙিন পুতুল সেখানে। আর পারছে না—দাঁড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। হয়তো ফিরে যাওয়ার কথাই ভাবছে।

অনুকম্পায় আর আত্মতৃপ্তিতে হা-হা করে হেসে উঠলেন ভূপেন সেন। প্রফেসার! সাতাশ বছর! স্কুটার! স্পট-লাইট জ্বেলে বাঘ-শিকার!

হেসে উঠতেই মাথা ঘুরে গেল তাঁর। বুকের যন্ত্রণাটা যেন বন্যার বাঁধ ভেঙে এক মুহূর্তে সমস্ত শরীরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বসে পড়লেন, তারপর শুয়ে পড়লেন মাটিতে। স্বপ্নে দেখা সেই সিঁড়িটাকে চিনতে পারলেন, হাতের কাছে কুড়িয়ে পেলেন ক্রিকেট ব্যাটটা—স্কোর বোর্ডে দেখলেন তাঁর নামের পাশে নিরানব্বুই জ্বলজ্বল করছে।

আর তখন তাঁর সামনে এসে বসল সেই স্বপ্নের পাখিটা। সাদা রঙের পালক, পা দুটো চুনীর মতো লাল, চোখ দুটো পান্নার মতো সবুজ, বুকের কাছটা সোনালি। কিন্তু—

কিন্তু ওটা, ওটা কি পাখি? ওর মুখটা আস্তে আস্তে এণাক্ষীর মতো হয়ে যাচ্ছে না?

স্বপ্নের অর্থটা বোধহয় খুঁজে পাচ্ছিলেন ভূপেন সেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে ঘিরে

যে ঝড় উঠছিল, সেটা আচমকা থেমে গেল আর দুর্গা পাহাড়ের চূড়োটা এক ডুবে তলিয়ে গেল একটা অন্ধকার সমুদ্রের তলায়।

তমস্বিনী

কালীঘাটের মন্দিরে যেতে হয়েছিল। দুর্বল গলায় বলেছিলুম, দেখো সপ্তাহে একটা মাত্র রবিবার—সেদিনও যদি—

জবাব এল ঃ রবিবার না হলে তোমাকে ধরা যায় নাকি?

বললুম ঃ আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে না-ই আনলে। তোমার পুণ্যে আমারও তো অর্ধেক দাবি আছে, তুমিই যাও, আমি বরং—

—বরং কী? প্রাণের বন্ধুরা আসবে, বারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলবে, চা-সিগারেটের শ্রাদ্ধ হবে, এই তো? চালাকি নয়, অনেক কষ্টে আজ তোমায় ধরেছি। ওঠো—

উঠতে হল। রবিবারের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বার স্বর্গীয় বিলাসিতা, অলস সকালের আমেজ, দু-একজন বন্ধু-বান্ধব এলে কিছুক্ষণ নিঃস্বার্থ পরচর্চা—সমস্তই গেল আজকের মতো। সান্ত্বনার বাণীও শুনতে পেলুম ঃ সারাদিন তো আর কালীঘাটে বসে থাকতে হবে না, ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে আসব।

ঘণ্টাখানেকের অর্থ আমি জানি। ফেরবার পথে দু-একজন আত্মীয়কে মনে পড়বে, অনেকদিন যাদের সঙ্গে দেখা হয় না; খুঁটিনাটি কেনা-কাটাও বাদ পড়বে না। উদাস হয়ে এক লাইন ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতেই ঝাঁঝালো স্বরে শোনা গেল ঃ কী বললে?

খেয়াল ছিল না, ওপক্ষেরও ইংরেজি জানা আছে। সামলে নিয়ে বললুম, কিছু না—কিছু না। চলো—বেরুনো যাক।

তারপর যথানিয়মে পূজো, পাণ্ডা, সিঁদুরের টিপ, ফুলের মালা। বেরিয়ে আসবার সময় বিরক্ত হয়ে ভাবছিলুম, লেখাপড়া যা-ই শিখুক, মা ঠাকুরমার ট্রাডিশনকে মেয়েরা কোনো মতেই ছাড়তে রাজী নয়। দেখলুম, ভিখারীদেরও ব্যবস্থা আছে—খুব সম্ভব তিন-চার টাকার নয়া পয়সায় ব্যাগ ভর্তি করে আনা হয়েছে সঙ্গে।

কিন্তু চাওয়া যেখানে অনন্ত, সেখানে মধ্যবিত্ত গৃহিণীর দাক্ষিণ্য কতক্ষণ চলে? একলাফে গাড়িতে উঠে বললেন, দাঁড়িয়ে আছো কী—এরপরে গায়ের জামা ছিঁড়ে দেবে!

আমি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম, সে কথা ঠিক। এক বুড়ী ভিখারিণীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়েছিল। কোথায় যেন দেখেছি, মুখটাকে ভারী চেনা-চেনা ঠেকল।

বুড়ীর চোখ দুটোতে ঘোলাটে হলুদ রঙ, ছানি পড়েছে মনে হল। বাড়িয়ে দেওয়া শীর্ণ হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে, ভাঙা গলায় বললে, গরীবকে কিছু দিয়ে যান বাবা—মা-কালী আপনাকে হাজারগুণ ফিরিয়ে দেবেন—!

মা কালী কী দেবেন না দেবেন, সে-কথা ভাববার দরকার ছিল না। এতক্ষণ ভিখারীদের আমি কিছুই দিইনি, সে দায়িত্ব স্ত্রীই নিয়েছিলেন। কিন্তু এইবার আমি পকেটে হাত দিলুম, একটা আধুলি আঙুলে ঠেকল, সেইটেই বের করে ফেলে দিলুম বুড়ীর হাতে।

স্ত্রী বললেন, কী হচ্ছে? তুমি আবার দানসত্র খুলে বসলে নাকি? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উজাড় করে দিয়েও কি ওদের খাঁই মেটাতে পারবে? ওঠো গাড়িতে!

বলবার দরকার ছিল না, আধুলির প্রতিক্রিয়ায় তখন প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম। বিদ্যুৎবেগে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললুম, অ্যাকসিডেন্ট না ঘটিয়ে যত জোরে পারো, চালাও!

পুরোনো গাড়ির বেসুরো কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে 'রাজাবাবু' 'বড়বাবু'র আর্তরব ঘূর্ণির মতো মিলিয়ে গেল।

কিন্তু ঘোলাটে হলুদ রঙের সেই ছানিপড়া চোখ, সেই কাঁপা হাতটা, সেই ভাঙা গলার আওয়াজ। মুখটা বড়ো বেশি চেনা-চেনা ঠেকছে। কিছুতেই মনে করতে পারছি না—অথচ!

তারপর নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অলস মুহূর্তের ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তায়, রাত্রে ঘুম আসবার আগে, ওই মুখখানাকে জীবনের কোনো একটা অন্ধকার কোণা থেকে আমি খুঁজে বার করতে চেয়েছি। খুব একটা আগ্রহ নিয়ে নয়, অবসর সময়ে ক্রস-ওয়ার্ডের শব্দ খোঁজবার মতো, জিগ্স পাজ্ল মেলাবার মতো। উত্তরটা না পেলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু কেমন একটা অতৃপ্তি যেন আছে।

চেনা আধচেনা কত মুখ ভিড় করে এল। অচেনারাও বাদ গেল না। কেউ এল কোনো ট্রেনের কামরার সহযাত্রিণী হয়ে, কেউ এল প্রবাসের কোনো হোটেলের পাশের ঘর থেকে, কাউকে মনে পড়ল কোনো তীর্থের ধর্মশালায়। কোনো কোনো মুখের সঙ্গে দু-একটা রেখা হয়তো মিলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারো সঙ্গেই সম্পূর্ণ মেলাতে পারলুম না।

মিলল না, কিন্তু ছবি আনল। যেন একটা পিকচর গ্যালারির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমি একটি মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

পারুল কাকিমার ছবি। অনেক বেশি করে চেনা, অথচ সবচাইতে ঝাপসা। আর সেই অস্পষ্টতার আড়াল পারুল কাকিমা নিজেই সবচেয়ে বেশী করে টেনে দিয়েছিলেন।

তাহলে ফিরে যেতে হল নিজেদের গ্রামে। তখন যাওয়া খুব শক্ত ছিল না। একটা ধূ-ধূ-নদী, তার নাম আড়িয়াল খাঁ। সেখানে ছোট একটি স্টীমারঘাট। সেই ঘাটে নেমে নৌকো, নদী বেয়ে কয়েক মাইল চলা, তারপর বাঁ-দিকে খাল। তার হলদে জল হিজল আর বেতবনের ছায়ায় কালো, তাতে জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, মাঝে মাঝে থালার মতো ভেসে ওঠা কাছিম, কখনো নৌকোর ভেতরে লাফিয়ে পড়া দু-একটা ছোট মাছ, গোটাসাতেক বাঁক, সুপুরি আর নারকেল গাছের ফাঁকে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমন্দির, দাঁড়ে কয়েকটা টান—লগিতে গোটাকয়েক খোঁচা, আমাদের বাড়ির ঘাট।

ভূগোলের হিসেবে কলকাতা থেকে হয়তো দুশো মাইলের কিছু বেশি। কিন্তু এখন গ্রহান্তরের ওপারে।

সেই গ্রাম। আমার কৈশোর। আর পারুল কাকিমা।

পারুল কাকিমাদের বাড়ি খালের ওপারে। একটা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যেতে হত সেখানে। বাড়ির সামনে ছিল একটা থমথমে বাঁশবন। সেই বাঁশবনটার ভেতর দিয়ে যেতে দিনে-দুপুরেও কেমন ছমছম করত শরীর। হঠাৎ হাওয়া দিত এক-একটা—বাঁশের শুকনো পাতা পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে থাকত, কাঁচা বাঁশের কেমন একটা গন্ধ ভেসে বেড়াত, হাওয়ার তালে তালে কটকট খড়খড় করে আওয়াজ উঠত। এই বাঁশবনের ভেতরেই একবার বিকেলে আমি একটা প্রকাণ্ড বন-বেড়াল দেখেছিলুম—একটা শুকনো

বাঁশের গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছিল সে, কড় কড় করে আওয়াজ হচ্ছিল আর নখের টানা-টানা দাগ পড়ছিল বাঁশটাতে। আমার পায়ের শব্দে চমকে সে ফিরে তাকিয়েছিল আমার দিকে। লাল টুকটুকে মুখটাকে ফাঁক করে ফ্যাস-স্ করে আওয়াজ তুলেছিল একটা, তারপর একলাফে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আর একবার ফাল্গুন মাসের সকালে—যখন বাঁশবনের এখানে ওখানে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাঁটফুল ফুটেছে, তখন আমি ওখানে মস্ত একটা খরিশ গোখরোর সঙ্গে একটা বেজিকে লড়াই করতে দেখেছিলুম। বেজিটা যেন ফুলে আটগুণ হয়ে উঠেছিল, থেকে থেকে সাপটার রক্তে বাঁশের শুকনো পাতাগুলো রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

গ্রামের পুরোনো দীঘি, তাদের পাড়ে পাড়ে চিতা'র ওপর মঠ দেওয়া। কত সকাল দুপুর সন্ধ্যায় রাতে সেই সব নির্জন দীঘির ধার দিয়ে গেছি, শীতের ভোরে চুরি করেছি খেজুর রস—কোনোদিন ভয় পাইনি। কিন্তু পারুল কাকিমাদের বাড়ির সেই বাঁশবনটা ভরা দিনের আলোতেও সারাশরীরে কেমন একটা শিরশিরানি বইয়ে দিত।

জোর পায়ে বাঁশবাগান পেরিয়ে যেতুম, তারপরেই দেখতে পেতুম বলরাম কাকাকে।

একটা জলচৌকিতে বসে তামাক টানতেন। পাশেই বাঁধা আছে বাড়ির সাদা ছাগলটা—বুড়ী হয়ে গেছে, তার দাড়ির রংটা পর্যন্ত লাল। বলরাম কাকা তামাক খাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে হাত বোলাচ্ছেন তার গায়ে।

দেখেই জিজ্ঞেস করতেন ঃ কিরে, কী চাই?

—কিছু না।

—ঘুরে বেড়াচ্ছিস শুধু শুধু? ইস্কুল নেই?

—ইস্কুল ছুটি।

—কী ইস্কুলই হয়েছে সব।—বলরাম কাকা মুখটা বাঁকাতেন ঃ লেখাপড়ার পাট তো উঠেই গেল দেশ থেকে। মাস্টারগুলো শুধু মাইনে নেবার জন্যেই মুখিয়ে রয়েছে সব। ছ্যাঃ!

—বা-রে, রবিবারেও ছুটি থাকবে না?

—রেখে দে রবিবার। তোদের সব বারই সমান। লেখাপড়া কিছু করিস? —হুঁকোটাকে নামিয়ে, জলচৌকির আর একধারে ঠেকান দিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করতেন ঃ তুই তো ক্লাস নাইনে পড়িস—তাই নয়? আচ্ছা বল দিকি এই ধাঁধাটার মানে কী? 'দেবরাজ ময়া দৃষ্টং বারিবারণ-মস্তকে, ভক্ষয়তি অর্ঘ্যপত্রাণি, অহং চ বনহস্তিনী?'

আমি বিরস দৃষ্টিতে বলরাম কাকার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। এই রকম গোটাকয়েক সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকই লোকটার পুঁজি। কতদূর লেখাপড়া করেছেন জানি না, নীচের দিকের কয়েকটা ক্লাসেরও চৌহদ্দি পেরিয়েছেন বলে শুনিনি। কোনো কালে পাঠশালার পণ্ডিতের মুখে এগুলো শুনে থাকবেন—এদের ভাঙিয়েই আমাদের জব্দ করতে চেষ্টা করেন।

শ্লোকটা এবং ওর ব্যাখ্যানা আরো অন্তত পঞ্চাশবার আমি শুনেছি, কিন্তু বলরাম কাকার সঙ্গে কথা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি হত না। আসল কথা, লোকটাকে আমার কোনোদিন ভালো লাগেনি—কেমন মনে হত, ওই বাঁশবনটা পেরিয়েই আমি ওঁকে দেখতে পাই—আর ওই বাগানটার ভয়ধরানো রহস্যের সঙ্গে বলরাম কাকারও কোথাও

কী একটা সম্পর্ক আছে। ওঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলো কখনো স্থির থাকত না, সব সময় নড়ত; আর তাই দেখে আমার খামোকা মনে হত যেন কোথা থেকে একটা হাঁস চুরি করে খেয়ে বনবেড়ালটা শুকনো বাঁশের গায়ে ঘষে ঘষে নখে শান দিচ্ছে।

বলরাম কাকার চোখ এক ধরনের অদ্ভুত খুশিতে পিটপিট করত।

—কিরে, বলতে পারলি নে তো?

—পারি। আপনার কাছেই শুনেছি অনেকবার।

—শুনেছিস নাকি? ও! তা হলে এইটে কি বল তো?

আর একটা উদ্ভট শ্লোক এবং সেটাও পঞ্চাশবার শোনা। বিরক্ত হয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই বলতেন ঃ যাচ্ছিস কোথায়? ওই তো একটা মোড়া রয়েছে ওখানে, একটু বোস না, গল্প করি।

গল্প করার লোক বেশি তাঁর জুটত না। বলরাম কাকা ঠিক অসামাজিক ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু গ্রামের লোক সাধ্যমতো তাঁকে এড়িয়ে চলত। তা ছাড়াও তিনি না হয় সারাদিন হুঁকো হাতে বসে থাকতে পারেন—আর সকলেরই কিছু না কিছু কাজকর্ম আছে। কাজেই আমাদের কাউকে পেলে আর ছাড়তে চাইতেন না। আমাদের দারুণ খারাপ লাগত, কিন্তু এড়িয়ে চলার উপায় ছিল না—বসেই যেতে হত খানিকক্ষণ।

বলরাম কাকা হুঁকোয় টান দিয়ে একটা উঁচুদরের আলোচনা শুরু করতে চাইতেন।

—বল দিকি, শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী?

ক্লাস নাইনে পড়ি, পৈতে হয়েছে অনেক দিন। জবাব দিতুম ঃ বেদ।

—হল না। শাস্ত্রের সেরা হচ্ছে তন্ত্র।

তর্ক করার বিদ্যে নেই, নিরুপায় ক্রোধ নিয়ে চুপ করে থাকতুম। আর বলরাম কাকা গলা নামিয়ে বলে যেতেন ঃ বুঝলি, তন্ত্র হচ্ছে সাধনার সবচেয়ে কঠিন রাস্তা, তাই ওর নাম হল বীরাচার। মানে, একমাত্র বীরেরাই ওই সাধনার অধিকারী আর জপ-তপ-পূজো, এসব হল দুর্বলের ধর্ম, সেইজন্য এদের পশ্বাচার বলে। সেইজন্যেই তো আমি তান্ত্রিক—হুঁ-হুঁ!

আমি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখতুম বলরাম কাকার দিকে। তিনি তান্ত্রিক—এ কথা বলে দিতে হয় না বাইরে থেকে। সব সময়েই হাঁটু পর্যন্ত একটা লাল কাপড় পরে থাকেন, গলায় আর বাহুতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে খানিকটা গলানো সিঁদুর লেপটানো—যেন রক্তমাখানো রয়েছে মনে হত। কিন্তু এত সব ভয়ঙ্কর সাজ-পোশাকেও বলরাম কাকাকে যথেষ্ট ভীতিকর বোধ হত না। রোগা, হাড়-বেরকরা কালো চেহারা, শীতকালে হাঁপানির টানে কষ্ট পেতেন। সেই বয়সেই বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' পড়া হয়ে গিয়েছিল আমার—বালিয়াড়ী শিখরে সেই দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্তির সঙ্গে বলরাম কাকার সাদৃশ্য কল্পনা করা কঠিত হত। আমার শুধু ওঁর বাঁ-হাতের কালো কালো রোগা আঙুলগুলোকে পানিজোঁকের মতো কিলবিল করতে দেখে—ঠিক ভয় করত না—একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে শরীর শিরশিরিয়ে উঠত। জিজ্ঞেস করতুম ঃ শবসাধনা করেছেন আপনি?

—এখনো করিনি, কিন্তু করব। মুশকিল কী জানিস, তার বায়নাক্কা অনেক, চণ্ডালের শব চাই—তার অপঘাতে মরা চাই—জুৎমতো অমাবস্যার রাতে পাওয়া চাই—তার সঙ্গে আরো কিছু চাই—মানে সে-সব তোকে বলা যাবে না। যদি কোনোদিন শিষ্য হোস, তখন

জানতে পারবি।—এক গাল হাসতেন বলরাম কাকা ঃ কিরে, চ্যালা হবি আমার?

—আপনি তো আগে সিদ্ধিলাভ করুন, তারপর দেখা যাবে।

—ও, আমার কথায় বুঝি বিশ্বাস হল না? দাঁড়া, দেখবি, দেখবি—হুঁকোটায় টান দিতে গিয়েই দেখতেন আগুন নিবে গেছে। তখন ডাক ছাড়তেন ঃ তারা-তারা-তারিণী—

দুটো কাজ হত একসঙ্গে। একদিকে ব্রহ্মময়ী ডাক পেতেন—অন্যদিকে বেরিয়ে আসতেন তারা মাসিমা। তারা মাসিমা জিজ্ঞেস করতেন ঃ কী হল? এত চেঁচামেচি কেন?

—কলকেটা একটু বদলে দেবে?

—সারাদিন তামাক খাওয়া আর বকবক করা—ভালোও লাগে?

—কী আর করব—বলো?—মিহি গলায় জবাব দিতেন বলরাম কাকা ঃ মানে ঠিক বকবক করা নয়, একটু তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিলুম ওর সঙ্গে।

—চুলোয় যাক তন্ত্র!—তারা মাসিমা ভ্রূকুটি করতেন ঃ নিজে তো গোল্লায় গেছই, এই বাচ্চা ছেলেটারও মাথা খেতে চাও?

—কালী—কালী—কী যে বলো!—বলরাম কাকা নিবে যেতেন ঃ এ-সব কথা আবার কেন? যাও না লক্ষ্মীটি, চট করে একটু তামাক সেজে আনো।

এরই মধ্যে আমি লক্ষ্য করতুম, কখন দরজার সামনে পারুল কাকিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রায়ই কোনো কথা বলতেন না—যেমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতেন, তেমনিই আস্তে আস্তে ছায়ার মতো সরে যেতেন। কেন আসতেন, কী দেখে চলে যেতেন, সে-কথা তিনিই শুধু বলতে পারেন।

পারুল কাকিমা বলরাম কাকার স্ত্রী। বয়েস কত জানি না, কিন্তু বলরাম কাকার পাশাপাশি অনেক বেশি ছেলেমানুষ বলে মনে হত তাঁকে। ছেলেপুলে ছিল না—রান্না করে, দাওয়া নিকিয়ে, ধান সেদ্ধ করে, চিঁড়ে কুটেই তাঁর দিন কাটত। তারা মাসিমা ছিলেন তাঁরই দূর সম্পর্কের বোন। তারা মাসিমা কী করে এই সংসারে এসেছিলেন জানি না, কী কাজ যে তিনি করতেন তাও বলতে পারি না। শুধু মনে হত, বলরাম কাকাকে তামাক যোগানোই তাঁর একটিমাত্র উদ্দেশ্য। যতদূর মনে পড়ে, আমি কোনোদিন পারুল কাকিমাকে তারা মাসিমাব সঙ্গে কথা কইতে পর্যন্ত দেখিনি।

পারুল কাকিমাকে সুন্দরী বলা যায় না—মোটামুটি শান্তশিষ্ট গেরস্ত মেয়ের চেহারা। কিন্তু তারা মাসিমাকে একবার দেখলে ভোলা শক্ত। আগুনের মতো গায়ের রঙ—টানা টানা চোখ, চুলের গোছা পিঠ ছাপিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে। চোখের তারা দুটোয় কেমন একটা নীলচে আভা—মনে হত সে দুটো সব সময় ঝকঝক করছে। আর আশ্চর্য রুক্ষ আর চড়া ছিল তাঁর গলার আওয়াজ—মেয়েদের অমন কঠিন নীরস স্বর জীবনে আমি কখনো শুনিনি।

মা-কে বলতে শুনেছি ঃ অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। তাই বিয়ের এক বছরের মধ্যে ওর সোয়ামীকে সাপে কাটল। তারা মাসিমা ছিলেন বিধবা। খুব সম্ভব তিনকুলে কেউ ছিল না তাঁর, তাই আশ্রয় নিয়েছিলেন বলরাম কাকার সংসারে। কিন্তু খুব চোটপাটেই থাকতেন। বলরাম কাকাকে ঘন ঘন তামাকের যোগান দিতেন—ধমক দিয়ে বলতেন : রাতদিন হুঁকো মুখে বসে থাকা আর বকবকানি—পেটের ভাত হজম হয় কী করে?

—হয়—হয়। আমি তান্ত্রিক। সাধনার জোরে সব করতে পারি।

ভ্রূকুটি করে তারা মাসিমা বলতেন ঃ মরণ!

আর কখনো-কখনো দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেন পারুল কাকিমা। স্থির শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন এদের দিকে। মাঝে মাঝে নিঃশব্দে সরে যেতেন, কখনো-বা আমাকে ডেকে বলতেন ঃ অন্তু, আমার একটু কাজ করে দিবি?

বলরাম কাকার বকুনির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়তুম। চলে যেতুম বাড়ির ভেতরে।

পারুল কাকিমা আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন চিঠি লেখার জন্যে।

নিজে লেখাপড়া একেবারে জানতেন না তা নয়, কিন্তু হাতের লেখা ছিল কাঁচা আর বড়ো বড়ো—একখানা পোস্টকার্ডে কয়েক লাইনের বেশি ধরত না। আর আমি খুব ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে অনেক কথা লিখতে পারতুম—পোস্টকার্ডের দেড় পিঠেই একখানা এনভেলপের কাজ হয়ে যেতো। শুধু পারুল কাকিমারই নয়—পাড়ার অনেকেরই চিঠি লেখায় আমার ডাক পড়ত।

বাড়ির ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে চিঁড়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু আর গঙ্গাজলী—এই সব খেতে দিতেন। খাওয়া হয়ে গেলে বলতেন, আমাকে একখানা চিঠি লিখে দে।

চিঠি লিখতেন তাঁর বাবার কাছে। গ্রাম খলিশাকোটা, জিলা বাখরগঞ্জ। আমি বাখরগঞ্জের বদলে বরিশাল লিখতুম। ইস্কুলে পড়তে গিয়ে আমি জেনেছিলুম, আজকাল আর বাখরগঞ্জ লেখার রেওয়াজ নেই, বরিশাল লিখতে হয়।

কী লেখা হত চিঠিতে?

"বাবা, তুমি একবার অবশ্য আসিবে। আজ কতদিন তোমাকে দেখি না। আমারও সংসার ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই। মরণ না হওয়া পর্যন্ত এখান হইতে আমি নিস্তার পাইব না। ইহারা আমাকে নিয়া যাইবে না—"

এই পর্যন্ত লিখে আমার খারাপ লাগত। কলম থামিয়ে জিজ্ঞেস করতুম ঃ আপনি কেন বাপের বাড়ি যান না কাকিমা? বলরাম কাকাকে বললেই তো পারেন।

—ও যাবে না।

—কেন যাবেন না? কাজকর্ম তো কিছুই নেই—বসেই তো রয়েছেন রাতদিন।

এ কথা অনেকবার আমি জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু পারুল কাকিমা কোনোদিন জবাব দেননি। এড়িয়ে গিয়ে বরাবর বলেছেন, অত কথায় তোর কী দরকার? যা বলছি, লিখে যা।

এরই মধ্যে আমি দেখতুম, তারা মাসিমা উঠোন দিয়ে চলে যাচ্ছেন। যেতে যেতে চেয়ে দেখলেন আমাদের দিকে, রোদ লেগে চোখের নীলচে তারা দুটো তাঁর জ্বলে উঠল একবার, যেন ছড়িয়ে পড়ল কয়েকটা আগুনের ফুলকি। মনে হয়েছে, পারুল কাকিমা যেন একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলেন, যেন শ্বাস বন্ধ করে বসে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর তীব্র স্বরে ফিসফিসিয়ে বললেন, লিখে যা অন্তু, লিখে যা। তাড়াতাড়ি লেখ।

অস্বীকার করব না, বলরাম কাকার সংসার নিয়ে একটা চাপা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছিল। আমি তখন সেই বয়েসে পা দিয়েছি—যখন জীবনের আর একটা

উপকূল চোখের সামনে ছায়ার মতো ফুটে উঠেছে আর তার অস্পষ্ট আভাসের ওপর আমার মনের রঙ পড়ছে। আমি উপন্যাস পড়তে শুরু করেছি, মতি বিবি আর কপালকুণ্ডলার সম্পর্ক অনেকটা অনুমান করতে পারি, বড়োদের কথাবার্তার ভেতর থেকে অনেক ইঙ্গিত তখন খুঁজে পাই। একদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে মেয়েদের আসর বসেছিল, আমি বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেয়েছিলুম রায়-বাড়ির রাঙা জেঠিমা চিৎকার করে বলছেন ঃ পারুল বলেই সহ্য করে, আর কেউ হলে এতদিন ঝাঁটা মেরে ওই বলাকে—

আমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি থেমে গিয়েছিলেন. মা বলেছিলেন, অন্তু, যা এখান থেকে। মেয়েদের কথার ভেতর পুরুষমানুষের দাঁড়াতে নেই।

সেইদিন থেকে আমি অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছিলুম। কতগুলো ছায়া আমার সামনে রূপ নিতে লাগল, মানুষের মনের অরণ্য সেই প্রথম তার জটিল অন্ধকারে আমাকে আকর্ষণ করল। বলরাম কাকাকে এর আগে আমার ভালো লাগত না, এর পর থেকে যেন তাঁর সম্পর্কে একটা তীব্র বিদ্বেষ আমি অনুভব করতে আরম্ভ করলুম। ডাকলেও আমি আর বসতুম না—'কাজ আছে' বলে জোর পায়ে পেরিয়ে যেতুম জায়গাটা। তারা মাসিমা বিশেষ কথা বলতেন না আমার সঙ্গে—শুধু মনে হত তাঁর নীলচে উগ্র চোখ দুটো থেকে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠত। বুঝতে পারতুম, আমাকে তিনি পছন্দ করেন না।

হয়তো একটু কারণ ছিল। একবার শ্রাবণ মাসে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যেবেলা এসে একবার একটু 'মনসামঙ্গল' পড়ে দিয়ে যাস তো। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কাল থেকে—পড়তে পারছি না। ওদিকে সংক্রান্তি তো এসে গেল।

পয়লা শ্রাবণ থেকে আমাদের দেশে 'মনসামঙ্গল' পড়বার রেওয়াজ—সংক্রান্তিতে মনসা পূজোর দিনে সে পড়া শেষ করতে হয়। সন্ধ্যার পরে ওই বাঁশবন পেরিয়ে এই বাড়িতে আসতে আমার প্রচুর আপত্তি ছিল, সংক্ষেপে বললুম, সন্ধ্যের সময় আমার স্কুলের পড়া আছে—আমি আসতে পারব না।

তারা মাসিমার নীলচে চোখ দুটো ধক ধক করে উঠল। সেই অদ্ভুত কর্কশ গলায় বললেন, তা পারবি কেন? পারবি কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা পারুল কাকিমার চিঠি লিখতে। তাতে তোর লেখাপড়ার একটুও ক্ষেতি হয় না।

আমি জবাব দিইনি। চলে আসতে আসতে দুটি মিষ্টি সম্ভাষণ শুনেছিলুম পিছন থেকে ঃ লক্ষ্মীছাড়া—বাঁদর।

বলরাম কাকার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আমার যে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ ছিল তা নয়। ওদের সঙ্গে আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল না—কাকা ডাকতুম নিতান্তই গ্রাম-সুবাদে। ওদের ওখানে আমার আসা-যাওয়াও বাড়ির লোকে পছন্দ করত না। আমিও ইচ্ছে করে যেতুম না, কিন্তু খাল পেরিয়ে কোথাও যেতে গেলেই বলরাম কাকার বাড়ির ওপর দিয়ে পা বাড়াতে হত আর সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পাড়তেন ঃ এই শোন্ শোন্—আয় এদিকে।

তারপরেই গোটাকতক উদ্ভট শ্লোক, স্কুলের পড়ানোর নিন্দে আর তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা। কথা বলতে বলতে বাঁ হাতের সেই পানিজোঁকের মতো লিকলিকে আঙুল

দিয়ে গা চুলকোতেন—রোগা কালো কালো খড়িওড়া পায়ে নখের দাগ পড়ে যেত, ঠিক মনে হত, একটা বনবেড়াল হাঁস চুরি করে খেয়ে শুকনো বাঁশের ওপর আঁচড় কেটে কেটে থাবায় শান দিচ্ছে।

আর একটি রবিবারের ছুটি। ওই বাঁশবন ছাড়িয়ে চলেছি ওপারের এক বন্ধুর বাড়িতে। একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, বলরাম কাকা ওখানে বসে নেই, জলচৌকিও নেই। শুধু বাড়ির বাচ্চা রাখাল আক্তার বসে বসে গোরুর জাবনা কাটছে। চলে যাচ্ছি, পিছন থেকে ডাক শুনলুম ঃ অন্তু।

দেখি পারুল কাকিমা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

পারুল কাকিমা ডাকলে চলে যাওয়া যায় না। আমাকে ফিরতে হল। অর্ধচেতনভাবে আমি জানতুম, এই বাড়িতে দুটো দল আছে, একদিকে বলরাম কাকা আর তারা মাসিমা— আর একদিকে পারুল কাকিমা একা। আমিও মনে মনে পারুল কাকিমার সঙ্গে যোগ দিয়েছি, কিন্তু কেন দিয়েছি, সে আমার নিজেরও জানা নেই। আর তারা মাসিমা সেকথা জানে—তার চোখের দৃষ্টি দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম।

আমি কিছু বলবার আগেই পারুল কাকিমা বললেন, একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাবি?

—আচ্ছা।

তিনজনের এই বাড়িটি এমনিতেই নির্জন, আজকে আরো ফাঁকা ঠেকল। বলরাম কাকাকে দেখতে পেলুম না, তারা মাসিমাকেও নয়। দাওয়ায় বসে আমি জিগ্যেস করলুম ঃ কাকা কোথায়?

একটু চুপ করে রইলেন পারুল কাকিমা। তারপর বললেন, শিষ্যবাড়ি গেছেন।

বছরে একবার করে বলরাম কাকা শিষ্যবাড়ি যেতেন—পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এই ভাগ্যটুকু তাঁর পাওয়া। বরিশাল-ফরিদপুরে ক'ঘর শিষ্য তাঁদের ছিল, একবার করে সে-সব জায়গায় ঘুরে আসতেন—যা পেতেন দু-হাতে কুড়িয়ে আনতেন। তারপর বাড়িতে বসে জমির ধান; পুকুরের মাছ আর রাতদিন তামাক টানা। এই মাস দেড়েকই যা কিছু নড়ে-চড়ে বেড়াতেন তিনি। কিন্তু—

আমি বললুম, এ-সময় তো কাকা শিষ্যবাড়ি যান না।

পারুল কাকিমা বললেন, না গিয়ে উপায় ছিল না।

কথার স্বরে আমি চমকে উঠলুম। পারুল কাকিমার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে—চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ আমাকে খানিক বিষ এনে দিতে পারিস অন্তু?

—কাকিমা!

—তোকে আর চিঠি লিখতে হবে না, তুই যা।

আমি ভয় পেলুম। আমার মনে হল আসবার সময় বাঁশবনের ভেতর কেমন যেন একটা ভূতুড়ে হাওয়া দিচ্ছিল, বাঁশে কঞ্চিতে কট্‌কট্ খড় খড় করে আওয়াজ উঠছিল— কোথায় যেন একটা দাঁড়কাক রাক্ষুসে গলায় খা-খা-খা বলে ডেকে চলেছিল। আমি অনুভব করলুম—বাঁশবাগান থেকে যেন কী একটা অদ্ভুত ছায়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িতে চলে এসেছে, বাইরে আক্তার খস খস করে জাবনা কাটছিল—শুকনো হাওয়ায়

সেই খড় কাটার আওয়াজ যেন বনবেড়ালের নখের আঁচড়ের মতো আমার কানে বাজতে লাগল।

আমি উঠে দাঁড়াতেই পারুল কাকিমা শক্ত করে আমার কাঁধটা চেপে ধরলেন। বললেন, তুই তো বড়ো হয়ে গেছিস—আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে পারিস?

কী বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু চোখ তুলেই নামিয়ে নিলুম আমি। পারুল কাকিমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তারা মাসিমার চোখেও অত আগুন আমি কোনোদিন দেখিনি।

পরক্ষণেই আমার কাঁধে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, যা—বেরো। আর কখনো এখানে আসিস নি। এ বাড়িকে পিশাচে পেয়েচে, তোর রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে।

সেদিন আমি দেড় মাইল ঘুরে বাড়ি ফিরেছিলুম। ওই বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সাঁকো পার হতে আর আমার সাহস হয়নি।

সারা গ্রামে ঝড় উঠল তার পরের দিন। খুন। খুন হয়েছেন তারা মাসিমা।

গ্রামের বুনোপাড়ার দুজন লোক বাঁশি তৈরী করবার জন্যে তল্‌তা বাঁশ কাটতে গিয়েছিল বাঁশবনে। বাগানের যে-দিকটাতে সচরাচর কেউ যায় না, যে-দিকটাতে বাঁশবনের সঙ্গে ঝোপঝাড় আর বেতবন মিশে একাকার হয়ে গেছে, যেখানে খালের কালো জল চওড়া হয়ে বাঁক নিয়েছে একটা, পাশের ঢালু জমিতে একটুখানি জলার মতো সৃষ্টি হয়ে অজস্র কলমীর ফুল ফুটেছে আর গজিয়ে উঠেছে হোগলার জঙ্গল, সেখানে—

সেখানে দিনে-দুপুরেই নরম কাদার ভেতর থেকে দু-তিনটে শেয়াল কী যেন টেনে তুলছিল। বুনোরা পাশে ডিঙি ভিড়োতেই শেয়ালেরা ছুটে পালালো। তখন দেখা গেল কলমীর ফুল রক্তে মাখা, হোগলার বনে রক্তের ছিটে, জায়গায় জায়গায় কাদার রঙ পোড়া ইটের মতো লাল। আর দেখা গেল প্রায় উলঙ্গ একটা মানুষের শরীর—টকটক করছে গায়ের রঙ—এক মাথা ছড়ানো চুলের গদীর ওপরে যেন শুয়ে আছে সে—তার দীর্ঘ সাদা গলাটার বারো আনা অংশ মুরগী জবাই করার মতো নিপুণ হাতে কাটা।

তাদের আকাশ ফাটানো চিৎকারে দু-মিনিটে গ্রামের সব লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। আমাদের স্কুলে ছুটি হয়ে গেল, পোস্টমাস্টার ছুটে এলেন ডাকঘর বন্ধ করে, এলেন ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার রায় জ্যাঠা, এল দফাদার, এল চৌকিদার। আরো কয়েক ঘণ্টা পরে দলবল নিয়ে দেখা দিলেন গৌরনদী থানার দারোগা।

সেই দুঃস্বপ্নের মতো বীভৎস দিনটার প্রত্যেকটা মুহূর্ত পর্যন্ত যেন আজ মনে করতে পারি।

দারোগা লাস দেখলেন, লোক তাড়িয়ে সেখানে পুলিস চৌকিদারের পাহারা বসালেন—তারপর সোজা চলে গেলেন বলরাম কাকার বাড়ি।

সেখানে নাকি পারুল কাকিমা বলেছিলেন, বলরাম কাকা চারদিন হল শিষ্যবাড়ি গেছেন। রাতের বেলা তারা মাসিমা কখন, কেন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আর ওই বাঁশবনেই বা কেন গিয়েছিলেন তা তিনি জানেন না। তারা মাসিমাকে কে খুন করতে পারে তা-ও তিনি বলতে পারেন না। তাঁদের কোনো শত্রু নেই। তারা মাসিমা তাঁর দূরসম্পর্কের বোন—বালবিধবা। এ সংসারে পাঁচ-ছয় বছর ধরে আছেন—তাঁর স্বামীই অনাথা দেখে নিয়ে এসেছিলেন। না—কোনো ঝগড়াঝাঁটি ছিল না, তারা মাসিমার সঙ্গে

বাইরের কোনো লোকের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা তাও তাঁর জানা নেই।

আরো কার কার সব জবানবন্দি নিয়ে দারোগা চলে গেলেন। সঙ্গের নৌকোয় চলল কলাপাতা আর কয়লার গুঁড়ো দিয়ে জড়ানো একটা অদ্ভুত জিনিস—শুধু কলাপাতার ফাঁক দিয়ে তা থেকে খানিকটা জট বাঁধা এলোচুল বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মাসিমার লাস।

বলরাম কাকা নাকি কী করে খবর পেয়ে দিন সাতেক পরে ফিরে এসেছিলেন। নৌকো থেকে নেমেই—কী সর্বনাশ হল—বলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পুরো তিন ঘণ্টা পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

দারোগা তাঁকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন গৌরনদী থানায়। বলরাম কাকা কী বলে এলেন জানি না, দারোগাকে আরো বার-দুই আমাদের গ্রামে দেখা গেল। তারপর সমস্ত ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ল। আর গ্রামের লোকের মুখে নানা জল্পনা ক্রমে ফিকে হতে হতে শেষ পর্যন্ত একেবারে মুছে গেল। তারা মাসিমা বলে কোথাও যে কেউ ছিল, আর তার গলা কেটে খুন করে তাকে হোগলা-কলমীর বনের তলায় পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, সেই কথাটা পর্যন্ত হারিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

আর আমার মনের সামনে ওই বাঁশবনটা যেন তার সমস্ত হিংস্র তাৎপর্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেই বনবেড়াল, সেই বেজির থাবায় খরিশ গোখরোর রক্ত মাখা ছেঁড়া-ছেঁড়া শরীর, সেই দুপুরের ভূতুড়ে হাওয়ার শুকনো পাতা আর বাঁশের শব্দ, কখনো বা ঘুণ ধরা বাঁশের ফুটো থেকে বাতাসের ধাক্কায় আর্তনাদের মতো একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনি—সব মিলে একটা যোগফল টেনে আনল।

তারা মাসিমার খুন।

এরপর থেকে ও-পথে চলাই আমি ছেড়ে দিলুম। নেহাৎ দরকার হলে দেড় মাইল ঘুরে ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ বোর্ডের কাঠের সাঁকো পার হয়েছি, কিন্তু ওই বাঁশবন দিয়ে আর নয়। আমি জানতুম—যে কোনো নির্জন দুপুরে যে-কোনো নিঃসঙ্গ বিকেলে একটা রাক্ষুসে দাঁড়কাক হঠাৎ খা-খা-খা করে ডেকে উঠলে ওই বাগানের ভেতর তারা মাসিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে। যে তারা মাসিমার গলার বারো আনা জবাই করার মতো কাটা, অথচ যার উগ্র নীল চোখ থেকে ঘৃণার হল্‌কা ছুটে আসছে আমার দিকে।

এইখানেই পারুল কাকিমার সঙ্গে সম্পর্ক আমার শেষ হতে পারত। হল না।

আরো এক বছর পরে একটি রাত। এগারোটা বেজে গেছে—গ্রাম ঘুমিয়েছে অনেক আগেই। শুধু খালের ধারে ধারে চাপবাঁধা জোনাকি—দূরে দুটো-চারটে দপ-দপানো আলেয়া, কোথাও বাঁশের সাঁকোর ওপর এত রাতেও হঠাৎ কেউ পার হয়ে যাচ্ছে—তার টর্চের আলো। জলের শব্দ, নৌকোর শব্দ, খালের জলে নুয়ে পড়া বনের ভেতর সাপ আর মাছের শব্দ, কুকুরের ডাক আর অনেক দূর থেকে চৌকিদারের আওয়াজ ঃ 'জাগো হো—জা-গো—'

আমি ঘাট থেকে খুলে নিয়েছি আমাদেরই একটা এক-মাল্লাই নৌকো। সেই নৌকোয় পারুল কাকিমা একা যাত্রী। আমি তাঁকে চুপি চুপি পৌঁছে দিতে চলেছি স্টীমারঘাটে। বলরাম কাকা বেরিয়েছেন শিষ্যবাড়ি—সেই ফাঁকে কাকিমা একবার মা-বাপকে দেখতে যাচ্ছেন।

আক্তারের হাতে চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডেকেছিলেন পারুল কাকিমা। যাব না বলে

প্রতিজ্ঞা করেও না গিয়ে পারিনি। সেই দেড় মাইল পথ ঘুরেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলুম।

পারুল কাকিমা বলেছিলেন ঃ তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু এরপরে আর কোনো দিন জ্বালাব না। এবার শুধু একটুখানি উপকার কর আমার—তুই আমায় স্টীমারঘাটে পৌঁছে দে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমি দত্তদের ঘাটলার কাছে হিজলতলায় দাঁড়িয়ে থাকব, তুই ডিঙি করে এসে আমায় তুলে নিবি।

আমার খটকা লেগেছিল ঃ বাপের বাড়ি যাবেন—এত লুকিয়ে কষ্ট করে কেন?

—দরকার আছে। তুই বুঝতে পারবি না।

আমি চুপ করে গিয়েছিলুম। পারুল কাকিমা আবা.' বলেছিলেন, তোর বুঝি সাহস হচ্ছে না?

সাহস হচ্ছিল না, সত্যি কথাই। বুঝতে পারছিলুম সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। তবু সে-কথা আমি বলতে পারিনি। একটু পরে জবাব দিয়েছিলুম : আচ্ছা আসব।

চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে চুরি করে ডিঙি নিয়ে এসেছিলুম। দূর থেকে দেখেছিলুম, দত্তদের হিজলতলায় অন্ধকারে একটা সাদা কাপড় পরা মূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবারের জন্যে আমি চমকে উঠেছিলুম, একবারের জন্যে মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে যদি দেখি পারুল কাকিমার বদলে তারা মাসিমাই ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? যদি—

ঘাটে নৌকো ভিড়োতে প্রথমে আমার সাহস হয়নি। কিছুক্ষণ আমি ইতস্তত করেছিলুম। তারপর খালের পশ্চিম দিকে ডুবে যাওয়া চাঁদের এক ঝলক রাঙা আলো হঠাৎ এসে হিজলতলায় পড়ল, আমি পারুল কাকিমাকে চিনতে পারলুম।

নৌকো কাছে এগিয়ে নিয়ে এলুম। সম্পূর্ণ পাড়ের কাছে আনবার আগেই পারুল কাকিমা এগিয়ে এলেন—উঠে পড়লেন পাটাতনে, শুধু একটি কথা বললেন, চল্—

—স্টীমারঘাটে যাব তো?

—হুঁ, স্টীমারঘাট।

—কিন্তু এত রাতে তো স্টীমার নেই।

—সকালে আছে। রাতটা বসে থাকব ওখানেই।

খালের জলে জোয়ার-ভাঁটা থম থম করছিল। আমি বৈঠাতে টান দিয়ে বললুম, কিন্তু কোথায় বসে থাকবেন কাকিমা? নদীর ধারে তো একটা চালাঘর ছাড়া কিছুই নেই। ঘাটবাবুর ঘর বন্ধ—সকালের আগে সে আসবে না।

—চালাঘরেই বসে থাকব।—নৌকোর ছইয়ে ঠেসান দিয়ে, হাতের ছোট পুঁটলিটা কোলের ওপর রেখে পারুল কাকিমা বললেন, আমার কাছে এখন সব সমান।

বাপের বাড়ি যাওয়ার মতো গলার সুর এ নয়। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, খালের এই কালো জল যে নদীতে গিয়ে পড়েছে, সে নদী কোথায় কোন্ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে সে-কথা যেমন কেউ জানে না, তেমনি পারুল কাকিমার খলিশাকোটাও এই রাত্রে—এই অন্ধকারে যেখানে তলিয়ে আছে, বাখরগঞ্জ জেলার কোনো ভূগোল আজও তার সন্ধান পায়নি।

চমকে বৈঠা তুলে নিয়ে আমি বললুম, পারুল কাকিমা, ফিরে চলুন।

—না।

—আমার ভয় করছে।

—তবে তুই নেমে চলে যা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, নৌকো বাইতে জানি। আমিই নৌকো নিয়ে যাব।

এরপরে আর আমি কথা বাড়াইনি। খালের জলে ভাঁটার টান এসেছে, নৌকো এগিয়ে চলেছে, পশ্চিমের গাছপালার আড়ালে চাঁদ ডুব দিয়েছে। এখন জলের গন্ধ, কাদার গন্ধ, ভিজে গাছপালার গন্ধ, মাছের শব্দ, সাপের শব্দ, নৌকোর শব্দ, স্রোতের আওয়াজ, কুকুরের ডাক। চৌকিদারের হাঁক আর শোনা যায় না। আকাশে তারা জ্বলছে, ঝোপে জোনাকি জ্বলছে কিন্তু বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে টর্চ হাতে আর কেউ পার হয়ে যাচ্ছে না।

এখন শুধু আমাদের ডিঙা। আমি আর পারুল কাকিমা। আর রাত্রির পৃথিবী।

বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে ওই অন্ধকারের ভেতরেও নদীর সাদা বুকটা সামনে জ্বলে উঠল। বৈঠার আরো কয়েকটা টানে আমি একেবারে নদীর ভেতরে এসে পড়লুম। ঘুমন্ত গ্রামের ভেতর থেকে কুকুর ডেকে উঠল, নৌকোর সামনেই আমাকে চমকে দিয়ে পর পর দুটো শুশুক উল্‌সে গেল।

নদীর ওপার নিশ্চিহ্ন—এপারের কালো কালো গাছপালার সার নিথর। কী আশ্চর্য রাত—এত বড়ো নদীর বুকেও এতটুকু হাওয়া নেই, চারদিক যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। জলের ওপর অসংখ্য তারা দুলছে, ফুলছে— ভেঙে ভেঙে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দিয়ে হাল ধরে বসে আছি—যেন নদী নয়—অদৃষ্টের স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে পারুল কাকিমা আবার কথা কইলেন।

—যেদিন সমস্ত রাত ওর রক্তমাখা কাপড় কেচেছিলুম—সে রাতও এমনি—

আমার হাতের হাল কেঁপে উঠল, একটা দারুণ ঝাঁকুনি লাগল নৌকোয়, কোথা থেকে মস্ত একটা কাঠের গুঁড়ি এসে ডিঙিতে ধাক্কা দিয়েছে। আমি বললুম, পারুল কাকিমা!

পারুল কাকিমা প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, কী করব—বল্? তান্ত্রিক স্বামীর পুণ্যের ভাগ নিতে হবে না?

আমার মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ চমকে গেল ঃ তবে কি বলরাম কাকাই তারা মাসিমাকে—

পারুল কাকিমা জবাব দিলেন না।

—কিন্তু বলরাম কাকা যে শিষ্যবাড়িতে—

—সন্ধ্যেবেলা লুকিয়ে চলে এসেছিলেন। দিদিকে বলেছিলেন, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখব যেখানে কেউ জানতে পারবে না। তন্ত্রসাধনার ফল ফলেছিল কিনা—দিদি যে ওঁর ভৈরবী হয়েছিল!—পারুল কাকিমার গলায় কেউটে সাপের ফোঁসানির মতো আওয়াজ উঠতে লাগল ঃ একজন না চাইতেই সন্তান পেল, তাই মরতে হল তাকে। আর একজন সাত বছর চেয়েও পেল না—তাই তাকে বেঁচে থাকতে হল, বেঁচে থাকতে হল মরবার সাহস নেই বলে।

এক মুহূর্তে সমস্ত জিনিসটা তার কুৎসিত উলঙ্গ সত্যটা নিয়ে আমার সামনে ফুটে

উঠল। মনে হল, নৌকো থেকে এখনি মাথা ঘুরে আমি পড়ে যাব জলের ভেতর। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে অসংখ্য তারা ফুলছিল, দুলছিল, ভেঙে ভেঙে একাকার হয়ে যাচ্ছিল—আমার চোখের সামনে তারা চাপ চাপ রক্তে পরিণত হয়ে গেল। আমি শুধু বিকৃত গলায় একটা চিৎকার করলুম।

পারুল কাকিমা আবার বললেন, অনেক বেশি পুণ্য নিয়ে ও-বাড়িতে আমাকে জোর করে বাঁচতে হয়েছিল। এবার দেখব সব পুণ্যের বোঝা নামিয়ে মরে বাঁচতে পারি কিনা। অন্তু, নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে দে।

—সে কি কাকিমা! এ তো স্টীমারঘাট নয়!

—তা হোক, এখানেই আমি নামব। স্টীমারের দ'কার নেই, এখান দিয়ে গয়নার নৌকো যায়—তাতেই আমি চলে যাব।

—পারুল কাকিমা, মেয়েরা তো গয়নার নৌকোয়—

—কথা বাড়াসনি, আমাকে নামিয়ে দে এখানেই।

—আপনার ভয় করবে না?

—না, ভয় আমার কাউকেই নেই।

আমি শেষবার বললুম, পারুল কাকিমা, আপনি সত্যিই কি খলিশাকোটায় যাবেন?

পারুল কাকিমার শুকনো একটা হাসির আওয়াজ আমার কানে এল ঃ হ্যাঁ, খলিশাকোটাতেই আমি যাব।

আজ কত বছর পরে সেই দিনগুলোকে যখন ভাবছি, তখন আরো মনে পড়ছে, খলিশাকোটার পথ ওদিকে ছিল না। যে স্রোত অজানা সমুদ্রে যায়—সেই স্রোতেই পারুল কাকিমা ভেসে গিয়েছিলেন। আর যে জল একবার চলে যায় সে যেমন কখনো ফেরে না, তেমনি পারুল কাকিমাও আর আমাদের গ্রামে কখনো ফিরে আসেন নি।

শুধু আমি ভোর হওয়ার আগেই নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলুম। বলরাম চক্রবর্তীর স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়া নিয়ে গ্রামে যে তুফান উঠেছিল, তাতে একটি কথাও আমি বলিনি।

তারপর আজ কালীঘাটে এই বুড়ীকে আমি দেখলুম।

দুটো মুখের রেখায় কি মিল আছে? হয়তো আছে—হয়তো নেই।

পারুল কাকিমা কেন এসে শেষে ভিক্ষার জন্যে হাত পেতেছেন কালীঘাটে? তান্ত্রিক স্বামীর পুণ্যফলই কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে?

মন মানতে চাইল না। যে ঋণ শোধ করবার জন্যে পারুল কাকিমা সেই অন্ধকারের পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেই ঋণ কি সারাজীবনেও তাঁর শোধ হবে না? হতে পারে না, এমন হতেই পারে না।

তার চাইতে অন্ধকারের নদী বয়ে চলুক সমুদ্রে। সেই সমুদ্রে সব জল, সব প্রাণ, সব ঋণ মুক্তি পায়। পারুল কাকিমাও নিশ্চয় সেই সমুদ্রেই তাঁর বোঝা নামিয়ে দিতে পেরেছেন—পেয়েছেন তাঁর ছুটি।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে

সবসুদ্ধ পাঁচজনকে সই করতে হল ফর্মটায়। পাত্র-পাত্রী, আর তিনজন সাক্ষী।

ছেলেটি খুব জোরালো ভাবে সই করল, সাধারণত এত বড়ো করে নিজের নাম সে কখনো লেখে না। যেন আজকে অনেক বেশি স্পর্ধার সঙ্গে পৃথিবীর কাছে নিজেকে ঘোষণা করল সে, কালো কালিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল ঃ অংশুমান রায়। মেয়েটির ছোট কলমটিতে বোধ হয় কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল, হিমানী নিয়োগীর শেষ দীর্ঘ ঈ-কারটা কেবল একটা আঁচড় কাটল কাগজের ওপর। নিশীথ সই করল ইংরেজিতে, তার পরনে স্যুট ছিল আর ঝুঁকে সই করবার সময় গলার টাই-টা কলমের মাথায় দুলছিল। সুধাকান্ত বেশ ধরে ধরে নাম লিখল, পাশে লিখল এম.কম্। আর বাংলায় এম.এ. পড়া ছেলেটি সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'য়'-টাকে হাতির শুঁড়ের মতো বাঁকিয়ে দিয়ে যেন একটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসতে চাইল।

প্রথম পর্ব শেষ হল এইখানেই।

রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে পাঁচজন যখন বেরিয়ে এল, তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ যেন বাতাসে কাঁপছে। পার্কের বেমানান আমগাছটার একরাশ রূপালি মুকুল সোনা হয়ে গেছে, নিমগাছের হলুদ পাতাগুলো ফাল্গুনের কিশলয়কে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সোনার কুচির মতো ঝরে পড়ছে। সামনে পুকুরের জলে চারটে রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে আর পার্কের শেষ সীমায় সারবাঁধা কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া রক্ত-রঙিন দিগন্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হিমানী নিয়োগী এইমাত্র ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে যে 'রায়' হয়ে বেরিয়ে এল, সে পার্কের দিকে চোখ মেলে কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমের মুকুল সোনা হয়ে গেছে—নিমের শুকনো পাতাগুলো সোনার কুচি হয়ে ঝরে যাচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে এই সোনা? একটু পরে রাত আসবে—সব কালো হয়ে যাবে তখন। ভাবতে ইচ্ছে করে ওই কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর পরেই একটা অন্তহীন অরণ্য শুরু হয়েছে, আর খানিক বাদে এই চারটে রাজহাঁস সেই দূর বনের মধ্যে কোনো দুর্গম জলায় উড়ে চলে যাবে। কিন্তু হিমানী জানে, কৃষ্ণচূড়া গাছের পরেই সারি সারি লোহার রেলিং; আর তারপরেই—অনেক, অনেক দূর পর্যন্ত উদ্ধত কঠিন কলকাতা—একটা নেশাখোর বেদের সর্বাঙ্গে সাপের পাকের মতো কালো পথের বাঁকে বাঁকে জড়ানো।

মেয়েটির স্তব্ধতার ছোঁয়া লেগে বাকী চারজনও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শেষে নিশীথ একটুখানি কাশল, সুধাকান্ত একবার তাকাল হাতের ঘড়িটার দিকে।

নিশীথ বললে, এবার বরং চলি অংশু। একটা পার্টি বিশ হাজার টাকার ইন্শিয়োর করাবে—সাড়ে সাতটায় টাইম দিয়েছে।

সুধাকান্ত একটা রাতের কলেজে কমার্স পড়ায়। সে বললে, আমারও ভাই ক্লাস আছে—সাতটায়।

শুধু বাংলায় এম.এ. পড়া ছেলেটির কোনো তাড়া ছিল না। কালো ফ্রেমের চশমার পুরু লেন্সের নীচে মেয়েটির মতো তারও চোখদুটো ছায়াছায়া হয়ে গিয়েছিল। এই বিকেলের রোদে, হাওয়ায়, সোনার কুচির মতো পাতাঝরার ভেতরে, দূর অরণ্যের

সংকেতের মতো কৃষ্ণচূড়ার রক্তরঙে আর মেয়েটির বিচ্ছিন্ন একাকীত্বে কতগুলো এলোমেলো ছবি ভাসছিল তার মনে। সে কবিতা লেখে।

কিন্তু অংশু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—আরে তা কি হয়! একটু চা না খাইয়ে ছাড়বে কী করে? ফ্লোরা কাফেতে ব্যবস্থা করেই রেখেছি। চলো—চলো—

ফ্লোরা কাফে কাছেই। নতুন সৌখীন ধরনের রেস্তোরাঁ। তারই দোতলার একটা কেবিনে গিয়ে ঢুকল পাঁচজন। কাঠের পার্টিশনের গা থেকে এখনো চাপা বার্নিসের গন্ধ, ওয়াল পেপারে এখনো দাগ ধরেনি, পর্দাটা এখনো দক্ষিণী সমুদ্রের মতো নিবিড় নীল, টেবিলের ওপর পুরু কাচের আবরণটা এখনো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। সাদা বকের মতো পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর।

চপ-কাটলেট, মাংস-রুটি, পুডিং, চা। খুব খুশি হয়ে খেল নিশীথ, সুধাকান্ত। অংশুও কিছু খেয়ে নিলে, সারাদিন ঘোরাঘুরি করে দারুণ খিদে পেয়েছিল তার। চায়ের ভেতরে এক টুকরো রুটি ভিজিয়ে হিমানী চুপ করে বসে রইল আর সুমন্ত পুডিংটা ছাড়া আর কিছুই খেল না। খাওয়া হলে সুধাকান্ত আবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো, নিশীথ আর সুধাকান্ত দুটো সিগারেট ধরালো, দুজনেই একসঙ্গে বললে, আসি ভাই। চলি মিসেস রায়।

মিসেস রায় কথাটা প্রথমে যেন হিমানী বুঝতে পারল না, তারপর সজাগ হয়ে উঠল। অল্প একটু হাসল, আলতোভাবে হাত দুটো জড়ো করে নমস্কার জানাল।

—উইশ্ ইয়ু এ হ্যাপি ম্যারেড লাইফ—নিশীথ বললে। সুধাকান্ত একটু ঘুরিয়ে, আর একটু বিশেষণ দিয়ে বললে, হ্যাপি অ্যাণ্ড প্রস্‌পারাস কন্‌জুগাল লাইফ। বাংলায় এম.এ. পড়া ছেলেটি—সুমন্ত মুখোপাধ্যায় বললে, আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তিনজনেই বেরিয়ে গেল ফ্লোরা কাফে থেকে। নিশীথ ভবানীপুরে চলল তার বিশ হাজার টাকার পার্টির সন্ধানে, সুধাকান্ত একটা পানের দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে পকেটের ছোট চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়ে কলেজের দিকে রওনা হল। আর সুমন্ত মুখোপাধ্যায় এস্‌প্ল্যানেডের একটা ট্রামে উঠে পড়ল—গড়ের মাঠের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘাসের ওপর শুয়ে থাকবে সে, তারপর বাড়ি ফিরে এই মেয়েটিকে নিয়ে একটা উজ্জ্বল আর গভীর কবিতা লিখবে।

ফ্লোরা কাফের ওয়াল পেপারে নতুন ফুলগুলো ঝকঝক করছিল আলোয়, মাথার ওপর বকের মতো সাদা পাখাটা ঘুরে চলেছিল, নতুন বার্নিশের গন্ধ ছড়াচ্ছিল একটা চাপা মাদকতা নিয়ে। দক্ষিণী সমুদ্রের মতো নিবিড় নীল পর্দাটার ঢেউ উঠছিল। হিমানী সেই দিকে চোখ মেলে মগ্ন হয়ে বসেছিল।

অংশু হিমানীর একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর ভেতরে।

—আজকের দিনটা যে সত্যিই আসবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মুখ ফিরিয়ে হিমানী ক্ষীণ রেখায় হাসল।

—স্বপ্নে কেউ ভাবতে পারে না। ও কথাটা মানুষে বানিয়ে বলে।

—কিন্তু তোমাকে যে সত্যিই পাব—

হিমানী সামনে থেকে ভিনিগারের শিশিটা আলতোভাবে সরিয়ে দিল ঃ আমাকে কি মিথ্যে করেই পেতে চেয়েছিলে তা হলে?

—ঠাট্টা নয়—অংশু যেন আহত হল একটুখানি ঃ কতদিন ধরে আজকের এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছি বলো তো?

—আবার কতদিন ধরে এই মুহূর্তটির জন্যে তোমায় অনুতাপ করতে হবে—কে জানে।

অংশুর মুখের রং বদলালো এবার, কপালে ছায়া পড়ল। হিমানীর হাত থেকে তার মুঠোটা আলগা হয়ে আসতে চাইল।

—তোমার কী হয়েছে হিমানী?

—রাগ করলে? মাপ করো আমাকে।—অনুতাপের ছোঁয়ায় হিমানীর মৃদু গলা আরো নম্র আর স্নিগ্ধ হয়ে এল ঃ হয়তো সারাদিনের ক্লান্তি, হয়তো মনের ওপর বড্ড বেশি চাপ পড়েছিল। কী যে বলেছি, নিজেই ভালো করে বুঝতে পারছি না।

—তোমার দোষ নেই।—অংশু লজ্জিত হল ঃ এ রকম অবস্থায় কারো নার্ভ ঠিক থাকে না।

—কিন্তু নার্ভ ঠিক রাখবার সময় তো আসছে। এর পরেই তো ঝড় আসবে।

—আসুক, গ্রাহ্য করি না।

কথাটা অনেকখানি জোর দিয়ে বলল অংশু, যেমন করে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে সই করেছিল রেজিস্ট্রেশন ফর্মটায়। কিন্তু মনটা থমকে দাঁড়ালো। কড়া মেজাজের ব্যবসাদার বাপের ছেলে অংশু—এবং পুত্র হিসেবে একতম নয়। আরো বড়ো দু ভাইয়ের সঙ্গে বাপের ব্যবসা দেখাশুনো করে, সামান্য কিছু অ্যালাউয়েন্স পায়। অর্থাৎ নিজের পায়ে পুরো জোর তার নেই। তার হিমানীর বাবা তাদেরই ফার্মের একজন ছোটখাটো কর্মচারী—অংশুর বাবা অফিসে ঢুকে যার সশ্রদ্ধ অভিবাদন পর্যন্ত লক্ষ্য করেন না।

অংশুর বাবা ক্ষেপে উঠবেন—কী কাণ্ড করে বসবেন এখনো বলা যায় না। চাকরি হারানোর ভয়ে তার চাইতেও বেশি ক্ষেপে উঠবেন হিমানীর বাবা, মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই স্বীকার করতে চাইবেন না হয়তো। হ্যাঁ, ঝড় আসছে। আর তার জন্যে শরীরের সমস্ত স্নায়ুকে ধনুকের ছিলের মতো টেনে রাখতে হবে; মেরুদণ্ডকে লোহার মতো শক্ত করে খাড়া রাখতে হবে মাথা। সেই কঠিন পরীক্ষার আর দেরি নেই।

হিমানীর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আলাপটা ঘটে গিয়েছিল অংশুর। সে দু-বছর আগেকার কথা। একদল বন্ধুর সঙ্গে অংশু পিকনিকে গিয়েছিল খড়দাতে। সেইখানেই রাস্তায় তাদের কর্মচারী মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা।

—মন্মথবাবু যে!

—আমি তো এখানেই থাকি। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করি।

—জানতুম না তো।—অফিসের টেবিলে যে মন্মথবাবু একরাশ ফাইল সামনে নিয়ে সারাদিন ঘাড় গুঁজে বসে থাকেন আর বাবা কিংবা দাদা ঘরে পা দিলেই যিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান, তাঁরও যে ঘরবাড়ি আছে আর তিনি খড়দায় থাকেন, এই খবরটা অংশুর কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হল।

মন্মথবাবু বিনীতভাবে হাসলেন, হাতও কচলালেন একবার।

—আপনার বাড়ি কত দূরে?

—বাড়ি নয়, বাসা। কাছেই।

—চলুন, ঘুরে আসি।

—আজ্ঞে, গরীবের কুঁড়েয়—মন্মথবাবু সংকুচিত হয়ে উঠলেন।

—চলুন—চলুন, এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক বাজারে চলেছিলেন, থলেটা কোঁচার আড়ালে লুকিয়ে অংশুকে নিজের বাসায় নিয়ে এলেন। ছোট সাধারণ বাসা, পুরোনো একতলার দুখানা ঘর। তবু সামনে একটি ছোট বাগান, তাতে নানা রঙের অজস্র দোপাটি, একরাশ পুলকিত চন্দ্রমল্লিকা।

—বাঃ, বেশ বাগানটি তো।

—আমার মেয়ের সখ।

পরিচয় হল মেয়েটির সঙ্গে। শ্যামবর্ণা দীর্ঘচ্ছন্দা একটি সপ্তদশী। বড়ো বড়ো দুটি গভীর চোখ। কোঁকড়া চুলের গোছা কোমর ছাপিয়ে নেমে পড়েছে।

মেয়ের জন্যে মন্মথবাবুকে একটুখানি গর্বিত মনে হল। বিনীত ভীরু মুখের ওপর যেন আত্মমর্যাদার আলো জ্বলে উঠল খানিকটা।

—হিমানী আমার বড়ো ভালো মেয়ে। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে। সুন্দর গান গায়।

হিমানীর তৈরী এক পেয়ালা চা খেলো অংশু, গান শুনল ঃ 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে, কেউ তা জানে না।' কলকাতায় ফিরে এসেও বড়ো বড়ো নিবিড় চোখ দুটোকে ভুলতে পারল না, মনের ভেতর বাজতে লাগল ঃ 'তোমার মত এমন টানে কেউ তো টানে না।'

কয়েকদিন পরে হিমানীর কলকাতার কলেজের ক্লাসে একখানা স্লিপ এল ঃ অংশুমান রায়।

দু বছর কাটল। আরো দু বছর কাটতে পারত, এম.এ. পাস করতে পারত হিমানী, এর ভেতরে নিজের শক্তিতে কোথাও দাঁড়াবার মতো জায়গাও করে নিতে পারত অংশু। কিন্তু আর সময় পাওয়া গেল না। মন্মথবাবু খবর আনলেন পলতায় একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া গেছে, সরকারী চাকরি করে, ট্রেনে যাতায়াতের সময় হিমানীকে দেখে পছন্দ করেছে, দাবি-দাওয়া নেই। অতএব ফাল্গুনের আটাশে তারিখেই—

অংশুর বাবার কাছে দরবার করা নিরর্থক, মন্মথবাবুকে বলা আরো অসম্ভব। সুতরাং সাতদিনের মধ্যেই যা করবার করে নিতে হল। আজ দশই ফাল্গুন।

হিমানী বলেছিল, আমার জন্যে কেন নিজের সর্বনাশ করতে যাচ্ছ?

—সর্বনাশ করতে যাচ্ছি না। 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট।'

—ও তো কবিতা। তোমার বাবা কখনো আমাকে ঘরে নেবেন না।

—আমরা নতুন ঘর গড়ব।

—তাতে দুঃখ আসবে।

—অনেক বেশি করে পেতে গেলে দুঃখের দাম তো দিতেই হবে।

—কিন্তু আমি কি সেই দাম দেবার যোগ্য?

হিমানীর কপাল থেকে কয়েকটা ঝুরো চুল সরিয়ে দিয়ে অংশু বলেছিল, আমার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে পেলে বুঝতে পারবে।

কিন্তু সেই সব সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলবার পালা ফুরিয়ে গেছে এখন। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সইটা করবার পর থেকে কোনো কথাই আর রাঙিয়ে উঠছে না। অংশুর মন ক্ষীণ আশায় বলছে, মা-কে কিংবা বড়বৌদিকে দিয়ে আস্তে আস্তে বাবাকে বলানো যাবে,

হয়তো নরম না হয়ে পারবেন না। আর হিমানী ভাবছে, পার্কের রোদের সোনা এতক্ষণে মুছে গেছে, কৃষ্ণচূড়ার রক্তসীমান্তের ওপারে কোনো অরণ্য নেই—যেখানে সকলের চোখ থেকে হারিয়ে যাওয়া চলে; গাছগুলোর পরেই সারি সারি লোহার রেলিং বল্লমের মতো খাড়া হয়ে আছে—তারপরেই কোনো মরা বেদের শরীরে অজগরের পাকের মতো কালো কালো রাস্তা দিয়ে বাঁধা কঠিন কলকাতা!

দুজনের ভাবনার মধ্যে দিয়ে অনেকখানি সময় নিঃশব্দে পার হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অংশুই হেসে উঠল জোর করে।

—কী আশ্চর্য, আজকের এই দিনটাতে আমরা গুমি হয়ে যাচ্ছি!

হিমানীও হাসতে চেষ্টা করল।

—এমন ভাবে ঘরে বসে থাকলে ভালো লাগে নাকি? চলো, বেরুনো যাক।

—চলো।

কাফে থেকে দুজনে বাইরে নামল। পথে বসন্তর হাওয়া মাতলামো করছে। কোথায় যেন হিন্দুস্থানীরা ঢোল-করতাল বাজিয়ে শুরু করে দিয়েছে হোলির গান। নিঃশব্দে দুজনে খানিকটা পথ পেরিয়ে আবার পার্কটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আলো-অন্ধকারে এখনো নিমের পাতা ঝরছে, রূপালি আমের মুকুলগুলো ঝিকমিক করছে এখনো। চারটে রাজহাঁস জড়ো হয়ে আছে পুকুরটার ঠিক মাঝখানে। কৃষ্ণচূড়ার রং আর চোখে পড়ছে না।

—বসবে পার্কে?—অংশু জানতে চাইল।

—কী হবে বসে থেকে?—হিমানী কোনো উৎসাহ খুঁজে পেল না।

—সিনেমায় যাবে?

—শো অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।

—সেকেণ্ড শো দেখব।

—ফিরব কী করে? এগারোটা বেজে যাবে, ট্রেন পাব কোথায়?

—না-ই বা ফেরা হল।—অংশু একখানা হাত রাখল হিমানীর কাঁধের ওপর ঃ আমার পকেটে আছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট আর দুশো টাকা। আমরা স্বামী-স্ত্রী। চৌরঙ্গীর কোনো বড়ো হোটেলে গিয়ে ঘর নেব।—অংশুর গলার স্বরে নেশা ফুটে বেরুল ঃ সেইখানেই প্রথম বাসর হবে আমাদের।

—না—না—না!—একটা অমানুষিক ভয়ে শিউরে উঠল হিমানী।

—না কেন? আমরা স্বামী-স্ত্রী। একটা কথাও বলতে পারে, পৃথিবীতে এমন সাহস কারো নেই।

—তা হোক, আজ ক্ষমা করো আমাকে। আজকে আমি কিছুতেই ও-সব ভাবতে পারছি না।

নিজেই কি সম্পূর্ণভাবে ভাবতে পারছে অংশু? মনের ভেতর একটা করে ঢেউ উঠছে, তারপরেই সামনের একটা পাহাড়ের প্রাচীরে আছড়ে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে সেটা। সে যদি আজ রাতে বাড়ি না ফেরে—তা হলে? বাবা থানায়, হাসপাতালে টেলিফোন করবেন—সমস্ত রাত গাড়ি নিয়ে সারা কলকাতা চষে বেড়াবেন। আর হোটেল? সেখানকার বাসর-রাত্রিটাই কি খুব মনোরম হয়ে উঠবে? সঙ্গে জিনিসপত্র

নেই—সোজাসুজি হোটেলে গিয়ে উঠলে সেটা কিরকম চেহারা নেবে ওদের চোখে? এক রাতের জন্যে যারা ঘরভাড়া নেয়, তাদের ওরা কী মনে করে? প্রত্যেকটা বয় বাবুর্চি সুইপারের দৃষ্টির তলায় যা ঝকমক করে উঠবে, সেই অশ্লীল কৌতূহলকে সে ঠেকাবে কোন্ উপায়ে? সকলের চোখের সামনে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা মেলে ধরে সে কি চিৎকার করে বলতে পারবে ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমরা বিবাহিত, আমাদের ভেতরে এতটুকুও পাপ কোথাও নেই?

ঠিক কার ওপর বুঝতে পারল না, একটা অক্ষম ক্রোধে একবার দাঁতে দাঁতে চেপে ধরল অংশু। তারপর বললে, চলো তবে, তোমাকে একটা গয়না কিনে দিই।

—আংটি তো দিয়েইছ, আবার কেন?

—ও তো বিয়ের আংটি। একটা গয়না প্রেজেন্ট করতে চাই তোমাকে।

—সে সুযোগ তো পড়েই আছে সামনে। তা ছাড়া বাবার কাছে কথাটা আজই বলতে পারব না—দু-একদিন সময় লাগবে মনটাকে তৈরী করে নিতে। তোমার গয়নার কৈফিয়ত আজ আমি দিতে পারব না।

আবার দাঁতে দাঁতে চাপল অংশু। যতক্ষণ রেজিস্ট্রি হয় নি কী অদ্ভুত উন্মাদনা ছিল ততক্ষণ। কাউকে ভয় করি না, কোনো বাধাই এখন আর আমাকে রুখতে পারবে না। সারা পৃথিবীর সঙ্গে এখন আমি একাই যুদ্ধ করতে পারি। আশ্চর্য, মনের সেই উদ্দাম শক্তিটা যেন এই মুহূর্তে একটা শিথিল অবসাদের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়েছে। যেন অনেকখানি পথ উল্কাবেগে ছুটে গিয়ে একটা দুরন্ত বুনো ঘোড়া এখন থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে তার।

আর সেই অবসাদের ওপর ছায়া নামছে। নিজের মনের ভেতর দুঃসাহসের যে আলো জ্বলছিল এই সাতদিন ধরে, আজ তার ভেতরে সারি সারি ছায়া পড়ছে এসে। বাবার ছায়া। কালকের ছায়া। ভবিষ্যতের ছায়া।

হতাশ গলায় অংশু বললে, আজকের রাত কি আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না হিমানী?

হিমানী হাসল ঃ কেন কাজে লাগবে না? সাতটা দিন তো পাগলের মতো কাটালে—আজ বাড়ি ফিরে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমোও গে। ভয় কি—আমি তো আর পালাতে পারব না।

—ঠাট্টা করছ না তো?

—ঠাট্টা করব কেন?—হিমানীর গলা মমতায় ভরে উঠল ঃ এ কদিন নিজের চেহারা তো তুমি দেখতে পাওনি, আমি দেখেছি। গলার হাড় বেরিয়ে এসেছে, কালি পড়েছে চোখের কোণায়। আজ এখন বাড়ি ফিরে যাও—ভালো করে বিশ্রাম করো।

—আর তুমি?

—আমিও তাই করব।

—তারপর?

—কাল কলেজের পরে আবার দেখা হবে। আজকের ভাবনা আবার কাল তুলে নেব দুজনে। সামনে যে ঝড় আসছে, তার জন্যে তৈরী হতে থাকব। এখন চলো স্টেশনে, আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে।

শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল অংশু, পার্কের রেলিংটা এমনভাবে চেপে ধরল যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে সে। বললে, আচ্ছা।

তারপর নৈহাটি লোকাল যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, যখন হিমানীর চলে যাওয়ার চিহ্নটা দুটো লাল আলো হয়ে জ্বলতে জ্বলতে জোনাকি হয়ে মিলিয়ে গেল, তখন ফাঁকা একটা বেঞ্চির ওপর ঝুপ করে বসে পড়ল সে। এই সাতটা দিনের ক্লান্তি আর ভাবনার ভার তন্দ্রার মতো তার মাথাটাকে বুকের দিকে টেনে নামাতে লাগল, তার মনে হতে লাগল, বেঞ্চির তলায় জমে থাকা একরাশ কালো ছায়া যেন হাত বাড়িয়ে তার পা দুটোকে কোন্ পাতালের দিকে আকর্ষণ করছে। তার ভবিষ্যতের ছায়া।

আর প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে অংশু যখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ট্রেন থেকে নেমে একটা রিক্শায় উঠেছে হিমানী। স্টেশন থেকে প্রায় মাইলখানেক যেতে হয়। অন্যদিন হলে বাসে যেত, আজ রিকশা নিয়েছে। বাড়ি পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত যতটুকু সময় পাওয়া যায়—যত বেশিক্ষণ ভাবতে পারা যায়।

রাত প্রায় নটা বাজবে পৌঁছোতে। কলেজ থেকে ফিরতে এত দেরি হল কেন, একটা জবাবদিহি করতে হবে তার। কোনো বান্ধবীর বাড়িতে পড়তে গিয়ে রাত হয়ে গেল, এমনি একটা কিছু সাজিয়ে বলতে পারলেই চলবে। বাবা কোনোদিন তাকে অবিশ্বাস করেন নি, আজও করবেন না।

পথের দুধারে বসন্তের বাতাস ঝড়ো হাওয়ার উল্লাসে বড়ো বড়ো অন্ধকার গাছের পাতা ঝরিয়ে চলেছে। চোখ বুজে এখন একটা মর্মরিত আদিম অরণ্যের কথা ভাবা যায়—যে অরণ্যে লক্ষ লক্ষ দৃষ্টির বাইরে অনায়াসেই হারিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু চোখ মেললেই আলো আর মানুষ। তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

হঠাৎ হিমানীর মনে হল, যে ভয়টা তাদের দুজনের ওপর আজ চেপে বসেছে, সে ভয় তার বাবাকে নয়, অংশুর বাবাকে নয়, চারদিকের এই লক্ষ শাণিতচক্ষু পৃথিবীকেও নয়। সে ভয় তার আর অংশুর নিজের মধ্যেই। সুধাকান্ত, নিশীথ আর সুমন্ত সরে যাওয়ার পর তাদের দুজনের মাঝখানে এখন আর কেউ রইল না। অসংখ্য মানুষ আর অনেক বাধার ভেতর দিয়ে দুজনে দুজনকে কিছু দেখেছে, কিছু দেখতে পায় নি। আর সেই না-দেখা-টুকুকে ঘিরে ঘিরে স্বপ্ন ঘনিয়েছে, জড়িয়েছে মোহের জাল। কিন্তু আজকে সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়ে দুজনে যখন একান্ত হয়ে দাঁড়ালো, যখন কোথাও কোনো আবরণ রইল না, তখনই তো যাচাই করবার পালা। তোমার আমার সেই সম্পূর্ণতা—যার ওপর কোনো কুয়াশা নেই—কোথাও আলো-আঁধারি নেই—সেই সম্পূর্ণ নগ্নতাকে তুমি আমি কি স্বীকার করতে পারব, সইতে পারব, ক্ষমায় প্রেমে ধন্য করে নিতে পারব? পারব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?

কে জানে! কে বলতে পারে!

রিকশার একপাশে নিজের একটা বিকৃত ছায়া কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গে চলেছে। ওই ছায়াটাকে অত্যন্ত খারাপ লাগল হিমানীর। তারপর মনে পড়ল, রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে বেরিয়েই তার সিঁথিতে একটা সিঁদুরের রেখা টেনে দিয়েছিল অংশু। লাল শাড়ীর আঁচল দিয়ে সেটাকে ঘষে ঘষে তুলতে লাগল হিমানী। শেষ চিহ্নটুকু সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে কপালটাকে ঘষে চলল সে, আর চাপা যন্ত্রণার একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ ছড়িয়ে যেতে লাগল তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

কুয়াশা

একটা ছোট কাঠবেড়ালী। সামনের নারকেল গাছ থেকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে নেমে এল। মোটা ল্যাজটাকে ডোরাকাটা পিঠের ওপর তুলে কোথায় যেন দৌড়ে চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ ঘাসের মধ্যে কী একটা খাওয়ার জিনিস দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড শুঁকল, তারপর সামনের পায়ে সেটাকে ধরে, পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে, কুটুর কুটুর করে খেতে লাগল, খুব সম্ভব ছেলেটিরই ছুঁড়ে দেওয়া একটা পোকাধরা চীনেবাদাম।

চাঁপা ফুলের গন্ধে দুপুরটা ঝিমঝিম করছে। একটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে মাথার ওপর চলে এল। ছেলেটি ভাবল—কোন্‌টাকে ধরবার চেষ্টা করা যায়? প্রজাপতি, না কাঠবেড়াল?

—খটাস্—খটট্! খটাস্—খট্—খট্—খট্—

ষোলো বছর আগেকার স্বপ্নটা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ পেল ডাক্তার। নিঃশ্বাস তার নিজের না ওই স্বপ্নটারই—ভালো করে বুঝতে পারল না। ডাক্তার চোখ মেলল।

ঘরের কোণের ছোট তেপায়াটার উপর গোল কেরোসিনের ল্যাম্পটা নিবে আসছে। মেনিন্‌জাইটিসের রোগীর চোখের মতো শিখাটার রঙ। মর্গের মতো হিমশীতল ঘরটায় কেরোসিন গ্যাসের অস্পষ্ট গন্ধ। বাইরে শব্দহীন নিথর রাত। আশ্চর্য এই দেশ—এখানে একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকে না!

আবার সেই খট্—খট্। সেই খটাস্—খট্—খট্—

অক্‌জিলিয়ারী হাসপাতালের অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জন ডাক্তার অমূল্য দত্তগুপ্ত নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিলে। হাসপাতালের সেই সার্জিক্যাল কেস্‌টার নিশ্চয় বাড়াবাড়ি হয়েছে কোনোরকম। মরতেই যদি হয়—বিছানা থেকে নামতে গিয়ে, নিজের অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা চটিটার ছোঁয়ায় শিউরে উঠে, ডাক্তার ভাবল : মরতেই যদি হয়, তা হলে অমন হাঁক-ডাক করা কেন? নিঃশব্দে ভালো ছেলের মতো কম্বলের তলায় শিঁটিয়ে থাকো। তারপর সকাল হোক—মুঠো মুঠো আলোয় চারদিক উষ্ণ হয়ে উঠুক, তখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে খবরটা পেলে ডাক্তার সহানুভূতির দু-চারটে নিঃশ্বাস ফেলতেও আপত্তি করবে না।

আবার সেই শব্দ। কলেজের সোস্যালে একবার শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের কয়েকটা দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল। ডাক্তারের তার পোর্টার সীনটা মনে পড়ল।

—উঃ, একটু বিশ্রাম দেবে না! আর এই শীতের ভেতরে। মানুষ খুন করতে ইচ্ছে করে।—দাঁতে দাঁতে ঘষে কথাগুলো আওড়ালো ডাক্তার, তারপর একটা আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে দরজাটা খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই যেন উত্তর মেরুর রক্ত-জমানো রাত্রি এসে ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আপাদমস্তক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ডাক্তারের।

না, হাসপাতালের বেয়ারা নয়—নার্সও নয়। অন্য লোক।

ত্রয়োদশীর চাঁদ ঝক ঝক করছে পশ্চিমের সারবাঁধা পাইন গাছগুলোর ওপর। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে এদিক ওদিক নড়ে বেড়াচ্ছে ধোঁয়ার সাপ—সামনের পাহাড়ী

খাদের ভেতর রূপালি পেঁজা তুলোর রাশি জমে উঠছে। কাল সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনালি রোদ এসে পাহাড়ে পড়বে না—নিশ্ছেদ নিবিড় কুয়াশা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জমাট হয়ে থাকবে।

কিন্তু কুয়াশার ভাবনা এখন থাক। কী চায় লোকটা? এমন অসময়ে?

—ব্যাপার কী? কে তুমি?—শীতে দাঁতে দাঁতে ঠকঠকিয়ে জানতে চাইল ডাক্তার।

—হুজুর, আমি বলবাহাদুর।—মাথা থেকে মাফলার সরে গেল লোকটির।

ডাক্তার চিনল। বত্রিশ নম্বর বাংলোর কীপার। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারকে সস্তায় মুরগীর যোগান দেয়—দুটো-চারটে ডিমও উপহার দিয়ে যায় কখনো কখনো।

—কী হয়েছে বলবাহাদুর? সাইলির অসুখ নাকি?—সাইলি বলবাহাদুরের স্ত্রী!

—না হুজুর, আমার খবর ভালো—রামরো। সাইলি গেছে তার বাপের বাড়ি। আমি এসেছি বাংলোর বুড়ো বাবুর কাছ থেকে। পায়ে ভাঙা শিশা ফুটেছে—খুব কষ্ট পাচ্ছে।

মনে পড়ল। আজ বিকেলে পোস্ট অফিস থেকে ফেরবার সময় চোখে পড়েছিল বত্রিশ নম্বর বাংলোর সামনে কালো রঙের একখানা মোটর দাঁড়িয়ে। আর বারান্দায় প্রকাণ্ড ডেক-চেয়ারে শাল জড়িয়ে শুয়ে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অলস কৌতূহলে একবার মাত্র চেয়ে দেখেছিল ডাক্তার। ছাড়াছাড়া বাংলোগুলোতে প্রায়ই দু-একটি অতিথির আবির্ভাব হয় এখানে। কিন্তু এখানকার অদ্ভুত নির্জনতা সইতে না পেরে দুদিন পরেই তাঁরা পালিয়ে যান দার্জিলিঙে। এখানকার লোকদের চেনবারও সময় পান না তাঁরা—এখানকার বাসিন্দারাও তাঁদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল রাখে না।

—কে বুড়ো বাবু? তোমার মালিক?

—জী, না। মালিকের কোনো দোস্ত, চিঠি নিয়ে এসেছে। হর সালই এমন আসে দো-চারজন। কিন্তু ডাক্তারবাবু, ছিট্রো আসুন। বাবু বড্ড ছট্‌ফট্ করছে।

ডাক্তার ভ্রূকুটি করল।

—ভাঙা কাচ পায়ে ফুটল কী করে? এত রাতে?

—আমি জানি না হুজুর। নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলুম। 'মাথি' থেকে বাবুর ড্রাইভারের ডাকাডাকি শুনে—

—কালকেই এই চাকরিতে রিজাইন দেব—ডাক্তার কঠোর প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিতে বললে, তারপরে ডাকাতের দল খুলে শীতের রাতে লোকের বাড়িতে ডাকাতি করব। রিভেনজ্!

ডাক্তারের চট্টগ্রামী বাংলায় স্বগতোক্তি বলবাহাদুর বুঝতে পারল না। বললে, জী?

—না, কিছু না। দাঁড়াও, তৈরি হয়ে আসছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরুল ডাক্তার। পাশের ঘরে ঘুমন্ত নেপালী কম্‌বাইণ্ড-হ্যাণ্ডটিকে আর জাগাতে চেষ্টা করল না, এখন কম্বলের তলা থেকে তার উত্থান ঘটাতে গেলে লোকটার কানের পাশে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ফাটানো দরকার। সে অস্ত্রটি ডাক্তারের হাতের কাছে কোথাও নেই, থাকলে বড় ভালো হত।

ওভারকোট চাপিয়ে, ব্যাগ হাতে করে ডাক্তার বেরুল। দরজায় তালা লাগালো একটা।

বত্রিশ নম্বর বাংলো প্রায় দুশো ফুট ওপরে। বেশ খানিকটা পথ—দু-তিনটে বিরক্তিকর খাড়াই। এই মাঝরাতে চমৎকার ভাগ্য বলতে হবে! কোথায় কার পায়ে ভাঙা কাচ

ফুটেছে—সঙ্গে সঙ্গে গরম বিছানা আর মিষ্টি স্বপ্নের মায়া কাটিয়ে ছুটতে হচ্ছে বিশল্যকরণে। ডক্‌টরস ডিউটি। অমূল্য দত্তগুপ্ত ভাবল—সত্যি সত্যিই তার ডাকাতের দল খোলা উচিত, এ ছাড়া আর প্রতিহিংসার পথ নেই। উঃ—দিস্‌ লাইফ্‌ ইজ্‌ সিম্‌প্‌লি টেরিব্‌ল।

রূপালি পেঁজা তুলোর রাশি খাদের থেকে ধীরে ধীরে আরো উপরে উঠে আসছে। জ্যোৎস্নার রঙ যেন একটু ফিকে—সাদা সাদা ধোঁয়ার সাপগুলো গায়ের ওপর দিয়ে খেলে যাচ্ছে তার। চাঁদের ওপরে ধরছে হলুদের আমেজ। টুপ করে কপালে একটা শিশিরের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল—শিউরে উঠল শিরাগুলো, একটা কটু গাল থমকে গেল ঠোঁটের প্রান্তে।

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পাহাড় ভাঙতে লাগল ডাক্তার। জ্যোৎস্নায় অকারণেই টর্চ জ্বেলে বলবাহাদুর পথ দেখিয়ে চলল সামনে।

একটা ঝিঁঝি কোথাও ডাকছে না—আশ্চর্য এই দেশ! দূরে কাছে পাইন গাছের ভূতুড়ে চূড়োগুলো এতটুকু নড়ছে না—তারাও যেন পাথর দিয়ে গড়া। ডাক্তার একবার বাঁ-দিকে তাকিয়ে দেখল। রংলির প্ল্যান্টেশনটা যেন আবছাভাবে চোখে পড়ে—কিন্তু মংপু ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণের মধ্যেই রংলি ছাড়িয়ে—নীচের ঢালু জায়গাটা পার হয়ে ওই কুয়াশা এসে এই ফৌজবাড়ির পাহাড়কেও ঢেকে ফেলবে—তখন নিজের হাতপাগুলো পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাবে না।

কী বিশ্রী শীত। এই রাতে ছাড়া কি লোকটার পায়ে কাচ ফোটবার আর সময় হল না?

ফৌজবাড়ির ছাড়া-ছাড়া জনহীন বাংলোগুলো জ্যোৎস্নায় হানাবাড়ির মতো পড়ে আছে। আরো উপরে রাক্ষসের মতো ঝুলে রয়েছে গভীর জঙ্গল—পাহাড়ীদের ক্ষেতে ভুট্টা বড় হয়ে উঠলে কখনো ওখান থেকে শুয়োর আসে, ভালুক নামে। এই সময় তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলে কেমন হয়?

ডাক্তার জোরে জোরে শ্বাস টানল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরে উঠল ফুসফুস। নিজের লেপটার কথা একবার ভাবল অমূল্য দত্তগুপ্ত, তার সঙ্গে সেই স্বপ্নটার কথা এতক্ষণে কাঠবেড়ালী কিংবা প্রজাপতি—যেটা হোক ধরা হয়ে যেত। তারপর—

—আসুন হুজুর—

ডাক্তারের ঘোর ভাঙল। বত্রিশ নম্বর বাংলোর গেট খুলে ধরেছে বলবাহাদুর। সামনেই আলো জ্বলছে ঘরের ভেতর, আর কাচের উপর একটি সিলুয়্যাৎ ছবি। একটি মেয়ের ছায়া।

বলবাহাদুর ডাকল ঃ বাবু—

দরজা খুলল। স্কার্ফ জড়ানো একটি তরুণী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিল মনে হয়।

—ডাক্তারবাবুকে এনেছো বলবাহাদুর? আসুন ডাক্তারবাবু, ভেতরে আসুন। একটু কষ্ট দিতে হল অসময়ে, কিছু মনে করবেন না।

দুটো বড় বড় কেরোসিনের বাতি জ্বলছে ঘরে। খাটের ওপর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক—শাল চড়িয়ে বিকৃত মুখে বসে আছেন। ডান পায়ের গোড়ালি জড়িয়ে একটা ন্যাকড়ার

ব্যাণ্ডেজ। মেজের একপাশে ভাঙা একটা কাচের গ্লাসের কয়েকটা টুকরো, কয়েক ফোঁটা রক্ত।

—রাত্রে নামতে যাচ্ছিলেন খাট থেকে। ধাক্কা লেগে পাশের টেবিল থেকে গ্লাসটা পড়ল, আর তার ওপর পা দিয়ে—

ডাক্তার তাকিয়ে দেখল মেয়েটির দিকে। বাইশ থেকে ছাব্বিশের ভেতর যে-কোনো বয়েস। এই মাঝরাতেও ঠোঁটে গালে প্রসাধনের রঙ। মেয়েটি রূপবতী। ডাক্তারের মনে হল, ভাঙা কাচে মেয়েটিরই পা কাটল না কেন? তা হলে এ সময়ের এই বিরক্তিকর পরিশ্রম খানিকটা সার্থক হত অন্তত।

আহত লোকটি কাতরোক্তি করলেন একবার।

—দেখি পা-টা—

ব্যাণ্ডেজ খুলতে গিয়ে ডাক্তারের অভ্যস্ত নাসারন্ধ্র চকিত হয়ে উঠল। কিসের একটা চাপা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। না—শুধু আয়োডনি নয়। ইয়েস—ইট্‌স্ অ্যাল্‌কোহল। আই অ্যাম শিয়োর!

নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ খুলল ডাক্তার। তলায় গোড়ালিতে নয়—পায়ের ডিমের নীচে তিনটি ছোট ছোট রক্তাক্ত ছিদ্র। ছিদ্রগুলো একটু বিশেষ ধরনের। অত উপরে অমনভাবে ভাঙা কাচ কি কখনো বেঁধে? তা ছাড়া—আয়োডিন, অ্যাল্‌কোহল—আর—আর একটা অতি মৃদু গন্ধও যেন থমকে আছে বন্ধ ঘরটার ভেতরে? বাই জোভ্, ইট্‌স্ পাউডার! না—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো! দৃঢ় একটা সরল রেখার মতো। মুখের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে গেছে।

—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল মেয়েটির উপর। কথাটার জবাব না দিয়ে বললেন, মাপ করবেন, আমাকে একবার পোস্ট অফিসে যেতে হবে এখুনি।

মেয়েটি চমকে উঠল ঃ পোস্ট অফিসে কেন?

—কারণ, এটা পুলিস কেস্।—ইস্পাতের মতো কঠিন শোনালো ডাক্তারের গলা ঃ পোস্ট অফিস থেকে থানায় একটা ফোন করতে চাই। ওঁর পায়ে ভাঙা কাচ ফোটেনি—ইট্‌স্ এ গান-শট্ ইন্‌জুরি।

—ডাক্তারবাবু!—মেয়েটির বিদীর্ণ মিনতি কানে এল। একটা আর্ত, গোঙানি ভেসে উঠল আহতের কাছ থেকে।

—আমি চললুম। আমার সময় নেই।

দরজা আড়াল করে দাঁড়ালো মেয়েটি। সুন্দব মুখখানায় ছাইয়ের রঙ ছড়িয়ে গেছে। লিপ্‌স্টিক-বোলানো ঠোঁট দুটো কাঁপছে অল্প-অল্প।

—একটু দাঁড়ান। দুটো কথা শুনবেন?

—বলুন। চোখ সরিয়ে নিয়ে তেমনি কঠিন গলায় বললে ডাক্তার ঃ সংক্ষেপে বলুন।

—কত টাকা চান আপনি?

কর্কশ শব্দে ডাক্তার হাসল। বললে, ওটা পুলিসকে জিজ্ঞেস করবেন—যদি ওরা রাজী হয়। ইউ কান্ট্ ক্যাচ্ মি দেয়ার।

খাটের ওপর থেকে ভদ্রলোকের গোঙানি ভেসে এল। আর তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পায়ের সামনে একেবারে মেজেতে বসে পড়ল মেয়েটি। চোখের কোণায় চিক চিক করে উঠল জল।

—পাঁচ মিনিট বসুন ডাক্তারবাবু, অন্তত পাঁচ মিনিট। তারপর যা করবার করবেন।

ডাক্তার চোখ নামিয়ে চেয়ে দেখল মেয়েটির মুখের দিকে। সুন্দর মুখখানা এখন আর ছাই-রঙ নয়—একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কালো চোখ দুটিতে বাইরের হিমার্ত রাত্রির চেয়েও আরো শীতল, আরো নিষ্ঠুর ভয় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সেই সাদা কুয়াশা এসে জমেছে চোখে, এখনি হয়তো শিশির হয়ে ঝরতে আরম্ভ করবে।

—আর মিথ্যে কথা বলব না ডাক্তারবাবু। পায়ে গুলিই লেগেছে। কাচের গ্লাস ভেঙে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যায়নি। আপনি দয়া করে পায়ের একটা ব্যবস্থা করুন, সব কথা শুনুন—তারপর আপনি থানায় খবর দিন—আপনার যা খুশি করুন।

মেয়েটি সুন্দরী। তার পায়ের কাছে বসে পড়েছে কোনো বিয়োগান্তক নাটকের নায়িকার মতো। কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর ডাক্তার নয়, যে অমূল্য দত্তগুপ্ত একটু আগেই ঘাসের ভেতরে কাঠবেড়ালী আর প্রজাপতির স্বপ্ন দেখছিল, সে বললে, আচ্ছা—তাই হবে তা হলে।

বলবাহাদুরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে কয়েকটা দরকারি জিনিসপত্র আনালো ডাক্তার। তিনটে ছোট ছোট ছর্‌রা বেরুল পা থেকে! দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করলেন ভদ্রলোক—একটা আর্তনাদ করবারও যেন সাহস পেলেন না আর।

ড্রেসিং শেষ করে ডাক্তার একটা চেয়ারে বসল। তাকালো শীতল নির্মম দৃষ্টিতে।

—বলুন এবার। সত্যি কথা খুলে বলুন। কিছু গোপন করতে চেষ্টা করবেন না।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। সোজা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর লেপের তলা থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া গেল।

—মঞ্জু, ওঁকে এক পেয়ালা চা—

—এখুনি করে দিচ্ছি। ডাক্তারবাবু—

—থ্যাঙ্ক ইউ, এ অসময়ে চায়ের দরকার নেই। যা বলবার খুলে বলুন এবার।

ডাক্তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। রাত তিনটের কাছাকাছি। নিজের গরম বিছানাটা এতক্ষণে নিশ্চয় ববফ হয়ে গেছে। ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত কম্‌বাইণ্ড হাণ্ডটার মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার প্রলোভন জাগল ডাক্তারের।

খাটের কোণা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মঞ্জু। আস্তে আস্তে বললে, কাল আমরা কোচবিহার থেকেই স্ট্রেট্ 'কার' নিয়ে এখানে এসেছি। দিনকয়েক বেড়িয়ে যাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেখুন—কী দুর্ভোগ!

হাতের ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে গেল। এখনো ফিরে গেলে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনো চলত। কিন্তু—

ডাক্তার ভুরু কোঁচকালো।

—ভণিতা থাক। কাজের কথা বলুন। এই ভদ্রলোক আপনার কে হন?—রূঢ় পুলিসী জেরার মতো বেজে উঠল প্রশ্নটা।

লেপের মধ্যে নড়ে উঠলেন ভদ্রলোক। কয়েক সেকেণ্ড অদ্ভুত নীরব হয়ে রইল

মেয়েটি। তারপর বললে, উনি? উনি আমার বাবা।

ভদ্রলোক সশব্দে পাশ ফিরলেন—খাটটা মচমচ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের মনের ওপর থেকেও যেন অনেকখানি ভার নেমে গেল। কিন্তু কথাটা বলতে কেন দ্বিধা করল মঞ্জু? আর—আর ওই অ্যাল্‌কোহলের গন্ধটাও? ওটা না থাকলেই অনেকটা স্বস্তি পেতো ডাক্তার, আরো খানিকটা সহজ হতে পারত।

মেয়েটি আবার জোর দিয়ে বললে, উনি আমার বাবা। শিকারে ওঁর খুব ঝোঁক। সঙ্গে বন্দুক এনেছেন, এদিকে নাকি প্রচুর গ্রীন পিজিয়ন আর বনমুরগী পাওয়া যায়—মারবেন। রাত্রে আমায় বললেন, মা—

আবার সশব্দে পাশ ফিরলেন আহত ভদ্রলোক। গোঙানি আওয়াজ উঠল একটা।

—বললেন, মা, বন্দুকটা সাফ করে রাখ্‌ আজকেই। ভোরবেলাই শিকারে বেরুব।

—তাই মাঝরাতে উঠে বন্দুক নিয়ে বসলেন?

—হ্যাঁ, পরিষ্কার করে রাখব ভেবেছিলুম। কেসের মধ্যে বন্দুকটা জোড়াই ছিল। আমি খেয়ালই করিনি, একটা ব্যারেলে কার্ট্রিজ রয়েছে। বাবা খাটে বসেছিলেন, আমি মেজেতে বন্দুক নামিয়ে পরিষ্কার করতে যাচ্ছি, যেই ট্রিগারে টান পড়েছে, অমনি গুলি বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস নলটা ওপরের দিকে ছিল না, নইলে—শিউরে উঠে মঞ্জু থামল।

—আনুন তো বন্দুকটা।

পাশের ঘর থেকে মঞ্জু একটা দোনলা বি.এস.এ শট্‌ গান নিয়ে এল। বন্দুকটা হাতে করে দেখল ডাক্তার। দামী, দুর্লভ জিনিস। একটা নল থেকে পরিষ্কার এক্সপ্লোশনের গন্ধ পাওয়া গেল, আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে জড়িয়ে গেল হলুদ রঙ বারুদের গুঁড়ো। মৃদু হেসে ডাক্তার বন্দুকটা নামিয়ে রাখল।

—এই গল্পটা পুলিসে বিশ্বাস করবে মনে করেন?

—পুলিসে না করে, আপনি করুন। মঞ্জুর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল ঃ গল্প তো আপনাকে বলিনি, যা সত্যি কথা তাই বললুম। এরপরেও যদি আপনি আমাদের পুলিস কেসের স্ক্যাণ্ডালে ফেলতে চান, ফেলুন।

ডাক্তার চুপ করে রইল। মনের ভেতরে অনিশ্চয়তা দুলছে। ডাক্তার আর অমূল্য দত্তগুপ্ত। ডক্টরস্‌ ডিউটি আর ঘাসের ওপর সেই কাঠবেড়ালীটা। মঞ্জুর সঙ্গে সেই উড়ন্ত প্রজাপতির কোথাও একটা মিল আছে। কোথায়?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো। বললে, চিন্তা করে দেখব। আপাতত আপনার বলবাহাদুরকে আমার সঙ্গে দিন। কয়েকটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি! কিন্তু সত্যি কথাটা গোড়াতেই গোপন করলেন কেন তা-ই ভাবছি।

মঞ্জু কাছে এগিয়ে এল। চোখের জল মুখে ফেলেছে, কিন্তু দৃষ্টিটা এখনো তার কুয়াশা দিয়ে ছাওয়া।

—ভয় পেয়েছিলুম ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন।

অমূল্য দত্তগুপ্ত হাত তুলে নমস্কার করলে। বললে, আচ্ছা আসি এখন।

বাইরে চাঁদ ঘন ফগের আড়ালে লুকিয়ে গেছে, শুধু পশ্চিমের আকাশে একটা আকারহীন হলুদের ছোপ। মংপু পার হয়ে, রংলি ছাড়িয়ে, সেই পেঁজা তুলোর রাশ সমস্ত ফৌজবাড়ির পাহাড়টাকে আড়াল করে দিয়েছে। বাড়িঘর, বনজঙ্গল সব যেন মুছে গেছে

একাকার হয়ে, শুধু সামনের কয়েক হাত পথ জেগে আছে স্বপ্নের মতো—ধূমল সরীসৃপেরা তার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। বাঁ দিকে কয়েকটা পাইনের চূড়া দেখা যাচ্ছে—যেন ওরা পৃথিবীর সীমান্ত-জীবনের শেষ প্রাকার।

ডাক্তার আস্তে আস্তে নেমে চলল। অদ্ভুত স্তব্ধতা চারদিকে। একটা ঝিঁঝি পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও, আশ্চর্য এই দেশ। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটাকে কেমন অবাস্তব মনে হতে লাগল তার। মনে হল, এই ঘন কুয়াশায় ফৌজবাড়ির পাহাড়, পাইনের বন, চারদিকের ছাড়া ছাড়া জনহীন বাংলোগুলো যেমন স্বপ্ন হয়ে গেছে—তেমনি ওই ঘটনাটাও স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। ঘুমের ঘোরে অলস মেঘের মতো যারা আসে যায়—ও-ও তাদেরই একটা কাঠবেড়ালী আর প্রজাপতির সঙ্গে একাকার। হঠাৎ চটকা ভেঙে হয়তো দেখতে পারে, নিজের বিছানায় গরম লেপের নরম আলিঙ্গনের মধ্যে সে শুয়ে আছে, জানলার ফিকে নীল কাচের ভেতর দিয়ে এক মুঠো বেগুনি রোদ এসে পড়েছে, লনের ফুলগুলো হেসে উঠেছে রোদের ছোঁয়ায়—

টপ করে কপালে এক ফোঁটা জল পড়ল। শিশির। তার তীক্ষ্ণ হিংস্র ছোঁয়ায় সমস্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল ডাক্তারের। আর তখনই মনে হল, এই রকম রাত্রে ডাকাতি করা উচিত, লেপের তলায় যারা আরামে ঘুমুচ্ছে, তাদের টেনে বের করে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া দরকার। আর তা যদি না হয়, তা হলে অন্তত পোস্ট অফিসে গিয়ে তিন মাইল দূরের থানায় একটা ফোন করা যেতে পারে ঃ গান শট্ কেস—ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। শিগ্‌গীর এসো।

কিন্তু ভারী সুন্দর মেয়েটির চোখ। সেই গভীর কালো চোখ দুটি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কুয়াশাম্লান জ্যোৎস্নায় নিজের নিঃশ্বাসের ধোঁয়া দেখতে দেখতে ডাক্তার ভাবল ঃ অমূল্য দত্তগুপ্তই জিতল শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারের কিছু আর করবার নেই। ইউ মাস্ট বিলিভ্ হার স্টোরি।

ডাক্তারকে আর একবার ডাকতে এল বলবাহাদুর। তখন বেলা প্রায় গোটা বারো। সবে হাসপাতালের কাজ শেষ হয়েছে, স্নানের উপক্রম করছিল।

ডাক্তার বললে, তুমি যাও, একটু পরেই আমি আসছি।

—না হুজুর, এখনি একবার আসুন। ওঁরা রওনা হয়ে যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করেই বেরিয়ে পড়বেন।

—ওই পা নিয়ে?—ডাক্তার আশ্চর্য হল ঃ আচ্ছা চলো।

পাহাড় ভেঙে আবার সেই বত্রিশ নম্বর বাংলো। সামনে কালো মোটরটা তৈরি হয়ে আছে। ডেক-চেয়ারে সেই ভদ্রলোক, পায়ে ব্যাণ্ডেজ—সারা মুখে যন্ত্রণাকাতর অনিদ্রার ছাপ।

ভদ্রলোক বললেন, আসুন—আসুন ডাক্তারবাবু। কাল রাতে আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব—জানি না।

ডাক্তারের সঙ্গে এই প্রথম সম্ভাষণ লোকটির। ডাক্তার ভালো করে তাকিয়ে দেখল তার রোগীর দিকে। ষাটের মতো বয়েস, মাথার বারো আনা চুল ধূসর, চুলে সৌখিন সিঁথি, মুখে অ্যালকোহলিক চিহ্ন। নিজের অত বড় মেয়ে রয়েছে সঙ্গে—তা সত্ত্বেও ড্রিঙ্ক

করে—লোকটার রুচি ভালো নয়।

একটা বেতের চেয়ারে বসল ডাক্তার।

—শুনলুম চলে যাচ্ছেন এখুনি। কিন্তু এই রকম পা নিয়ে—

—ব্যথা আছে বটে, কিন্তু ফীলিং অল রাইট। যা হয়ে গেল, তারপর এখানে থাকতে আর মন চাইছে না। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাই। ওখানে এক বড় ডাক্তার আছেন আমার বন্ধু—মেজর লাহিড়ী, তিনিই দেখবেন এখন।—ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালেন ঃ কিন্তু তার বোধ হয় আর দরকার হবে না। আপনি যা করলেন—

মঞ্জু বেরিয়ে এল ঘর থেকে। গায়ে শালের কাজকরা লাল টকটকে ক্লোক—পরনে লাল শাড়ী। হাতে একটি লাল ব্যাগ দুলছে। দিনের আলোয় ডাক্তার দেখল মেয়েটি শুধু সুন্দরী নয়—একটা আগ্নেয় হিংস্রতা জ্বলছে তার শরীরে। ডাক্তার এই মুহূর্তে তার দিকে যেন চাইতে পারল না। সভয়ে নামিয়ে নিলে চোখ।

—নমস্কার, নমস্কার। ডাক্তারবাবু আপনার ঋণ আমাদের চিরকাল মনে থাকবে।

জিনিসপত্র তোলা হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার আর বলবাহাদুরের কাঁধে ভর দিয়ে এক পায়ে ভদ্রলোক গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মঞ্জু উঠে বসল তাঁর পাশে।

পকেট থেকে এক মুঠো নোট বের করে ভদ্রলোক ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিলেন।

—এই সামান্য ক'টা টাকা যদি দয়া করে রাখেন—

—করেন কি—করেন কি! আমি কেবল আমার ডিউটি—

—না, ডাক্তারবাবু, না। ভিজিটও তো আপনাকে কাল দেওয়া হয়নি। এ আপনাকে নিতেই হবে।—মঞ্জুর কালো চোখের দৃষ্টি এসে অমূল্য দত্তগুপ্তের মুখের ওপর বিঁধল। সে দৃষ্টিতে আগুনের জ্বালা—চোখ যেন বুজে আসতে চাইল।

মোটর চলতে আরম্ভ করল। আর একবার কানে এল মঞ্জুর গলা ঃ আপনার দয়া আমরা কখনো ভুলব না ডাক্তারবাবু। কখনো না।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরে গাড়ি মিলিয়ে গেল কালিম্পংয়ের পথের দিকে।

মুঠোর ভেতর নোটগুলো আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল অমূল্য দত্তগুপ্ত। যে স্বপ্নটা কাল রাতের শীত আর কুয়াশার মধ্যে শুরু হয়েছিল, আজ দিনের ধারালো শুভ্র রোদের ভেতরে তা নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেল। ওরা এমনিভাবেই মিলায়। ডাক্তারের নিঃশ্বাস পড়ল। আর কেবল একটা জিনিস সামনে খচ খচ করে বাজতে লাগল বুকে। প্রেস্‌ক্রিপশন লিখেছিল ফর পি এস রায়চৌধুরী। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন, কিন্তু না দিলেন ঠিকানা—না পরিচয়। মঞ্জুও তো বলতে পারত? বলতে পারত, সময় করে কখনো যদি আমাদের ওদিকে আসেন—

ডাক্তার টের পেলো, এতক্ষণে তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। ক্লান্ত, আড়ষ্ট পায়ে ধীরে ধীরে ফিরে চলল হাসপাতালের দিকে। স্বপ্নেরা তো কখনো স্থির হয়ে থাকে না, শরতের মেঘের মতো দেখা দেয় আর মিলিয়ে যায়। হায়, এমনিই নিয়ম!

প্রায় আড়াই বছর পরে আর একবার চমকালো ডাক্তার অমূল্য দত্তগুপ্ত। শিলিগুড়ির রেল স্টেশনে।

দোতলার ওয়েটিং রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল অন্যমনস্কভাবে। তার ট্রেন আসতে ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে। অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল একটা

ইঞ্জিন শাণ্ট করছে, শালপাতার ঠোঙা নিয়ে ঝগড়া করছে তিন-চারটে কুকুর, ঝিম্‌ঝিমে অলস রোদে গামছা পেতে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়েছে কুলিরা। ব্যতিব্যস্ত স্টেশনটা আপাতত ছুটি আর বিশ্রামের মধ্যে এলানো।

—ভালো আছেন ডাক্তারবাবু?

অমূল্য দত্তগুপ্ত ফিরে তাকালো। প্রথমে চিনতে পারল না। মুগ্ধ বিহ্বলতায় দত্তগুপ্ত স্মৃতির ভেতরে অসহায়ভাবে হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

—মাপ করবেন, আপনাকে তো ঠিক—

—মেয়েটি হেসে উঠল। লিপ্‌স্টিক রাঙানো ঠোঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সাদা দাঁতের ঝিলিক!

—চিনতে পারলেন না? সেই বন্দুকের গুলি? কাচের গ্লাস ভেঙে আপনাকে ঠকাতে চেয়েছিলুম?

মুহূর্তে সমস্ত চেতনায় ঝাঁকুনি লাগল। একটা শীতার্ত অবাস্তব রাত ফিরে এল চোখের সামনে। যেন এতক্ষণের কুয়াশা সরে গিয়ে স্পষ্ট রেখায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল পাইন গাছের কতগুলো ভূতুড়ে চেহারা, হানাবাড়ির মতো ক'টা ছাড়া-ছাড়া বাংলো।

—মঞ্জু দেবী? নমস্কার।—অমূল্য দত্তগুপ্ত সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল ঃ খুব অদ্ভুতভাবে দেখা হল আবার। আপনার বাবার পা ভালো হয়ে গেছে আশা করি?

মঞ্জু আবার হাসল। কেমন অবোধ্য মনে হল এবারের হাসিটা।

—সেই রায়চৌধুরী? হ্যাঁ, ভালোই আছেন। আপনার হাতযশ আছে ডাক্তারবাবু।

শেষ কথাটা কানে গেল না ডাক্তারের। তার আগেই চমকে উঠেছিল।

—তার মানে? উনি আপনার বাবা নন?

—না। আমি ওঁর—কিন্তু কথাটা সোজা বাংলায় নাই বা শুনলেন। আমাকে নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন ফূর্তি করতে। বাড়িঘরে এসব সুবিধে হয় না, বুঝতেই পারেন। রাত্রে মদের মাথায় কেমন সন্দেহ হল, আমি ওঁকে তেমন ভালোবাসি না। নেশার ঝোঁকে বন্দুক নিয়ে গোবিন্দলালের পার্ট করতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলুম। ফল যা হল তা আপনি জানেনই। তারপর আমাকে ওঁর মেয়ে সাজতে হল। আসল কথা জানলে আপনি তো থানা-পুলিস না করিয়ে ছাড়তেন না!

রেলিঙে হেলান দিয়ে পাথর হয়ে রইল অমূল্য দত্তগুপ্ত। ভাবতে লাগল, মেয়েটাকে এখান থেকে সোজা নীচে ফেলে দেওয়া যায় কি না। কিংবা কোনো দানবিক শক্তিতে ছুঁড়ে দেওয়া চলে কিনা একেবারে শাণ্টিং-করা ইঞ্জিনটার সামনে!

—খুব রাগ করলেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার যে কতবড় ক্ষতি করেছেন তা তো জানেন না!

রুক্ষ গলায় ডাক্তার বললে, আপনার আবার কী ক্ষতি? ষোলো আনাই তো লাভ। খুব বোকা বানিয়েছিলেন আমাকে!

—বড় ভালো আশ্রয় পেয়েছিলুম ডাক্তারবাবু। কিন্তু আপনার কাছে সেই যে মিথ্যে মেয়ে সেজেছিলুম—রায়চৌধুরী তো সে কথা আর ভুলতে পারলেন না! পথে আসতে আসতে বললেন, মঞ্জু, সত্যিই আমার ভুল ভাঙল এতদিনে। এই বন্দুকের গুলি আমায় জানিয়ে দিলে এবার আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় হয়েছে। এখন থেকে সত্যিই তুমি আমার

মেয়ে—তোমায় কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব আমি—যৌতুক দেব দশ হাজার টাকা। আমি নিজেকে বদলাব, তোমার জীবনকেও বদলে দেব।

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল ডাক্তারের মুখে।

—তা হলে কোনো ভালো ছেলেকেই বিয়ে করেছেন? টাকাও পেয়েছেন দশ হাজার?

মঞ্জুর কালো চোখ ঝক ঝক করে উঠল।

—কী ভেবেছেন আমায়? একটা আত্মসম্মান নেই আমার? ছি-ছি! দু দিন পরেই পালালুম বুড়োর খপ্পর থেকে। এখন যে আছে—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ওয়েটিং-রুম থেকে নিদ্রারক্ত চোখে বেরুলেন এক বিপুলকায় মাঝবয়েসী ভদ্রলোক। একটু আগেই বুকের ওপর একটা সিনেমা পত্রিকা নিয়ে লোকটিকে ডাক্তার হাঁ করে ঘুমুতে দেখেছিল ওয়েটিংরুমের একখানা ডেক-চেয়ারে।

ভদ্রলোক ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে জড়ানো মোটা গলায় ডাকলেন, আরে, গয়ী কিধার? চা পিয়েগী নেই?

—আতী হুঁ—

পরক্ষণেই একটা কথাও আর না বলে, একটা বিদায়-সম্ভাষণও না জানিয়ে, মঞ্জু লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। অকথ্য অপমানের মতো একটা হাসির আওয়াজ চল্‌কে এল ডাক্তারের দিকে।

রেলিঙে হেলান দিয়ে, যেমন ছিল তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল অমূল্য দত্তগুপ্ত। সেই আশ্চর্য রাত্রিটার মতো আবার মংপু পার হয়ে, রংলি ছাড়িয়ে, হিমালয়ের ওপার থেকে রাশি রাশি কুয়াশা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। রায়চৌধুরী নিজের মেয়ে বলে ভাবতে শুরু করেছে, তাতে মঞ্জুর আত্মসম্মানে কোথায় যে ঘা লেগেছে সেইটেই সে কোনোমতে বুঝতে পারল না।

হলদে চিঠি

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নিছক অভ্যাসেই লেটার-বক্সটা খুলল অনিন্দ্য। একটি লম্বা ধরনের হলদে লেফাফা—ওপরে অন ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট সার্ভিস। এবং চিঠিখানা তারই নামে।

না খুলেও অনিন্দ্য জানে কী লেখা আছে চিঠিতে। সেই ইণ্টারভিউয়ের প্রহসন। বাঁধা প্রশ্নোত্তর। কখনো বা একপাতা ডিক্টেশন লেখা। 'অল্ রাইট—ইয়ু মে গো।'

সেই যাওয়াই অগস্ত্যযাত্রা—অর্থাৎ সে-পথে ফেরবার দরকার পড়ে না। আজ চার বছরের মধ্যেও পড়েনি।

চিঠিটা না খুললেও চলে, পাশের ডাস্টবিনটি উপচে পড়ছে, এই মূল্যবান বস্তুটিকে নিশ্চিন্তেই সেখানে জমা করে দেওয়া যেতে পারে। তবু অভ্যাসেই খুলতে হল একবার এবং—

তারপরেই মেঘহীন আকাশ থেকে এক আকস্মিক বজ্রাঘাত!

চিঠির বঙ্গানুবাদ করলে যা দাঁড়ায়, তা সংক্ষেপে এই রকম :

'অমুক তারিখে তোমার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের সম্পর্কসূত্রে আমরা সানন্দে

তোমাকে জানাচ্ছি যে, আগামী পয়লা মার্চ থেকে অন্যতম কেরানীরূপে তোমাকে এই অফিসে নিয়োগ করা হল। বেতন—'

অনিন্দ্যর মাথাটা ঘুরে উঠল একবার—গলিটা যেন নেচে উঠে তাকে প্রদক্ষিণ করে নিল। চিঠিটা তার নামে? হাঁ—তারই নামে, একবার খামের ওপরে আর একবার চিঠির মাথায় টাইপ করা হয়েছে—এমন কি 'অনিন্দ্য' বানানের 'ওয়াই'টা পর্যন্ত বাদ পড়েনি। এপ্রিল ফুল? না—এত তাড়াতাড়ি সেটা আসতে পারে না, কারণ আজকে বাইশে ফেব্রুয়ারী।

তা হলে সত্যি সত্যিই সেই মিরাক্‌লটা ঘটেছে। চাকা·ি পেয়েছে অনিন্দ্য। আজ চার বছর পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ঘটেছে তার।

এখুনি বাড়িতে ফিবে যাব? চিঠিটা গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব বৌদির সামনে? বলব, 'আর তোমায় বাঁকা বাঁকা কথা শোনাতে হবে না, এবার থেকে নিজের পেটের ভাবনা নিজেই ভাবব আমি?'

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়। আগে ধাতস্থ হওয়া যাক একটুখানি।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার ওপরেই ফায়ার-ব্রিগেডের যে লাল রঙের বাক্সটা রয়েছে, সেইখানেই হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিন্দ্য। চিঠিটা একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল। চিঠির তলায় কালি দিয়ে যে দুর্বোধ্য স্বাক্ষরটা রয়েছে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করল ঃ এ কে রায়—না এস কে রাহা—কিংবা এস কে বোস? ডাক্তার আর বড় অফিসারদের সই কখনো পড়া যায় না—ওটা ওঁদের বিশিষ্টতার চিহ্ন।

সামনে দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রামের একটা প্রথম সংস্করণ ঘোড়ার মতো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল। ওই ট্রামটার দিকে তাকিয়ে সেই লোকাল ট্রেনটার কথা মনে পড়ল তার—যেটায় করে এই চাকরিটার জন্যে সে খড়্গপুরে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিল।

সেই বেঞ্চিপাতা লম্বা বারান্দায় তিনটি চাকরির জন্যে ষাটটি লোকের ভিড়। অনেক ইণ্টারভিউ দিয়ে দিয়ে দার্শনিক হয়ে-যাওয়া অনিন্দ্য ভিড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে দোতলার রেলিংয়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। আদালতের পেয়াদার মতো গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে একের পর এক নাম ডাকছে বেয়ারা, আধ মাইল দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে—নিতান্তই কাঠকালা না হলে অনিন্দ্যর পালাও ফসকাবার জো নেই। তা ছাড়া বেঞ্চিগুলোতে বসে কিংবা দেওয়ালে হেলান দিয়ে যারা চুন আর পায়রার গন্ধ শুঁকছিল, তাদেরও চেঁচিয়ে কথা বলবার মতো কারো উৎসাহ ছিল না। সবাই প্রতীক্ষা করছিল, সকলের মুখেই একটা শ্রান্ত গাম্ভীর্য থমথম করছিল, কেউ কেউ বার বার কপালের ঘাম মুছে ফেলছিল। অভিজ্ঞ অনিন্দ্য দেখেই বুঝতে পারছিল কার প্রথম ইণ্টারভিউ—কে তার মতো অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অনিন্দ্য তাকিয়েছিল বাইরে। ট্রেনের আসা-যাওয়ার আওয়াজে থেকে থেকে গম গম করছে স্টেশন, সাইডিঙের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে আকাশ, নানা সুরে এঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আসছে। একটু দূরে লন আর বাগান নিয়ে অফিসারদের কোয়ার্টার্স—তাদেরই সামনে দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কালো পেরাম্বুলেটারে যেন একটা সাদা মোমের পুতুল ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক জোড়া ফলন্ত রাধাচূড়ো গাছের গায়ে হলুদের রঙ—এক জায়গায় ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে

গোটা তিনেক গোরুর নিশ্চিন্ত জাবর-কাটা, আরো দূরে কালো ফিতের মতো পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে নীল রঙের একখানা মোটরগাড়ি।

অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছে অনিন্দ্য, কলকাতার এয়ার-কনডিশন্ড অফিসে, কোথাও অন্ধকার ঘুপচি ঘরে, কোথাও বা দুপুরের রোদে গন্‌গন করে জ্বলতে থাকা টিনের ছাউনির তলায়। কিন্তু চাকরি না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—অথবা ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে আসামাত্রই—সেই সব ঘর, তাদের পরিবেশ—কোনো গভীর পুরোনো ইঁদারার কালো জলের ভেতর একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়বার মতো মিলিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিকে ধারালো আর উগ্র করে তাদের কখনো খুঁজতে যায়নি অনিন্দ্য। কিন্তু ইঁদারার সেই কষকালির মতো জলের থেকে আজ খড়্গপুরের সেই দিনটা হঠাৎ তার সবটুকু নিয়ে উড়ে এল, শুকনো পাতা নয়—প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলল তার চোখের সামনে।

কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে অনিন্দ্য ফায়ারব্রিগেডের লাল বাক্সটার গায়ে তেমনি ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ষাটজন মানুষের তখনকার বর্ণহীন ভিড়ের মধ্য থেকে আরো দুটো মুখকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে লাগল সে। তিনটে পোস্টে আর দুজন কে কে এল? সেই যে অল্প টাকপড়া ভদ্রলোক একমনে ডুবে বসেছিলেন খবরের কাগজের পাতায়? সেই সোনার চশমা আর পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ছেলেটি—যাকে দেখে অনিন্দ্য ভেবেছিল—চাকরির ইন্টারভিউ না দিয়ে এ কেন ফিল্মস্টার হতে চেষ্টা করে না? কিংবা লম্বা-চওড়া স্পোর্টসম্যান চেহারার ছোকরা—যে ট্রাউজারের দু-পকেটে হাত পুরে আর ভারী জুতোর মচমচানি তুলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল করিডোরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত?

ভেবে লাভ নেই—সাতদিন পরেই চক্ষু আর কানের বিবাদ মিটে যাবে।

ফুটপাথে একটা ফিরিওলা কতগুলো কাগজের সাপ নিয়ে চলেছিল, তাদেরই একটা খড়মড়িয়ে পায়ের কাছে এগিয়ে আসতে অনিন্দ্যর চমক ভাঙল। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না, যেখানে রওনা হয়েছিল সেদিকেই যাওয়া যাক।

পকেটে হাত দিয়ে দেখল, বিড়ি ফুরিয়ে গেছে। এগিয়ে গেল সামনের দোকানটার দিকে।

'ছয় নয়া পয়সার বিড়ি'—বলতে গিয়েও সামলে নিলে সে। আজকে একটা বিশেষ দিন—বি.এ. পাস করবার খবরটা যেদিন প্রথম পেয়েছিল—সে এর কাছে কিছুই নয়। আর বি.এ. পাস করবার আনন্দ তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিকে হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এতদিন ছাত্র থেকে তার কোনো ভাবনা ছিল না, কোথাও কোনো দায় ছিল না; এইবারে তাকে নিজের ওপর দাঁড়াতে হবে, চাকরি করতে হবে—দাদার ঘাড়ে বসে থাকা আর চলবে না।

রাত্রে খেতে বসে দাদাই তুলেছিল কথাটা।

'কী করবি এবার?'

'যদি এম.এ.-টা পড়া যায়—'

ভুরু কুঁচকে দাদা বলেছিলেন, 'পাস কোর্সে বেরিয়ে সীট পাবি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে?'

'পোলিটিক্যাল সায়েন্সে কিংবা এনশেন্ট হিস্ট্রিতে'—

'হয়েছে, আর দরকার নেই। একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দ্যাখো তার চাইতে।'

তারপরে চার বছর কেটেছে। একবার একটা টেম্পোরারি কাজ জুটেছিল, ছ'মাসের, কিছুদিন স্কুল-মাস্টারিও মিলেছিল। বাকী সময়টা খুচরো-খাচরা টিউশন, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রিনিউ করানো আর দরখাস্তের পর দরখাস্ত। এতদিনে প্রতীক্ষার অবসান, অবশ্য শেষ পর্যন্ত যদি পাকা হয় চাকরিটা।

পানওয়ালা অনিন্দ্যের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

'কী চাইলেন বাবু?'

পকেটে হাত দিয়ে দেখল তিন টাকার মতো আছে। আজকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট খাওয়ার বিলাসিতা চিন্তা করা যেতে পারে।

'গোল্ড ফ্লেক দাও এক বাক্স।'

নোটটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পানওলা বললে, 'আউর পাঁচ পয়সা।'

'কেন, এক টাকা করেই তো দাম।'

'ও তো ঠিক হ্যায়। লেকিন মিলতা নেই, দাম বঢ় দিয়া—' পানওলা হাসল।

ব্ল্যাক মার্কেট। মনটা বিষিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—যে ঘোরটা লেগেছিল, সেটা তরল হয়ে এল।

গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা ঠকাৎ করে ফেলে দিয়ে বললে, 'নাম্বার টেন।'

'কেয়া?'—পানওলা যেন বিশ্বাস করতে পারল না। একেবারে এতখানি পশ্চাদ্‌পসরণ তার কানে অদ্ভুত ঠেকল।

'নাম্বার টেন।'

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট শেষ করল, ট্রাম বাসের আনাগোনা দেখল কিছুক্ষণ, বাস-স্টপের সামনে দুটি কলেজের ছাত্রী হাসিতে উছলে পড়ছিল—বেশ লাগল অনিন্দ্যর। দেখল রাস্তার ওপারে গাছটা বকুল, অনেক ফুল ধরেছে তাতে—ঝরেও যাচ্ছে বৃষ্টির গুঁড়োর মতো। এতদিন ধরে এই পথ দিয়ে কতবার এসেছে গেছে, অথচ বকুল গাছটাকে সে লক্ষ্যই করেনি!

তারপর সিগারেটটা শেষ হল, আঙুলে গরমের ছোঁয়া লাগল, তখন অনিন্দ্য সামনের ট্রামটাতে উঠে পড়ল।

সাড়ে ন'টাও বাজেনি. এর মধ্যেই অফিসের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। অনিন্দ্য বসতে পেল না, একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল পেছনের দিকটায়। আর ক'দিন পরে তাকেও হয়তো সাড়ে ন'টায় অফিসে যেতে হবে। কিন্তু কলকাতার বাসে ট্রামে নয়—সে চাকরি করবে—খড়্গপুরে, তাকে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে হবে না এদের মতো। কলকাতায় চাকরি না পেয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে অনিন্দ্যর, পরমায়ু কিছুদিন বেড়েই যাবে। উঃ—এমনি ভিড়ে, এমনি অমানুষিক অ্যাক্রোব্যাটিক করে দশটা-পাঁচটা জার্নি করা যায় প্রত্যেক দিন?

পরের স্টপে ফোলিও ব্যাগ হাতে ঘর্মাক্ত এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। বয়েস চল্লিশ পেরুনো, শরীর একটু মোটার দিকেই। করুণ চোখে একবার সীটগুলোর দিকে তাকালেন, শেষে অনিন্দ্যর পাশেই রড ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। বড় বড় ক্লান্ত নিঃশ্বাস পড়ছে—অনেকটা দৌড়ে এসেই ট্রাম ধরেছেন মনে হল।

অনিন্দ্যর চিন্তাটাই যেন বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে।

'সাত সকালে বেরিয়েও ট্রামে বসতে পাইনে মশাই—ওঃ। কী যে হয়েছে কলকাতায়!'

এতদিন এ-সব আলোচনায় অনিন্দ্যর কোনো অংশ ছিল না। এই মানুষগুলোর দোলায়মান অবস্থা দেখে দূর থেকে হিংসে হয়েছে, কখনো কখনো কোনো-কোনোদিন ডালহাউসি স্কোয়ার-ফেরত ট্রামে বাসে বিকেলে এদের দোলায়মান অবস্থা দেখে অনুকম্পায় মন ভরে গেছে তার। আজকে এই ভদ্রলোককে—ট্রামের এই অফিস-যাত্রী প্রতিটি মানুষকে, আপনার জন বলে বোধ হল যেন। তৎক্ষণাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল সে।

'আমরা যারা কলকাতার বাইরে চাকরি করি—' অনিন্দ্য হাসল ঃ 'বেশ আছি আমরা। আপনাদের মতো বাদুড় ঝুলতে হয় না।'

ভদ্রলোক মোটা শেলের চশমার ভেতর দিয়ে, ঘোলাটে চোখে অনিন্দ্যের দিকে চাইলেন।

'কোথায় কাজ করেন আপনি?'

'খড়্গপুর। সাউথ ইস্টার্ন রেলে।'—প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল অনিন্দ্য, আলাদা করে জোর দিলে প্রত্যেকটার ওপর। আজ আর সে অকেজো মানুষগুলোর একজন নয়—একটা সরকারী অফিসের দরকারের খাতায় তার নামটা জায়গা করে নিয়েছে এখন।

'অ।'—ভদ্রলোককে বিমর্ষ দেখালো ঃ 'কিছুদিন আগে আমিও বাইরে পোস্টেড ছিলুম মশাই—ঘাটালে। দিব্যি জায়গা, এখনো খাবার-দাবার মেলে—মিষ্টি তো চমৎকার। নদীর ধারে বাড়িটিও পেয়েছিলুম ভালো। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হল, তদ্বির করে চলে এলুম কলকাতায়। কিন্তু আর থাকা যায় না এখানে—নরককুণ্ড হয়ে গেছে একেবারে।'

কথাটা শেষ হবার আগেই সামনের সীট থেকে একজন যাত্রী উঠে পড়লেন, মোটা ভদ্রলোক বিদ্যুৎগতিতে দখল করলেন তার জায়গাটা। অনিন্দ্য একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে লাগল—লোক উঠছে নামছে, একজন নামলে ছ'জন উঠে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে। অফিস টাইম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছেন বসে বসে। মাথার ছাঁটা চুলগুলো ধবধব করছে বকের পাখার মতো, এক হাতে একটা পুরোনো ফাইল ধরা রয়েছে—হাতটা শির-বের-করা, চামড়া কোঁচকানো। বয়েস কত হতে পারে? পঁয়ষট্টির কম নয়। এত বয়েস পর্যন্ত নিশ্চয় সরকারী চাকরিতে রাখে না—কোনো মার্চেন্ট অফিসেই কি রাখে? এই বুড়ো মানুষ তা হলে কোথায় চলেছেন, কী চাকরি করতে?

একটা চিন্তা চমকে উঠল মনে।

কার মুখে যেন শুনেছে গল্পটা। রিটায়ার করে এক ভদ্রলোক নাকি ভয়ানক দমে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, পা-ভাঙা রেসের ঘোড়ার মতো দুনিয়ার কাছে একেবারেই অকেজো হয়ে গেছেন তিনি—কেউ আর তাঁকে চায় না, বাড়িতে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, এমন কি ঝি-চাকরের কাছে পর্যন্ত কোনো আর সম্মান নেই তাঁর। দিনের পর দিন মেলাঙ্কলিয়ায় ডুবে যেতে লাগলেন—খান না, ঘুমোন না—কারো সঙ্গে কথা বলেন না। শুধু বাড়ির ঘড়িতে টং টং করে দশটা বাজলেই ছটফটিয়ে ওঠেন—যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার মতো একটা অসহ্য কষ্ট শুরু হয়ে যায় তাঁর।

ডাক্তার এলেন। সব দেখে শুনে এক অদ্ভুত প্রেস্‌ক্রিপশন দিলেন তাঁকে।

রোজ ন'টা বাজলেই দৌড়ে গিয়ে স্নান করবেন, খাবেন, অফিসের জামাকাপড় পরবেন, ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাবেন ডালহাউসি স্কোয়ার। সেখান থেকে যেখানে খুশি যেতে পারেন—কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন ইডেন গার্ডেনে। তারপর চারটেতে আবার ট্রাম ধরবেন—তেমনি করে ত্রিশূন্যে দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরে আসবেন।

প্রেসক্রিপশনে নাকি কাজ হয়েছে, বেশ আছেন এখন। দৌড়-ঝাঁপ নিয়মিত করে আর দুপুরে ঘণ্টা পাঁচেক পার্কের ছায়ায় নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে—মেজাজও নাকি চমৎকার। অভ্যেস একেই বলে।

ঝিমন্ত ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্যের মনে হল ইনিই তিনি নন তো? অথবা তাঁরই দলের আর কেউ? ফলো করে দেখলে মন্দ হয় না। অফিসেই যান, না ইডেন গার্ডেনের ঝিলের পাশে শুয়ে পড়েন কোথাও?

সে নিজেও তো একদিন রিটায়ার করবে। সেদিন কেমন দাঁড়াবে তারও অবস্থা?

অনিন্দ্যর হাসি পেলো। চাকরিতে জয়েন করবার আগেই রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছে। সে এখনো অনেক দূর।

চব্বিশ বছর বয়েস তার এখন। কম করে আরো একত্রিশ বছর। অত পরের কথা এখন না ভাবলেও ক্ষতি নেই—অনেকখানি পথ এখনো সামনে পড়ে আছে।

কিন্তু ভদ্রলোককে আর ফলো করা হল না, একত্রিশ বছর পরেকার কথাও ধামাচাপা রইল আপাতত। অনিন্দ্য দেখল সামনে জগুবাবুর বাজার। এখানেই নামতে হবে তাকে।

অমরেশের বসবার ঘরে আড্ডা জমে উঠেছে। দলের আর দুজনও এসে গেছে আগেই।

অমরেশ তার নতুন উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছে। তক্তপোশের ময়লা তাকিয়াটায় কনুই রেখে আধশোয়া ভঙ্গিতে বিড়িতে টান দিচ্ছে মনোরঞ্জন আর অরুণাভ ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে কাকের মতো। অমনি বিশ্রী বোকাটে ভাবে দাঁত বের করে তাকিয়ে থাকাই ওর স্বভাব।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিন্দ্য। একটি মেয়ে—খুব সম্ভব নায়িকা—এই মুহূর্তে পটাশিয়াম সায়নাইড খেতে যাচ্ছে। আবহাওয়াটা বেশ ঘনিয়ে তুলেছিল অমরেশ, হঠাৎ মাঝখানে টিপ্পনী কাটল মনোরঞ্জন।

'তুই পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়েছিস কখনো?'

চটে পাণ্ডুলিপি বন্ধ করল অমরেশ।

'খেলে আর উপন্যাস লেখবার সুযোগ পেতুম নাকি? না তোর মতো ইডিয়েটকে গল্প শোনাতে হত?'

'আহা, বন্ধ করছিস কেন? পড়ে যা।'

অনিন্দ্য ঘরে ঢুকে তক্তপোশের এক পাশে বসে পড়ল। হাত বাড়ালো অমরেশের উপন্যাসের দিকে ঃ 'সেই "নানা আলোর রঙ"—না?'

অমরেশ বিদ্যুৎবেগে সেটা কেড়ে নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'তোরা সব সমান। খালি যা তা কমেন্ট্ করতে পারিস। ঠিক আমার সেই হাঙর-মার্কা পাবলিশারের মতো।'

'তোর নতুন উপন্যাসটা কেমন চলছে রে?' অরুণাভ কৌতূহল প্রকাশ করল।

'এক বছরে একশো কপি'—গলা দিয়ে বিষ ঝরল অমরেশের।

অরুণাভ বললে, 'শেম'।

অনিন্দ্য অবাক হল ঃ 'কেন রে! আজকাল তো বাজারে এক মাসে এডিশন হয় শুনতে পাই।'

'কাদের হয়?'—তক্তপোশে একটা চড় বসালো অমরেশ। সেই আকস্মিক বিপর্যয়ে শতরঞ্জির তলা থেকে ছোটখাটো চটপটির মতো একটি পৃথুল ছারপোকা কোথা থেকে লাফিয়ে উঠল আর অমরেশ তাকে সংহার করবার আগেই কাঠের জোড়ের মধ্যে চটপট অদৃশ্য হল সে।

ছারপোকাটার সন্ধান না পেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠল অমরেশ ঃ 'কাদের বই বিক্রি হয়? যারা মেয়েদের কাঁদাতে পারে, পুরুষের সস্তা সেন্টিমেণ্ট নিয়ে ফাঁপাতে পারে আর গোল আলুর মতো গোলালো একটি গল্প বানাতে পারে। তোদের সব দিকপালের দল'—পরম ঘৃণাভরে বাংলাদেশের একদল শ্রদ্ধেয় লেখকের নাম চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল ঃ 'এঁরাই হচ্ছেন তোমাদের মাথার মণি। পড়াশুনো নেই, ইনটেলেকট্ নেই—সামান্য 'ন্যাক' ছিল, সেই ব্যাঙের আধুলি দিয়েই কারবার চালাচ্ছে। একেবারে হালের কথা নয় ছেড়েই দে। মেরিডিথ্-হেন্‌রি জেম্‌স পড়েছে কেউ? প্রুস্তের এক পাতা বুঝতে পারবে? জোসেফ কন্‌র্যাড্ না-ই পড়ুক, কন্‌র্যাড্ অয়কেনের গল্পগুলোর নাম শুনেছে? এইটিনথ্ সেঞ্চুরির রীডার—সিক্সটিন্‌থ্ সেঞ্চুরির লেখক।'

মনোরঞ্জন আর একটা বিড়ি ধরালো। একদা নিজের বিদ্যার উপর তার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ছিল। ইতিহাসে থার্ড ক্লাস এম.এ. হবার পর থেকেই সিনিক হয়ে গেছে। এখন একটা কোচিং ক্লাসে পড়ায়, টিউশন জুটলে তা-ও করে। অমরেশের কথায় তার চোখ দুটো মিট মিট করে উঠল।

'তুমিও তাদের মতো করে লিখলেই পারো বন্ধু। এইটিনথ্ সেঞ্চুরির পাঠকের কাছে টুয়েন্‌টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির রুচি আশা করো কেন?'

'আমি? দি লাস্ট ম্যান। ওসব লেখবার আগে কলম ছেড়ে দিয়ে বরং কেরানীগিরিতে ঢুকব।'

কথাটা অনিন্দ্যর কানে বাজল। উত্তেজিত হলেই এই সংকল্পটা বরাবর প্রকাশ করে থাকে অমরেশ। তার মতো বুদ্ধিজীবীর কাছে কেরানীগিরির মতো দীনতা আর নেই। এতদিন এই নিয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। অমরেশ চাকরি করে না—পৈতৃক বাড়ির আধখানা ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় কোনো মতে তার চলে, অবসর সময়ে বাংলা উপন্যাসে বিপ্লব আনবার স্বপ্ন দেখে সে। অরুণাভ বি.এ. ফেল করে শেয়ার মার্কেটে ঘুরে বেড়ায়—তার ঊর্ধ্ব দৃষ্টি বড়বাজারের ভাগ্যবানদের দিকে।

কালও অনিন্দ্য বলছিল, এবার শেয়ার মার্কেটেই অরুণাভর সঙ্গেই জুটে যাবে সে। কিন্তু আজকের সকালে—এই এক ঘণ্টার মধ্যে—বদলে গেছে সমস্তই। অমরেশের কথাটা তার গায়ে লাগল।

অনিন্দ্য বললে, 'নাইন্‌টি পারসেণ্ট শিক্ষিত বাঙালীই কেরানী। বাংলা বইয়ের তারাই রীডার।'

অমরেশ থাবা দিয়ে বললে, 'আলবাৎ! ট্রামে আর লোকাল ট্রেনে তারাই বাংলা বই পড়ে—পড়তে পড়তে ঘুমোয়। আইডিয়াল!'

অনিন্দ্যর কান লাল হয়ে উঠল ঃ 'তোমাদের পনেরো আনা গল্পই লেখা হয় তাদের নিয়ে।'

'আমি লিখি না। সেই একঘেয়ে মিড্‌লক্লাসিজ্‌ম্—ওঃ, হরিড্। ছাঁটাই—ইনক্রিমেণ্ট—অভাবের ফিরিস্তি, ফাঁকে ফাঁকে মিনমিনে প্রেম, কখনো সেক্সের খোঁচা, ভাড়াটে বাড়ির একতলা, কল নিয়ে ঝগড়া আর এক আধ ডোজ সোশ্যালিজম পড়া যায় না।'

বি-এ ফেল অরুণাভ মাথা নাড়ল ঃ 'যা বলেছিস। ওর চাইতে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়া ভালো।'

মনোরঞ্জন বলতে যাচ্ছিল ঃ 'তোমার ইনটেলেকচুয়াল জিমনাস্টিকও—' কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেল। অনিন্দ্য নেমে পড়েছে তক্তপোশ থেকে, নিজের চটি জোড়াকে খুঁজছে।

'কিরে, এখুনি চললি কোথায়?'

'কাজ আছে।'

অমরেশের রাগ পড়ে এসেছিল, ''নানা আলোর রঙে''র পাণ্ডুলিপি খুলতে যাচ্ছিল আবার। এ-রকম এক-আধটু ঝগড়া-ঝাঁটি সব সময়েই চলে। বললে—'বোস—বোস—এই চ্যাপ্‌টারটা শুনে যা। মনোরঞ্জনের তো কিছুই ভালো লাগে না—আর অরুণাভ এখন থেকেই বলছে—মেয়েটাকে বিষ খাওয়াসনি ভাই, লাস্টে বিয়ে দিয়ে দে। তোর ওপিনিয়ানটাই জেনুয়িন। তা ছাড়া চা আনাচ্ছি—সেই সঙ্গে গরম পকৌড়ি।'

অরুণাভ পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ 'লাভ্‌লি!'

কিন্তু সামনের তেলেভাজার দোকান থেকে বিখ্যাত গরম পকৌড়ী আসবার সম্ভাবনাতেও এতটুকু উৎসাহ পেল না অনিন্দ্য। মনের সুরটা কেটে গেছে। এক মুহূর্তে যেন বুঝতে পেরেছে এতদিনের চেনা বন্ধুর দল থেকে আজ সকালেই সে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এদের সঙ্গে তার আর মিলবে না।

আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল অনিন্দ্য। কালীঘাটের দিক থেকে দলে দলে মানুষ আসছে, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, হাতে প্রসাদ, গঙ্গাজলের ঘটি। আজ কি তিথি আছে কোনো? তখন মনে পড়ল দিনটা মঙ্গলবার। শনি-মঙ্গলবারে এমনিতেই ভিড় হয় কালীঘাটে।

চাকরি পেলে লোকে পূজো দেয় ওখানে। সে-ও যাবে একবার? পকেটে পাঁচসিকের বেশি পয়সা নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু খেয়ালী কল্পনাটা থমকে গেল, ভুরু কুঁচকে এল অনিন্দ্যর। গাড়ি বোঝাই অফিস-যাত্রীর ভিড়। ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠছে—উঠতে পারছে না। খানিক দৌড়ে ফিরে আসছে—আবার পরের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে। একখানা একটু ফাঁকা ধরনের ট্রাম এল—কয়েকটি ব্যস্ত মানুষ সেদিকে ছুটে গিয়েই নিরাশ মুখে যথাস্থানে ফিরে এল আবার। 'লেডীজ্ স্পেশাল।'

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিন্দ্য ভাবতে লাগল। অমরেশই কি ঠিক বলছিল?

এই অফিস করতে করতে—এই কেরানীগিরির ধান্দায়, দিনের পর দিন তারও মনটা বিন্দু বিন্দু করে মরে আসবে? কোনোমতে বেঁচে থাকা—একটা দিন কেটে গেলে আর একটা দিনের কথা ভাবতে থাকা—ইনক্রিমেন্টের চিন্তা, ছোটখাটো দাবিদাওয়া—এর ভেতরেই একটু একটু করে শুকিয়ে আসবে সে? তখন কোথাও কোনো রং থাকবে না—রূপ থাকবে না—অমরেশের আধুনিক চিন্তার একটি বর্ণও তার মাথায় ঢুকবে না—কোনো জমাট গল্পওলা বাংলা উপন্যাস কোলের ওপর মেলে রেখে লোকাল ট্রেনের দোলায় দোলায় সে ঝিমুতে থাকবে?

হরেনবাবুকে মনে পড়ল। পাড়ার লোক।

সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যান, সাড়ে পাঁচটায় কুঁজো হয়ে ফেরেন। চশমাটা তখন নাকের সামনে ঝুলে আসে, হাতের ছাতাটার ওপর যেন ভর দিয়েই বাড়ি ফেরেন ভদ্রলোক। তারপর—

তারপর কারণে অকারণে ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে প্রহার। স্ত্রীর সঙ্গে কুৎসিত কলহ।

'আত্মহত্যা—আত্মহত্যা করব আমি। নইলে তুমি আর তোমার এই শুয়োরের পাল একদিন ছিঁড়ে খাবে আমাকে।'

'করো না আত্মহত্যা। কে বারণ করছে তোমাকে?'—স্ত্রীর ঝাঁঝালো জবাব আসে।

'সে তো বটেই। কিন্তু আমি মরলে যে হবিষ্যি করতে হবে, মাছের মুড়ো যে আর চিবুনো চলবে না—সেটা খেয়াল আছে তো?'

'মাছের মুড়ো। এই কুড়ি বছর চোখে দেখিয়েছ নাকি কোনোদিন?' স্ত্রীর গলায় যেন ঝাঁ ঝাঁ করে ক্ষুরের শান পড়ে ঃ 'যে সুখে রেখেছ, এর চেয়ে হবিষ্যিও আমার ঢের ভালো।'

এইসব শুনতে শুনতে কতদিন ধড়াম ধড়াম শব্দে নিজের জানলা বন্ধ করে দিয়েছে অনিন্দ্য—ভেবেছে, মানুষ কী কদর্য হয়ে যায় কখনো কখনো! এখন তার চোখের সামনে এইগুলো যেন প্রেতচ্ছায়ার মতো দুলতে লাগল। সেও কি আজ থেকে ওই হরেনবাবুর ভাগ্যই বেছে নিয়েছে, আজ থেকে কুড়ি বছর পরে তারও কি—

ধেৎ!

বিরক্ত হয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল অনিন্দ্য, আর ফেলেই অনুতপ্ত হল। আধখানাও খাওয়া হয়নি। কিন্তু আর কুড়িয়ে নেওয়া চলেও না, কারণ একেবারে রাস্তার ঝাঁঝরির মুখে খানিকটা পানের পিকের ওপরে গিয়ে পড়েছে ওটা।

আশ্চর্য তার মন! চার বছর চেষ্টার পর চাকরি হয়েছে—আর মাস ছয়েক মাত্র দেরি হলে চব্বিশ পেরিয়ে যেত—সরকারী চাকরিই আর জুটত না তখন। একেবারে শেষ মুহূর্তে শিকে ছিঁড়েছে বলতে গেলে। এত বড় একটা সৌভাগ্যে. কোথায় সে আনন্দে উপচে পড়বে, তার বদলে একরাশ এলোমেলো দুর্ভাবনার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে! পাগলামি আর কাকে বলে!

অমরেশের কথা ছেড়ে দাও—ওর উপন্যাসের মতোই ওর কথারও কোনো অর্থ হয় না। হরেনবাবু রোগা আর ডিসপেপ্‌টিক লোক—মাসে দু হাজার টাকা মাইনে পেলেও স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করত, না করেই থাকতে পারত না, অকারণে অবান্তর ভাবনার জাল বুনে কেন সে এইভাবে বিমর্ষ হয়ে উঠছে? আশ্চর্য!'

সামনে সিনেমার একটা পোস্টার চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রতারকার মুখে ভেসে উঠল নমিতা।

অথচ নমিতার কাছেই সবচাইতে আগে যাওয়া উচিত ছিল তার ; চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক ছিল—কী করে এতক্ষণ তাকে ভুলে গিয়েছিল সে। অনিন্দ্য আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললে, 'আশ্চর্য!'

বালিগঞ্জের একখানা ট্রাম বাঁক নিচ্ছিল। আরো দশজন ছুটন্ত কেরানীর ভঙ্গিতেই উর্ধ্বশ্বাসে ট্রামটার দিকে দৌড়োল অনিন্দ্য, উঠে পড়ল এক লাফে। নামল এসে ফার্ন রোডের মোড়ে।

দুই বোন—নমিতা আর শমিতা। শমিতা বি.এ. পড়ছে, নমিতা একটা স্কুলের টিচার। ওই গার্লস স্কুলেই কয়েক মাসের টেম্পোরারি চাকরি করতে গিয়ে নমিতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অনিন্দ্যর। প্রথম দিনেই দুজনে মিলে রুটিন ঠিক করে নিয়েছিল নিজেদের।

স্কুল অনিন্দ্যকে চারমাস পরেই ছাড়তে হল—চাকরিটা মেটার্নিটি লিভের। কিন্তু পরিচয়টা টিকেই রইল নমিতার সঙ্গে। দুজনে কাছাকাছি এল, এক সঙ্গে চা খেল অনেকদিন, লেকের ধার দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুজনের মনে হল, সারাটা জীবন যদি এমনিভাবে পাশে পাশে চলতে পারা যেত। কিন্তু বেকার অনিন্দ্য কথাটাকে ভাববার আগেই আতঙ্কের অন্ধকারে তলিয়ে দিলে, আর ক্লান্ত স্কুল-মিস্ট্রেস্ নমিতা শ্রান্তভাবেই কোনো ঘুমভাঙা রাতের নিঃসঙ্গ প্রহরগুলির জন্যে সেটা সরিয়ে রাখল। আপাতত এসব বিলাসিতা তাদের জন্যে নয়।

ইণ্টারমিডিয়েটের আগে কখনো কখনো পড়াতে যেত শমিতাকে। আর, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আভাস দিত শমিতাই।

'আজকাল তো এদিক প্রায় ভুলেই যাচ্ছেন।'

'সময় পাই না।'

'আমার জন্যে বলিনি।'—শমিতা অল্প একটু হেসে বলত, 'আপনি মাঝে মাঝে এলে দিদির মেজাজটা ভালো থাকে। কারণে অকারণে আমাকে বকুনি খেতে হয় না।'

'পাকামো করতে হবে না। পড়ো।'

বাপ-মা পাকিস্তানে, দুই বোন কলকাতায় একখানা ঘর নিয়ে থাকে। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি—সামান্য ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরেই দুখানা তক্তপোশ, দুটি চেয়ার, শমিতার পড়ার টেবিল। ঘরের ঘোণায় একটুখানি কাঠের পার্টিশন, দুই বোনের রান্নাঘর।

পার্টিশনের ওপার থেকে চা নিয়ে বেরিয়ে আসত নমিতা। অনিন্দ্যর সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে, ঘামে ভেজা কপালের ওপর লেপ্‌টে থাকা কয়েকটা ঝুরো চুল সরিয়ে দিয়ে হয়তো জিজ্ঞেস করত ঃ 'কী বলছিল শমি?'

শমিতা জবাব দিত ঃ 'কিছু না দিদি, কিছু না। লজিকের কয়েকটা ফ্যালাসি বুঝে নিচ্ছিলুম।'

ফার্ন রোড দিয়ে এগোতে এগোতে অনিন্দ্য ভাবছিল নমিতা নিশ্চয় স্কুলে বেরিয়ে গেছে এতক্ষণ। শমিতার কলেজ হয় সকালে—সে ফিরে এসেছে ঘরে। খবরটা তাকেই দিয়ে যাবে, 'সন্ধ্যের দিকে আসব, দিদিকে থাকতে বলে দিয়ো।'

কিন্তু দেখা হল নমিতার সঙ্গেই। শমিতার টেবিলে বসে কী যেন লিখছিল সে!

'এসো—এসো।' খুশিতে আলো হয়ে উঠল নমিতার মুখ ঃ 'হঠাৎ এ সময়ে যে? কী করে তুমি টের পেলে আজ আমাদের স্কুলে ফাউণ্ডেশন ডের ছুটি?'

'ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌। শোনো, মিষ্টি খেতে এলুম। চাকরি পেয়েছি।'

'পেয়েছ—সত্যি?'—আনন্দে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল নমিতা ঃ 'সত্যিই চাকরি পেয়েছ? কোথায়—কবে থেকে?'

হলদে খামখানা এগিয়ে দিলে অনিন্দ্য। প্রায় ছোঁ মেরে চিঠিটা নিলে নমিতা—চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে তার।

কিন্তু লাইন কয়েক পড়েই মুখের আলোটা নিবে গেল। পাতলা ভ্রূ দুটোর ওপর ছায়া ঘনালো একটুখানি।

'কলকাতায় নয়—খড়্গপুরে!'

'বেশি দূর তো আর নয়—মেল ট্রেনে চট্‌ করে চলে আসা যায়।'

'তা নয়, তবু—' নমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটু আগেই যে খুশীর আলোটা ঝলমল করে উঠেছিল, স্কুল-মাস্টারির ক্লান্ত অবসাদে সেটা কোথায় তলিয়ে গেল আবার।

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি চাকরিটা কলকাতায় হলেই খুব ভালো হত। আমাদের অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্‌ হেড মিস্ট্রেস্‌ রিটায়ার করছেন মাস তিনেক পরে—তাঁর জায়গায় চান্সটা আমিই পাব। মাইনেও কিছু বাড়বে। তুমি যদি কলকাতায় থাকতে পারতে—'

যে কথা নমিতা বলতে বলতে থেমে গেল, সেগুলো এক মুহূর্তে অনিন্দ্যর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ হানল। চাকরি-টাকা-স্বার্থ! অনিন্দ্য কলকাতায় থাকলে লেকের ধারের স্বপ্নটাকে একবার জাগিয়ে তোলা যেত, ভাবা যেতে পারত দুজনের রোজগারে কোনোমতে ভদ্রভাবে বাঁচাও যায় হয়তো। কিন্তু নমিতা কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে খড়্গপুর যেতে পারে এক সামান্য কেরানীর অভাবের সংসারে—আরো বিশেষ করে অ্যাসিস্‌ট্যান্ট্‌ হেড মিস্ট্রেস হওয়ার সম্ভাবনাটা এত কাছেই এগিয়ে এসেছে যখন?

আর হেড্‌ মিস্ট্রেস হওয়ার পরম লগ্নটিই বা কি এমন সুদূর? তার মাইনে তো রীতিমতো কুলীন! অনিন্দ্য মুহূর্তে অনুভব করল, কেবল অমরেশের আড্ডাই নয়—এই চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত ঘাটগুলো তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে! কেউ যেন হঠাৎ একটা বন্যার নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে তাকে!

বলতে পারত ঃ 'একদিন হয়তো কলকাতায় বদলী হয়ে আসব—' কিন্তু সে-কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হল না। সেই অভিশপ্ত হলদে খামটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আসি আজকে।'

নমিতা তখনো হয়তো সেই হিসেবের মধ্যেই মগ্ন হয়ে ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে বললে, 'চা খাবে না?'

'আজ থাক। যাওয়ার আগে একদিন আসব।'

'আচ্ছা।'

রাস্তায় বেরিয়ে সবে যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল, সেটা ছুঁড়ে ফেলল অনিন্দ্য। কিন্তু

এমন অপচয়ের দিকটা সে খেয়ালও করল না এবার। আর বড়ো বড়ো পায়ে রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের দিকে যেতে যেতে তার মনে হল, ফার্ন রোডে আর সে ফিরবে না—কখনোই না। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড্ মিস্ট্রেস—হেড্ মিস্ট্রেস্—অনেক দূরের কূলে নমিতার মূর্তিটা এখুনি ঝাপসা হতে শুরু করেছে। যখন বেকার ছিল—তখন সম্ভাবনার সীমা ছিল না, কিন্তু চাকরির এই বৃত্তটার ভেতরে এই মুহূর্তে জীবনের কাছে—নমিতার কাছে সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল সে!

চাকরি পাওয়ার প্রথম দিনেই সমস্ত পৃথিবীটা এমন কদর্য বিস্বাদ হয়ে যায়—কে জানত!

সেই পাখীটা

বাড়িটা শহরের প্রায় শেষ মাথায়। এদিকের রাস্তাটা এগিয়ে এসেছে সাপের মতন পাকে পাকে। ডানদিকে খাড়া পাহাড়ের ওপর বোটানিক্যাল গার্ডেনের গাছপালা কালো অন্ধকারে তলানো, বাঁ দিকে খাদ। খাদের দিকে সব জায়গায় রেলিং নেই—অসতর্ক মোটরগাড়ির জন্যে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে মনে হয়। সেজন্যে সন্ধ্যার পর ক্বচিৎ কখনো এ অঞ্চলে গাড়ি আসে, বিরল বসতি এলাকাটা সূর্য ডোবার পরেই প্রায় নির্জন হয়ে যায়।

এই পথ ধরেই একটা আহত জন্তুর মতো এগিয়ে আসছিল সঞ্জীব। শুধু রাত নয়—ডিসেম্বরের শীতলতম রাত। ইঁদুরে-কাটা কাগজের কুচির মতো তুষার ঝরছে অনেকক্ষণ থেকে। শীতের দিনে পাহাড়ী ঝরনার জলোচ্ছ্বাস, মৃতপ্রায় জ্যোতিঃহীন হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের বাতিগুলো আলো দিচ্ছে না, কয়েকটা আরক্তিম ঘোলাটে চোখের মতো তাকিয়ে আছে কেবল। ফার্নের পাতা থেকে খর খর করে ভূতুড়ে আওয়াজ উঠছে, আঁকা-বাঁকা পথটার ওপর তুষারের কুচি জমছে, আড়ষ্ট হাতে মাথা-মুখ সাফ করতে করতে যেন মহাপ্রস্থানের পথে চলেছে সঞ্জীব।

স্টেশন থেকে কতখানি রাস্তা? দু মাইলের কম নয়। এতখানি পথের ওঠা-নামা ভেঙেও সঞ্জীব এতটুকু উত্তপ্ত হতে পারছে না—বাইরে থেকে ডিসেম্বরের শীতলতম একটি রাত যেন তারও রক্তের মধ্যে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। নাকের ডগায় অসহ্য একটা যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে—বার বার সেখানে আঙুল ঘষতে ঘষতে সঞ্জীবের মনে হচ্ছিল সে যেন জ্যাক লণ্ডনের একটা বীভৎস গল্পের নায়ক—মেরুর শীতলশ্বেত অনন্তের মধ্যে পথ হারিয়ে যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর ভেতরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মৃত্যুর প্রশ্ন এখনো নয়। যদিও বুকে-পিঠে ব্রঙ্কিয়াল প্যাচের অনুভূতিটা এই শীতের ছোঁয়াচ লেগে অনেকখানি প্রখর হয়ে উঠেছে, তবু এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে সঞ্জীবকে। বাঁচার যেমন কোনো অর্থ নেই, মৃত্যুও তেমনি সমান নিরর্থক। তবু বেঁচে থাকাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—অন্তত আজ রাতে সে জ্যাক লণ্ডনের গল্পের নায়ক হতে চায় না।

আর বিশেষ করে, তুষারঝরা এই নির্জন সরীসৃপ পথটা দিয়ে, কাঁটাওলা পাইন পাতার খর খর আওয়াজ শুনতে শুনতে যখন দু মাইল সে পার হয়ে এসেছে আর

সামনের ওই ছোট কাঠের বাড়িটার কাচের জানলায় লাল পর্দাটা যখন লাল্চে আলোয় লাইটহাউসের মতো জেগে আছে, সেই তখন।

বাড়িটার সামনে এসে মিনিটখানেকের জন্যে সঞ্জীব দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো হাত একসঙ্গে ঘষল একবার। নাকমুখ দিয়ে কয়েকটা বড়ো বড়ো ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পা টেনে টেনে গোটা আটেক ধাপ উঠে টক টক করে দরজায় টোকা দিলে কয়েকটা।

দরজা খুলল সুনন্দাই।

ঘরের ভেতর থেকে লালচে আলোর রেখা সুনন্দার দুপাশ কাটিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে সঞ্জীবকে একটা বিচিত্র মূর্তিতে রূপান্তরিত করল, মনে হল তার কিছুটা বাস্তব, অনেকখানিই অবাস্তব। তুষারের কুচি ছড়িয়ে আছে এক মাথা বন্যচুলের ওপর, গায়ের কোটের কাঁধে কলারে, দুটো ক্লান্ত চোখ অন্ধকারে মগ্ন। সুনন্দা সর্বাঙ্গে একটা দুঃসহ শিহরণ অনুভব করল।

—কে? কে আপনি?

—আমাকে চিনতে পারলে না? আমি সঞ্জীব—সঞ্জীব মুখার্জি।

একটু দূরেই খাদের পাশে ইয়োরোপীয়ানদের যে পুরোনো কবরখানাটা রয়েছে, চকিতের জন্যে তার কথা মনে পড়ল সুনন্দার। মনে হল সেই সব শ্যাওলাধরা কোনো হিমার্ত সমাধির আবরণ সরিয়ে কে একজন এসে দাঁড়ালো—পঞ্চাশ বছর আগে পাথরে মাটির গভীরে যাকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা হলে সঞ্জীব মুখার্জি নামটা সে অন্তত উচ্চারণ করত না।

ঠাণ্ডাবসা ভারী গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল সঞ্জীব, একটুখানি হাসতে চাইল।

—দোরগোড়া থেকেই বিদায় করবে, না ভেতরে গিয়ে বসতে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে?

দরজার ফ্রেম থেকে একটুখানি সরে গিয়েছিল সুনন্দা আর ভেতরের আলোয় সঞ্জীবের শরীরটা এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল অনেকখানি। সুনন্দা দেখল, সঞ্জীব শীতে অল্প অল্প কাঁপছে, নাকের ডগাটা অতিমাত্রায় আরক্তিম, ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে, হাত দুটোকে ঘষে চলেছে একসঙ্গে, মাথায় বরফের কুচিগুলো গলে গিয়ে যেন কয়েকটা অশ্রুবিন্দু নামছে তার গাল বেয়ে। এক মুহূর্তের অনিশ্চয়তায় দুলল সুনন্দা, বুকের চঞ্চলতা একটু নিয়ন্ত্রিত হল, তারপর দরজা থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে বললে, আসুন ভেতরে।

—ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে সঞ্জীব। কাঠের খিলটা আটকে দিতে চাইল তারপরে। আর তক্ষুনি ধরা গলায় সুনন্দা বললে, না—খিলটা খোলাই থাক।

কোটরের আলো অন্ধকারের ভেতরে এবার চকিতের জন্যে ঝিমিয়ে উঠল সঞ্জীবের চোখ। বাইরের মৃত্যুশীতলতা থেকে এই উত্তপ্ত ঘরটার ভেতরে পা দিয়ে যেন একটুখানি সজীব হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। বললে, তার মানে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

সুনন্দা সে কথার জবাব দিল না। বললে, বসুন।

এবার ঘরটার চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখল সঞ্জীব। একসঙ্গেই শোওয়া এবং

বসবার ঘর। একদিকে একটি ছোট বিছানা—পরিপাটি করে একজোড়া নরম লেপ ভাঁজ করা রয়েছে তার ওপর। আর একদিকে একটি গোল নীচু টেবিলকে ঘিরে তিনখানা বেতের চেয়ার। ফিকে নীল রঙ করা দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডার ছাড়া আর কোন ছবি নেই। কাঠের মেজেতে দড়ির কার্পেট বিছানো, এক কোণায় ছোট্ট একটি বুককেসে খানকয়েক বই। গোল টেবিলটার ওপর ইংরেজি একটা সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা খোলা—বোঝা গেল সঞ্জীব এসে দরজায় টোকা দেবার আগে পর্যন্ত ওই পত্রিকাটাই পড়ছিল সুনন্দা।

প্রাচুর্যের চিহ্ন কিছুই নেই—এর বেশি কী আর থাকতে পারে একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্ মিস্ট্রেসের ঘরে? তবু যেন বাইরের শীতলতম রাত্রির মৃত্যু-সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে সঞ্জীব একটা লাইট হাউসের কবোষ্ণ কোমল আশ্রয় পেল। ঘরের ফায়ার প্লেসের খোলা মুখটার ভেতরে কতকগুলো জ্বলন্ত চারকোল যেন মুঠো মুঠো পদ্মরাগ মণির মতো জ্বলছে। কী উত্তাপ—কী মমতা—কী আশ্রয় এখানে! ব্রঙ্কিয়াল প্যাচের বেদনাময় অনুভূতি ভরা—এই শীত-বিষাক্ত রাত্রিতে দীর্ঘ দু মাইল সরীসৃপ পথের চড়াই-উৎরাই ভাঙা ক্লান্ত শরীর এই মুহূর্তে যেন ওই নরম বিছানাটার ওপরেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছিল। চার বছর আগে তাতে কোনো বাধা ছিল না, নিজের কাছে নয়, সমাজের চোখেও নয়। কিন্তু সঞ্জীব জানে, আজ তা অসম্ভব।

সুনন্দা আবার নিষ্প্রাণ গলায় বললে, আপনি বসুন।

আপনি বসুন! একবার হা-হা করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল সঞ্জীবের। কিন্তু অতখানি উদ্যমও আর শরীরে কোথাও অবশিষ্ট নেই তার। তা ছাড়া হাসলে গেলেই ফাটা ঠোঁটে যেন পিন বিঁধতে থাকে, নোনা রক্তের স্বাদ লাগে জিভের ডগায়, একটু আগেই সঞ্জীব তা টের পেয়েছিল।

—বসব? কিন্তু স্নো পড়েছে আমার জামা-কাপড়ে, চেয়ার নষ্ট হয়ে যাবে।

—কিছু হবে না—বসুন।

সঞ্জীব জামা আর ট্রাউজার একবার ঝেড়ে নিলে, কিন্তু বরফের কুচিগুলো ঘরের উত্তাপে গলে গিয়েছিল, কয়েকটা জলের বিন্দু কেবল পড়ল কার্‌পেটের ওপর। হঠাৎ সঞ্জীবের নিজেকে একটা জানোয়ারের মতো মনে হল, যেন বাইরে থেকে এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে এসে গায়ের রোঁয়াগুলোকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। সঞ্জীব আবার হাসতে চাইল। ফাটা ঠোঁটের যন্ত্রণায় হাসিটা বিকৃত মুখভঙ্গিতে পরিণত হল, তারপর সশব্দে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

বাইরে এখন তুষার ঝরছে—আরো বেশি করেই ঝরছে হয়তো। বাইরের পাতাগুলো থর থর করে ভূতুড়ে আওয়াজ তুলছে নির্জন বাঁকা পথটার ধারে, নিষ্ঠুর শীত চারদিকে রচনা করে চলেছে মেরুর মতো শ্বেত-মৃত্যুর বিস্তার। কিন্তু এই ঘরে এখন জীবন, উত্তাপ, কোমলতা, আর, আর চার বছর আগে হলে বলা যেত ঃ প্রেম।

কিন্তু আজ আর সে কথা কল্পনাও করা চলে না।

সুনন্দা বুককেসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার শঙ্খের মতো কপাল-মুখ-গ্রীবার রঙ, তার গায়ের নক্‌শা করা সাদা শাল, তার পরনে সাধারণ কালো পাড়ের সাদা শাড়ী সব মিলিয়ে ঘরের আলোয় তাকে একটা সাদা পাথরের মূর্তির মতো দেখাল ;

মূর্তির মতো নিশ্চল—পাথরের মতো নিরনুভব। দুটো গভীর কালো চোখ তার তাকিয়ে রয়েছে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে—যেখানে দুটি বুনো হাঁস তাদের চিত্রিত ডানা ছড়িয়ে নেমে আসছে বাংলাদেশের কোনো পদ্মবিলের ওপর।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কাটল। কতক্ষণ কাটল সঞ্জীব জানে না। তার হাতে ঘড়ি ছিল না, এই ঘরটাতেও নয়। আর বসে থাকতে থাকতে তার ঝিম এল, ক্লান্ত ঘাড়টা কুঁজো হয়ে নেমে পড়তে চাইল বুকের ওপর, ঘরের তপ্ত গভীর আরাম দু হাত বাড়িয়ে তাকে যেন একটা অচেতনার মধ্যে টেনে নিতে চাইল, চোখের পাতা দুটো ঝুলে পড়তে চাইল দুটো ভারী পর্দার মতো। ঘুমিয়ে পড়তে পারে সঞ্জীব—এই মুহূর্তেই কুণ্ডুলী পাকিয়ে এই চেয়ারটার ভেতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সঞ্জীব জানে, এখানে ঘুমোবার দাবি তার আর নেই। জোর করে পিঠ সোজা করে তুলল, প্রয়োজনের চাইতেও বেশি করে ছড়িয়ে দিলে চোখ। দাঁতের ঠকঠকানি অনেকখানি থেমে গিয়েছিল—খানিকটা সহজ স্বাভাবিকভাবে সঞ্জীব বললে, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না নন্দিনী?

সুনন্দা একটুখানি নড়ে উঠল এবার। মৃদু গলায় বললে, ভুল করছেন, আমার নাম সুনন্দা।

ঠিক কথা, সুনন্দাই বটে। বিয়ের পরে 'রক্তকরবী'র নায়িকার সঙ্গে সঞ্জীব মিলিয়ে নিয়েছিল সুনন্দাকে। কিন্তু নন্দিনী আজ মৃত—তাকে আর কোনোমতেই নতুন করে জাগিয়ে তোলা যাবে না।

সঞ্জীব নিঃশ্বাস ফেলল।

—হ্যাঁ, ভুলই হয়েছে বটে। কিন্তু তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে?

—আমি বেশ আছি।

—তার মানে আমি যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয়ে যাই, তাই তুমি চাও—এই তো?

সুনন্দা জবাব দিল না। একবার ভদ্রতা করে পর্যন্ত বলতে পারল না—না, না, তা নয়—তা নয়। সঞ্জীব আবার বুকে পিঠে সেই ব্রঙ্কিয়াল প্যাচের বেদনাময় উপস্থিতি অনুভব করল।

—আমি কেমন আছি, কোথা থেকে এলুম, এ-সব তো তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না সুনন্দা?

সুনন্দা আবার শেল্‌ফটায় হেলান দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঠোঁট নড়ল কি নড়ল না, অথচ স্পষ্ট মৃদু একটা স্বর ভেসে এল ঃ তার কি কোনো দরকার আছে?

—না, দরকার নেই, সত্যিই কোনো দরকার নেই।—সঞ্জীব মাথা নাড়ল ঃ তোমার কাছে আজকে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে বিরক্ত না করলেই ভালো হত—তাই নয় সুনন্দা?

সুনন্দা যেন ইতস্তত করলে এক মুহূর্তের জন্যে। ঘরে কোনো শব্দ ছিল না, শুধু পদ্মরাগ মণির মতো উগ্র উজ্জ্বল কাঠকয়লা থেকে আগুনের একটা অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট গুঞ্জন যেন শোনা যাচ্ছিল। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তারই একটুকরো জ্বালা মিলিয়ে সুনন্দা বললে, হয়তো।

চাবুকের সামনে কুঁকড়ে-যাওয়া কুকুরের মতো সঞ্জীব স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল, এর পরে এই ঘরটাতে এক সেকেণ্ডও বসে থাকা পৃথিবীর কদর্যতম নির্লজ্জের পক্ষেও

অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অসম্ভব সম্ভব করতে হবে সঞ্জীবকে—অন্তত আরো কয়েকটা কথা না বলে এই ঘর থেকে সে কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না। ভাগ্যের কাছে নিজেকে যাচাই করতে এসেছে—আজই হয়তো তার শেষ সুযোগ।

এই বন্ধ ঘরের ভেতরে বসেও একটা মৃদু জান্তব কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল দূর থেকে, কানে এল নখ দিয়ে দরজা আঁচড়ানোর আর্তি। কোনো বাড়ির রুদ্ধ দরজায় শীতে জর্জরিত একটা পথের কুকুর আশ্রয় চাইছে। ঠিক তারই মতো ভাগ্যবান। হাসতে গিয়ে মুখ বিকৃত করল সঞ্জীব, ঠোঁটের নোনা রক্তে জিভের ডগা বিস্বাদ হয়ে উঠল।

যদিও জানত পকেটের শেষ সিগারেটটা তিন ঘণ্টা আগেই শেষ হয়ে গেছে, তবু কোনো একটা মির্যাক্‌লের আশায় কোটের ডান পকেটটা একবার হাতড়ালো সঞ্জীব। সিগারেট পাওয়া গেল না, ভেতরকার ছেঁড়া লাইনিংয়ের মধ্যে আঙুলগুলো যেন একটা অসীম শূন্যতার স্পর্শ অনুভব করল, হাতে ঠেকল ময়লা রুমালটা। হিংস্রভাবে সেটাকেই টেনে বের করল সঞ্জীব, চেপে ধরল ঠোঁটে, রক্তের কয়েকটা বিন্দু ফুটে উঠল তার ওপর।

সেই রক্তবিন্দুগুলোর দিকে তাকিয়ে সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, যেন একটা দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা লিপির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে তার মস্তিষ্কে একটু একটু করে মেঘ ঘনিয়ে এল। কিন্তু আবার দূর থেকে শোনা গেল শীতজর্জরিত সেই কুকুরটার গোঙানি, তার নখের আওয়াজ, দ্বিতীয়বার জেগে উঠল সঞ্জীব।

—সুনন্দা, আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?—এমন অদ্ভুত হীনতা নিয়ে কথাটা বলল যেন নিজের গলার স্বর সঞ্জীব নিজেই চিনতে পারল না। বলেই বুঝতে পারল, কোনো দরকার ছিল না, এতখানি ছোট হয়ে যাওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না তার, কিন্তু কথাটা যখন মুখ থেকে বেরিয়েই গেছে, তখন চূড়ান্ত গ্লানির জন্যেই তৈরী হতে হল তাকে।

সুনন্দা বললে, আমি আপনাকে অনেক দিন আগেই ক্ষমা করেছি।

—তা হলে কি একটা সেটেলমেণ্ট—

—কিসের সেট্‌লমেণ্ট?—সুনন্দা হঠাৎ ঋজু হল, গভীর কালো চোখ দুটো লালচে আলোয় পিঙ্গল হল, একবার ধারালো হয়ে উঠল গলার স্বর ঃ কোন্ সেট্‌লমেণ্টের কথা বলছেন আপনি?

সঞ্জীব দৃঢ় হল, প্রাণপণ চেষ্টায় নুয়ে আসা শরীরটাকে অস্বাভাবিকভাবে সবল করতে চাইল। অকারণে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, তুমি তো জানো, সেই বিশ্রী মামলাটার পরেই নীহারিকা সুইসাইড করেছিল।

এবার একটা উদ্যত বজ্রের মত যেন তৈরী হয়ে দাঁড়ালো সুনন্দা। অসহ্য ঘৃণা ঠিকরে পড়ল চোখ থেকে। বললে, জানি। আপনি যে সেই খুনটা করেছিলেন, কাগজে আমি তা পড়েছি।

—খুন আমি করিনি—সঞ্জীব যেন মনের মধ্যে অসংখ্য মুঠি তৈরী করে আত্ম-প্রত্যয়টাকে ধরে রাখতে চাইল ঃ সে বিষ খেয়েছিল—পুরো এক শিশি কার্বলিক অ্যাসিড। আমি তখন জেল খাটছিলুম।

—কোনো তফাৎ হয় তাতে?—সুনন্দার স্বরে বিদ্যুৎ ঝলকালো।

—হয়তো হয় না। তার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কিন্তু সুনন্দা, পৃথিবীতে সব

পাপেরই তো প্রায়শ্চিত্ত আছে।

—না, নেই—সুনন্দার শরীরের সমস্ত রেখাগুলো সাদা পাথরের নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হল ঃ এমন অনেক পাপ আছে, চরম দণ্ড ছাড়া তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মানুষের আইন অতটা পর্যন্ত তোমায় ছুঁতে পারেনি—বলেই সুনন্দা থমকালো ঃ অতখানি পর্যন্ত ছুঁতে পারেনি আপনাকে—সেইটেই আপনার সৌভাগ্য।

'তোমায়' বলেই সুনন্দা সামলে নিলে—এটা লক্ষ্য করেও ভুলে গেল সঞ্জীব। তখন আরো তীব্র হয়ে বুকে পিঠে যন্ত্রণাটা উঠে আসছিল। সঞ্জীব বললে, তার মানে—তুমি বলতে চাও বাইগ্যামির চার্জে আমার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল?

—আপনার কাছে বাইগ্যামি কিছুই নয়। কিন্তু আপনার এই খেলাটুকু মেয়েদের পক্ষে কত বড় সর্বনাশ—সেটুকু বোঝবার মতো শক্তি আছে আপনার—মন আছে?—এতক্ষণের প্রায় নিরাসক্ত শীতলতা থেকে এইবারে ধীরে ধীরে আগ্নেয় হয়ে উঠতে লাগল সুনন্দা ঃ নীহারিকার আত্মহত্যা থেকে কিছুই কি আপনি বুঝতে পারেন নি?

সঞ্জীব মাথা নামিয়ে ফেলল, চোখের দৃষ্টি পড়ে রইল নীচের কার্পেটটার ওপর। কী অদ্ভুতভাবে দূরে সরে গেছে সুনন্দা, কী নিদারুণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে সে! মেয়েরা যখন কঠোর হয়, তখন তার আর কোনো সীমা থাকে না।

মনের জোরটাকে চেষ্টা করেও আর ধরে রাখা যাচ্ছে না—বরফের কুচিগুলোর মতোই গলে জল হয়ে যাচ্ছে ; সঞ্জীব অনুভব করল যেন মুঠোয় করে খানিকটা পারদ আঁকড়ে রাখতে চাইছে সে—আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে পিছলে সরে যাচ্ছে সেটা। ধরা যায় না তবু ধরবার জন্যে কী অদ্ভুত পণ্ডশ্রম!

তবুও মুখ তুলল। তবুও কৈফিয়ৎ দিতে চাইল।

—জানো তো, সেই সাব-ডিভিশনাল টাউনে তখন আমি পোস্টেড। একা থাকতুম—কী করে যেন দুর্বলতা এসে গেল। পাশের বাড়ির মেয়ে, ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃস্থ—মেয়েটাকে মধ্যে মধ্যে বিনা-পয়সায় পড়াতুম—

—তাই বুঝি এইভাবে তার পারিশ্রমিক তুমি—আপনি আদায় করে নিলেন?

—না, অ্যাড্‌ভান্টেজ আমি নিইনি।—কার্পেটের দিকে আবার দৃষ্টি নামল সঞ্জীবের। যে-যুক্তির কোনো দাম নেই, একান্ত নির্বোধের মতো সেইটেই তুলে ধরল ম্লান গলায় ঃ আমি নীহারিকাকে বিয়ে করেছিলুম।

—তোমার স্ত্রী বেঁচে থাকতে?—এবার ভুলটাকে শোধরাবার কথা ভুলে গেল সুনন্দা ঃ তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে, ট্রেনিং থেকে আর আমি ফিরে আসব না? আর ফিরেও যদি আসি দু পাশে দুই যুগলমূর্তি নিয়ে তুমি সিংহাসনে বসবে? আর রাত্রে দুই মহিষীর একজন তোমার মাথা টিপে দেবে, দু নম্বর পদসেবা করতে থাকবে?

—নন্দিনী—

—ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার নাম সুনন্দা।

আবার চুপ করল সঞ্জীব, আবার পিছলে যাওয়া খানিকটা পারদকে ব্যর্থ চেষ্টায় মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। বাইরে সেই কুকুরটার গোঙানি আর আঁচড়ানি নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে—হয়তো বাড়িতে কোনো লোক নেই, হয়তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, হয়তো শুনেও শুনতে চাইছে না।

এইবারে ফাটা ঠোঁটের যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই খানিক নির্লজ্জ হাসি হাসল সঞ্জীব। অন্তত হাসা ছাড়া কিছু আর তার করবার ছিল না।

—কিন্তু তার শাস্তি তো তুমি দিয়েছ সুনন্দা। আমাকে জেল খাটতে হয়েছে। নীহারিকা আত্মহত্যা করেছে। তুমি এক্স্‌পার্টি ডিভোর্স করে নিয়েছ, আমি কন্‌টেস্ট করিনি।

—সব দোষ আমার, কী বলো?—সুনন্দার চোখ দুটো এবার সোজা এসে সঞ্জীবকে বিদ্ধ করতে লাগল ঃ আমি মিথ্যেই তোমায় জেলে পাঠালুম, নীহারিকাকে আত্মহত্যা করতে অনুরোধ করলুম, পতিব্রতার ধর্ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটালুম? আর তুমি নির্মল—নিষ্পাপ—শুধু পরের দুঃখে বিচলিত হয়ে, নিজের বিবাহিত পরিচয় গোপন করে একটি গরিবের মেয়ের দায় উদ্ধার করলে?

—আমার অপরাধ আমি তো অস্বীকার করিনি সুনন্দা।—যেন মৃত্যুর ওপার থেকে একটা বিদেহী সত্তার গলায় কথা কইতে লাগল সঞ্জীব ঃ জেলে যাওয়ার অপমানের চাইতেও অনেক বেশি লজ্জায় আর গ্লানিতে তিলে তিলে আমি জ্বলে গেছি, দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। আমি যে কিভাবে দিনের পর দিন—

—এই সব কথাই কি আজ বলতে এসেছ আমার কাছে?—সুনন্দা ব্যঙ্গে কুটিল হয়ে উঠল ঃ কিন্তু কিছুমাত্র দরকার ছিল না। তুমি অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে শুদ্ধ হয়ে উঠেছ, খুব সুখের কথা। এইবার শান্ত চিত্তে তুমি নীহারিকার জন্যে ধ্যান করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দাও—তোমার আত্মা স্বর্গের দিকে অগ্রসর হোক।

বাইরের কুকুরটা একটা তারস্বর আর্তনাদ তুলে ছুটে পালাচ্ছে মনে হল, খুব সম্ভব বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে কেউ এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিয়েছে তাকে। অনেক দূর পর্যন্ত একটা করুণ কান্নার রেশ এগিয়ে চলেছে—এইবারে কোথাও গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, শীতে জমে মরে যাবে—সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার মিলবে তার। এতক্ষণ তবু এক রকম ছিল, এই ঘরের উত্তাপে, একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের ভেতরে একভাবে বসে ছিল সঞ্জীব ; এইবার তার মনে হল, ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলোর ওপর ছাইয়ের একটা মৃদু আবরণ পড়ছে, বাইরের শীত যেন কাঠের ফাটল দিয়ে একটু একটু করে ঢুকছে এই ঘরটারও ভেতরে, তার সেলাই খুলে যাওয়া কোটটার মাঝখানে কয়েকটা তীক্ষ্ণ ফলকের মতো প্রবেশ করছে সেই শীত—বুকে-পিঠের যন্ত্রণার কেন্দ্রগুলোতে এক-একটা তীরের মতো বিঁধে যাচ্ছে তারা। সঞ্জীব আবার হাত দুটোকে ঘষতে আরম্ভ করল, হঠাৎ দেখল এক জোড়া সাদা দস্তানা সুনন্দার মণিবন্ধ পর্যন্ত আড়াল করে আছে।

—সুনন্দা, সব কি ভুলে যাওয়া যায় না?—ভিক্ষুকের আকৃতি ফুটে উঠল সঞ্জীবের গলায়। আর নিজেকে ওই কুকুরটার চাইতেও করুণার যোগ্য বলে বোধ হল তৎক্ষণাৎ।

—ভুলে গিয়ে কী লাভ?

—আমরা তো নতুন করে—এতক্ষণ পরে আবার দাঁতে দাঁতে বেজে উঠল সঞ্জীবের ঃ নতুন করে শুরু করতে পারি আবার।

—নতুন করে শুরু?—শিকারীর রাইফেলের নল চোখে পড়া হরিণীর মতো মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল সুনন্দা, শক্ত করে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো বুকশেলফ্‌টার গায়ে ঃ কী বলতে চান আপনি?

—তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারো।—আবার প্রাণপণ শক্তিতে—ভেঙে পড়তে

যাওয়া কাঁধটাকে যথাসাধ্য সোজা করে নিয়ে সঞ্জীব বললে, গিভ্ মি এ চান্স।

—চান্স?—কথাটা সুনন্দা তখনি পাথরের টুকরোর মতো ছুঁড়ে মারল সঞ্জীবের মুখের ওপর ঃ কিসের চান্স?

—বাঁচবার। বাড়ি থেকে চলে এসেছি, সম্পূর্ণ বেকার। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। সরকারী চাকরি আর পাব না, কিন্তু কোথাও একটা ফার্মে-টার্মে কিছু কাজ যোগাড় করতে পারি। এখনো যথেষ্ট দেরি হয়ে যায় নি, আবার উঠে দাঁড়াতে পারি আমি।

—তা পারো।—সুনন্দা সাপের মতো অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সঞ্জীবের দিকে ঃ মাত্র বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়েস তোমার। সব তুমি শুরু করতে পারো নতুন ভাবে। কেবল বিপন্ন দেখলেই তাকে উদ্ধার করবার বদঅভ্যাসটা তোমায় ছাড়তে হবে।

—সুনন্দা—আহত কুকুরটার আর্তনাদ ফুটে উঠল সঞ্জীবের গলায় ঃ মানুষের কি কোনো দিন শিক্ষা হয় না?

—এখনো তার পরীক্ষা হয় নি। অন্তত তোমার দিক থেকে নয়।

সঞ্জীব কী বলতে যাচ্ছিল, কাচের জানলায় ঝটপট করে আওয়াজ উঠল খানিকটা। চমকে দুজনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখল সেদিকে। কী একটা পাখি, হয়তো প্যাঁচা—হয়তো শীতের রাত্রে নীড়হারা আর কেউ ; বাইরে যে অনিবার্য মৃত্যু একটু একটু করে আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আলোজ্বলা এই জানলাটার দিকে ছুটে এসেছে—মাথা খুঁড়ছে কাচের গায়ে।

সঞ্জীব বললে, সুনন্দা, জানলাটা খুলে দাও।

কঠিন গলায় সুনন্দা বললে, না।

—ঠাণ্ডায় ওটা মরে যাবে।

—মরবে না, আর কোথাও আশ্রয় পাবে।

—যদি না পায়?

—সব মৃত্যুকে ঠেকাবার দায় আমার একার নয়। তোমার মতো মহৎ প্রাণ আমার নেই।

সঞ্জীব চুপ করে গেল। এতক্ষণ ধরে যে কথাটা ভেবেও সে ভাবতে চাইছিল না—আর সেটাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো উপায়ই নেই। সুনন্দা তাকে ক্ষমা করবে না—যে ঘরের দরজা একবার বন্ধ হয়ে গেছে, সে আর খুলবে না কোনোদিন। মিথ্যেই পকেটের সব কটা অবশিষ্ট টাকা খরচ করে সে এখানে আসবার জন্যে ট্রেনের টিকিট কিনেছিল, সম্পূর্ণ অর্থহীনভাবে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে নিজের সুটকেস-বিছানা ফেলে রেখে এই শীত আর স্নোর ভেতরে প্রায় অন্ধের মতো টলতে টলতে এই দু মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছিল। এত বড়ো নির্বোধও মানুষ হয়!

জানলার গায়ে মিথ্যে মাথা খুঁড়ে পাখিটা আবার উড়ে গেল, চেয়ে দেখল সঞ্জীব। এইবার তাকেও যেতে হবে। ওই কুকুরটার মতো, এই পাখিটার মতো, জ্যাক লণ্ডনের গল্পের সেই পথ হারানো নায়কের মতো। আর তিনজনের একটি মাত্রই পরিণাম। বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া দুই-ই এখন এক হয়ে গেছে ; দুই-ই সমান, দুই-ই অর্থহীন। তবু এত দিন ধরে বেঁচে থাকাটা অভ্যাস হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় তখনো চেয়ারটাতে বসে রইল সঞ্জীব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবতে চেষ্টা করল, কোন্‌খানে তাদের মূল আলোচনাটা থেমে গিয়েছিল। মনে করতে পারল না। মাথার ভেতর স্তরে স্তরে কুয়াশা ঘনিয়ে আসছিল, ঠোঁট জ্বালা করছিল। আবার ময়লা রুমালটা চেপে ধরল সেখানে, দুর্বোধ্য কোনো লিপির মতো রক্তের কয়েকটা সূক্ষ্ম রেখা পড়ল—আচ্ছন্ন দৃষ্টি তারই ওপরে ফেলে রেখে সঞ্জীব যেন কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

আর সুনন্দা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। এতক্ষণের বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা, ঘৃণার আড়ালে যে মানুষটার শরীরকে সে দেখতে পায় নি, শুধু যে একটা ব্যক্তিত্বকে সে বিচার করছিল, এবার তার বাইরেটাকেও দেখল সুনন্দা। অদ্ভুত রোগা হয়ে গেছে, লোকটা যে অসুস্থ, তাতেও কোনো সংশয় নেই। নীলচে ফাটা-ফাটা ঠোঁট, চোখ দুটো অন্ধকারে মগ্ন, কপালটা যেন অস্বাভাবিক চওড়া হয়ে উঠে একটা করোটির মতো দেখাচ্ছে। কোট ছেঁড়া, তলায় একটা সাধারণ শার্ট দেখা যায়, ভেতরে কোনো স্লিপওভার আছে কিনা সন্দেহ। বিবর্ণ পুরোনো মোজা, জুতোটা তালি দেওয়া; ব্যারোমিটারের মাত্রা যখন বরফ পড়বার পর্যায়ে নেমে এসেছে, তখন শীত নিবারণের পোশাক এ নিশ্চয়ই নয়।

সঞ্জীব একবার স্বগতোক্তির মতো বললে, আমার জীবনে তা হলে আর তুমি ফিরে আসবে না নন্দিনী।

যে করুণাটুকু কণায় কণায় সঞ্চিত হচ্ছিল, এক মুহূর্তে উড়ে গেল মন থেকে। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল সুনন্দার। ছ'মাস কাছে না থাকার সুযোগ নিয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসতে যার বিবেকে বাধল না—সে! ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, শয়তান!

—আমার নাম সুনন্দা—শালের আড়াল থেকে শঙ্খবর্ণ বাম বাহুটির আরো কিছু অংশ বেরিয়ে এল সুনন্দার, একটি সোনালি ছোট ঘড়ি চিকচিক করে উঠল। সেদিকে চোখ ফেলে বিরস স্বরে সুনন্দা বললে, রাত প্রায় সোয়া ন'টা বাজে। পাড়াটা নির্জন। এর পরে বোধ হয় কোনো অনাত্মীয়া মেয়ের ঘরে আপনার আর থাকা উচিত নয়।

—অনাত্মীয়া!—এবার অনেকখানি বেশি করে হাসল সঞ্জীব, ফাটা ঠোঁটের যন্ত্রণাটা ভুলে গেল একবারের জন্যে। বলতে চাইল ঃ অনাত্মীয়া হলেই বা কী, আজ দুপুরে আমি কিছু খাইনি, তুমি অন্তত এক পেয়ালা চা আমায় খাওয়াতে পারো সুনন্দা। বলতে চাইল ঃ 'আমার শরীর আর বইছে না—বাইরে পৃথিবীর শীতলতম রাত, স্নো পড়ছে—না, তোমার ছোট-নরম পরিপাটি বিছানাটাতে আমি লোভ করব না—শুধু এই চেয়ারটিতে একটি রাতের মতো আমায় কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে দাও। স্টেশন পর্যন্ত দু মাইল রাস্তা হেঁটে যাওয়া আর হয়তো আমার শরীরে কুলোবে না। বেঁচে থাকার কোনো গরজ আমার নেই সুনন্দা, কিন্তু অনেক দিন বেঁচে থেকে কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে, মরতে আমার ইচ্ছে করছে না।'

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না সঞ্জীব। ফায়ার-প্লেসটার দিকে চেয়ে রইল শুধু। আগুনের ওপর ছাইয়ের রেখা ঘন হচ্ছে, আরো কিছু কয়লা দেওয়া উচিত সুনন্দার। হয়তো দেবে; সঞ্জীব চলে যাওয়ার পর। তার জন্যে এতটুকু উত্তাপও সে আর অপচয় করবে না।

সুনন্দা আবার ঘড়ির দিকে চাইল। চেয়ে দেখল সঞ্জীবের দিকে। সেই করুণার একটা আদিম অন্ধ অনুভূতি—এই বীভৎস লোকটাকেও যেন তার কাছে সহনীয় করে তুলছে!

সুনন্দা নিজেকে শক্ত করে নিল, সঙ্গে সঙ্গেই আরো কঠিনভাবে আঘাত করতে চাইল সঞ্জীবকে, কিছু ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ভোঁতা মিথ্যার অস্ত্র হানল।

—আমার স্বামীর ফেরবার সময় হয়ে গেছে। তিনি কাছেই একটা বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। তাঁর ফিরে আসবার আগেই আপনার চলে যাওয়া উচিত।

ঘরে একজনের জন্যে একটি মাত্র নরম বিছানা, পুরুষের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন-হীনতা—আগের থেকেই মেঘ-ঘনিয়ে-আসা সঞ্জীবের মাথায় এই নতুন আঘাতটা এমন সরল মিথ্যাটাকেও আর বিচার করতে দিল না। সঞ্জীব ঘোলাটে চোখ মেলে শুধু একবার বললে, তোমার স্বামী?

—হাঁ, আমার স্বামী। আপনি কি ভেবেছিলেন যে সারা জীবন আমি আপনার জন্যে তপস্যায় বসে থাকব?

এই ব্যঙ্গটুকুর দরকার ছিল না, তার আগেই সঞ্জীবের সমস্ত স্নায়ুগুলো অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীব আবার শরীরের একেবারে শেষ উদ্যমটুকু সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়ালো ঃ জানতুম না—আমি জানতুম না। জানলে তোমায় বিরক্ত করতুম না। আমাকে ক্ষমা কোরো।

এগিয়ে গেল দরজার কাছে, কাঁপা হাতে খুলে ফেলল পাল্লা দুটো, তারপর পাথরের ধাপ বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে সেই দু মাইল অন্তহীন সরীসৃপ পথের দিকে নেমে গেল। এক শীতলতা—এক মৃত্যু—ঘর আর বাইরেটা তার কাছে এখন একাকার।

কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দা—দাঁতের ওপর দাঁত চেপে রাখল। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে হু হু করে খানিকটা হাওয়া ঢুকল, এক রাশ তুলোর মতো তুষার এসে পড়ল কার্পেটের ওপর। তখন মনে হল দরজাটা বন্ধ করা দরকার।

আর বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, এতক্ষণে পথটা প্রায় দু ইঞ্চি তুষারে ঢেকে গেছে, বিবর্ণ-বিনত আকাশ থেকে নেমে আসছে অশান্ত জমাট বৃষ্টির বিন্দু, অন্ধকার পাইন গাছগুলো যেন সাদা সাদা মঞ্জরীতে ছেয়ে গেছে। আর তারই ভেতর দিয়ে টলতে টলতে চলেছে একটা কালো মূর্তি—যেন কোথায় চলেছে, কবে পৌঁছুবে কিছুই তার জানা নেই। সুনন্দার মনে পড়ল তার অসুস্থ শীর্ণ মুখ, মনে পড়ল ছেঁড়া কোটটার কথা, মনে পড়ল এই দারুণ শীতের ভেতরে এই রাত্রে পথ চলবার মতো পোশাক তার গায়ে নেই।

কিন্তু অমন এলোমেলোভাবে চলছে কেন? পথের ডাইনেই যে খাড়া খাদ নেমেছে। থেকে থেকে একেবারে খাদের কোণা ঘেঁষে যাচ্ছে, এই স্রোতে যদি জুতো একবার পিছলে যায়—

চকিতে সিঁড়ির ধাপ ক'টা পার হয়ে নেমে এল সুনন্দা! আর্ত গলায় চিৎকার করে বললে, শুনছ—শোনো—শোনো—ফিরে এসো—

মূর্তিটা একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

—শোনো—শোনো—ফিরে এসো—আমি নন্দিনী—তোমায় ডাকছি—

কালো মূর্তিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বার কয়েক টলে উঠল, তারপরে আর নিজের ভার বইতে পারল না—হঠাৎ সেই তুষারের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল। চিৎকার তুলে সেদিকে ছুটে গেল সুনন্দা।

আর খোলা দরজা দিয়ে, আলো আর উত্তাপের আহ্বানে এতক্ষণে ঘরের ভেতর ঝট্‌পটিয়ে ঢুকে পড়ল সেই পাখিটা।

একটি কৌতুকনাট্য

তিন মেয়ের পর আমার মামাতো ভাই টোকনদার প্রথম পুত্রলাভ ঘটেছে। তারই অন্নপ্রাশনে আমাকে যেতে হয়েছিল।

উৎসবের পালা মিটে গেলেও দিন তিনেক থেকে যেতে হল। আর বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটল সেই সময়। মামা যে মোটা হারছড়া দিয়ে খোকাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপর্যয় কাণ্ড শুরু হল বাড়িতে।

বৌদি বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলাতেও খোকার গলায় হারটা ছিল। রাত্রে যখন খোকাকে তিনি দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ান, তখন গলায় লাগছে দেখে খুলে রেখেছিলেন। কোথায় যে রেখেছিলেন এখন আর তা মনে করতে পারছেন না। হয়তো ড্রেসিং টেবিলের ওপরে, হয়তো তার টানার ভেতরে—কাজের ঝঞ্ঝাটে ভালো করে তাঁর খেয়ালও ছিল না।

কিন্তু কে নিয়েছে? কাকেই বা সন্দেহ করা? বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন—অধিকাংশই বাইরে থেকে এসেছেন। কথাটা ছড়িয়ে পড়বামাত্র তাঁদের কারো কারো মুখে ছায়া নামল। চাকর কুড়ি বছরের পুরোনো—ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তুলে আনে—তাকে সন্দেহ করার কথা কল্পনা করা যায় না। কাজকর্ম উপলক্ষে কিছু লোক মজুর খেটেছে বটে, কিন্তু পরশু থেকে তাদেরও ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাহলে—

তাহলে ভেতর থেকেই কেউ নিয়েছে।

কাউকেই সন্দেহ করা যায় না অথচ কাউকে সন্দেহ না করে উপায় নেই—এমনি একটা বিষাক্ত আবহাওয়ায় থমথম করতে লাগল বাড়িটা। যাঁরা কয়েকদিন আত্মীয়-বাড়িতে কাটিয়ে যাবার কথা ভাবছিলেন—তাঁদের কারো জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল, কেউ বা হঠাৎ টের পেলেন তাঁর ছুটি ফুরিয়ে গেছে। এস ডি ও-র স্ত্রী ছোট মাসীমা স্পষ্টই বললেন—আমি বাপু কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব বহরমপুরে। আর যাবার আগে সকলের সামনে বাক্স-বিছানা খুলে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

সমস্ত দিন কাটল একটা কুৎসিত অস্বস্তির ভেতর। বাচ্চারা চেঁচামেচি করতে গিয়ে চড়-চাপড় খেলো, বড়রা সারাদিন গুম হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত গুমোট কাটাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলায় তিন-চারটি কিশোরী মেয়ে যখন হার্মোনিয়াম নিয়ে গানের আসর বসিয়েছে, সেই সময় ধরা পড়ল চোরটা।

ধরল আমার তিন নম্বর মামাতো ভাই পোকন। বার-তিনেক আই.এস.সি ফেল করে এখন সে শহরের ড্রামাটিক ক্লাব আর ফুটবল টিমের উৎসাহী সদস্য। মধ্যে মধ্যে স্বাধীন স্বাধীন ব্যবসার কথাও ভাবছে। স্পোর্টসম্যান শৌখিন ছেলে—স্নানের সময় রোজ তার একখানা করে সাবান দরকার হয়।

প্রথম থেকে সে-ই বলেছিল, তোমরা যা-ই বলো বৌদি, এ বাইরের চোরের কীর্তি। খোলা জানলা দিয়ে আঁকশি বাড়িয়ে হার টেনে নিয়েছে।

—কিন্তু বাইরের জানলা তো আমি বন্ধ করে রাখি।

—গণ্ডগোলে ভুলে গিয়েছিলে। আমি বলছি, এ ছিঁচকে চোরের কাজ না হয়েই যায় না।

পোকনের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি—কিন্তু প্রতিবাদ করা আরও *বেশী বিপজ্জনক।* তবু সকলের মন ঘুরে-ফিরে সেই তিন-চারটি আত্মীয়ের কথাই ভেবেছে—যাদের মেয়েদের হাতে কাচ আর ব্রোঞ্জের চুড়ি, যাদের বাচ্চাদের জামা-ফ্রক কলকাতার ফুটপাথ থেকে কেনা, যাদের কর্তারা টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। পোকন যেন এক মুহূর্তে একটা বন্ধ জেলখানার দরজা খুলে দিলে।

—ধরেছি ব্যাটাকে। আজও সন্ধ্যের পর খিড়কির ওদিকে আস্তাকুঁড়ের আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে পালাও—আজ—

কথাটা আর শেষ করল না। স্পোর্টসম্যানের হাতের ঘুষি পড়ল পেটে, লম্বা কালো লোকটা 'কঁক' করে একটা আওয়াজ তুলেই দু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল উঠোনে।

মাসীমা বললেন, আহা-আহা—

—আহা—আহা? তিন ভরির হার, তুমি সিম্প্যাথি করছ?—পোকন একটা প্রকাণ্ড লাথি লাগালো লোকটার পিঠে ঃ চেহারা দেখছ না? আসল জেলখানার আসামী।

চেহারা দেখে যদি চোর সাব্যস্ত করতে হয়—তা হলে লোকটাকে ফাঁসির আসামী বলে মনে করতেও দোষ নেই। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা, ভূষো কালির মতো মরা কালো রং, মাথায় পাকধরা ছাঁটা ছাঁটা চুল, বুকের পাঁজরা গোনা যায়, পরনে নেংটির মতো এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কোনো আবরণ নেই। দুটো সাদা চোখ যন্ত্রণায় কুঁচকে এসেছে, কদাকার মুখটা ফাঁক করে হাঁপাচ্ছে একটু-একটু।

কৌটো থেকে বিড়ি বের করেন, এমন একজন আত্মীয় এগিয়ে এলেন। লোকটার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিলেন একটা।

—এই, কী নাম তোর?

—কা-কালীচরণ।—লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল ঃ আমি কিছু করি নাই বাবু—আমারে ছাইড়্যা দেন।

—তবে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছিলি কেন?

—অনেক কলাকাতা পইড়্যা আছে, খাওনের কিছু পাই নাকি খুঁজতে আছিলাম। পাকিস্তান থিকা আসছি—আমার কেউ নাই—ভিক্ষা-শিক্ষা কইরা খাই। আমি চোর না বাবু—মিথ্যা আমারে—

সারাদিনের অসমানের জ্বালাটা ফেটে পড়ল। আত্মীয়টি ঠাস করে চড় বসালেন একটা ঃ চুপ কর হারামজাদা! বিপাকে পড়লে সবাই অমন পাকিস্তান কপচায়। বল্—হারছড়া কোথায় রেখেছিস?

আমি এতক্ষণ দর্শকের ভূমিকাতেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু মারধোরের ব্যাপারটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। বললুম, মেরে আর কী হবে? তার চাইতে বরং থানায় দিন।

—থানায়?—পোকন তাচ্ছিল্যভরে বললে, ব্যাটা পাকা চোর—থানাতেও কি কবুল করবে নাকি? হার তো গেছেই সুকুমারদা—বরং যতটা পারা যায় হাতের সুখ করে নেওয়া যাক।

—হ্যাঁ, মারই হচ্ছে ওষুধ—আত্মীয়টি যোগান দিলেন।

তারপরে মিনিট কয়েক ধরে যা চলল তা অবর্ণনীয়। কলকাতার রাস্তায় পকেটমার

ধরা পড়বার পর যা ঘটে থাকে, তা-ই চলতে লাগল লোকটার ওপর। আর তার সঙ্গে পোকনের হুঙ্কার ঃ এখনো বল্, হার কোথায় বিক্রি করেছিস, নইলে খুন করে ফেলব!

আমি বারান্দার একটা থাম ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, মেয়েরা বাচ্চাদের টেনে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। টোকনদা বলতে লাগলেন, থাক্ থাক্—মরে যাবে—এই সময় সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। মামা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন।

—কী হয়েছে?

সমস্বরে উত্তর এল ঃ চোরটা ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে? তাই নাকি?—সাইকেল রেখে মামা এগিয়ে এলেন ঃ একি—এমনিভাবে মেরেছিস! মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে যে!

টোকনদা বললেন, তবু কবুল করছে না বাবা। পাকা চোর।

—নিশ্চয় পাকা চোর!—মামা একবার গোঁফজোড়ায় হাত বুলিয়ে নিলেন ঃ তা ধরা পড়ল কী করে?

আবার সমস্বর উঠল আর পোকনই বুক ঠুকে এগিয়ে এল সামনে।

—আমি ধরেছি বাবা। সন্ধ্যের পর খিড়কির পেছনে ঘুর ঘুর করছিল। আমি একেবারে ক্যাঁক্ করে—

লোকটার রক্তমাখা মুখ থেকে আবার কান্নামেশানো জান্তব স্বর বেরুল : আমি চোর না বাবু—প্যাটের জ্বালায় পাতা-কুড়ানি—

—শাট্ আপ!—পোকন আর একটা লাথি বসাতে যাচ্ছিল, মামা তাকে থামিয়ে দিলেন।

—খিদে পেয়েছে তো দরজায় এসে চাইলি না কেন? বাড়ির পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি কি জন্যে?

—চাইলে খ্যাদাইয়া দেয় বাবু! অনেক কলাপাতা পইড়া আছে দেখলাম—দোহাই বাবু, আমি চোর না—কিছু জানি না—খামাখা আমারে মাইরা—

মামা মোটা গলায় ধমক দিলেন ঃ চোপ। হারটা নিয়ে কী করেছিস তাই বল।

—কিসের হার বাবু? আমি কিছু জানি না!

পোকন আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মামা হাত বাড়িয়ে তাকে ঠেকালেন। তারপর বললেন, আচ্ছা—হারের কথা পরে হবে। তোর খিদে পেয়েছে? খাবি কিছু?

—খাইতে চাই না বাবু! আমাকে ছাইড়া দেন।

—তা কি হয়?—মামার মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ঃ এতক্ষণ মার খেলি, এবার একটু মিষ্টি না খাইয়ে তোকে ছাড়ব কেন? যা তো পোকন—ভাঁড়ার থেকে সেরখানেক সন্দেশ নিয়ে আয়। ভাঁড়ারে না থাকে, দোকান থেকে আন।

—এক সের সন্দেশ!—যেন বাজ পড়ল। প্রায় চিৎকার করে উঠল পোকন ঃ আপনি কী বলছেন বাবা! চোরকে একসের সন্দেশ খাওয়াবেন?

মামার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। শক্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, যা বলছি তাই করো। আর এক ঘটি জল আনো কেউ—লোকটা মুখটুখগুলো ধুয়ে ফেলুক।

গোঁজ হয়ে বেরিয়ে গেল পোকন। আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিড়

বিড় করে বলে গেল, বাবার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।

আসল নাটকটা জমল এর পরে।

চোরকে জামাই আদরে সন্দেশ খাওয়ানোর দৃশ্য দেখবার জন্য সারা বাড়ি ভেঙে পড়ল এবারে। একটা প্রকাণ্ড থালায় এক সের নয়—প্রায় দেড় সের সন্দেশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটা প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু মামার একটা নিদারুণ ধমকে ধীরে ধীরে খেতে আরম্ভ করল।

প্রথমে আস্তে সুস্থে, তারপরে রাক্ষসের মতো। মনে হল, কতদিন সে খায়নি। ক্ষুধা আর লোভের এমন মূর্তি এর আগে আমি কোনোদিন দেখিনি। তাকানো যায় না—সমস্ত শরীর শিউরে উঠতে থাকে। মুখের দু কষে তখনো রক্ত লেগে আছে, কপালের ওপরটা ফুলে রয়েছে অনেকখানি—গায়ে জলকাদা, উঠোনের লাল্‌চে ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় নিজের চারপাশে একটা কদাকার ছায়া রচনা করে লোকটা গোগ্রাসে সন্দেশ গিলছে—সমস্ত ব্যাপারটা যেন অশ্লীল বীভৎসতা—যেন কল্পনাই করা যায় না!

সন্দেশের থালা শেষ করে লোকটা অবরুদ্ধ স্বরে বললে, বাবু, জল!

মামা লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নিষ্ঠুর শীতল স্বরে বললেন, হারটা কোথায়?

—হার আমি জানি না বাবু। একটু জল দ্যান।

—বল, হার কোথায়?

—হার নিই নাই বাবু।—লোকটা বোবা-ধরার মতো গলায় বললে, জল দ্যান বাবু। সন্দেশ বুকে আটকাইয়া গেছে—মইর‍্যা গেলাম—জল দ্যান।

—হার কোথায় আছে না বললে জল দেওয়া হবে না।

একসের সন্দেশের রহস্য বোঝা গেল এতক্ষণে। লোকটার সারা মুখে তখন মরণান্তিক যন্ত্রণা—সাদা সাদা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। এর চাইতে মারাত্মক শাস্তি পোকনও বোধ হয় ভাবতে পারত না।

বুকে হাত চেপে লোকটা ঝুঁকে পড়ল ঃ বাবু—জল—মইরা গেলাম—জল—

আমি বললুম, মামা—দম আটকে মরে যাবে যে!

—না, মরবে না—মামা কঠোর গলায় বললেন, আমি ডাক্তার, আমি জানি। বল্ হার নিয়েছিস কিনা?

উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মতো তাকালো লোকটা। বললে, নিছি—নিছি—হার নিছি। এখন একটু জল দ্যান—

চারদিকে উল্লাসের ধ্বনি উঠল।

মামা গর্জন করলেন, চুপ—সব চুপ। বল্—হার কী করেছিস?

—বাজারে একজনরে বেইচ্যা দিছি। তারে চিনি না। একশো টাকা পাইছিলাম—হারাইয়া গেছে!—লোকটা গোঙানির মতো সুর তুলে বলে যেতে লাগল ঃ হইল তো? এ্যাখন আমারে থানা পুলিস যেখানে খুশি দ্যান—তার আগে এট্টু জল দ্যান।

জলের ঘটিটা মামাই এগিয়ে দিলেন। এক ঘটি জল শেষ করে ঝিম মেরে বসে রইল লোকটা।

মামা বললেন, বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি নাই।

—তবে বেরো এখান থেকে। এখুনি।

শুধু পোকন নয়—সবাই কোলাহল করে উঠল একসঙ্গে ঃ ছেড়ে দিচ্ছেন?

মামা বললেন, হ্যাঁ, ছেড়েই দিচ্ছি। এই—ওঠ্—বেরো—

লোকটা উঠল, মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। আর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগল পোকনের। ক্রোধে, বিরক্তিতে।

—এটা কী করলেন বাবা? চোরটাকে এভাবে—

মামা স্থির দৃষ্টিতে পোকনের দিকে তাকালেন।

—কবুল করেছে, হারটা বাজারে যার কাছে বেচে ছিল—সে আমার চেনা স্যাঁকরা—তারই গড়ানো—সে-ই আমাকে ডিস্‌পেন্সারিতে এটা দিয়ে গেছে। আর ওকে থানায় দিয়ে কী হবে পোকন?—মামা কোটের পকেট থেকে হাত বের করে মুঠো খুলে ধরলেন, সোনার হারটা ঝলমল করে উঠল।

মাথা নামিয়ে পোকন সরে গেল হঠাৎ—ভিড়ের মধ্যে আর তাকে চোখে পড়ল না।

মামা আমাকে ডাকলেন ছাতে। রাত এগারোটার সময়। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, বিষণ্ণ চাঁদের আলো চোখে মুখে চিকচিক করছে তাঁর। এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলুম, মামা অনেক—অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন।

গম্ভীর মৃদুস্বরে মামা বললেন, পোকন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। হারটা সে-ই বিক্রি করে এসেছিল। চেনা স্যাঁকরা আমাকে ডিস্‌পেন্সারিতে ফেরৎ দিয়ে গেল।

আমার মাথা ঘুরে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। খোলা ছাত হলে আমি সোজা একতলায় পড়ে যেতুম।

—সত্যি বলছেন মামা?

—নিজের ছেলের নামে মিথ্যে কথা বলব সুকুমার?—মামার চোখে জল চিক-চিক করতে লাগল ঃ পোকন একেবারে অধঃপাতে গেছে—ফ্ল্যাশ খেলে, মদও ধরেছে।

কিন্তু তার চাইতেও বড়ো বিস্ময়ের চাবুকে চমকে উঠলুম আমি।

—লোকটা যে নিজের মুখে কবুল করল মামা!

—যে দুদিন খেতে পায় না, তাকে এক থালা সন্দেশ খাইয়ে জল না দিলে চুরি তো চুরি—তিনটে খুনও সে কবুল করত সুকুমার।

—কিন্তু সব জেনেশুনে—

—বাড়িভর্তি আত্মীয়ের সামনে ঘরের কেলেঙ্কারি ফাঁস করব? এই তো ভালো হল সবচাইতে। অনেক মার খেয়েছে, পেট ভরে সন্দেশ খাইয়ে বিদেয় করে দিলুম। বলো, ভালো করিনি?

মামা বোধ হয় হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আওয়াজটা আমার কানে কান্নার মতোই ঠেকল।

সুখ

—মাছ ধরতে চান? ওভাবে হবে না।

আমি চমকে উঠলুম। আমার ধারণা ছিল বিকেলের এই নির্জন মাঠে, এই ছোট নদীটার ধারে যেখানে একটুকরো পাথরের ওপর বসে আমি শান্ত স্বচ্ছ জলের ভেতরে বঁড়শি ফেলেছি, তার আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী নেই। না—ভুল বলা হল। দু-একটা গোরু চরতে দেখেছিলুম এদিক-ওদিক, আশপাশের ক'টা ঝোপ-ঝাড় থেকে এক-আধটা শেয়ালও বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু—

তাকিয়ে দেখলুম, পেছনে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস, একটু বেশিমাত্রায় লম্বা বলে শরীরের ওপরদিকটায় অল্প একটু ভাঁজ পড়েছে। গায়ে আধময়লা হাফ শার্ট, পরনে ধুতি, পায়ে ধুলো-মাখা রবারের জুতো। কালো ফ্রেমের চশমার ওপর পশ্চিমের রোদ পড়ে মনে হচ্ছিল চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের গোলার মতো।

ভদ্রলোক আবার বললেন, নতুন লোক নিশ্চয়। নাহলে এ নদীতে ছিপ ফেলবার পণ্ডশ্রম কেউ করে না। কিছু পেলেন?

বললুম, একটা ছোট বেলে মাছ।

—ব্যাস-ব্যাস। যথেষ্ট পেয়েছেন। আজকের মতো খুশি হয়ে বাড়ি চলে যান। আর সত্যিই যদি দুটো-চারটে মাছ ধরতে চান, তাহলে রোমে এসে রোমান হতে হবে। অর্থাৎ গামছা পরুন, পলো নিয়ে জলে নামুন, ঘণ্টা-তিনেক পরিশ্রম করুন, তারপর দেখবেন অন্তত পোয়াটাক চুনো মাছ যোগাড় হয়েছে।

বলে হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক কিছু লেখাপড়া জানেন বলে মনে হল। আর ঠিক এই পরিবেশে তাঁর আবির্ভাবটা কেমন অসঙ্গত বোধ হয় আমার কাছে। উত্তর বাংলার এই গ্রামটিতে কয়েকটা ছুটির দিন আমি কাটাতে এসেছি এক সপ্তাহ আগে। যে আত্মীয়টির কাছে এসেছি—তিনি সম্পর্কে আমার কাকা; তাঁর পরিচিত এবং বন্ধুবান্ধব—অর্থাৎ যে দু-চারটি মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ এখানে আছেন, তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেছে আগেই। দুজন পোস্টঅফিসের কেরানী, জনকয়েক স্কুল-টিচার, একজন ডাক্তার আর তার কম্পাউণ্ডার, জনতিনেক ব্যবসায়ী। এঁদের বাইরে আর কেউ রোমে এসে রোমান হওয়ার প্রবাদ শোনাতে পারেন সে-কথা আমার জানা ছিল না। আর বিকেলের এই নির্জন মাঠে যেখানে আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী আছে বলে আমার মনে হয়নি, যেখানে হাওয়ায় বেনাবন সরসর করছিল, যেখানে ওপারের জঙ্গল থেকে মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছিল লেবুঘাস আর বনতুলসীর গন্ধ, যেখানে আমার ঠিক পায়ের নীচেই মিহি বালির ওপর খানিকটা নীলচে জল প্রায় নিথর হয়ে ছিল আর কয়েকটা ভাঙা ঝিনুকের রূপালি খোলায় লাল রোদের টুকরো মুক্তো হয়ে জ্বলছিল, সেখানে এই লোকটি যেন হঠাৎ ফুটে উঠল; যেন একটু আগে সে কোথাও ছিল না—একটু পরে এই রোদ মুছে গেলে সে-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি ছিপ গুটিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়লুম। জলের কোল ছেড়ে উঠে এলুম

পাহাড়ের ওপর। সেই চার ইঞ্চি বেলে মাছটা পাথরের ধারেই পড়ে রইল।

নদীর ধারের একটি মাত্র গাছ—একটা শিমূলের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

—চললেন?

বললুম, হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, আপনার প্রস্তাবটাই ভালো। কাল গামছা আর পলো এনেই চেষ্টা করে দেখব।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন, বাইরের লোক—না?

—এক সপ্তাহ হল এসেছি।

—কোথায় উঠেছেন?

পরিচয় দিলুম। তারপর বললুম, আমার ধারণা ছিল, এখানকার সকলের সঙ্গেই আমার মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। কারণ, বিকেলে ডাক আসবার সময় সবাই-ই একবার পোস্ট অফিসে যান। কিন্তু আপনার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি।

বিড়িতে টান দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, তার কারণ আমার কখনো চিঠি আসে না। কখনো আসবে না।

শেষ কথাটায় আর একবার চমকালুম আমি। চিঠি কখনো আসেনি এটা অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু চিঠি কখনো আসবে না, এইটেই কানে অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। আর বিকেলের সেই পড়ন্ত রোদে আরো একবার তাঁর চশমার কাচদুটোকে আগ্নেয় বলে মনে হল আমার। অনুভব করলুম, এখানে আসবার পরে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—এই মানুষটি তাদের চেয়ে অন্তত খানিকটা আলাদা।

বললুম, আপনিও বোধহয় ঠিক এখানকার লোক নন।

—এখনো এখানকার লোক হতে পেরেছি কিনা জানি না। কিন্তু আট বছর আছি এখানে। মাসের হিসেব ধরলে আরো কিছু বেশী।

—কী করেন?

—চাষবাস। মডেল ফার্মিং।

মডেল ফার্মিং! ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সব যেন রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। এই নগণ্য ছোট গঞ্জটির আশপাশে মডেল ফার্মিং-এর মতো একটা ব্যাপার কিছু আছে এ-কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।

ভদ্রলোক বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না—না? একদিন নিয়ে যাব আপনাকে। আছেন তো এখন?

—আর দিনচারেক থাকব।

—আচ্ছা, দেখা হবে তা হলে। নমস্কার।

বলে ভদ্রলোক পাড় থেকে নদীর দিকে নেমে গেলেন। জুতো খুলে হাতে নিলেন, কাপড় তুললেন হাঁটু পর্যন্ত, তারপর প্রায়-মজা নদীটার তিরতিরে জলটুকু ছপছপ করে পার হয়ে একটা বুনো জন্তুর মতো ওপারের বনতুলসী আর লেবুঘাসের বনের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।

একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে আরো কিছুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। যেন স্বপ্ন দেখলুম—যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে। এই নির্জন মাঠ,

বাতাসে বেনাবনের শব্দ, লেবুঘাস আর বনতুলসীর গন্ধ আর কালো হয়ে আসা রোদের রঙ সমস্ত জিনিসটাকে অদ্ভুত প্রেত-প্রত্যয়ে পৌঁছে দিতে পারত, যদি না আমি দেখতুম তখনো নদীর জলটা অনেকখানি ধরে ঘোলা হয়ে আছে, যদি না আমার চোখে পড়ত শিমুল গাছের তলায় একটা আধপোড়া বিড়ি থেকে সুতোর মতো ধোঁয়া উঠছে তখনো।

কাকা কনফার্মড ব্যাচেলার, একটি পোস্টাল পিয়নকে নিয়েই তাঁর সংসারযাত্রা। সে-ই রান্নাবান্না করে। রাত্রে খেতে বসে আমি নদীর ধারের সেই অদ্ভুত লোকটার কথা কাকাকে বললুম।

কাকা বললেন, বুঝেছি, পাগলা চৌধুরী।

—পাগ্‌লা চৌধুরী মানে? পাগল?

—না, পাগল বলে তো মনে হয় না। একটু অদ্ভুত ধরনের এই যা।

—অদ্ভুত কেন?

—তা ছাড়া কী আর। লেখাপড়া জানে মনে হয়—ভদ্রলোক, অথচ কারুর সঙ্গে বিশেষ মেশে-টেশে না। যা কিছু খাতির গ্রামের চাষাভূষোর সঙ্গে। আমি তো এই দু-বছর আছি এখানে—হাটে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আর সামান্যই আলাপ।

—নিজের সেই মডেল ফার্মিং নিয়েই থাকেন বুঝি?

—মডেল ফার্মিং!—কাকা ভ্রূকুটি করলেন ঃ সে সব তো কিছু শুনিনি। সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, চাষ-বাষ করে, তা ছাড়া গ্রামের লোককে জড়িবুটি দেয়, টোট্‌কা চিকিৎসা করে—এই তো জানি।

—টোট্‌কা চিকিৎসা?

—হুঁ, এইসব করেই চালায়। এখানকার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশায় একেবারে আনসোস্যাল। শুনেছি প্রথম যখন এদিকে এসেছিল, তখন পুলিসে সন্দেহ করেছিল অ্যাবস্‌কণ্ডার, কিছু খোঁজখবরও নিয়েছিল। শেষে দেখেছে ওই এক ধরনের খেয়াল-খ্যাপা লোক—ঘাঁটাঘাঁটি করে কোনো লাভ নেই।

—কোথায় থাকেন?

—গঞ্জের বাইরে, গাঁয়ের ভেতর। ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না।

কৌতূহল মিটল আপাতত। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ নিজের খেয়ালখুশিতে দিন কাটিয়ে চলে; আমার কাছে যা নিছক পাগলামো, আর একজন তার ভেতর নিজের মতো করে যুক্তির শৃঙ্খলা খুঁজে পায়—অতএব ও নিয়ে মাথা ঘামানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু তবুও রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। জানলার বাইরে দূরের একসার কালো গাছপালার ওপর তামাটে রঙের বিবর্ণ চাঁদটার ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতে আর বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনতে শুনতে দুটো জিনিস আমাকে বার বার পীড়ন করতে লাগল। সেই পড়ন্ত রোদের আলোয় আগুনের মতো জ্বলতে থাকা চশমার কাচ ঃ 'আমার চিঠি কখনো আসবে না।' আর—আর সেই আসন্ন সন্ধ্যায় অমনভাবে নদীটা পার হয়ে বনতুলসী আর লেবুঘাসের জঙ্গলে কোথায় মিলিয়ে গেল লোকটা?

পরের দিনটা নিজের এলোমেলো কাজ নিয়ে কাটল। সারা সকাল বসে বসে অনেকগুলো চিঠি লিখলুম। কাকার ছোট রেডিওটা গোলমাল করছিল, সেটা খুলে ঘণ্টা-দুই হাতুড়ে চিকিৎসা চালালুম, কাজ চালানোর মতো দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরে বাঁধানো

পুরোনো মাসিক পত্রিকা যোগাড় করে একটা ধারাবাহিক নিটোল প্রেমের উপন্যাস পড়ে ফেললুম শেষ কিস্তিটা পর্যন্ত। বিকেলে চা খাওয়ার সময় মনে পড়ল মাইল পাঁচেক দূরে একটা চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, সেটা নাকি দেখবার মতো। চা শেষ করে কাকার সাইকেলটা নিয়ে সেই মন্দিরটার উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়লুম।

কাকা বললেন, দেরি করিসনি, রাস্তাটা খারাপ।

—না, না, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে চারটে। যেতে আসতে মাইল দশেক রাস্তা—সাইকেলে কতক্ষণই বা লাগবে? মন্দিরের জন্যে আধঘণ্টা সময় ধরে রাখা যেতে পারে। সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে আসব। তা ছাড়া পৌনে সাতটা-স'তটার আগে তো ভালো করে অন্ধকারই হয় না আজকাল। ভাবনার কিছুই ছিল না।

কাঁচা মাটির পথ, গোরুর গাড়ি চলে, তবু সাইকেলের পক্ষে এমন কিছু দুরূহ দুর্গম নয়। মাঠের ভেতর দিয়ে, আম-জাম-বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে আর খুব সম্ভব সেই নদীটারই একটা লোহার সাঁকো পার হয়ে যখন মন্দিরে পৌঁছলুম তখন আকাশে কালকের মতোই রাঙা বিকেল। কিন্তু আজ আর আমার পাগলা চৌধুরীকে মনে পড়ল না। মন্দিরটাই আমাকে মুগ্ধ করল। লাল পোড়া ইটে বিষ্ণুপুরী ধরনে তৈরী—প্রত্যেকটি ইটে কারুকার্য; এখন ফাটল ধরেছে এখানে ওখানে, নবরত্ন চূড়োর ক'টাই ভেঙে পড়েছে, তবু দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর যেন রাজার মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। ভেতরে কালো কষ্টিপাথরে গড়া অষ্টভূজা কালীমূর্তি—তাঁর গায়ে বহুদিনের জমাট সিঁদুরের প্রলেপ, চাপধরা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। মন্দিরের চাইতেও মূর্তিটা অনেক বেশি পুরোনো বলে মনে হল।

ঘাটের সিঁড়িগুলো ভেঙে ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়েছে, দীঘিটা মজে এসেছে আধাআধি, শ্যাওলা-পানা-পদ্মপাতায় ঢাকা মেঘরত্ন জলের ওপর পদ্মের কালো শুকনো ডাঁটা সারি সারি ফণাহীন কেউটের মতো দাঁড়িয়ে। মন্দিরের সামনে বসে দীঘির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম আমি আর শুনতে পেলুম হাওয়ায় হাওয়ায় দীঘির চারধারে বেল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ আর হরীতকীর বন থেকে যেন দমচাপা দীর্ঘশ্বাস উঠছে!

যখন খেয়াল হল, তখন ফিকে নীল রেশমী শাড়ীর মতো হালকা সন্ধ্যার গায়ে তারা জরী বুনছে, জোনাকির বুটি ফুটছে বেল-আমলকী-রুদ্রাক্ষের ছায়ায়। অনেক দেরি হয়ে গেল যে! ব্যস্ত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম, সাইকেলটা নিয়ে নেমে এলুম উঁচু ডাঙাটা থেকে, তারপর বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে দিলুম।

আম-জাম-বাবলা গাছের ওপর দিয়ে তামাটে রঙের চাঁদটা আলো ছড়াচ্ছে—মেটে পথে চলেছি সাইকেল নিয়ে। কেন জানি, না, ওই মন্দিরটাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে দিল। চমক ভাঙল বিশ্রী একটা হোঁচট খেয়ে। কড়াং কট করে আওয়াজ কানে এল—অর্থাৎ চেন ছিঁড়ল সাইকেলের।

সামনে এখনো প্রায় দেড় মাইল পথ। আর যেখানটায় চেন ছিঁড়ল সে জায়গাটাও একটু বেয়াড়া। কতগুলো বড়ো বড়ো গাছ যেন সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর, চাঁদ দেখা যায় না—ছাড়া ছাড়া অন্ধকারের টুকরো থমথম করছে। সাইকেলের

আলোর শেষ সীমানা দিয়ে বাঘের বাচ্চার মতো বাদামী রঙের কী একটা দৌড়ে গেল, আতঙ্কের ধাক্কা লাগল একবার। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম ওটা একটা অতিকায় ভাম বেড়াল।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিচ্ছি, হঠাৎ কানে এল ঃ কী হল সাইকেলের?

আরো একবার দারুণভাবে চমকালুম আমি। পথের ধারের অন্ধকার ছায়া ফুঁড়ে একটা কুঁজো মতন লোক এগিয়ে আসছে। লোকটার হাতে ছোট একটা টর্চের আলো ঝল্‌কে না উঠলে আমি হয়তো চিৎকার করে উঠতুম।

আমার মুখে টর্চ ফেলে লোকটা বললে, আরে—আপনি যে!

তখন চিনতে পারলুম। সেই পাগ্‌লা চৌধুরী।

জিজ্ঞেস করলুম ঃ আপনি এখানে?—বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল তখনো, গলার আওয়াজ যে আমার কেঁপে উঠল, নিজেই টের পেলুম সেটা।

—একটু কাজ ছিল। কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—কপালিনীর মন্দির দেখতে।

—সেটা বুঝেছি। নতুন লোক, তাই জানেন না—দিনের বেলা ছাড়া এ সব দিকে না আসাই ভালো।

—চোর-ডাকাত? অপদেবতা?

—না মশাই, সে সব নয়। অন্য ব্যাপার। নিন- -এগিয়ে চলুন এখন। সাইকেল তো দেখছি বেকার হয়ে গেছে, টানতে টানতেই যেতে হবে। চলুন।

ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় মনে ভরসা এসেছিল। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলুম, পথে কী আছে বলছিলেন?

—সাপ মশাই, সাপ। বিরাট বিরাট গোখরো। পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, পশ্চিমে গহুমা বলে খ্যাত, এদিকে বলে গোমা সাপ। কামড়ালে আর দেখতে হবে না। খুব পুরোনো আমলের জায়গা কিনা—নবাবী ইটের পাঁজা আর ভাঙা মন্দির-মসজিদের তো অভাব নেই আশপাশে। নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করছে।—বলেই ভদ্রলোক আমার হাত ধরে টানলেন ঃ একটু দাঁড়ান।

—কী হল?

—শুকনো পাতার খড়খড়ানি পাচ্ছেন না? ওঁদেরই কেউ যাচ্ছেন একটু দূর দিয়ে—সাপের চলা ছাড়া ও-রকম আওয়াজ হয় না। দাঁড়িয়ে যান—এগোতে দিন মহাপ্রভুকে। সাইজে বেশ বড়োই হবেন—নিদেনপক্ষে হাত পাঁচেক মনে হচ্ছে।

আর বলবার দরকার ছিল না। এমনিতেই আমার রক্ত হিম হয়ে এসেছিল।

কতক্ষণ পরে সাপটা চলে গেল জানি না। ভদ্রলোক আমার হাতে আবার একটা চাপ দিলে সভয়ে নড়ে উঠলুম আমি।

—নিন, চলুন এবার। লাইন ক্লিয়ার।

চলতে লাগলুম, কিন্তু কী ভাবে সে কেবল আমিই জানি। অন্ধকার গাছগুলোর ভূতুড়ে জগৎটা পেরিয়ে যখন তামাটে চাঁদের আলোয় আবার মেঠো পথে এসে পড়লুম, তখনো সমানে পা কাঁপছে। চৌধুরীর টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে-নিবছে, কিন্তু আমার ক্রমাগত মনে

হচ্ছিল—যে-সব ছোট ছোট অন্ধকারের টুকরোগুলোতে টর্চের আলো পড়ছে না, সাক্ষাৎ মৃত্যু কুণ্ডলী পাকিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের ভেতর ; আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের মতো বিষাক্ত ফণা মাথা তুলবে তারা।

আরো আধ মাইল পথ নিঃশব্দে কাটল। আমার গলা অদ্ভুতভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল, আমি কথা কইতে পারছিলুম না। চৌধুরী কী ভাবছিলেন জানি না—তামাটে চাঁদের পিঙ্গল আলোয় তাঁর একটা লম্বা ছায়া পড়েছিল পথের ওপর; কেমন যেন মনে হচ্ছিল ও ছায়াটা চৌধুরী নয়—তাঁর আগে আগে একটা ছায়ামূর্তি তাঁকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ চৌধুরী বললেন, নিন—ওই আপনার পোস্ট-অফিসের আলো দেখা যাচ্ছে, গঞ্জের কাছে এসে পড়েছি আমরা। নির্ভয়ে চলে যান এবার।

—আপনি?

—আমি বাঁ দিকে যাব। ওই যে ওখানটায় একটা মিটমিটে আলো দেখছেন, ওই আমার আস্তানা—একটু হেসে বললেন, মডেল ফার্ম। আসুন না বেড়াতে বেড়াতে কাল সকালের দিকে। চিনতে অসুবিধে হবে না, একটা ডোবা দেখতে পাবেন, তার ধারে তিনটে তাল গাছ। আসবেন কাল?

বললুম, আসব।

—তা হলে এই টর্চটা রাখুন সঙ্গে। কাল সকালেই সঙ্গে করে আনবেন।

বললুম, টর্চের দরকার নেই, এমনিই যেতে পারব এখন। আর তা ছাড়া আমার চাইতে বেশি পথ যেতে হবে আপনাকে, ওটা আপনারই দরকার।

—আমার না হলেও চলে। অভ্যেস হয়ে গেছে।

কেন জানি না, ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলুম ঃ একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—রাগ করব কেন? বলুন।

—আপনি সব জেনেশুনেও এই সন্ধ্যেবেলা ওই সাপের জাঙালে গিয়ে ঢুকেছিলেন?

—দরকার মশাই, দরকার। পিয়োর অ্যাণ্ড সিম্পল নেসেসিটি।—চৌধুরী হাসলেন ঃ কয়েকটা সাপের খোলস আনতে গিয়েছিলুম।

—সাপের খোলস!—পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার ঝাঁকুনি লাগল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আজ কী তিথি জানেন? জানেন না? যাই হোক, এই তিথিতে সাপের খোলস কুড়িয়ে আনতে পারলে তা দিয়ে বাতের একটা অব্যর্থ ওষুধ নাকি তৈরী করা যায়। সেইটে পরীক্ষা করব বলেই খোলস খুঁজতে গিয়েছিলুম। একেবারে হতাশ হতে হয় নি, দুটো পেয়েছি। দেখবেন?

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, কাকার কাছে শুনেছি যে চৌধুরী জড়িবুটির ব্যবসা করেন ; আরো খেয়াল হল, চৌধুরীর বাঁ হাতে ছোট একটা চটের থলি আছে বটে।

চৌধুরী থলিতে হাত ঢোকাবার উপক্রম করতেই আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলুম।

—না-না, সাপের খোলস আমি দেখতে চাই না।

হা-হা করে মাঠ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, যতই বিষধর সাপ হোক মশাই, তার খোলসে বিষ থাকে না। আচ্ছা—চললুম এখন; কাল সকালে তা হলে

আসছেন আমার ওখানে—নেমন্তন্ন রইল।

বলে আর দাঁড়ালেন না—বাঁ দিকের রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন। আর আমার মনে হল, তাঁর পাশে পাশে যেটা চলেছে ওটা তাঁর ছায়া নয়—আর একটা ছায়া-মূর্তি সহযাত্রী বন্ধুর মতো তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নদীর ধারের সেই অদ্ভুত বিকেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সাপের জাঙাল আর ঘুরে-ফিরে সেই একটা লোক! সব মিলে একটা রহস্যময় তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। একজন বিদেশী মানুষ, যথেষ্ট শিক্ষিত বলে মনে হয়, আট বছর ধরে উত্তর বাংলার এই নগণ্য পাড়াগাঁয়ে একটা আশ্চর্য জীবন যাপন করছে। আরো বিচিত্র এই যে এখানকার কেউ আজ পর্যন্ত তাকে ভালো করে চেনে না। পলাতক আসামী নয়—তা হলে পুলিসের চোখ এড়াতে পারত না। পাগলা বলে একটা বদনাম আছে, কিন্তু যেখানে যেভাবেই দেখা হোক—লোকটিকে অন্তত পাগল বলে আমার মনে হয়নি।

রহস্যের আকর্ষণে পরদিন যখন চৌধুরীর মডেল ফার্মে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন বেলা গোটা আটেক হবে। চৌধুরী ডোবার ধারে সেই তিনটে তাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মনে হল। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন।

—আসুন—আসুন।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম কাকার কথাই ঠিক। এ আর যাই হোক—মডেল ফার্মিংয়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। টিনের ছোট একটি বাড়ি—বিঘে কয়েক জমিতে সামান্য কিছু তরিতরকারি চোখে পড়ল। গুটি ছয়েক হাঁস চরছিল ডোবায়—কয়েকটা মুরগীকেও এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখলুম।

যে ঘরটায় ঢুকলুম—সেইটেই বোধ হয় বসবার ঘর। একটা তক্তপোশের ওপর মলিন ছেঁড়া মাদুর। মেটে দেওয়ালের দুটো কুলুঙ্গিতে কতগুলো শিশি-বোতল-কৌটো, কিছু শেকড়-বাকড়। বুঝতে পারলুম, মডেল ফার্মিংয়ে চৌধুরীর অন্ন-সংস্থান হয় না—এইগুলোতেই তাঁর আসল জীবিকা।

—বসুন, চা বলে আসি।

বললুম, চা আমি খেয়ে এসেছি, ব্যস্ত হবেন না।

—আহা, খেয়ে তো আসবেনই, সে কি আর আমি জানিনে? কিন্তু আমার ফার্মের টাটকা মুরগীর ডিমের ওমলেট আর নিজের গোরুর দুধের মালাই চা—তার স্বাদ একটু আলাদা মনে হবে আপনার। বসুন—বসুন—

ভেতরের দিকে চলে গেলেন চৌধুরী, আমি সেই তক্তপোশটায় বসে রইলুম। মেটে ঘরের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে সেই ওষুধপত্রগুলোর আঘ্রাণ যেন একটু একটু করে কুয়াশার মতো আমার মস্তিষ্কের ভেতরে ঘন হতে লাগল। বাইরে থেকে হাঁসের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম—খোলা দরজা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা নীল ভ্রমর এসে ঘরের ভেতরে একবার ঘুরপাক খেয়ে গেল।

চৌধুরী ফিরে এলেন—বসলেন তক্তপোশের আর এক কোণায়। বললেন, আমার মডেল ফার্ম দেখে খুব নিরাশ হয়েছেন, না?

কী জবাব দেব বুঝতে পারলুম না। একে আদৌ ফার্ম বলে কিনা আমার জানা নেই,

আর এইটেই মতেন হিরোরে মেনে নেওয়া উচিত কিনা তা-ও আমার মনে সংশয় তুলল।

চৌধুরী হাসলেন : ইচ্ছে একটা সত্যিই ছিল সুকুমারবাবু। কিন্তু এই আট বছরে—

বাধা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললুম, আমার নাম আপনি জানেন?

—কলকাতার একজন প্রফেসার এসেছেন আমাদের পাড়াগাঁয়ে—নাম কে না জানে বলুন। আমার নামও নিশ্চয় শুনেছেন আপনি—

হাসিটা আবার ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে ঃ পাগলা চৌধুরী, তাই না?

কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলুম ঃ তাই শুনেছি।

—কিন্তু পাগলা আমার নাম নয়, ডাকনামও নয়। এখানকার লোকেই ওটা দিয়েছে আমাকে। আপনি নিশ্চয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে পাগলাবাবু বলে ডাকতে পারবেন না—আর বার বার চৌধুরীমশাই বলতেও বেয়াড়া লাগবে। আমার একটা জবরদস্ত পোশাকী নাম আছে—তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। সংক্ষেপে তুহিন বলতে পারেন।

তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী! এই মুহূর্তে ঘরের মেটে দেওয়াল আর ওষুধপত্রের গন্ধে কুয়াশা জমে ওঠা আমার মস্তিষ্কের ভেতরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এই নাম একটু অসাধারণ—এ নাম একবার কানে এলে সহজে ভোলা যায় না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল।

সেই কবিতার বইটি। সবশুদ্ধ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বেশি নয়। গাঢ় হলুদ রঙের মলাটে লাল টকটকে অক্ষরে লেখা : 'খাঁচায় সকাল'। কতগুলি তীক্ষ্ণধার আধুনিক কবিতা। বিখ্যাত সমালোচকের লেখা উচ্ছ্বসিত মুখবন্ধ।

পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। আর শুধু বইটিই নয়। কিছু কিছু সাময়িক পত্রিকায় এই উজ্জ্বল প্রতিভার আবির্ভাব জানিয়েছিল সেদিন। ভিড়ের মাঝখানে মিশে যায়নি—নিজের পরিচয়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ কবে হারিয়ে গেলেন তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। তাঁর আরো কিছু অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও তাঁর কবিতার খোঁজ করেছিলুম দু-এক বছর পর—তারপরে যেমন হয়, 'খাঁচায় সকাল'-এর কবিকে আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু মনে পড়ল। প্রায় দশ বছরের ওপার থেকে মনে পড়ল আবার। সেই গাঢ় হলদে মলাটের ওপর টকটকে লাল অক্ষরগুলো স্পষ্ট জ্বলে উঠল চোখের সামনে।

রুদ্ধ স্বরে বললুম, কবি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী?

ঠিক দেখলুম কিনা জানি না, পাগলা চৌধুরীর মুখ সাদা হয়ে গেল একবারের জন্যে। তারপরেই হেসে উঠলেন।

—কী আশ্চর্য, সে-সব ছেলেমানুষির কথা এখনো কারো মনে আছে নাকি? আমি তো কবে ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছেন? অথচ এত ভালো কবিতা লিখতেন আপনি?

—ভালো কবিতা নয় মশাই, হাত থাকলেই বাঙালির ছেলে কবিতা লেখে, আমিও লিখতুম। তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, একটা ভদ্ররকমের চাকরিও জুটিয়েছিলুম—একজনের পাল্লায় পড়ে একটা কবিতার বইও ছেপে ফেলা গেল। তারপরেই দেখলুম এ-সব প্রলাপ বকবার কোনো মানেই হয় না, ভাবলুম—একটা বড়ো কাজ কিছু করা যাক—সাম্‌থিং কনস্ট্রাক্‌টিভ। একটা মডেল ফার্ম করলে কেমন হয়? ছুটিতে দার্জিলিং চলেছি—এই রেলস্টেশনটায় এসে হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল—লাইনে গোলমাল হয়েছে

কোথাও। কী মনে হল—নেমে পড়লুম এখানে। চলে গেলুম গাঁয়ের ভেতরে। সেইদিনেই কয়েক বিঘে জমি বায়না করে ফেললুম অসম্ভব সস্তায়। সেই থেকে আছি এখানে—কবিতা লেখার চাইতে অনেক বড়ো কাজের খোঁজ পেয়েছি। এদিকের লোকে টোট্‌কায় বিশ্বাস করে, আমিও কিছু আলোচনা করেছি ও নিয়ে। নেহাৎ ফেল্‌না জিনিস নয় মশাই। মডেল ফার্মিংয়ে তেমন জুৎ করতে পারিনি, তবুও সব মিলিয়ে বেশ আছি। কী হবে মশাই বানানো কবিতা দিয়ে—কী মানে হয় তার?

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন তুহিনাংশু। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলুম না আমি; কেমন মনে হল অনেক কথার ভিড়ে কয়েকটা ছোট ছোট কথা লুকিয়ে রইল; এমন অনেকগুলো প্রশ্ন রইল—যার জবাব তুহিনাংশু কোনোদিন দেবেন না।

আমার স্মৃতির মধ্যে কয়েকটা কবিতার লাইন জ্বলে উঠল হঠাৎ। আশ্চর্য ভালো লেগেছিল সেদিন। অন্যমনস্কের মতো আমি আবৃত্তি করলুম ঃ

মণিকা, তোমার বাঘিনী-প্রেমের
আদিম অন্ধ রাতে
নোনা সাগরের ক্ষুব্ধ নিশান
তোলে সুন্দরবন
আমি ছুটে চলি হিংস্র কিরাত
খর বল্লম হাতে
সাপের মণিতে বিষাক্ত-নীল
আলোর সঞ্চরণ—

—থামুন!

না, চিৎকার করলেন না তুহিনাংশু, প্রায় নিঃশব্দেই উচ্চারণ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে, তাঁর ঠোঁটে, তাঁর সমস্ত শরীরে যেন আর্তনাদ ফুটে উঠল একটা—যেন ঘর ফাটিয়ে একটা নীরব হাহাকার জেগে উঠল তাঁর। আতঙ্কে থেমে গেলুম আমি।

তুহিনাংশু আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কালো, কদাকার, গায়ে ময়লা একটা শাড়ী জড়ানো—একটি সেমিজ-ব্লাউজ পর্যন্ত নেই। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা—হাতে ওমলেট আর জলের গ্লাস।

তুহিনাংশু বললেন, আমার স্ত্রী।

আমি বললুম, নমস্কার।

ভদ্রমহিলা ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে। তক্তপোশের ওপর আমার পাশেই প্লেট আর গ্লাস নামিয়ে রাখলেন, এক হাতে মাথার ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে দিলেন. তারপর আবার যে পথে এসেছিলেন সেই দিকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তুহিনাংশু বললেন, কিছু মনে করবেন না মশাই। আমার স্ত্রী বোবা আর কালা—কানে শুনতে পায় না। চোখেও যে খুব ভালো দেখে তা নয়।

চকিত হয়ে বললুম, তাই নাকি?

সেই কালো ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তুহিনাংশুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায় জ্বলতে লাগল ঃ এই তো ভালো মশাই—যাকে বলে আদর্শ স্ত্রী। লেখাপড়া জানে না--গরিবের মেয়ে, কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না। আমি বিয়ে করেছি বলে

চিরকৃতার্থ হয়ে আছে—কী করি না করি কোনোদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। এর চাইতে সুখ কিছু আছে বলতে পারেন আপনি? যাক গে—ওটা খেয়ে ফেলুন আগে—ঠাণ্ডা হলে আর ভালো লাগবে না।

কথা খুঁজে না পেয়ে আমি ওমলেটটাতেই মন দিলুম। স্বাদ পাচ্ছি না—একটা অজানা অস্বস্তি মনটাকে যেন চেপে ধরেছে এসে। মেটে দেওয়াল আর ওষুধ-বিষুধের সেই গন্ধের কুয়াশা আবার যেন ঘন হয়ে আসছে আমার মস্তিষ্কের ভেতরে। আমি এক হারিয়ে-যাওয়া কবি আর এই পাগলা চৌধুরীর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে ফিরছি কোথাও—খুঁজছি সেই নির্জন বিকেলের আলোয় বনতুলসী আর লেবুঘাসের গন্ধভরা নদীর ধারে—খুঁজছি কপালিনীর মন্দির থেকে আসবার সময় সেই থমথমে অন্ধকারভরা সাপের জাঙালের মাঝখানে।

সেই মহিলা দুটো ময়লা পেয়ালায় করে প্রায় সাদা রঙের চা নিয়ে এলেন। তাঁকে সম্ভাষণ করবার পণ্ডশ্রম আমি আর করলুম না। শুধু দুখানি কালো কালো শীর্ণ হাতের ওপর আমার চোখ পড়ল—যেখানে চারগাছা নীল কাচের চুড়ি ছাড়া আর কোনো আভরণই নেই।

—যাই বলুন মশাই, আমি সুখী।—তুহিনাংশু যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন ঃ কবিতা—কলকাতা! কোনো মানে হয় না মশাই। তার চাইতে এই ভালো—অনেক ভালো। ভাবতে পারেন আট বছরের মধ্যে আমার নামে কোনো চিঠি আসেনি, আমি খবরের কাগজ দেখিনি—'টোট্‌কা দর্পণ' আর 'ভেষজ-রহস্য' ছাড়া কোনো বই পড়িনি? সুখ! সুখের অর্থ যে কী, কেউ বলতে পারে! বেশ আছি আমি—কারো কাছে এতটুকু নালিশ নেই আমার।

কোনো নালিশ নেই? 'খাঁচায় সকাল' কবিতার আরো কয়েকটা পংক্তি আমার মনে এল :

> এক মুঠো আগুন দাও তোমার হৃদয় থেকে
> হে লোহিতাক্ষ—হে জবাকুসুমসংকাশ, হে হিরণ্যপাণি!
> খাঁচার এই লোহার শলাকাগুলো পুড়ে যাক
> গলে যাক—চিরতরে হোক্ নিশ্চিহ্ন—

—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে মশাই!

—হ্যাঁ, খাচ্ছি।

মালাই চা-ই বটে। চায়ের স্বাদ-গন্ধ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না তাতে। সন্দেহ নেই, তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী সত্যিকারের সুখের সন্ধান পেয়েছেন এখানে—জীবন থেকে শহরকে চিরদিনের মতোই মুছে দিয়েছেন। নইলে এ চা বরদাস্ত করা অসম্ভব হত।

পকেট থেকে বিড়ি বের করে তুহিনাংশু জিজ্ঞেস করলেন ঃ চলে?

—না, মাপ করবেন।

—ওঃ, আপনার বুঝি সিগারেট? আমাদের পাড়াগাঁ মশাই, বিড়ি নইলে ঠিক জুৎ হয় না। আচ্ছা, চলুন এবার—আমার ফার্ম একটু দেখিয়ে আনি আপনাকে। অবশ্য দেখবার মতো কিছুই নেই, সামান্য কিছু তরিতরকারি কেবল আছে। বরং শীতকাল এলে—

বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। মাথার ওপর নীল উজ্জ্বল আকাশ,

দিগন্তে পাহাড়ের রেখা। শস্যহীন মাঠ পড়ে আছে—যতদূর চোখ যায়। সেই নদীটার একফালি জল দেখতে পেলুম, এখান থেকেও সেই শিমূল গাছটা দেখা গেল যেখানে আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলুম, আর যেখানে প্রথম হঠাৎ যেন বিকেলের আলোর ভেতর থেকে ফুটে উঠেছিলেন চৌধুরী।

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলুম। রগের কাছে দু-তিনটে চুল চকচক করছে রোদে, চোখের কোলে কালির রেখা, আজ দিনের বেলায়—এই রোদের ভেতরে আমার মনে হল, বয়েসের তুলনায় ভদ্রলোক যেন অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন।

সামনে একটা প্রকাণ্ড গ্র্যানাইট পাথরের চাঙাড় পড়ে ছিল। হঠাৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন তুহিনাংশু।

—এই পাথরটা দেখছেন?

—দেখছি।

—কী মনে হয় আপনার?

—কী আবার মনে হবে?

—খুব একটা বিসদৃশ ব্যাপার বলে বোধ হয় না? কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ যেন রাস্তা জুড়ে একটা অর্থহীন বাধা।—বলতে বলতে একটা উগ্র বন্য আলো তাঁর দু-চোখে ঝল্‌কে উঠল ঃ জানেন—এই আট বছর ধরে এটাকে রোজ আমি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করি, অথচ একটুও নড়ে না।

আমি বললুম, কী আশ্চর্য, খামোকা ওটাকে সরাবার জন্যে কেন পণ্ডশ্রম করবেন? আর অতবড়ো একটা পাথরকে মাটি থেকে নড়ানো কি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব?

—কী সম্ভব তা হলে বলতে পারেন?—চৌধুরীর স্বরে হঠাৎ যেন একরাশ আগুন ঝরে পড়ল ঃ চিরকাল কি এমনি করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে? কবিতা হারিয়ে যাবে—মণিকা হারিয়ে যাবে—যেখানেই যাব, এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না? আপনি বিশ্বাস করুন—এইবারে এটা সরবেই, তার সময় এসেছে।

বলতে বলতেই চৌধুরী পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রাণপণে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে। লোকটা সত্যিই পাগল কিনা বুঝতে চেষ্টা করছি, তৎক্ষণাৎ একটা তীব্র চীৎকার আমার কানে এল।

অমন জান্তব, অমন বুকফাটা চীৎকার জীবনে আমি কখনো শুনিনি। বিদ্যুৎবেগে ফিরে তাকালুম। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তুহিনাংশুর সেই কালো কুৎসিত বোবা কালা স্ত্রী। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, চোখের তারাদুটো বিস্ফারিত, একরাশ রুক্ষ চুল উড়ছে ডাকিনীর মতো। তার মুখের চেহারা কল্পনা করা যায় না—যেন মৃত্যু-বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছে সামনে।

—আঁ-গাঁ-গাঁ-গাঁ—আবার একটা জৈব আর্তনাদ বেরুল তার গলা দিয়ে।

তখন তুহিনাংশু সোজা হয়ে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। পাথর ঠেলবার পরিশ্রমে বুকটা তখনো যেন ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে ভদ্রলোকের। ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হেসে বললেন, ভয় পায় মশাই—পাথরটা ঠেলতে গেলেই ভয় পায়! কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে ওটা না সরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না।

চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পা-দুটো মাটির মধ্যে গেঁথে গেল।

অনেকগুলো কথার উত্তর একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে তখন। আত্মহত্যা করব না—এই প্রতিজ্ঞা করে তিলে তিলে আত্মহত্যার সাধনা কি এমনিভাবেই করতে হয়? এই বোবা-কালা কুরূপা স্ত্রী, এই জীবন, অকারণে বিকেলের নদী পার হয়ে সন্ধ্যার বনতুলসী আর লেবুঘাসের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, তার অন্ধকারের ভেতরে সাপের খোলস খোঁজার কী অর্থ থাকতে পারে আর? খাঁচার শলা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি—তীরের ফলা হয়ে পাখির বুকে বিঁধেছে।

আমি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরীর আত্মহত্যা দেখতে পাচ্ছি। পাথর ঠেলার পরিশ্রমে তখনো ঝড়ের মতো শ্বাস পড়ছে তাঁর, আর—আঃ ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে দুটো সরু রক্তের ধারা রোদের আলোয় জ্বলে উঠেছে।

চৌধুরীর স্ত্রী পাগলের মতো ছুটে এল তার দিকে। কিন্তু আমি দেখলুম তার পাশে সেই ছায়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—সেই প্রেতলোকের সহচর যে শেষ মুহূর্তের আগে তার সঙ্গ ছাড়বে না।

ট্যাক্সিওয়ালা

ট্রেনটা অসম্ভব লেট করে যখন শেষ পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে 'ইন' করল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

কিন্তু ঘড়িটার দিকে চাইবার মতো মনের অবস্থা তখন সন্তোষের ছিল না, চোখেরও নয়। দুদিন অসম্ভব খাটনি গেছে বিয়েবাড়ির। হাজারখানেক লোককে পরিবেশণ করে সমস্ত মেরুদণ্ডে টনটনে একটা তীব্র যন্ত্রণা। কাল দোতলার বারান্দায় যেখানে শুতে হয়েছিল, সেখানে এক ফোঁটা হাওয়া ছিল না—সামনের নারকেল গাছের সার মরা-মরা জ্যোৎস্নায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সারারাত। অগত্যা মশারিটা তুলে ফেলতে হয়েছিল, আর মশার কামড়ে চমকে চমকে জেগে উঠে দেখতে হয়েছিল, চাঁদ ডুবছে, তারা অস্ত যাচ্ছে, এক-একটা উল্কার তীর ছুটছে অন্ধকারের অনিশ্চিত লক্ষ্য ভেদ করতে।

আর বার বার মনে হচ্ছিল, কাল কেতকীর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে হওয়াটা অবশ্য বড়ো কথা নয়; তারও চাইতে বেশি করে মনে হচ্ছিল—এই বিয়েতে সে-ই সবচাইতে বেশি খাটল। তিন দিন ছুটি নিল অফিস থেকে। পৌঁছুল মেদিনীপুরে—নগেন কাকা খুশি হয়ে বললেন, যাক সন্তোষ এসে গেছে, আর ভাবনা নেই। মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল আমার।

সন্তোষের এই এক অসাধারণ খ্যাতি। আত্মীয়-মহলে, পরিচিতদের এলাকায় সে নামজাদা পরিবেশণকারী, বিখ্যাত খাটিয়ে; এমন জনশ্রুতিও আছে যে সাহায্য করবার একজন লোকও যদি না জোটে তা হলেও সন্তোষ একাই একটা বিয়ে, একটা শ্রাদ্ধ কিংবা জাঁকালো কোনো অন্নপ্রাশনের দায় মিটিয়ে দিতে পারে। আর এ সম্পর্কে সন্তোষেরও একটা অদ্ভুত উৎসাহ আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'মিশনারী জিল'। কাউকেই সে না করে না। আত্মীয়-স্বজন থেকে অফিসের বন্ধু পর্যন্ত সকলের ওপরে তার সমদৃষ্টি। কোন্ ছেলেবেলায় সে প্রথম এ কাজে হাত পাকিয়েছিল, তারপর থেকে আর বিরাম নেই। এই বত্রিশ বছরের ভিতর বাংলা দেশের অর্ধেক লোককে সে পরিবেশণ করেছে, আর দশ বছরের মধ্যে—আশা করা যায়—কেউই আর বাকী থাকবে না।

কিন্তু কেতকীর বিয়েয় পরিবেশণে এত কষ্ট হবে, সন্তোষ একথা ভাবতেও পারে নি।

বিয়ের খবর যখন এল, তখন প্রথমটা ধক্ করে উঠেছিল বুকের ভেতর. মনে হয়েছিল কে যেন তার নাড়ী ধরে একেবারে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত টান দিয়েছে। যন্ত্রণায় সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। কেতকী পর হয়ে চলে গেল। আর কোনো দিন ভালো করে তার দিকে চেয়ে পর্যন্ত দেখতে পাবে না।

অথচ—অথচ একটু সাহস করলেই—

নগেন কাকা ঠিক আত্মীয় নন—জ্ঞাতি, প্রস্তাবটা শুনলে প্রথমটা হয় তো চমকে উঠতেন একবার। এত বেশি মেশামেশি, সম্পর্কটা এমনই ঘনিষ্ঠ যে বিশ্বাসই করতে চাইতেন না গোড়ায়। তারপর ভেবে দেখতেন যে, না, এমন বিয়ে অসম্ভব নয়; সম্পর্কে বাধে না। বয়সে বছর বারো তফাৎ হত—কেতকীর বয়েস কুড়ির বেশী নয় ; কিন্তু বারো বছরের ব্যবধান এমন একটা মারাত্মক বাধা হত না—এর চাইতে ঢের বেশি বয়সের তফাৎ হয় আজকাল—ত্রিশের ঘরে না পৌঁছে, একটা ভালো রকম কাজকর্মে একটু না থিতিয়ে, এ যুগের তো অধিকাংশ ছেলেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে সাহসই পায় না।

সবই হতে পারত, কিন্তু—

কেতকী তাকে অপছন্দ করত? না—না। কলকাতা থেকে যখনই মেদিনীপুরে গেছে, নতুন গান দুটো একটা তার শেখাতেই হয়েছে কেতকীকে, পড়িয়ে দিতে হয়েছে আই-এ ক্লাসের পড়া; ইংরেজিতে এম-এ ফেল সন্তোষ নিজের গৌরব রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে কেতকীকে ইংরেজি শিখিয়েছে। কতদিন কেতকী বলেছে, সত্যি সন্তোষদা—কী সুন্দর ইংরেজি লেখেন আপনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তোষ ভেবেছে, শুধু ইউনিভার্সিটিই তার কদর বোঝে নি।

কিংবা গান। পরিবেশণের মতোই বন্ধুমহলে গানেরও তার নাম আছে। এমন কিছু বড়ো ওস্তাদ সে নয়, কিন্তু সবাই একবাক্যে বলেছে—খাসা মিঠে গলা সন্তোষের। আর তার গান শুনতে শুনতে কেতকী কতবার মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখেছে তার দিকে, সুর তুলতে ভুলে গিয়ে তাকেই দেখেছে বসে বসে।

—কী চমৎকার আপনি গাইতে পারেন সন্তোষদা।

আর তখন সন্তোষ ভেবেছে, বেশ মেয়েটি। রং ধবধবে নয়—কিন্তু উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা আছে ; বড়ো বড়ো টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট, মিঠে মুখের ডৌলটি, যখন ভিজে চুল মেলে দেয় তখন কোমর ছাপিয়ে অনেক নীচে নেমে আসে। চমৎকার মেয়ে।

কেতকীকে কিছু বলা যায়? না একেবারে নগেন কাকাকেই?

মনঃস্থির করা যায় নি। প্রত্যেকবার মেদিনীপুরে এসেছে আর ভেবেছে, এবার নয়—পরের বার। আর এমনি করেই কেটে গেছে দুটো বছর। সন্তোষের আর সময় হয়নি।

শুধু এক বর্ষার সন্ধ্যায় সুযোগ এসেছিল। দোতলার ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। গানটা সবে শেষ হয়েছিল ঃ

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

সুরের মূর্ছনা তখনো ছড়িয়ে ছিল চারদিকে, তখনো বৃষ্টির শব্দে ঝঙ্কার বাজছিল ঃ

'পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

কেতকীর মগ্ন চোখের দিকে চেয়ে সন্তোষ বলেছিল, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে কেতকী।

কী কথা সন্তোষদা?

শেষ মুহূর্তে আটকে গেল।

—আজ থাক, পরে একদিন বলব।

আর তারপরেই ছাতা মাথায় দিয়ে, নিজের রক্তের দোলা বুকের ভেতরে অনুভব করতে করতে, জল-কাদা ছপছপিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল সন্তোষ; আর পরের দিন ফার্স্ট ট্রেনে তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

লগ্ন এসেছিল, চলে গেল। আর তার দাম মিটিয়ে দিতে হল কড়ায় গণ্ডায়।

বিয়ের খবরে যন্ত্রণায় নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে হল কিছুক্ষণ। একবারের জন্যে মনে হয়েছিল, এখুনি ছুটে চলে যায় সে মেদিনীপুরে, নগেন কাকার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে—না—না—এ কিছুতেই হতে পারে না! কিন্তু দু' বছরের ভেতর যে এতটুকু সংকোচের আড়াল সরাতে পারল না—তার পক্ষে এতখানি জোরের সঙ্গে নিজের দাবি পেশ করা সম্ভব?

হল না—কিছুই হল না। কেতকী হারিয়ে গেল! হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।

দু'দিন পরে আবার পড়ল চিঠিটা, তখন যন্ত্রণাটা একটু ফিকে হয়েছে যেন। দেখল, হলদে কাগজ, ব্রহ্মার ছবি, ছাপানো চিঠি—সব কিছুর সঙ্গে লাল কালিতে নগেন কাকার নিজের হাতের কয়েকটা ছত্র ঃ বাবা সন্তোষ, তিনদিনের ছুটি লইয়া অবশ্য আসিবে। তুমিই আমার সর্বাধিক বল-ভরসা।

আমার বুকে ছুরি বিঁধবে, আর—আর আমি যাব! অসম্ভব! দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল সন্তোষ—না, কিছুতেই নয়। কিন্তু বিয়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে গেল, হলদে চিঠির সেই লাল তারিখটা চোখের তারায় এসে যেন স্থির হয়ে রইল, সন্তোষের অবচেতন পরিবেশণকারী মন ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠে বলতে লাগল ঃ তুমি না গেলে চলে, তুমি ছাড়া কী এত বড়ো একটা কাণ্ড মিটতে পারে ঠিক মতো?

মানুষের চাইতেও শিল্পী বড়ো হয়ে উঠল—সন্তোষের মধ্যে জেগে উঠল সেই বিখ্যাত দুর্ধর্ষ পরিবেশণকারী—যে বত্রিশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষের পাতায় হাতা উপুড় করে দিয়েছে। সন্তোষ তিনদিনের ছুটি নিল। শুধু পরিবেশণ করল না—সাতপাকের সময় বরের পিঁড়ি পর্যন্ত ধরতে হল তাকে, আর তারই চোখের সামনে কেতকী মালা পরিয়ে দিল কোন এক অনুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গলায়! ছেলেটা নাকি ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু লম্বা, কালো—কেতকীর পাশে কী বিসদৃশ রকমেই বেমানান!

আর, সব চুকে-বুকে গেলে—অসহ্য গরমে বাড়ীর দোতলার বারান্দায় সে বিছানা পাতল। হাতপাখায় ক্লান্তি ধরল (সেদিন আবার বাড়ীর ইলেক্‌ট্রিক লাইন খারাপ), মশারি তুলে দিল, সারারাত মশায় কামড়ালো, নারকেল গাছগুলো ভাঙা চাঁদের রাঙা আলোয় স্থির অনড় হয়ে রইল, আর ছাড়া ছাড়া ঘুমের মধ্যে চেয়ে চেয়ে দেখল, ধীরে ধীরে তারাগুলো ডুবতে ডুবতে পোড়া ছাইয়ের মতো আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছু বাকী ছিল। দুপুরে বর-কনে বিদায় হলে তারপর শেষ ট্রেন। ইলেক্‌ট্রিফিকেশনের জন্যে অসম্ভব লেট—হাওড়ায় পৌঁছুল রাত সাড়ে এগারোটায়।

তখন সারা শরীরে যেন হাজার মণ বোঝা, তখন চোখের সামনে স্টেশনের নিয়ন আলোগুলো এক-একবার বন্যার উচ্ছ্বাসের মতো আছড়ে পড়েই ঘুমের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে চাইছে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এল টলতে টলতে। যাত্রী বিশেষ নেই। রাস্তার ওপারে যেখানে টিনের শেডের নীচে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, সে পর্যন্তও যেতে হল না।

আধো ঘুমের মধ্যেই সন্তোষ দেখল, উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা আলোর ফলক ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

—ট্যাক্সি—এই ট্যাক্সি!

—কোথায় যাবেন?

—খিদিরপুর।

—অত দূরে?

শরীরে আর বইছে না, এখানেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। জড়ানো গলায় সন্তোষ বললে, একটাকা বেশি দেব না হয়।

—বেশি চাই না। মিটারেই দেবেন। উঠুন।

—ধ-ধন্যবাদ।

দরজাটা ট্যাক্সিওলাই খুলে দিয়েছিল, কোনমতে উঠে ঝুপ করে বসে পড়ল সন্তোষ। তারপর স্টেশনের কয়েকটা আলো দু'এক মিনিট ছায়া-বাজীর মতো নাচল চোখের সামনে, হাওড়ার ব্রীজ যেন রূপকথার দৈত্যের মতো দু'ধারে পা ফেলে দাঁড়ালো, গঙ্গার থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে মুখে পড়ল, তারপর—

সন্তোষের ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল।

সহজে ভাঙত না। ট্যাক্সির দু'ধারের জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। কালকে রাতে কোথাও এক ফোঁটা বাতাস ছিল না, নারকেল গাছগুলোর একটা পাতা পর্যন্ত কাঁপছিল না, ক্লান্তির সঙ্গে অসম্ভব গরমে বসে যেন দম আটকে আসছিল। কিন্তু এই রাতে হাওয়ায় সন্তোষের ঘুম ভাঙল। অসহ্য অতিরিক্ত হাওয়া! যে হাওয়ায় কান ভোঁ ভোঁ করে—যে হাওয়া মুখের ওপর আঘাতের মতো এসে লাগে, যে হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

সন্তোষ জেগে উঠেছিল। একটা শারীরিক কষ্টের মধ্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার।

তারপর তার চোখের দৃষ্টি পড়ল সামনে। স্পীডোমিটারের গোলাকার উজ্জ্বলতার দিকে। কাঁটাটা পঞ্চাশের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। তীরের মতো ছুটেছে ট্যাক্সি।

—এ কী কাণ্ড!

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে ট্যাক্সিওলা। শুধু বাতাসে তার চুলগুলোর ঝড় উঠছে। হাওয়ার স্রোতে সন্তোষের কথাটা ভেসে গেল—সে শুনতে পেল না।

আতঙ্কে রক্ত জমে গেল সন্তোষের।

হাওড়া থেকে খিদিরপুর অনেকদূরে, সে কথা ঠিক। তবু রাত্রির ফাঁকা রাস্তায় কতটা সময় লাগতে পারে? পঁচিশ—ত্রিশ মিনিট? সন্তোষ দেখল, রাত সোয়া বারোটা বেজে

গেছে, কিন্তু খিদিরপুরের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু খিদিরপুর কেন—কলকাতাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দু'পাশ থেকে। একটি আলো নেই কোথাও, পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত তারাভরা আকাশের কোণায় লাল টকটকে ভাঙা চাঁদ, দু'ধারে কালো মাঠ আর ঝাপসা গাছপালা থেকে হু-হু-করা দুঃসহ বাতাস, আর স্পীডোমিটারের কাঁটা ক্রমে ষাটের ঘরে।

গুণ্ডা—খুন—রাহাজানি!

ভাঙাগলায় চেঁচিয়ে উঠল সন্তোষ।

—ও মশাই ট্যাক্সিওলা, কী করছেন আপনি?

ট্যাক্সিওলা মুখ ফেরালো। হাওড়া স্টেশনে ঘুমের ঘোরে যাকে লক্ষ্যও করে নি, ড্যাশ বোর্ডের আলোয় আরো অস্পষ্ট—আরো আবছা দেখালো তার মুখ। শুধু বোঝা গেল সেও ছেলেমানুষ, বয়েস তার ত্রিশের বেশি নয়।

মৃদু হেসে ট্যাক্সিওলা বললে, খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জেগেছেন?

—জেগেছি বই কি। কিন্তু এ কোথায় চলেছেন আপনি? এ তো খিদিরপুর নয়।

—না, খিদিরপুর নয়। ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা।

—ডায়মণ্ডহারবার কেন?

এমনিই। ট্যাক্সিওলা মৃদু হাসল।

—এমনিই?—বুঝতে আর বাকী রইল না কিছু। বিকৃত গলায় সন্তোষ চেঁচিয়ে উঠল, থামান—গাড়ী থামান। নইলে পুলিস ডাকব।

—এখানে গাড়ী থামালে কোথায় যাবেন আপনি? দু'পাশে ফাঁকা মাঠ। আর পুলিস? পুলিস এর ত্রিসীমানায় কোথাও নেই।

সন্তোষ আর্তনাদ করল।

—কী চাও? ঘড়ি-টাকা-আংটি-বোতাম? দিচ্ছি সব। বোতাম নেই, দশটা মাত্র টাকা আছে সঙ্গে। তাই নিয়েই ছেড়ে দাও আমাকে, খুন কোরো না।

—কী পাগলামি করছেন? কে চায় আপনার ঘড়ি আংটি? কে আসছে আপনাকে খুন করতে?—ট্যাক্সিওলা হাসল : আপনি ভাববেন না। চুপ করে বসে থাকুন।

—চুপ করে বসে থাকব? খিদিরপুরের নাম করে ঝড়ের বেগে গাড়ী ছোটাচ্ছেন ডায়মণ্ডহারবারের দিকে, আমি চুপ করে থাকব?

—বেশ, তাহলে যত খুশি চেঁচান।

—ও মশাই শুনুন—কথাটা শুনুন একবার—

ট্যাক্সিওলার জবাব এল না।

গাড়ী ছুটল। ষাট পেরিয়ে সত্তরের ঘরে পৌঁছুল কাঁটা। একটা ঘুমন্ত গ্রাম-গঞ্জের গোটাকয়েক ইলেক্‌ট্রিক আলো মুহূর্তের জন্যে সামনে ঘুরপাক খেলো, তারপরে আবার রাত্রি আর ঝোড়ো হাওয়ার তুফান!

ঝুঁকে পড়ে ট্যাক্সিওলার কাঁধটা চেপে ধরলে কেমন হয়?

একটি মাত্র তার অর্থ। অ্যাক্সিডেণ্ট। গাড়ীটা উল্টে পড়বে কোনো খানা-খন্দলে, গিয়ে ধাক্কা দেবে কোনো গাছের সঙ্গে। তারপর—

তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভালো। যা হয় হোক। রাহাজানি করুক, খুন করে ফেলুক, লোপাট করে যেখানে খুশি নিয়ে যাক। এই দুর্ভাবনার নরক যন্ত্রণার চাইতে একেবারে

নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো।

সন্তোষ সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। সেই ঝোড়ো হাওয়া তার সর্বাঙ্গে এসে আছড়ে পড়তে লাগল, জানালার কাচ তুলে দেবার মতো উদ্যমটুকুও যেন শরীরের কোথাও খুঁজে পেলো না সে। বাতাসে দম আটকে আসতে চাইল, কানে অদ্ভুত যন্ত্রণা হতে লাগল—ছেলেবেলায় বর্ষার কাঁসাই নদীতে একবার ডুবে যাওয়ার অনুভূতিকে নতুন করে আস্বাদন করতে করতে বাইরের অন্ধকার এসে সন্তোষের চেতনাকে আত্মসাৎ করে নিলে।

এক সময় কে যেন ধাক্কা দিলে। সন্তোষ সেই ভয়ের স্মৃতি নিয়েই আর্তনাদ করে জেগে উঠল।

—কে—কে?

—আমি ট্যাক্সিওলা। খিদিরপুরে এসেছি। কোথায় যেতে হবে?

সন্তোষের মনে হল এখনো একটা স্বপ্নের পালা চলছে তার। কিন্তু স্বপ্ন নয়। নির্জন পথের ওপর ঝকঝক করছে ধারালো আলো। ট্রাম লাইনে ওয়েল্ডিং করছে কয়েকটা মানুষ—ফুলকি উড়িয়ে ছুটছে নীল আগুনের পিচকিরি। চেনা মোড়। ওই তো নতুন সিগারেটের প্রকাণ্ড বোর্ড লাগানো পানের চেনা দোকানটা, অফিস যাওয়ার সময় যেখান থেকে রোজ সে পান কেনে!

ট্যাক্সিওলা বললে, কোন্‌দিকে স্যার? ঘুম কি এখনো ভাঙেনি?

তাহলে স্বপ্ন দেখছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে? তাই হবে। সন্তোষ লজ্জিত হল।

—একটু এগিয়ে ডান দিকে। হ্যাঁ—ওই রাস্তা।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামল। ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল সন্তোষ।

—কত দিতে হবে?

ট্যাক্সিওলা মিটার দেখিয়ে দিলে। ফ্লাগটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘর ফাঁকা।

—সে কি!

ত্রিশ বছরের নয়, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুদর্শন ছেলেটি একটু হাসল।

—আপনাকে তো ভাড়া নিই নি স্যার, চড়িয়েছি। কিছু দিতে হবে না।

মিনিটখানেক হাঁ করে রইল সন্তোষ। মনে হল, স্বপ্নের ঘোরটা এখনো তার কাটে নি।

—কী বলছেন?

—স্যার, সারাদিন তো পরের জন্যেই গাড়ী চালাই। এই রাতে নিজের জন্যে একটু চালিয়ে নিলুম—বাঁচতে তো হবে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একটু দেরি হল, কিছু মনে করবেন না।

গর্জন উঠল ট্যাক্সির এঞ্জিনে। লাল ব্যাক লাইট দুটো একটু পরেই বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হল।

আর দরজার গোড়ায়—সারি সারি ধারালো আলোর আশ্চর্য নির্জনতায় স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তোষ। শুধু দূর থেকে আসতে লাগল ওয়েল্ডিংয়ের নীল আগুনের গর্জন, আর সন্তোষের মনে হতে লাগল, পরের জন্যে পরিবেশণের ফাঁকে যদি একটা নিজের জন্য অবকাশ তারও থাকত, তা হলে—

তা হলে আজ এমন করে কেতকী হারিয়ে যেত না।

ঘূর্ণি

১ ॥

অনেক দূরের গ্রাম থেকে বিয়ে করে এনেছিল কালাচাঁদ। বউ যমুনা তখনো কিছু জানত না।

বাবরী চুল ষণ্ডা মানুষটাকে দেখে তার ভালোই লেগেছিল। মস্ত ছাতি—মোষের মতো চওড়া কাঁধ। গায়ের কুচকুচে কালো রঙ রোদ পড়লে যেন উজ্‌লে উজ্‌লে ওঠে। আর কী অসম্ভব শক্তি তার শরীরে! একটা হ্যাঁচকা টা˙ দিয়ে তিনমণী ধানের বস্তাটাকে কতদূরে ছিটকে দিলে!

এমন জোয়ান, অথচ মুখখানা ঠিক বারো বছরের ছেলের মতো। শান্ত আর কোমল। হাসলে ভারী লাজুক মনে হয়। যমুনা খুশি হয়েছিল। সরল মানুষটি প্রাণভরে তাকে ভালোবাসবে—আপদ-বিপদের দিন এলে লোহার মতো চওড়া বুকের ভেতরে ছোট্ট একটা পাখির মতো লুকিয়ে রাখবে—বলবে, আমি আছি—ভাবনা কী!

আসবার দিন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল বুড়ো বাপ।

—তোর মা নেই যমুনা, এইটুকু বয়েস থেকে তোকে বড় করে তুলেছিলুম। আজ তুই দূর দেশে চলে যাচ্ছিস, বছরে একবারও তোকে দেখতে পাব না। কী নিয়ে আমি বাঁচব বল দিকি?

যমুনা কিছু বলতে পারেনি। চোখের জলে গলার স্বর থমকে গিয়েছিল।

কালাচাঁদ বলেছিল, তুমি ভেবো না মোড়ল। দু-চার মাস বাদ একবার করে তোমার মেয়েকে আমি দেখিয়ে নিয়ে যাব।

—কথা দাও।

—কথা দিচ্ছি।

বুড়ো মোড়ল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সময় পেলো না। নোঙর আগেই তুলে ফেলেছিল কালাচাঁদ, এবার একটা খোঁচ দিলে লগিতে। পদ্মার স্রোতে ছোট্ট একটা দুলুনি খেয়ে নৌকো ছুটল তীরের মতো। পড়ে রইল ভাঙনের মুখে হেলে-পড়া মন্দিরটা, দেখতে দেখতে মিলিয়ে এল গ্রামের চিহ্ন—কখন ছাড়িয়ে গেল শ্মশানটা। নৌকো চলল।

কালাচাঁদ বৈঠা ধরে বসেছিল। যমুনার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলে, ভয় করছে তোমার?

লাল শাড়ীর ঘোমটাটা আস্তে আস্তে মুখ থেকে সরিয়ে দিলে যমুনা। ভিজে-ভিজে পাতার তলা থেকে দুটো ডাগর ডাগর চোখ মেলে ধরল স্বামীর দিকে। বললে, না।

—বাপের জন্যে মন খারাপ করছে?

যমুনা জবাব দিলে না। আবার দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল চোখ থেকে।

কালাচাঁদ একবারের জন্যে বৈঠাটা তুলে ধরল। তারপর বললে, মন খারাপ করবারই কথা। তুমি ভেবো না। যখনই তোমার ইচ্ছে হবে নিয়ে আসব বাপের বাড়িতে। কেমন?

কৃতজ্ঞতায় যমুনা ঘাড় নাড়ল ঃ আচ্ছা।

পদ্মার ভরা স্রোতে নৌকা চলল। যমুনা তাকিয়ে রইল জলের দিকে। গহীন অথৈ পদ্মা। এপারের গাছপালাগুলো দেখা যায়—ওপারটা একেবারে ঝাপসা। মাঝখানে জল

আর জল। উঃ—কত জল আছে এই নদীতে!

হঠাৎ যমুনা জিজ্ঞেস করলঃ তুমি বুঝি পদ্মায় খুব নৌকো বাও?

কালাচাঁদ হা-হা করে হেসে উঠল। হাসিটা যেন কেমন বেয়াড়া আর নতুন রকমের শোনালো যমুনার কানে। চমকে চোখ তুলল যমুনা।

—পদ্মার জলেই তো বাস করি বলতে গেলে। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধারে পাড়ি জমাই। ঝড়-তুফান পেরিয়ে চলে আসি।

যমুনা শিউরে উঠল মনে মনে।

—ভয় লাগে না তোমার?

কালাচাঁদ শব্দ করে হাসল না বটে, কিন্তু হাসি এবার ঝরে পড়ল গলা দিয়ে।

—পদ্মার ধারে যে ঘর বাঁধে, পদ্মাকে ভয় করলে তার চলে?

—কিন্তু এ যে রাক্ষুসী নদী!

কালাচাঁদ বললে, উঁহু—মা। মা কালী। ঝড় উঠলে, রাত কালির মতো কালো হয়ে গেলে খাঁড়া নিয়ে নাচতে শুরু করে। সে নাচ দেখলে আর ভয় হয় না বউ—সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠতে ইচ্ছে করে। তোমাকেও সে নাচ দেখাব বউ—কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

—আমার দেখে দরকার নেই—যমুনা কেঁপে উঠল।

কালাচাঁদ একটু চুপ করে রইল, বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে স্নেহভরা চোখ মেলে চেয়ে রইল যমুনার দিকে। ছেলেমানুষ, এখনো কিছু জানে না। কিন্তু আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে ওর। রাত্রের পদ্মাকে চিনবে—রাত্রের পদ্মায় যা ঘটে, তা-ও ওর কাছে তখন আর ভয়ঙ্কর ঠেকবে না। ঠিক কথা—মা-র সেই কালীমূর্তি একবার যে দেখেছে, তার চোখ সে রূপে একেবারে ডুবে গেছে। যমুনারও তাই হবে।

কিন্তু এখনই নয়। এই দিনের আলোয় পদ্মা আর এক রকম। এ মা-র আর এক চেহারা। কোলে তুলে নেয়, আদর করে—ঠাণ্ডা হাওয়ার আঙুল বুলিয়ে দেয় গায়ে। এই পদ্মার মাঝিরা সারি গায়, ধানের নৌকা গঞ্জে এসে ভেড়ে, বাচ্চারা মোচার খোলা ভাসায়, দামাল ছেলে ঝাঁপাই ঝোড়ে, বৌ-ঝিরা কলসী ভরে নিয়ে যায়, জেলের জালে রূপোলি ইলিশ ঝিলমিল করে। এই পদ্মা ফসল দেয়, বাঁকে বাঁকে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। তুফানের রাতের কথা এখন থাক।

কালাচাঁদের চোখ আর মন পদ্মার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল। সাদা ঘোলা জল তো নয়—যেন মায়ের দুধ! মাটি সেই দুধ টেনে নিচ্ছে শিশুর মতো, পুষ্ট হয়ে উঠছে ধানের চারা—আম-জাম-নারকেল-সুপুরি রসে শ্বাসে ভরে উঠেছে। যমুনার ভীরু মুখের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে একটু চেয়ে রইল কালাচাঁদ, গুনগুন করল বার কয়েক, তারপর গান ধরল গলা ছেড়েঃ

পদ্মা মোদের মা জননী রে,
পদ্মা মোদের প্রাণ,
তার সোনার জলে মোদের ক্ষেতে
ভরে সোনার ধান রে—
ভরে সোনার ধান—

মুগ্ধ আনন্দে চোখের তারা দুটো বড় হয়ে উঠল যমুনার। এমন ষণ্ডা জোয়ান মানুষটা. এত বড় বুকের ছাতি, এমন লোহার মতো হাতের গুল—তার গলায় এই গান! আর এত মিষ্টি তার গলা! পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে দরাজ গলার এই গান যেন দূর-দূরান্তে ভেসে যেতে লাগল।

যমুনার মুখের দিকে আড়চোখের দৃষ্টি রেখে কালাচাঁদ গেয়ে চলল ঃ

রঙ্গিলা নাও স্রোতে বাইয়া
বন্ধু আসে ভিনদেশিয়া
আর আপন ভুলে রূপবতী
ভাসায় কলসখান—

যমুনার চোখে আর পলক পড়ে না। এই রূপবতী কে? সে-ই? আর এই কি সেই ভিনদেশিয়া বন্ধু, যে এমন করে তাকে রঙিলা নায়ে তুলে নিয়ে ভেসে চলেছে?

যমুনা স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু স্বপ্নটা ভেঙে গেল আচমকা।

নৌকার সঙ্গে সঙ্গে ওটা কী চলেছে? শ্যাওলা-ধরা কাঠের গুঁড়ি? না—তা তো নয়। পিঠের ওপরে কাঁটার মতো উঁচু উঁচু হয়ে আছে—চারটে ছোট ছোট কদাকার পা জল টানছে, সরু সুচলো মুখ, আর জলের একটু ওপরে দুটো হিংস্র পলকহীন চোখ যেন একভাবে চেয়ে আছে তার দিকে!

—কুমীর! কুমীর! ভীত বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল যমুনা।

সঙ্গে সঙ্গে জলের দিকে চোখ গেল কালাচাঁদের, আচমকা থেমে গেল গানটা। হিংস্র কর্কশ গলায় বললে, শা-লা! তারপর বৈঠাটা বাগিয়ে ঢপাস করে একটা প্রচণ্ড ঘা বসালো কুমীরটার পিঠের ওপর।

ল্যাজের একটা বিরাট ঝাপটা দিয়ে, একরাশ জল ছল্‌কে দিয়ে কুমীর ডুবে গেল।

যমুনা তখনো কাঠের পুতুলের মতো শক্ত হয়ে আছে। কালাচাঁদ হেসে বললে, ভয় নেই—ভয় নেই! আমরা আছি নৌকার ওপর—ও শালা আমাদের কী করবে! আর জলের তলায় হলেই বা কী করত! কালাচাঁদ দুলেকে চেনে না—গলা টিপে মেরে ফেলতুম ওকে!

কুমীরের চাইতে আরো নিষ্ঠুর—আরো বীভৎস দেখালো কালাচাঁদের চোখ। যমুনা ভরসা পেলো না—আরো শক্ত হয়ে ঠায় বসে রইল, বুকের ভিতরটা তার হিম হয়ে গেছে। কিছুই জানত না যমুনা, তবু এই মুহূর্তে কেমন করে যেন টের পেলো ঃ কালাচাঁদকে সে যা ভেবেছিল, কালাচাঁদ ঠিক তা নয় !

॥ ২ ॥

চাষীর ছেলে, অথচ চাষবাস করে না। জমিজমা বলতেও কিছু নেই। অল্পস্বল্প ঘরামির কাজ—জনমজুর খাটা। তবু টিনের নতুন দো-চালা ঘর, গোয়ালে তিন-তিনটে গোরু। ত্রি-সংসারে কোথাও কেউ নেই।

এ-ই হল কালাচাঁদের সংসার।

তখনো কিছু টের পায়নি যমুনা। পেলো সেদিন—যেদিন অনেক রাতে কোত্থেকে একপেট মদ খেয়ে ফিরল কালাচাঁদ। ভাত আর মাছের ঝোল রান্না করে যমুনা ঝিমুচ্ছিল

দাওয়ায় বসে বসে। পেয়ারা গাছের ও-পাশে হলদে রঙের একটুকরো চাঁদ ঝুলে পড়ছিল, থেকে থেকে ডাহুক ডাকছিল ঝোপের ভেতর। যমুনা ঝিমুচ্ছিল আর আলগা আলগা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে টুকরো টুকরো মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছিল ছাড়া-ছাড়া কতগুলো ছবি। মা-কে উঠোনে নামানো হয়েছে—একমাথা রুখো চুল ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ছোট্ট যমুনা কাঁদছে লুটোপুটি খেয়ে—পাশের বাড়ির মানিকের মা কী যেন বোঝাতে চাইছে তাকে—বাবা একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপরে বৃষ্টি পড়ছে,—অনেক—অনেক বৃষ্টি। উঠানে ব্যাঙ লাফাচ্ছে—একটা দুটো তিনটে চারটে। বাবা হাট থেকে আসছে, বেলা ডুবে যাচ্ছে, যমুনা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। বাবা এসে যমুনাকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলে, বললে, কী সুন্দর শাড়ী কিনে এনেছি তোর জন্যে—বিক্রমপুরের তাঁতের শাড়ী ময়ূরকণ্ঠী রঙ—

কড়-কড়াং! যেন বাজ পড়ল কোথাও। চমকে উঠে বসল যমুনা। সদর দরজাটা আছড়ে ফেলে বাড়িতে ঢুকল কালাচাঁদ—টলতে টলতে এগিয়ে এল।

—মদ খাও নাকি তুমি?—যমুনা চেঁচিয়ে উঠল।

—কারো বাপের পয়সায় খাই নাকি?—রূঢ় কর্কশ জবাব এল একটা।

—ছিঃ--ছিঃ—

—চুপ কর হারামজাদী—গলাটাকে সপ্তমে চড়িয়ে কালাচাঁদ জানোয়ারের মতো গর্জন করে উঠল ঃ চেঁচাবি তো গলা টিপে মেরে ফেলব!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না যমুনা—নিজের কানকেও নয়। লণ্ঠনের একমুঠো আলো গিয়ে পড়েছে কালাচাঁদের মুখে। সেই কালাচাঁদ—কিন্তু এক মাস ধরে যমুনা যার ঘর করেছে এ সে নয়। সমস্ত চেহারার আদলটাই বদলে গেছে তার। এখনি একটা লোহার মতো থাবা বাড়িয়ে সে যমুনার গলা টিপে ধরতে পারে।

যমুনা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে স্বামীকে চিনল যমুনা। কালাচাঁদের আসলে পেশা ডাকাতি। রাতের অন্ধকারে পদ্মার বুকে সে ডাকাতি করে বেড়ায়।

প্রথম জানবার পর তিন রাত সে ঘুমুতে পারেনি। চোখের জলে ঘরের দাওয়া ভিজিয়ে ফেলেছে—ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছে বাপের কাছে। কিন্তু কালাচাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে সে সাহসও পায়নি। কোথায় যাবে—কোনখানে পালাবে? কালাচাঁদের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই কোথাও।

কেঁদেছে—নিজের মাথা খুঁড়েছে মাটিতে, তারপর ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। দেখেছে, সন্ধ্যের অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো একদল মানুষ এসে জড়ো হয় তাদের বাড়ির দাওয়ায়, ফিসফিস করে কথা বলে, মদ খায়, গাঁজা খায়—তারপর একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে চলে যায়। অসম্ভব ভয়ে সারারাত জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে যমুনা। ভোর হওয়ার আগে ফেরে কালাচাঁদ—টাকা এনে ঢালে মেজের ওপর, আনে রক্তমাখা গয়না। দাঁতে দাঁত চেপে যমুনাকে বলে, একটা টুঁ শব্দ যদি করবি কারু কাছে, তা হলে গলা কেটে পদ্মায় ফেলে দেব—মনে থাকে যেন।

যমুনা বালিশ কামড়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে—নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে তার। তারপর একটা ছোট শাবল দিয়ে ঘরের কোণায় গর্ত করে টাকা-গয়নাগুলো পুঁতে রাখে

কালাচাঁদ। বিড়ি ধরিয়ে যমুনার পাশটিতে এসে শোয়—আতঙ্কে শরীর সিঁটিয়ে ওঠে যমুনার—স্বামীর গা থেকে যেন মানুষের রক্তের আঁশটে গন্ধ পায় সে!

কালাচাঁদের মনটা নরম হয় এতক্ষণে—হাত বাড়িয়ে যমুনাকে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে। যমুনার মনে হয়—একটা বাঘ যেন মেরে ফেলবার আগে খেলা করছে শিকারটাকে নিয়ে। চোখের পাতা চেপে ধরে সে শক্ত হয়ে থাকে।

—চোখ মেলে চা বউ, চোখ মেলে চা। তোর জন্যই তো এসব করি। একছড়া সুন্দর হার পেয়েছি, পরিয়ে দেব তোকে।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় যমুনা বলে, হার আমি চাই না, তোমার পায়ে পড়ি, এই মানুষ মারার কাজ তুমি ছেড়ে দাও।—তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

বিরক্ত হয়ে কালাচাঁদ বিড়বিড় করেঃ দুত্তোর—মেয়েমানুষের নিকুচি করেছে!

যমুনাকে ছেড়ে দিয়ে কাত হয়ে শোয়। ভাবে, বিয়ে না করেই বেশ ছিল। দলের সাকরেদ রাখালের সেই বিধবা বোনটাই ছিল তার সত্যিকারের যোগ্য। যমুনার মতো একটা ভিজে কাঁথা নয়—তেতে থাকত আগুনের মতো। তেমনি ছিল সোনা আর পয়সার খাঁই। কালাচাঁদের শড়কিতে নিজের হাতে শান দিয়ে বলতঃ একসঙ্গে তিনটেকে ফুঁড়তে পারবে এমনি করে ধার দিয়ে দিলুম!

তিনদিনের জ্বরে মরে গেল। নইলে কি আর যমুনাকে বিয়ে করে আনত সে? রাখালের বোনটার কথা ভাবতে ভাবতে কালাচাঁদের ক্লান্ত শরীর ঘুমে জড়িয়ে আসে, নাক ডাকতে শুরু করে। আর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে যায় যমুনা—আকাশে সকালের আলো ফুটেছে।

তবু চেষ্টা করেছে যমুনা। দিনের আলোয়, কালাচাঁদের মনটা ভালো থাকলে, তার মুখখানাকে বারো বছরের ছেলের মতো শান্ত আর কোমল দেখালে—সেই সময়।

—আচ্ছা, তোমার পরকালের ভয় নেই?

—দুত্তোর পরকাল! ও-সব বুঝি না!

—খুন করো কেন?

—সহজে করি না তো? চিনে না ফেললে কিংবা বাধা না দিলে হাত ছোঁয়াই না কারুর গায়ে।

—মানুষ মারতে কষ্ট হয় না?

—কইমাছ কুটতে কষ্ট হয় তোর? হাঁস কাটতে?

—এক হল?

কালাচাঁদ হাসেঃ তফাত কিছু নেই। লাল রক্ত বেরোয়—ছটফট করে, তারপর সব ঠাণ্ডা।

যমুনা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। আবার বলেঃ পরকালের ভয় না-ই করলে, পুলিসকে ভয় হয় না? ধরতে পারলে যে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে!

এই ভয়টা কালাচাঁদেরও নেই তা নয়। পুলিসের নজর তার ওপর আছেই। যমুনাকে বিয়ে করে আনবার আগে দু-তিনবার দারোগা এসে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে গেছে তাকে। কিন্তু এত সাবধান তার দলটা, এমন হিসেব করে কাজ করে যে আজ পর্যন্ত কাঁটার আঁচড়টি লাগেনি তার গায়ে। তবু মধ্যে মধ্যে বুক ধুকপুক করে। জল-পুলিসের লঞ্চ

ইদানীং একটু বেশি যাওয়া-আসা করছে এই তল্লাট দিয়ে। ভয় করে বইকি কালাচাঁদের।

আর ভয় করে বলেই সেটাকে আরো বেশি করে উড়িয়ে দিতে চায়। হা-হা করে হাসে এবারে।

—ওঃ, পুলিস! পুলিস ঢের দেখেছি!

—বেশ, পুলিসও নয় কিছু করতে পারবে না। কিন্তু টাকা তো কম জমল না। কেন আর এ-সব করে বেড়াও তুমি? যা আছে তাই দিয়ে জমি-জমা কেনো, বলদ আনো, চাষবাস করো।

—বলিস কি! শড়কি ফেলে লাঙল নেব! জোয়ানের কাজ ছেড়ে চাষা হয়ে যাব!

—কোনো লজ্জা নেই। চাষেই তো লক্ষ্মী। দোহাই তোমার—অনেক তো করলে, এবার ছেড়ে দাও এ-সব।

—দাঁড়া দাঁড়া। আর দু-চারটে ভাল ক্ষেপ মেরে নিই, তারপর—

—না-না, এখুনি। আজ থেকেই ছেড়ে দাও—যমুনা পা জড়িয়ে ধরে ঃ ছেড়ে দাও এ-সব।

আবার রাখালের বোনটাকে মনে পড়ে—বুকের ভেতরটা যেন জ্বালা করতে থাকে কালাচাঁদের। উঠে দাঁড়িয়ে বলে ঃ দেখব, দেখব ভেবে।

ভাবে কালাচাঁদ। পুলিসের ভয়—ফাঁসির দড়ি। ছেড়ে-ছুড়ে দিলেও মন্দ হয় না। কিন্তু তার বদলে চাষা? লাঙল চেপে ধরে দুপুরের রোদে হাল দেওয়া, জল-কাদার ভেতর ধান রোয়া, সকাল থেকে নুয়ে নুয়ে পিঠ কুঁজো করে ফসল কাটা? পারবে কালাচাঁদ? তার মেজাজে কুলোবে?

তা ছাড়া রাত! ডাকিনীর মতো কালো হয়ে আসে। পদ্মা তার ঝোড়ো চুল মেলে দিয়ে ডাক দেয় ঃ অথই গহীন জলের ওপর খাঁড়া নাচতে থাকে। সঙ্গীরা আসে, ফিসফিস করে খবর দিয়ে যায়—পাট বিক্রি করে ফিরছে নামকরা মহাজন, নৌকোটা ধরতে পারলে—

বুকে ঢেউ দোলে—খাঁড়া নাচিয়ে পদ্মা ডাক দেয়। মাথার ভেতর মদের নেশা আগুনের চাকা হয়ে ঘুরতে থাকে। কালাচাঁদ আর থাকতে পারে না। খিদেয় ছটফটিয়ে ওঠা বাঘ হরিণের গন্ধ পায়।

তারপর নদী।

ছিপের দাঁড় তালে তালে পড়তে থাকে—জল কেটে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চলে, বারো-চোদ্দ জোড়া চোখ অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলে, একটা মিটমিটে আলো দুলতে থাকে—পাট-বেচা মহাজনের নৌকোটা আসছে। মাঝপদ্মা, নিথর রাত—পদ্মার জলে খড়্গ ঝল্‌কায়। তখন কোথায় যমুনা—কোথায় কে?

দাওয়ার খুঁটি ধরে বসে আছে যমুনা। জল গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে।

সকালে দৃশ্যটা দেখেই বিরক্ত হয় কালাচাঁদ।

—এই সাতসকালেই কাঁদতে বসলি কেন? যমুনা চুপ করে রইল।

—তবে তুই কাঁদ বসে বসে—আমি চললুম।—কালাচাঁদ পা বাড়াবার উদ্যোগ করল।

—একটু দাঁড়াও—যমুনা চোখের জল মুছল ঃ কথা শুনবে একটা?

—আবার ওই সব বলবি তো? কালাচাঁদের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল ঃ তুই যা শুরু

করেছিস, এরপর বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে আমাকে। নইলে গিয়ে ধরা দিতে হবে পুলিসের হাতে।

যমুনা চোখ দুটো মেলে ধরল কালাচাঁদের দিকে। কাঁপা গলায় বললে, আমার কথা না হয় না-ই ভাবলে। আমার পেটে যে আসছে তার কথা একবার ভাবো। তোমার যদি একটা কিছু হয়, তাহলে—

যমুনাকে শেষ করতে দিলে না কালাচাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল বৌয়ের পাশে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কোমরটা।

—তোর ছেলে হবে বউ? সত্যি—ছেলে হবে তোর?

আনন্দে আদরে যমুনাকে ভরে দিলে এক মুহূর্তে। বদলে গেছে কালাচাঁদ—আবার সেই মানুষটা, বিয়ের আগে যার মস্ত জোয়ান শরীরটার ওপর ছেলেমানুষের মতো একখানা মুখ দেখে ভারী ভালো লেগেছিল যমুনার।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে—এই কি তুমি চাও?

কালাচাঁদ চুপ করে রইল একটু। তারপর ধীরে ধীরে বললে, না—এবার থেকে ভালো হয়ে যাব—সব ছেড়ে দেব, দেখে নিস তুই।

॥ ৩ ॥

ছেলেই হল। গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। কোলে তুলতে কাঁকাল বেঁকে আসে যমুনার। বড় হলে বাপের মতো হয়ে উঠবে—এখুনি ফুটে বেরুচ্ছে তার লক্ষণ।

কিন্তু কেবল জোয়ানই হবে বাপের মতো? ভাবতে গিয়ে চোখে অন্ধকার নামে।

কথা রাখতে চেষ্টা করেছিল কালাচাঁদ। প্রায় এক বছর সে যেন নতুন হয়ে গিয়েছিল। ঘরে পোঁতা টাকাকড়ি যা আছে আছেই, তবুও আবার মন দিয়ে ঘরামির কাজ শুরু করেছিল এখানে ওখানে। জনমজুরির খোঁজে আসা-যাওয়া করেছিল দূর-দূর গ্রামে। যমুনাকে নিয়ে গিয়েছিল বাপের বাড়ি, বুড়োকে দেখিয়ে এসেছিল নাতির মুখ।

বুড়ো কেঁদে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।

—তবু ভাগ্যিস, এতদিনে মনে পড়ল বাপটাকে!

—কী করব বাবা, অনেক দূরের পথ যে।

—না এলি, না এলি। তোরা সুখে থাকলেই আমার সুখ। হ্যাঁ রে, তোকে তো কালাচাঁদ কোনো কষ্ট দেয় না? ভাত-কাপড়ের দুঃখু পাসনে তো?

একবারের জন্যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল যমুনার। না, ভাত-কাপড়ের কষ্ট নেই। কষ্ট যে তার কোথায়, সে কথা মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারবে না যমুনা, শুধু ভেতরে ভেতরে পুড়ে খাক হয়ে যাবে তুষের আগুনে।

—না বাবা, কোনো কষ্ট নেই।

বলে যমুনা ভেবেছিল, সত্যিই তো। এই সাত-আট মাসের ভেতরে কালাচাঁদ একবারও রাত্রে বেরোয়নি পদ্মার বুকে হানা দিতে, রক্তমাখা পাপের ধন নিয়ে আসতে। ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে বদলে গেছে সে। জমি কেনবার কথা ভাবছে, বলদও মনের মতো খুঁজছে হাটে হাটে। না, যমুনার কোনো দুঃখ নেই।

ফিরে আসবার সময় তেমনি করেই বুড়ো বাপ এসে দাঁড়িয়েছিল ঘাটে। আর পদ্মার স্রোতে তেমনি তীরের মতো ভেসে গিয়েছিল নৌকো। এবার আর কালাচাঁদ কথা বলেনি, গান গায়নি, নিঃশব্দে বৈঠা টানতে টানতে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে।

—কী ভাবছ?—যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল।

—উঁ?

—কী ভাবছ চুপ করে?

ক্লান্তভাবে হেসেছিল কালাচাঁদ। বলেছিল, ভাবছি তোর কথাই সত্যি হল তাহলে! এরপর থেকে একেবারে চাষাই হয়ে যাব। রাতের পদ্মা যখন কালো আঁধারে ডাক পাঠাবে, তখন সে ডাক আমি আর শুনতে পাব না, একপেট পান্তা ভাত খেয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুব কেবল।

—আবার ওই কথা? ফের যদি ও-সব বলবে, তাহলে ছেলে বুকে করে আমি সোজা গাঙের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব এই বলে দিচ্ছি তোমাকে।

কালাচাঁদ আর কথা বলেনি। চুপ করে বৈঠা টেনেছে বসে বসে।

হাঁ, চেষ্টা সে করেছিল। মদ ছেড়ে তাড়ি ধরেছিল—তাও হপ্তায় এক-আধদিনের বেশি নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে যারা ছায়ামূর্তির মতো আসা-যাওয়া শুরু করেছিল, টিটকিরি দিত তারা।

—কী হল তোর? বৌয়ের আঁচল ছেড়ে যে নড়তে চাসনে?

—আর ভালো লাগে না এ-সব। আমাকে আর ডাকিসনি। পাপ কাজের ভেতরে আমি আর নেই। ছেলের আখেরটা তো দেখতে হবে!

—আরে ছেলের আখেরের কথাই তো হচ্ছে। একটু বড় হলেই সঙ্গে নিবি। নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি এখন থেকে। তবে না বাপের নাম রাখতে পারবে!

—না। ও-সব করব না আমি।

—পাগলামো করিসনি কালাচাঁদ—একজন ধমকে দেয়ঃ ওই বৌ-ই তোর মাথা খেয়েছে। দে ওটাকে তাড়িয়ে। তুই সঙ্গে না বেরুলে আমরা জোর পাই না—কানা হয়ে যাই। বৌটাকে দে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে।

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। তার মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, কথাটা তার পছন্দ হয়নি।

একজন টিপ্পনী কেটে বলে, তাহলে একদিন রাতে মুখে কাপড় বেঁধে দিই বৌটাকে লোপাট করে। তারপর—

হঠাৎ কালাচাঁদ বেসুরো গলায় গর্জন করে ওঠে। দপ-দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ—মুখের চেহারা হয়ে ওঠে হিংস্র জানোয়ারের মতো। কালাচাঁদ বলে, খবর্দার—খুন করে ফেলে দেব এসব বললে! মুখ সামাল্!

—আহা-হা—ঠাট্টাও বুঝতে পারিসনে?

—না, ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

দলের লোকেরা নিরাশ হয়ে চলে যায়। কিন্তু কালাচাঁদ খুশি হতে পারে না। মনের ভেতর সমানে জ্বলে যেতে থাকে। ওদের কথাগুলো বাজতে থাকে কানে।

যমুনা এসে বলে, অনেক রাত হল যে! খাবে না?

—না।

—কী হল?

কালাচাঁদ ধমক দিয়ে বলে, বিরক্ত করিসনি আমাকে। তোর ইচ্ছে হয়, এক পেট গিলে পড়ে থাকগে।

নিজের ওপর রাগ হয় কালাচাঁদের—অকারণ বিদ্বেষে মনটা ভরে ওঠে। ঘরামি—জনমজুর—চাষী! রাত্রের পদ্মা আর তাকে কোনোদিন ডাক পাঠাবে না। সে তার জীবন থেকে সরে গেছে চিরকালের মতো। এখন ভালোমানুস হবে কালাচাঁদ, পরের ঘর ছেয়ে দেবে, বেড়া বাঁধবে—ফসল কাটবে।

অসহ্য মনে হয়।

সব ওই যমুনার জন্যে। যদি রাখালের বোনটা অমন করে না মরে যেত, যদি সে বিয়ে করে না আসত, যদি ছেলেটা না হত! কিসের ভয় ছিল কালাচাঁদের, কাকেই বা পরোয়া করত সে! যেমন চলছিল, তেমনিই চলত। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হলেই বা কী আসত যেত তার! জোয়ান চিরকাল জোয়ানের মতোই মরে।

কিন্তু—

মাথাটা দুহাতে টিপে ধরে বসে থাকে কালাচাঁদ। কিছু ভালো লাগে না। বিশ্রী, অশ্লীল ভাষায় পৃথিবীসুদ্ধ লোককে তার গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে।

যমুনা আবার এসে জিজ্ঞেস করেঃ খেয়ে নিলে হত না?

—দূর হয়ে যা সামনে থেকে—উঠে ছিটকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কালাচাঁদ।

আরো এক মাস যায়—দু মাস যায়। জমি কিনব-কিনব করেও কেনা হয় না। হাটে হাটে ঘুরেও বলদ পছন্দ হয় না কিছুতেই। আর রাত জেগে জেগে শোনে দূরে পদ্মার ঢেউ ভাঙার শব্দ—ভাবে অন্ধকারে নিশ্চিন্ত টাকার থলে নিয়ে পদ্মায় পাড়ি দিচ্ছে পাটবেচা মহাজন, ভারী ভারী গয়না পরা মেয়েদের নিয়ে নৌকো চলেছে দূরের শহরে। কালাচাঁদের মাথার ভেতর তুফান ছুটতে থাকে।

ছেলেটাকে বুকে নিয়ে যমুনা ঘুমিয়ে পড়লে এক-একদিন এসে দাঁড়ায় পদ্মার ধারে। কালো উজ্জ্বল জল যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাক পাঠায়। মানুষ শিকার করার স্মৃতিগুলো সব ভেসে ওঠে চোখের সামনে। থাকতে পারে না কালাচাঁদ, একটা ডিঙি খুলে নিয়ে ভাসিয়ে দেয় অন্ধকার নদীতে—ঘণ্টাখানেক পাগলের মতো বৈঠা টেনে মনের অসহ্য অস্থিরতাটাকে খানিক শান্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু আর পারল না শেষ পর্যন্ত।

সেই ছায়ামূর্তিরা এল, অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করল ফিসফিস গলায়। তারপরঃ

কালাচাঁদ বললে, বৌ, যাচ্ছি!

কালাচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল যমুনা। ভয়ে পিছিয়ে গেল দু'পা।

—কোথায় যাবে?

—শিকারে।

—আবার? তুমি যে আমায় কথা দিয়েছ!

—কথা দিয়েছি!—কদর্যভাবে মুখ ভ্যাঙচালো কালাচাঁদঃ তুই আমায় ভেড়ুয়া বানিয়েছিস, সকলের কাছে ইজ্জত নষ্ট করেছিস। আমি আর এভাবে থাকতে পারব না—পাগল হয়ে যাব।

যাবার জন্যে পা বাড়াল কালাচাঁদ। যমুনা দুহাতে পা জড়িয়ে ধরল তার।

—আমার কথা না শোনো না-ই শুনলে। কিন্তু ছেলেটা—

কালাচাঁদের সমস্ত চেহারাটাকে বুনো মোষের মতো দেখালো। হিংস্র গলায় বললে, পা ছাড়,—ছেড়ে দে বলছি—

—দোহাই তোমার, ছেলেটার কথাও একটিবার—

—ছেলে নিয়ে পদ্মায় ডুবে মর তুই—তোরও শান্তি, আমিও বেঁচে যাই। পা ছাড় হারামজাদী—

ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে লাথি মারল কালাচাঁদ। যমুনা ছিটকে পড়ল তিন হাত দূরে।

একবারের জন্য অনুতাপ এল মনে। একবার ভাবল—

কিন্তু ভাবলেই জট পাকায়। এতদিন ধরে যত ভেবেছে ততই যমুনার জালে সে জড়িয়ে গেছে, টের পেয়েছে ধীরে ধীরে তার শক্তি শুকিয়ে আসছে, সাহস থমকে দাঁড়াচ্ছে। কালাচাঁদ আর অপেক্ষা করল না—পদ্মা তখন তার নাড়ী ধরে টান দিয়েছে।

নৌকোতে ছিল চক্রবর্তী। মেয়ের বিয়ের জন্যে গয়না কিনে নিয়ে ফিরছিল।

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল—ছাইয়ের মতো তার মুখ।

—দোহাই বাবা, গরিব ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দাও—ব্রহ্মস্ব হরণ কোরো না।

জবাব দিলে রাখাল। চক্রবর্তীর গলার ওপর রামদা বাগিয়ে ধরে বললে, চুপ কর বুড়ো শয়তান কোথাকার! যা আছে বের করে দে এখুনি। নইলে এক কোপে মাথা উড়িয়ে দেব।

তেমনি থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙে বসে বড়ল চক্রবর্তী। ভাঙা ঘ্যাসঘেঁসে গলায় বললে, বাবা সকল, দয়া করে—

—চুপ—কী আছে দে এখুনি!

চক্রবর্তী বেঁচে যেত, অনর্থক একটা বুড়ো মানুষকে খুন করে হাত নোংরা করবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নৌকোর লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় কালাচাঁদের মুখের দিকে তার চোখ পড়ল। দুর্গ্রহ।

চক্রবর্তী যেন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কুটো কুড়িয়ে পেলো।

—তুমি বাবা কালাচাঁদ না? রায়নগরে চাটুজ্জেদের রান্নাঘর ছেয়ে দিয়েছিলে না গত বছর?—বলতে বলতে আশায় জ্বলে উঠল চক্রবর্তীর মুখঃ আমি সে বাড়িতে ছিলুম—তারা আমার কুটুম। বসে বসে তামাক খেতুম আর তোমার সঙ্গে কত গল্প—

কথাটা আর শেষ হল না। রাখালের হাতেব রামদা নেচে উঠল বিদ্যুতের মতো। চক্রবর্তীর মনে হল ঘাড়ের ওপর খুব জোরে কে একটা ধাক্কা দিয়েছে। তারপরেই মাথাটা ছিটকে পড়ল পাটাতনের ওপর। চোখ দুটো তখনও জ্বলজ্বল করছে—ঠোঁট দুটো বাকী কথাটা শেষ করতে চাইছে তখনো।

কবন্ধটা কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে বসে রইল। আট-দশটা শিরা থেকে ফোয়ারার মত

ছিটকে উঠল রক্ত, তারপর উবুড় হয়ে পড়ে গেল শরীরটা।

—শা-লা! চিনে ফেলেছিল!—রাখালের চোখ দুটো অদ্ভুত দেখাচ্ছে—মনে হল এখন সে রক্ত খেতে পারে!

একটা মাঝি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাকে ধরা গেল না। আর একটা বল্লমের মুখে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল।

এ খুন এই প্রথম নয়, এমন আরো অনেকবারই ঘটেছে কালাচাঁদের। নিজের হাতেই যে কতগুলোকে শেষ করেছে সে কথা আঙুল গুনেও বলতে পারে না। তবু হঠাৎ রক্ত দেখে মাথাটার ভেতর কেমন পাক খেয়ে গেল তার। চোখ বুজে বসে পড়ল পাটাতনের ওপর।

ঝিম ভাঙল কার যেন ঝাঁকুনিতে।

—কী হল তোর? এই কালাচাঁদ—এই—

কিছুই হয়নি—চোখ খুলে উঠে পড়ল কালাচাঁদ। চক্রবর্তীর রক্তে সারা গা তার মাখামাখি।

শেষরাতে যখন স্নান করে বাড়ি ফিরল, রক্তের গন্ধটা তখনো যেন জড়িয়ে আছে শরীরে—কেমন গুলিয়ে উঠছে শরীর।

চক্রবর্তীকে খুন না করে উপায় ছিল না—চিনে নিয়েছিল। তবু—তবু—

—শালা!

নিজের উদ্দেশেই গালাগাল করলে কালাচাঁদ। এই অধঃপাত হয়েছে যমুনার জন্যেই। সে-ই তাকে এমনভাবে সব কাজের বার করে দিয়েছে। মানুষের রক্ত দেখে আজ তার মাথা ঘুরে গেল—ছিঃ ছিঃ! এর পরে আর তার মুখ দেখানোর জো রইল না। বাড়ির দরজায় পা দিয়ে কালাচাঁদ ভাবল, আজ বৌটা একটা কথাও বলতে এলে একচোট বোঝাপড়া হয়ে যাবে তার সঙ্গে!

কিন্তু কিছুই করবার দরকার হয় না কালাচাঁদের।

ভাঙা চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায়। সেইখানেই মুখথুবড়ে শুয়ে আছে যমুনা।

—এই ওঠ্—ওঠ্—ওঠ্ না হারামজাদী! দরজা খোলা রেখে এইভাবে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস!

যমুনার সাড়া এল না। কালাচাঁদের পায়ের গুঁতোয় সমস্ত শরীরটা একবার নড়ে উঠল কেবল। আর তখনি একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে মুখে, চাঁদের বিবর্ণ আলোয় দেখল খানিকটা তরল জিনিস লেপটে আছে যমুনার সর্বাঙ্গে—সারা বারান্দায়।

ঘরের বারান্দায় মিটমিট করছে লণ্ঠন। পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিল কালাচাঁদ, তারপর সেটা নিয়ে যমুনার মুখের ওপর একবার ঝুঁকে পড়েই দু'হাত পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দুটো সাদা পর্দা নেমে এসেছে যমুনার খোলা চোখে—যেন মরা পাখীর চোখ। ঠোঁটের দুপাশে গলায় বুকে বমি চিকচিক করছে এখনো।

কলেরা।

কখন বারকয়েক ভেদবমি করে এই বারান্দার ওপরেই মুখথুবড়ে মরেছে যমুনা। কালাচাঁদকে ছুটি দিয়ে গেছে চিরকালের মতো। আর কাঁদবে না, বাধা দেবে না, বারণ

করবে না কোনোদিন।

চক্রবর্তীর রক্ত দেখে যেমন হয়েছিল, তেমনি আর একবার মাথাটা ঘুরে গেল কালাচাঁদের। একদিনে দুবার। অন্ধের মতো বসে পড়ল সেই দুর্গন্ধ ময়লাগুলোর ওপর। ঘরের ভেতর ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেটা, শুকনো কাতর গলায়। ওর খিদে পেয়েছে—মায়ের দুধ চায় এখন।

॥ ৪ ॥

ক্রমশই দূর আকাশের একেবারে শেষ সীমায় বন্দরের আলোগুলো অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে এল। মিঠাইয়ের দোকানে যে বড় পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্পটা জ্বলছিল, সেটা পর্যন্ত একটা তারা হয়ে গেল কেবল। তারপরেই নীরেট অন্ধকার আর অতল গহীন পদ্মা ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে দেখবার মতো কিছুই রইল না।

উজানের মুখে শিরশিরিয়ে খানিক বাতাস দিচ্ছিল, তবু স্রোতের একরোখা টানে নৌকো এগিয়ে চলল সামনের দিকেই। পদ্মার ওপর কোনাকুনি পাড়ি জমালে লক্ষ্মীপুরের বাজার, সেখান থেকে কুমারহাটির খাল বেয়ে আরো ঘণ্টাখানেকের পথ। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বাড়ি পৌছে যাব—মথুরানাথ ঘোষাল ভাবল।

বিশাল পদ্মা—মাথার ওপর তারা-জ্বলা বিরাট আকাশ। মাঝখানে অন্ধকারের কালো পর্দা এই দুটোকে যেন একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। ওপরের তারারা স্থির, নিচে পদ্মার জলে লক্ষ লক্ষ তারা নেচে উঠছে একসঙ্গে, ঠিকরে পড়ছে, ছিটকে যাচ্ছে। স্রোতের মুখে ভেসে-যাওয়া পচা কচুরিপানার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে—এক-একটা কচুরির ঝাঁক পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পচা মড়ার মতো। দাঁড় টানা আর ফেলার আওয়াজ উঠছে তালে তালে—তর-তর করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। অন্ধকারে যাদের চোখ ভাম-বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল হয়ে যায়, সেই মাঝিরাও কপালে হাত রেখে, একাগ্রভাবে তাকিয়ে—এপার-ওপারের একটা গাছপালার আভাস পাচ্ছে না। এ বছর বান ডেকেছে অস্বাভাবিক, ক্ষ্যাপা পদ্মা মাত্রা ছাড়িয়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে।

অনেকটা আন্দাজ, অনেকখানি অভ্যাস আর রক্তের সংস্কারের ওপর ভরসা রেখে মাঝিরা পাড়ি জমিয়েছে। একবার ওপারের ডাঙা ধরতে পারলে লক্ষ্মীপুরের বাজার খুঁজে নিতে আর কষ্ট হবে না। তবু মনের ভেতর অনিশ্চিত অবস্থা একটা আছেই। আর সেইটে কাটাবার জন্যে একজন গান ধরেছে ঃ

কোন্ দেশেতে গেলা বন্ধু
পাথার দিয়া পাড়ি,
আমার সাথে দিয়া গেলা
জীবন-ভরা আড়ি রে—

যে দুজন দাঁড় টানছিল, তাদের একজন মাঝপথে থামিয়ে দিলে গানটাকে।

—একটু সামাল ভাই—খেয়াল থাকে যেন। বড় পাকটা অনেক নৌকো গিলেছে এবার।

হালের মাঝিই গান ধরেছিল। সে বললে, ভয় নেই—ভয় নেই—টেনে যা। সে আরো ঢের দক্ষিণে, অনেক নীচুতে।

---ভয় নেই, ভরসাও নেই!

—আমার হাল ঠিক আছে—হালের মাঝি অভয় দিলে ঃ নিজেদের কাজ করে যা তোরা।

মথুরানাথ ঘোষাল ছইয়ের বাইরে বসে হুঁকো টানছিল। এই রাতে—এমন দুরন্ত পদ্মায় পাড়ি দেবার ইচ্ছে তার বিশেষ ছিল তা নয়। কিন্তু বন্দরে দু-তিন দিন আটকে পড়তে হল। ওদিকে কাল থেকে ভাগীদারেরা গোলায় ধান তুলতে থাকবে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে নজর না রাখলে ঠিক বোকা বুঝিয়ে যাবে বউ-ছেলেকে। তাই আজ রাতে না ফিরলেই তার নয়।

কিন্তু মাঝখানে ভাবনায় বাধা পড়ল মথুরার।

অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে তার চোখের দৃষ্টি এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট আর স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তারাজ্বলা আকাশের ছায়া পদ্মার ঘোলা জলের ওপর পড়ে একটা চঞ্চল আলোর দীপ্তি যেন নেচে উঠছিল, ছুটন্ত স্রোতের ওপর কাঁপছিল। সেই আলোয় একটা কিসের ওপর যেন মথুরার চোখ পড়ল।

একখানা নৌকো আসছে না এদিক পানে?

পেছন ফিরে যারা দাঁড় টানছিল, তারা দেখতে পায়নি। কিন্তু হালের মাঝির ভাম-বেড়ালের মতো জ্বলন্ত সজাগ চোখ ঠিকই লক্ষ্য করেছিল। মনের ভেতর ছায়া ঘনাচ্ছিল তার।

---ঠিকই বলেছেন কর্তা। বড় একটা জেলেডিঙির মতো এগিয়ে আসছে তরতরিয়ে। কিন্তু আলো নেই কেন? এই রাত্তিরে যেভাবে পাড়ি মেরে এগিয়ে আসছে—

মাঝপথেই সে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে গলা বুক শুকিয়ে উঠল মথুরার।

—হ্যাঁরে, এ তল্লাটে তো কোনো ভয়ডর ছিল না!

—একেবারে যে নেই তাই বা কি করে বলি কর্তা? দিন-বারো আগেই মাইল সাতেক উজানে একটা বড় রকম ডাকাতি হয়ে গেছে!

—জলপুলিস কী করে?

---ঘুরে তো বেড়ায়। কিন্তু এত বড় গাঙ। তারপর কে কোন্‌দিক দিয়ে, কোন্‌ খাল বেয়ে সুট করে সরে পড়ে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে! শয়তানের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বাবু?

—বলিস কী!—মথুরার জিভটা কে যেন ভেতর থেকে টানতে লাগল। রাত্রির এই ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়াতে সারা গা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরিয়ে এল। ভাঙা গলায় বললে, হাঁকডাক করব?

দাঁড়ের মাঝিরা দাঁড় বন্ধ করে ঝুঁকে বসল সামনের দিকে। নীরস গলায় একজন বললে, এত রাত্তিরে মাঝগাঙে চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ সাড়া দেবে না কর্তা। এ বড় বিষম ঠাঁই। ধারে-কাছে দু-একখানা এক-মাল্লাই থাকলেও এখন তারা কিছুতেই কাছে ভিড়বে না।

হালের লোকটি নড়েচড়ে বসল। পদ্মার মাঝি, রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। সে বললে, লগি বাগিয়ে ধর মকবুল। যদি ডাকাতই হয় একটা মোকাবেলা করে ছাড়ব।

মকবুল সংক্ষেপে শান্ত গলায় বললে, খেপেছ ইয়াকুব চাচা!

সত্যি কথা। কী স্বার্থ আছে তাদের? সামান্য দু-একটি ময়লা জামাকাপড়, এক-আধটা তেলচিটে বালিশ, হুঁকো আর আগুনের মালসা, রান্নার মাটির হাঁড়ি আর কলাইকরা বাসন, সঙ্গে দু চার-ছ' গণ্ডা পয়সা বা এক-আধটা টাকা—এর লোভে কেউ আর ডাকাতি করতে আসবে না, মজুরিই পোষাবে না তার। অনর্থক পরের জন্যে মারামারি করতে গিয়ে তারা নিজেদের মরণকে ডেকে আনবে কেন?

এর মধ্যেই অন্ধকারে নৌকোটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। বারো-চৌদ্দটি কালো কালো মাথা—বারো-চৌদ্দটি হাতের দাঁড়ে জলের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে বাইচের নৌকোর মতো। ছিপ-নৌকো। এত রাত্রে—এই সময় কোন্ বাইচ খেলায় তারা বেরিয়ে পড়েছে, সেটা বুঝতে কারো আর এক মিনিটও সময় লাগল না। মথুরা ঘোষাল গেঞ্জির তলায় কাঁপা আঙুল ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল, কিন্তু সময় বুঝে পৈতের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ছিপ-নৌকো প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ইয়াকুব অনর্থক জেনেও হাঁক ছাড়ল ঃ এই নাও সামলে আপন ডাইন—

আপন ডাইনে নৌকো সামলাবার কোনো গরজ দেখা গেল না তাদের। তার বদলে বেশ মোলায়েম গলায় কে যেন জানতে চাইল ঃ নৌকো কোথায় যাবে হে?

—কুমারহাটি।

—কুমারহাটি? বেশ, বেশ। তা একটু তামাক খাওয়াও না মিঞা ভাই। গলা শুকিয়ে গেছে।

দুচোখ বুজে বসে রইল মথুরা ঘোষাল—কানের মধ্যে তার ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। সব নিয়মমাফিক চলছে—এমনি ভাবেই ওরা এসে আলাপ জমায়।

মকবুল গলা চড়িয়ে বললে, না—তামাক আমাদের নেই।

ও নৌকো থেকে হাসির আওয়াজ এল। মিষ্টি খিলখিল হাসি।

—আছে শেখের পো, আছে! কেন আর মিছে কথা বাড়াচ্ছ বলো দেখি! ভালো মানুষের মতো হুঁকোটা বাড়িয়ে দাও—এক ছিলিম টেনে নিয়ে চলে যাই।

মকবুল বোধ হয় একটা অসম্ভব আশায় হুঁকোই খুঁজতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খট্‌খটাং করে ছিপ এসে নৌকোর গায়ে ভিড়ে গেল। টলমল করে দুলে উঠল নৌকো।

ইয়াকুব চেঁচিয়ে উঠল ঃ গায়ে এসে পড়লে যে, তফাৎ যাও—তফাৎ যাও!

—থামো হে সুমুন্দি, আস্তে। ভালো কথায় কান দেবার পাত্তর তো নও, তাই বাঁকা আঙুলেই ঘি ওঠাতে হবে। আচ্ছা, তামাক তোমাদের আর দিতে হবে না, আমরাই খুঁজে নিচ্ছি।

কথাটা বলেই তারা আর সময় দিলে না। চোখের পলকে তিন-চারজন লোক প্রায় একসঙ্গেই এই নৌকোয় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একদিকে কাত হয়ে নৌকোটা সোজা হয়ে উঠতে-না-উঠতেই দেখা গেল—একখানা বিরাট রামদার উজ্জ্বল চেহারা—তিন-চারখানা শড়কির ক্ষুধার্ত ফলক। অন্ধকার পদ্মার অতল থেকে একদল প্রেত এসে যেন তাদের সামনে দাঁড়াল।

রামদা যার হাতে ছিল, কালভৈরবের মতো তার চেহারা। মাথার বিরাট বাবরি

নাচিয়ে, রামদাখানাকে বারকয়েক শূন্যে ভেঁজে নিয়ে সে মথুরাকে বললে, তাড়াতাড়ি বের করে দাও সব! একটু সোরগোল তুলেছ কি ধড় থেকে মাথা তফাৎ করে দেব!

মথুরা অস্পষ্টভাবে কী একটা হাউমাউ করে বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলে, ঠিক তার হৃৎপিণ্ডের ওপরটিতে বুকের চামড়ায় পিনের মতো খোঁচার একটুখানি মৃদু যন্ত্রণা। শড়কির একটা ধারালো ফলা অত্যন্ত পরিষ্কার অর্থ নিয়ে জায়গাটি স্পর্শ করে আছে।

—চুপ। নইলে এখুনি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলব।

মথুরা যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত শব্দ করে ফেলবার মতো সাহস তার নেই।

লুট শুরু হয়ে গেল। বাক্স-বিছানা থেকে শুরু করে জার্মান সিল্‌ভারের—পান খাওয়ার ছোট কৌটোটি পর্যন্ত বাদ পড়ল না। স্পর্শ করল না কেবল মাঝিদের ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা, গোটা দুই লোহার কড়াই আর তিন-চারখানা কলাই করা এনামেলের থালা।

সমস্ত চেষ্টা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মাঝিরা গলুইয়ের উপর নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিল। যেন নিতান্তই দর্শকের দল, যেন কিছুই তাদের করবার নেই। হঠাৎ যেন মকবুলের জ্ঞান ফিরে এল। চমকে জিজ্ঞেস করল ঃ এমন করে নৌকো ছুটেছে কেন ইয়াকুব চাচা? জলের এমন টান কেন?

টান!

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল সকলের। সত্যিই তো! দূরন্ত একটা স্রোতের টানে দুখানা নৌকোই যেন ঝড়ের পালে ছুটে চলেছে। এ স্বাভাবিক টান নয়—পদ্মার স্রোতের চাইতে অনেক প্রখর—অনেক দুরন্ত এর শক্তি!

মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল সব। শিকার আর শিকারী দু দলের মধ্যেই একসঙ্গে হাহাকার উঠল একটা। রামদা হাতে করে যে এতক্ষণ সকলকে শাসাচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ তার হাতখানা ঝুলে পড়ল দুর্বলভাবে। ভয়-জড়ানো গলায় সে বলল, বড় পাকের টান!

বড় পাকের টান! পদ্মার এই অঞ্চলে সে পাকের খ্যাতি কে না জানে! চুম্বক যেমন অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে টেনে আনে, তেমনি এই বড় পাকের টানও বহু দূর থেকে নৌকো বা যা কিছু পায়—সকলের অজ্ঞাতে বুভুক্ষু জলচক্রের ভেতর সেগুলিকে গ্রাস করতে নিয়ে আসে। সাপের চোখের মতো তার আকর্ষণ-প্রভাব। হুঁশিয়ার মাঝিরা দূর থেকে সে প্রভাব অনুভব করে প্রাণ বাঁচায়, যারা পারে না সেই অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে মোহমুগ্ধের মতো ছুটে আসে, বিশাল ঘূর্ণি প্রচণ্ড কয়েকটি আবর্তে বারকয়েক তাদের ঘুরিয়ে শোঁ করে অতলগর্ভে তলিয়ে নেয়—জলের ওপর কোনোখানে এতটুকু চিহ্ন রেখে যায় না। তারপর হয়তো তিন মাইল দূরের বাঁকের মুখে কয়েকটা দেহ বা একখানা উবুড়-করা নৌকো ভেসে ওঠে। এ নিয়তির টান—এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। এই পাকের টানে একবার পড়লে কোনো মাঝির সাধ্য নেই যে নৌকো কিংবা প্রাণ বাঁচিয়ে আসতে পারে।

ডাকাতির উত্তেজনায় হোক কিংবা অসাবধানেই হোক—কোন্ অশুভক্ষণে যে নৌকো পাকের টানের মধ্যে এসে পড়েছে, কেউ তা বুঝতে পারেনি। যখন পারল তখন আর সময় ছিল না। নৌকোর গায়ে ঘা দিয়ে দিয়ে পদ্মার জল বাজতে লাগল খানিকটা ক্রূর

কুৎসিত হাসির মতো।

লুটের মাল যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রইল। শড়কি, বল্লম, রামদা ফেলে দিয়ে দু দলই দাঁড় টানতে লাগল পাগলের মতো। ছিঁড়ে যেতে লাগল হাতের পেশী, ফেটে যেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। কিন্তু প্রকৃতির এই অসম্ভব শক্তির কাছে মানুষের সমস্ত চেষ্টা হার মানল। এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে এল নৌকো। উজানের বাতাসটুকুও পড়ে গেছে —পালের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আশা নেই।

নৌকো আর বাঁচবে না।

এবার ঝুপঝাপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। নৌকোর যা হওয়ার হোক—কোনোমতে বাহুবলে যদি আত্মরক্ষা করা যায়, যদি চড়া কিংবা অন্য কিছুর আকস্মিক আশ্রয় জুটে যায়। নৌকো দুখানা উল্কার গতিতে ছুটে চলে গেল, সেই অনিবার্য মৃত্যুচক্রের দিকেই।

॥ ৫ ॥

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু স্রোতের টানে কে যে কোন্ দিকে বুদ্বুদের মতো নিশ্চিহ্ন হল তার আর সন্ধানই মিলল না। সে আকর্ষণে মথুরা ঘোষালও কুটোর মতো ঘূর্ণির রাক্ষসগর্ভের দিকে ভেসে চলল। আগেই প্রায় মরে গিয়েছিল সে—এখন আচ্ছন্ন চেতনার ভেতর তার মনে হতে লাগল পেছন থেকে মরণের দূতেরা লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা হাতে তাকে পাতালের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে চলেছে, একবিন্দু করুণা নেই তাদের। জলের গর্জন ক্রমশ একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর আক্রোশ-ধ্বনির মতো বেড়ে উঠছে—পাকটা আর কত দূরে?

সেই সময় হঠাৎ জলের ভেতরে কিসে পা আটকালো মথুরার। কি যেন একটা জিনিস স্থির হয়ে আছে এই ভয়ঙ্কর স্রোতের ভেতরেও। দুহাতে সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল মথুরা, টের পেলো পাড় ভেঙে পড়া একটা নারকেল গাছের আশ্রয় পেয়েছে সে। পাড় কবে ভেঙেছে, পদ্মাতীরের সীমানা কত দূর সরিয়ে দিয়েছে ঠিক নেই, তবু অল্প গভীর এখানকার জলে—ঘূর্ণির প্রবল টানকে উপেক্ষা করেও মাত্র মাথাটুকু জাগিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আজ নারিকেল গাছটা।

পিঠের ওপর দিয়ে একটানা স্রোত। আশ্রয় পেয়েও অস্বস্তি বোধ করছিল মথুরা। নিশ্চিত মরণের ভেতর বাঁচার এতটুকু আশা মনকে চাঙ্গা করে তুলল অনেকখানি। শরীর ক্রমশ অচল হয়ে আসছে, গায়ে যে প্রচুর শক্তি অবশিষ্ট আছে তা-ও নয়। আর একটু দুর্বল হয়ে পড়লে নিঃসন্দেহে আত্মসমর্পণ করতে হবে নদীর করুণার সামনে।

অবশিষ্ট শক্তিটুকু কোনোমতে গুছিয়ে নিয়ে মথুরা বহুকষ্টে নারকেল গাছটার আগায় এসে পৌছুল। জল থেকে মাথাটা হাততিনেক মাত্র ওপরে। কিন্তু মাথা বলতে কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। কালক্রমে শুকিয়ে শুকিয়ে তারা পদ্মার জলে ঝরে পড়েছে; শুধু দু একটা শুকনো ডাঁটা ন্যাড়া মাথার ওপর কাঁটার মুকুটের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নক্ষত্র-ছাওয়া আকাশে এতক্ষণ কেবল অন্ধকারের উৎসব চলছিল। কিন্তু এতক্ষণে সেটা ফিকে হয়ে এল। ভাঙা ভাঙা হয়ে টুকরো মেঘের ওপার থেকে চাঁদ উঠল এতক্ষণে। খণ্ড চাঁদ—নিষ্প্রভ আলো—তবু সেই ম্লান করুণ আলোয় পদ্মার এই নিশীথ রূপটাকে আরো রহস্যময়—আরো ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল। নারকেলগাছটা থরথর করে উঠছে

স্রোতের বেগে, দীর্ঘকাল এই টান সয়ে জলের ভেতর ডুবে থেকে তার দাঁড়াবার শক্তিও কমে আসছে। ক্রমশ তিল তিল করে ক্ষয় হচ্ছে তার তলার মাটি, যে কোনো সময়ে উপড়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এত কথা ভাববার সময় মথুরার ছিল না। শেষ অবলম্বনটুকু দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে অজ্ঞানের মতো পড়ে রইল—তার চারদিকে মুখের শিকার ছেড়ে যাওয়া কালনাগিনী আক্রোশে গজ্‌রে চলল।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়, হঠাৎ সে টের পেলো নারকেলগাছটায় জোরালো ঝাঁকুনি লেগেছে একটা। চমকে তাকিয়ে দেখল স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে আর একটি মানুষও তারই মতো এই গাছটাকে আঁকড়ে ধরেছে। লোকটার সারা শরীর জলের মধ্যে, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা আর দুখানি হাত মাত্র ভেসে আছে জলের ওপর।

একবারের জন্য শিউরে উঠে পরক্ষণেই হাসি ফুটে উঠল মথুরার মুখে। একেই বলে বিধাতার ঠাট্টা! রামদা মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই এই লোকটাই না এতক্ষণ শাসাচ্ছিল তাদের! এতক্ষণ জলে ভিজলেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। তার ঝাঁকরা বাবরি আর বুনো মোষের মতো শরীরটা একবার দেখলে আর ভোলবার নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটার এত পরাক্রম চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মথুরা শব্দ করে হেসে উঠল।

লোকটা চমকালো—দারুণভাবে চমকালো। যেন মাথার ওপর কালো পদ্মার প্রেতাত্মার হাসি শুনেছে সে। আতঙ্কে বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল—চাঁদের আলোয় চিনতেও পারল মথুরাকে।

—ওঃ, তুমি!

সমস্ত ভয় আর ভাবনার একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছেছে মথুরা। এখন আর ঘাবড়াবার মতো কিছু নেই। লোকটার দশা দেখে ভারী কৌতুক বোধ হল তার।

ঠাট্টা করে মথুরা বললে, তোমাদেরই দয়ায় এখানে আসতে হল বাবা। কিন্তু যাত্রাটা দেখছি তোমাদেরও শুভ হয়নি।

—নাঃ!—একটু চুপ করে থেকে লোকটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলল। পদ্মার হাওয়ায় আর কলধ্বনিতে নিঃশ্বাসের আওয়াজটা মথুরা শুনতে পেল না। লোকটা আবার বললে, ছ'মাস আগেও জেল খেটে বেরিয়েছি, দু'বছর। কিন্তু এমন বিপদে আর কখনো পড়িনি!

মথুরা চুপ করে রইল।

লোকটা বলে চলল, কাল পূর্ণ হয়েছিল আর কি। ধর্মের ঢাক হাওয়ায় বাজে কিনা। বউটা বলত—এত পাপ ধর্মে সইবে না। এমন কাজ কোরোনি। আমি তার কথা শুনিনি। মরণ তাকে টেনে নিলে, দু'-তিন বছর ভালো হয়ে থাকলুম, তারপর আবার মানুষ মারার জন্যে পদ্মা ডাক পাঠালো ঃ মায়ের কাছে অনেক বলি দিয়েছি—এবার আমাকেই বলি নেবে।

আশ্চর্য—কান্নায় ভরা লোকটার গলা। একটা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর ডাকাত কোথাও নেই—নিতান্তই সাধারণ মানুষ। মরণের সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর থেকে তার হাহাকার উঠছে।

মথুরা শুনতে লাগল।

—ছেলেটাকে মানুষ করতে চেয়েছিলুম চাষী গেরস্তর মতো, লাঙল ঠেলে—মাটি কুপিয়ে। বৌয়ের শেষ মিনতি। পারলুম না। কিছুদিন পরেই আবার ওরা আমায় টানতে লাগল। বললে, চল্ কালাচাঁদ—চল্! আবার ধরিয়ে দিলে ডাকাতির নেশা। ছেলের কথা ভাবলুম না—বৌয়ের শেষ কথা ভুলে গেলুম। কিন্তু এবার দারোগা দলকে দল ধরে নিয়ে গেল। তিন বছর ফাটক খেটে এলুম।

—তার পরেও আবার বেরিয়েছিলে ডাকাতি করতে?

—ও যে রক্তের টান বাবু—ওখানেও যে সর্বনাশা বড় পাকের টান। নদীর ওপর কালো হয়ে রাত নামলে, পদ্মার জল খাঁড়া দুলিয়ে ডাক পাঠালে—হু-হু করে হাওয়ার তুফান বইলে তখন যে আর কিছুতেই ঘরে থাকা যায় না। অনেক চেষ্টা করেছি, দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছি, তারপর নিজেই দড়ি কেটে পালিয়ে গেছি। এতদিনে সব মিটল। শুধু ছেলেটাকে যদি—

কালাচাঁদ থামল। পদ্মা গর্জন করে চলল একটানা। ঘুমের ঘোরে কোন্ দূরের বাসা থেকে ভুলে বেরিয়ে এসে একটা গাংচিল কেঁদে চলে গেল।

জল থেকে ওপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল কালাচাঁদ—কিন্তু বসবার জায়গা কোথাও নেই। বৃষ্টি-বাদলায় শ্যাওলা পড়ে পড়ে গাছটা পেছল হয়ে আছে—বার বার হাত ফসকে যেতে চায়। আবার ভালো জায়গাটি মথুরা দখল করে বসে আছে, একবার হতাশভাবে কালাচাঁদ সেদিকে তাকিয়ে দেখল। তার পা দুখানা তখনো জলের ভেতর—বড় পাকের টান হিংস্রভাবে সে দুখানাকে যেন শরীর থেকে ছিঁড়ে নিতে চাইছে। হাতের মুঠা একটু আলগা হলেই সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেবে নিজের ঘুরন্ত রাক্ষসগর্ভের মাঝখানে।

কালাচাঁদ আবার বললে, তোমার বাড়ি তো কুমারহাটি—না?

—হুঁ।

—আমার হল মাদারঘাটা। একই দেশের মানুষ তাহলে।

—সে তো বটেই।—একটু খোঁচা দেওয়ার লোভটা সামলাতে পারল না ঃ না হলে আর সর্বনাশ করতে আসবে কেন আমার?

জ্যোৎস্না আর একটু উজ্জ্বল হলে দেখা যেত, কালাচাঁদের কালো মুখ লজ্জায় আরো কালো হয়ে উঠেছে।

—আর লজ্জা দিয়ো না ও-কথা বলে। শাস্তি তো আমার শুরু হয়েছে। নামটা কী?

মথুরা নাম জানালো।

—ঘোষাল? ব্রাহ্মণ?—কালাচাঁদ জিভ কাটল ঃ ব্রহ্মস্ব লুট করতে গিয়েছিলুম—হবেই তো—হবেই তো।—নিজে-নিজেই একবার মাথা নাড়ল ঃ এমনিই হয়।

—আর কখনো ব্রহ্মস্ব লুট করোনি বোধ হয়?

—না জেনে ক'বার করেছি বলতে পারিনে। কিন্তু জানিতে একবার—কালাচাঁদ থামল। চক্রবর্তীর কবন্ধ থেকে একরাশ রক্ত যেন ফিনকি দিয়ে চোখেমুখে ছিটকে পড়ল তার। একটু চুপ করে থেকেই বললে—দণ্ড হাতে-হাতেই পেয়েছিলুম। ঘরে ফিরে দেখি বৌটা মরে কাঠ হয়ে আছে। কলেরা।

আবার চুপ। পদ্মার গর্জন—ঘূর্ণির একটা ক্রুদ্ধ আহ্বান। কালো আকাশ আর কালো

জল—দুয়ের মাঝখানে খানিকটা কাকজ্যোৎস্না জ্বলছে কুয়াশার একটা পর্দার মতো। পাখার শব্দ বাজিয়ে উড়ে চলেছে গোটাকয়েক বাদুড়, মরা জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়া ওদের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। নীচে জলের অবিশ্রান্ত গতি—সময়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কলরোল ছুটেছে দ্বৈত-সঙ্গীতে। কাল যেমন করে সব ভেঙে এগিয়ে যায়, ঠিক সেই একই নিয়মে ছুটেছে কীর্তিনাশা পদ্মা—দুই কূলে তার ভাঙনের ডমরু বাজছে।

মানুষের দেহমন দুই-ই আশ্চর্য! সব অবস্থার সঙ্গেই যেমন করে হোক মানিয়ে নিতে পারে। তাই এর মধ্যেও মথুরার চেতনা অসাড় হয়ে আসছিল। চট করে ঘোর ভেঙে গেল। সত্যি সত্যিই ঝিমুচ্ছে নাকি সে! একবার হাত খুলে পড়ে গেলেই আর দেখতে হবে না—একটা টানেই পদ্মা একেবারে পনেরো-ষোল হাত দূরে নিয়ে চলে যাবে। তখন আর ফিরে আসা মানুষ কেন, দৈত্যের পক্ষেও সম্ভব নয়।

চোখ মেলে মথুরা চেয়ে দেখল। তেমনি জলের ভিতর বারো আনা শরীরটাকে ডুবিয়ে প্রাণপণে গাছটাকে আঁকড়ে আছে কালাচাঁদ। চাঁদ আরো খানিকটা উঠে এসেছে—প্রায় মাথার ওপর। সেই আলোয় মথুরা আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেলো তাকে। ক্লান্তি, যন্ত্রণা আর ভয় সমস্ত মুখের ওপর থমকে আছে তার—বেঁচে থেকেও যেন নরকবাস করছে।

—কেমন আছো হে কালাচাঁদ?

—ভালো নেই ঠাকুরমশাই।—ক্লিষ্ট গলায় জবাব এল ঃ জলে পড়বার আগেই পাঁজরাতে একটা চোট পেয়েছিলাম। ভিজে ভিজে আর জোর পাচ্ছিনে গায়ে। বেশিক্ষণ যে ধরে থাকতে পারব, সে ভরসা আর নেই।

—ওপরে উঠতে পারবে?

ওপরে দুজনের জায়গা হওয়ার কথা নয়; কিন্তু এই চরম বিপদে পরম শত্রুকে মথুরা ডাক না দিয়ে থাকতে পারল না। লোকটার জন্যে এখন তার কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু কালাচাঁদের মনও বদলে গেছে এখন।

—না ঠাকুরমশাই, দুজনের জায়গা হবে না ওখানে। তা ছাড়া শরীরেও এমন বল নেই যে এতটুকু উঠে আসতে পারি। হাত-পা আমার অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

—তাহলে?

—আর উপায় নেই ঠাকুর, মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে। তার আগে—

বার-বার-বারাং—

একটা ভয়ঙ্কর শব্দ চারদিক কাঁপিয়ে জেগে উঠল, কোথায় যেন তোলপাড় হয়ে উঠল জল। পদ্মা ভাঙছে—ভেঙে চলেছে। মানুষের নীড়, পৃথিবীর মাটি। কোথায় যেন মস্ত একটা ভাঙন নামল কাছাকাছিই।

দুজনেই কান পেতে কিছুক্ষণ ধরে শুনল শব্দটা। আবার পাড়ি ভাঙল। হয়তো কারো ঘর গেল, কারো জমি গেল, কারো সর্বস্ব হারিয়ে গেল ওর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে আবার নিঃশ্বাস ফেলল কালাচাঁদ।

—তুমি আমার দেশের মানুষ ঠাকুরমশাই, মরণের আগে তোমার চরণে নিবেদন আছে একটা।

মথুরার কষ্ট হল।

—মরবে কেন হে? অনেকক্ষণ তো কাটালে। আর ঘণ্টাতিনেকের বেশি রাত্তির নেই। এর মধ্যে যদি কোনো জাহাজ এসে পড়ে তো ভালোই, নইলে দিনের বেলা যে করে হোক উপায় একটা হবেই। ভগবান আছেন।

—আমার জন্যে নেই।—কালাচাঁদ হাসতে চেষ্টা করল ঃ তা ছাড়া তিন ঘণ্টা! আর পারছিনে ঠাকুরমশাই, আমার হয়ে এসেছে। আর ন'-দশ বছরের একটা ছেলে আছে সংসারে, সে পড়ে আছে রতনগঞ্জে তার এক পিসির বাড়িতে। তুমি সেই পিসিকে এই গেঁজেটা দিয়ো, খানকয়েক মোহর আছে এতে। এ নিয়ে যেন আমার ছেলের নামে জমি কিনে রাখে—বড় হলে যেন আমার ছেলে চাষী হয়ে নিজের রোজগারের ফসল খেতে পারে। তা ছাড়া আরো বোলো, উত্তরের পোঁতায় দু'ঘটি—

হাত নামিয়ে গেঁজেটা তুলে নিলে মথুরা।

—উত্তরের পোঁতায় দু-ঘটি—

কিন্তু আর বলতে পারল না কালাচাঁদ। এক হাতে গেঁজেটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দুর্বল বাঁ হাতখানা কালাচাঁদের পিছলে গেল নারকেলগাছের গা থেকে। তারপরেই ছলাৎ করে শব্দ হল—যেন বড় একটা রুই মাছ উলাস্ দিয়ে উঠল জলের ওপর।

তাকিয়ে রইল মথুরা ঘোষাল। দেখল পদ্মার সেই দূরন্ত ঘূর্ণির টানে কালাচাঁদের ঝাঁকড়া মাথাটা ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল একবার।

—যমুনা ঠিকই বলেছিল ঠাকুরমশাই—মাথাটা ডুবে আবার ভেসে উঠল ঃ মা নয়, রাক্ষুসী। রক্ত খায়—

সেই শেষ কথা। জলে বুদ্বুদ মিলিয়ে গেল। আর যাওয়ার আগে সমস্ত বিশ্বাস এমন একজনের হাতে দিয়ে গেল—একটু আগে চোখ বুজে যাকে সে খুন করতে পারত!

সকালের আলো জাগল। জেগে উঠল পদ্মা—যে মা। যে ক্ষিদের ফসল দেয়, পিপাসার জল দেয়, যে পদ্মায় রঙিলা নাও ভাসিয়ে ভিনদেশিয়া বন্ধু দেশে ফিরে আসে। যে পদ্মার জলে কালাচাঁদের ছেলে ডিঙি বেয়ে ধান বেচতে যাবে লক্ষ্মীপুরার বাজারে।

একটা চলতি স্টীমার এসে নারকেলগাছের মাথা থেকে যখন অজ্ঞান অচৈতন্য মথুরা ঘোষালকে উদ্ধার করল, তখন তার হাতের মুঠোয় গেঁজেটা বজ্রশক্তিতে ধরা।

ধানশ্রী

॥ ১ ॥

বন্দরের ঘাট থেকে এক্সপ্রেস স্টীমার ছেড়ে চলে গেল।

সুধাকর মাঝি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল সেদিকে। জাহাজ তো নয়—একটা প্রকাণ্ড দৈত্য যেন। কীর্তনখোলার জল তোলপাড় করে, চারদিক ফেনায় ফেনাময় করে দিয়ে বাঁকের মুখে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুধু বহুক্ষণ ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগল সুধাকরের কেরায়া নৌকো।

কোথায় যায়—কত দূর-দূরান্ত থেকে আসে! এতবড় রাক্ষসী নদীটাকে গ্রাহ্যও করে না। রোদ-বৃষ্টি-তুফান—কোনোটাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। উত্তরের আকাশে মেঘ জমে—

নদীর বুকে কাজল-বরণ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে—ঢেউ উলাস্ দেয়—হুঁশিয়ার মাঝিরা সঙ্গে সঙ্গে কূলের দিকে পাড়ি জমায়। কিন্তু ওই জাহাজটা নির্বিকার। ও জানে—পাগলা নদীর মাতাল ঢেউ মিথ্যে আক্রোশেই বার বার ওর গায়ে এসে ভেঙে পড়বে—এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না।

জাহাজটা আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কানে আসছে দুটো প্রকাণ্ড চাকার হুস্-হুস্ করে জল ভাঙবার আওয়াজ—শোনা যাচ্ছে বাঁশির গম্ভীর সুর। সুধাকর অন্যমনস্ক হয়ে রইল। ওই জাহাজটার দিকে তাকালে ভারী ছোট মনে হয় নিজের জীবনকে—মনে হয় ভারী সংকীর্ণ। কখনো কখনো ইচ্ছে করে জাহাজের খালাসী হয়ে চলে যায় সে—যেখানে হোক, যত দূরেই হোক।

সুধাকরের দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

এইবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে। অধিকাংশ কেরায়া নৌকোই তেমনি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। সোয়ারী জোটেনি। পূজোর মরশুম শেষ হয়ে গেছে। এখন আর ঘরমুখো যাত্রীর ভিড় নেই—সব ফিরে চলেছে কলকাতার দিকে। স্টীমার থেকে মাত্র সামান্য ক'টি লোক নেমেছিল—অধিকাংশই বন্দরের মানুষ। দূরের কেরায়া নেই বললেই চলে।

অতএব এখন আর হাতে কোনো কাজ নেই। চুপচাপ ঘাটেই অপেক্ষা করা। এর মধ্যে যাত্রী জোটে তো ভালোই, নইলে সন্ধ্যার 'মেল' পর্যন্ত দেখে তবে ঘরে ফেরা।

গোটাকয়েক ইলিশ মাছের নৌকো আসছিল ঘাটের দিকে। সুধাকর ডাকল ঃ আছে?

—আছে।

—দরদাম কি রকম?

—বারো আনা—চৌদ্দ আনা—এক টাকা।

বলে কি! একটা ইলিশ মাছ বারো আনা! মগের মুল্লুক ছাড়া একে আর কী বলা যায়!

—কিসের মাছ তোমার? সোনার না রূপোর?—সুধাকর রসিকতা করতে চেষ্টা করল।

—তুমি আদার ব্যাপারী, সে খোঁজে তোমার কী দরকার?—চটাং করে উত্তর এলো ইলিশ মাছের নৌকো থেকে।

মুখের মতো জবাব পেয়ে চুপ করে গেল সুধাকর। তারপর বিড়বিড় করে বকতে লাগল ঃ ইস্—বারো আনায় ইলিশ মাছ বেচবেন! সেদিন আর নেই—কলকাতার বাবুরা সব ফিরে গেছে এখন। ওই ইলিশ মাছ নৌকোতেই পচবে—এ আমি বলে দিচ্ছি।

তা না হয় পচুক, কিন্তু তাতে সুধাকরের কোনো সান্ত্বনা নেই। আপাতত রান্না চাপাতে হবে এবং কিছু মাছ দরকার। কিন্তু নৌকোর দর শুনেই আর গঞ্জের দিকে এগোতে সাহস হচ্ছে না। এক টাকা পাঁচ-সিকের কমে মাছ ছোঁয়াই যাবে না হয়তো। তার চেয়ে—

গলুইয়ের পাটাতন সরালো সুধাকর। ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে একটা আওয়াজ উঠল সেখান থেকে—নড়ে উঠল বেজির মতো একটা মেটে রঙের প্রাণী। উদ্‌বেড়াল একটা।

—আয় জুয়ান (জোয়ান), আয়—উদ্‌বেড়ালের গলার লম্বা দড়িটা ধরে টান দিলে সুধাকর। উদ্‌টা উঠে এল পাটাতনের ওপর। পোষা বেড়ালের মতোই সুধাকরের চারদিকে সে ঘুরতে লাগল—মাথা ঘষতে লাগল তার হাঁটুতে। সুধাকর একটা সঙ্কেত করলে, যা—

উদ্ আর অপেক্ষা করলে না। ওস্তাদ সাঁতারুর মতো ঝুপ করে ঘোলাটে নীল জলের

মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েকটা চ্যালা মাছ ঝাঁক বেঁধে নৌকোর আশপাশে ঘুরছিল—একরাশ খইয়ের মতো চারদিকে সভয়ে ছিটকে পড়ল তারা। হাতের দড়িটা শক্ত করে ধরে জলের দিকে তাকিয়ে রইল সুধাকর। উদের মেটে রঙের শরীরটা কখনো জলের তলায় নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে—কখনো বা নিঃশ্বাস নেবার জন্যে এক-একবার ভেসে উঠছে ওপরে। সুধাকর অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকের একটা নৌকো থেকে মকবুল মাঝি ছিপ ফেলেছিল। বিরক্ত হয়ে ছিপ তুলে নিয়ে বললে, আবার উদ্ নামিয়েছ জলে? একটা মাছও ধরা যাবে না আর! সুধাকর জবাব দিল না, তার দৃষ্টি তখনো জলের দিকে। জলের তলায় উদ্ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো টান পড়ছে হাতের দড়িতে—কখনো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে তার আকর্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা হুটোপুটি টের পাওয়া গেল। সুধাকর রইল উৎকর্ণ হয়ে।

একটু পরেই উদ্ ভেসে উঠল জলের ওপর। তার ধারালো দাঁতে আন্দাজ একপো একটা রূপালি মাছ ছট্‌ফট্ করছে প্রাণপণে। হাত বাড়িয়ে জানোয়াবটার ভিজে মসৃণ শরীর সুধাকর তুলে নিলে নৌকোর ওপরে।

—শেষ পর্যন্ত বোয়াল মাছ ধরলি জুয়ান!

জুয়ান একবার মনিবের মুখের দিকে তাকালো। তারপর আবার জলে ঝাঁপ দেবার উদ্যোগ করল।

—থাক থাক, ওতেই হবে। গলার দড়িতে একটা ঝাঁকুনি দিলে সুধাকর।

পাটাতনের ওপর বসে উদ্ এবার নিজের শরীর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাতে লাগল সুধাকরের দিকে। সে দৃষ্টিতে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ।

—বিকেলে একটা ইলিশ ধরতে হবে—বুঝলি? বেশ বড় ইলিশ মাছ। তুই আর আমি ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব রাত্রে। বুঝলি তো?

উত্তরে জুয়ান মনিবের হাঁটুতে ভিজে মাথাটা ঘষে দিলে।

—কী মাছ আনল তোমার জুয়ান?—মকবুল মাঝির জিজ্ঞাসা শোনা গেল।

—বোয়াল। ভাগ নেবে নাকি?

—থাক। আমি একগণ্ডা ট্যাংরা ধরেছি।

উদ্‌কে খানিকটা কাঁচা মাছ কেটে দিয়ে তোলা-উনুন ধরিয়ে নিলে সুধাকর। বেলা বাড়ছে—জোয়ার আসছে নদীতে। ঘোলা জল ফুলে ফুলে ওদিকের ইঁটের ভাঁটা পর্যন্ত পৌঁছেছে—কেরায়া নৌকো দুলছে, স্টীমার ঘাটের পন্টুন দুলছে। গাংশালিক উড়ছে দল বেঁধে। মন্থর শান্ত গতিতে একটা ডেস্‌প্যাচ্ চলেছে মাঝনদী দিয়ে—এ ঘাটে ওটা ভিড়বে না। স্টীমার ঘাটের সামনে একটা মিঠাইয়ের দোকানের কাছে কুকুরে ঝগড়া করছে তারস্বরে।

শুধু সুধাকরের নয়—সব নৌকোতেই প্রায় রান্না চড়েছে এখন। জলের গন্ধ—কাদার গন্ধ—কাছ দিয়ে ভেসে যাওয়া একঝাঁক নিরাশ্রয় কচুরিপানার গন্ধ। তার সঙ্গে রসুন, মশলা আর ফুটন্ত ভাতের গন্ধ মিশে গেছে। রোদটা সম্পূর্ণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠবারও সুযোগ পাচ্ছে না—নদীর ভিজে হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে বার বার।

সুধাকর খেতে বসেছে, এমন সময় ডাঙা দিয়ে ঘুরে ওর নৌকোয় মকবুল এসে উঠল।

—কী, খাওয়া হয়নি এখনো?

—না, রান্না চাপাতে দেরি হল একটু। রসুনের ঝোল মাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে সুধাকর বললে, একটু বোসো ভাই। তামাক খাও।

মকবুল তামাকের সরঞ্জাম বের করে টিকে ধরাতে বসে গেল।

—এই হয়ে এল আমার—বড় বড় গ্রাস মাখতে লাগল সুধাকর।

—আস্তে আস্তে খাও না, ব্যস্ত হওয়ার কী আছে!—টিকেতে ফুঁ দিতে দিতে মকবুল বললে, বিকেলের আগে তো কোনো সোয়ারী পাওয়ার আশা নেই। খাও নিশ্চিন্ত হয়ে—

—হয়ে গেছে আমার—প্রায় চক্ষের পলকে পেতলের থালাখানা পরিষ্কার হয়ে গেল সুধাকরের। দুটি চারটি ভাতের অবশেষ সে নদীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলে—ভালো করে সেগুলো জলে পড়বার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে চ্যালা মাছ তা যেন লুফে নিতে লাগল।

থালা মেজে, হাঁড়ি-কড়াই গলুইয়ের ভেতরে সাজিয়ে রাখতে আরো সময় গেল খানিকটা। ততক্ষণে হুঁকোয় একটা শালপাতার নল গুঁজে তামাক টানতে শুরু করেছে মকবুল। মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া।

—কী হল? মেজাজ খারাপ নাকি?

নলটা খুলে নিয়ে সুধাকরের দিকে হুঁকো এগিয়ে দিলে মকবুল ঃ নাও।

কড়া দা-কাটা তামাকে টান দিয়ে চোখ দুটো প্রায় তৃপ্তিতে বুজে এল সুধাকরের। বেশ আমেজ লাগিয়ে দিয়েছে মকবুল—কল্‌কেতে গন্‌-গন্‌ করছে টিকের আগুন।

আয়েস জড়ানো গলায় সুধাকর আবার বললে, কী হয়েছে? অমন কেন মুখের চেহারা?

মকবুল ভ্রূকুটি-ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। কপালটা কোঁচকানো—অন্যমনস্ক ভাবে হাতের শালপাতার নলটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে।

—আর ভালো লাগছে না, এবার চলে যাব শহরে।

—শহরে?

—সেই কথাই ভাবছি।—মুখ ফিরিয়ে মকবুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ঃ স্টীমারঘাটে কুলিগিরি করব, রিক্‌শা টানব তা নইলে।

—কেন, আর বুঝি নৌকো বাইতে মন চায় না?

—কী হবে? এও তো কুলির কাজ। যেখানেই যাই, আমার অবস্থা সমান। বরং শহরে দুটো পয়সা বেশি আসবে। রিক্‌শা টানতে পারলে আরো বেশি হবে রোজগার।

সুধাকর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু চাচার কথাটা একবার ভেবে দেখো তোমার।

চাচার কথা! কেমন চমকে উঠল মকবুল। তার চাচা জয়নালও একদিন গ্রাম-দেশ ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করেই পেয়ে গেল রিক্‌শা টানার কাজ। তারপরে মনে হত, জয়নালের মতো সুখী বুঝি বিশ্বসংসারে কেউ নেই। সারাদিনে রোজগার বেশ ভালোই হয়, মালিকের জমার পয়সা মিটিয়ে দিয়েও বেশ উদ্বৃত্ত থাকে হাতে। তাই থেকে প্রায়ই বাড়িতে পাঁচ-দশটা টাকা পাঠায় জয়নাল, ফর্সা লুঙ্গি পরে, সন্ধ্যাবেলায় এক-আধটু ফুরতি করতেও যায় দু চারদিন। বছরখানেক এইভাবেই চলল।

কিন্তু হোটেলের কলেছাঁটা ভাত, জলের মত ডাল, দুএক টুকরো মাছ আর কালেভদ্রে এক আধ খণ্ড মাংস—এতে পেট হয়তো ভরতে পারে, কিন্তু শরীরের তাগিদ মেটে না।

যে শক্তি আসে সীমানাহীন নদীর অপর্যাপ্ত জোলো-হাওয়ার উচ্ছ্বাস থেকে, যে প্রাণ আসে চন্দ্র-সূর্য-তারার অবারিত আলোর ঝর্ণায়, মুঠো মুঠো রাঙা মোটা চালের ভাত, টাটকা নদীর মাছ আর শাক-সবজী শরীরে যে সঞ্জীবনী জাগিয়ে রাখে, রেঙ্গুনচালের ভাতে আর মাপা তরকারিতে তা কোথায় পাবে জয়নাল? প্রথমে বেরিবেরি ধরল—হাত-পা ফুলে দিনকয়েক কষ্ট হল খুব। তারপর থেকেই কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল শহরের আলো, রিক্‌শা নিয়ে ছোটবার সময় কেমন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল কানে, হঠাৎ এক-এক সময় ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরে। শহরে তখন সাইকেল-রিক্‌শা আসতে শুরু হয়েছে, জয়নাল ভাবল, ওর একটা জমা নিতে পারলে ঢের বেশি রোজগার করা যাবে। কিন্তু সাইকেল-রিক্‌শার ওপরে বাবুদের ঝোঁক বেশি, কাজেই জমা নিতে গেলে আগাম চায় মালিক। অতএব টাকা জমাবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম শুরু করল জয়নাল। তারপর একদিন যখন সদর রোড থেকে সোয়ারী নিয়ে চলেছে কাশীপুরের দিকে, তখন নথুল্লা বাজার পুলের ওপরে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। সেই যে পড়ল—আর উঠতে পারল না, মুখ দিয়ে গল্‌-গল্‌ করে রক্ত ঝরতে লাগল খোয়া-ওঠা পথের ওপর। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে দু ঘণ্টার বেশি বাঁচেনি জয়নাল।

একবার—এক পলকের জন্যে সেই স্মৃতিটা চমকে গেল মকবুলের মনের ওপর। শহর! সেখানে টাকা পাওয়া যায়—সাইকেল-রিক্‌শা টানা চলে, কুলিগিরি করা যায়, একটা পান-বিড়ির দোকান দিয়ে বসলেও নেহাৎ মন্দ হয় না। বায়োস্কোপ দেখা যায়, নানা রকম স্ফূর্তি করাও চলে, কিন্তু—

কিন্তু!

মকবুল ভ্রূকুটি করে জোয়ারের ফুলে-ওঠা জলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখতে লাগল। কতকগুলো কুমীরের ছানার মতো একঝাঁক খরশুলা মাছের পোনা জলের ওপর বড় বড় চোখ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছে। উড়ন্ত মাছরাঙার লোলুপ দৃষ্টি আছে ওদের ওপর, কিন্তু সহজে ধরা দেবার পাত্র নয় ওরা। ছোঁ মেরে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই টুপ্‌ করে ডুবে যাবে জলের মধ্যে। মকবুল একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ওদের দিকে। ছলাৎ করে লঘু শব্দ হল একটু—মাছগুলো চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেছে। মকবুল বললে, তা হোক। শহরই আমার ভালো।

—যে-রকম ক্ষেপে গেছ, এরপরে খুন-খারাপী করবে মনে হচ্ছে।—সুধাকর হাসল।

—খুন করতে আর পারছি কই। তাহলে তো বেঁচে যাই। ইচ্ছে করে কাল্লাটা নামিয়ে দিয়ে ধড়টাকে পুঁতে দিই কচুরিপানার ভেতরে—শেয়াল-কুকুরে টেনে খাক।

—এত রাগ তাহলে ইদ্‌রিশ সাহেবের ওপরেই?

—ইদ্‌রিশ সাহেব!—মুখটা বিকৃত করলে মকবুল ঃ বাঁদীর ব্যাটা—চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে দুটো পয়সা জমিয়েই সাহেব হয়ে বসেছে। এখন আমাকে বলে বান্দা! বলে, আমি ওর জুতোর চাকর!

বান্দা তো বটেই—সুধাকর ভাবল। মকবুলের নৌকো তার নিজের নয়—ইদ্‌রিশ মিঞাই তার মালিক। প্রতিটি পাইপয়সার হিসেব দিতে হয় তাকে। আর আশ্চর্য খরশান দৃষ্টি ইদ্‌রিশ মিঞার! তিন টাকার সোয়ারী বয়ে দুটো টাকা বলে পার পাওয়ার

জো নেই। কী করে টের পায় সে-ই জানে। মকবুল বলে লোকটার ইব্‌লিশের চোখ আছে।

মকবুল বলে চলল, আমারও দিন ছিল। আমার বাপ-দাদা যদি দাঙ্গাবাজী আর মামলা করে ফতুর না হত, তাহলে কে পরোয়া করত ওই ইদ্‌রিশ মিঞাকে? এই আমাকেই তবে পোলাও খাওয়ার নেমন্তন্ন করত, ফরাসে বসিয়ে বলত ঃ আসুন মিঞা ভাই আসুন—এই নিন ফরশী। কী করব—সবই নসীব!

নসীব বই কি—কী আর নসীব ছাড়া! নইলে গোলাম আলি সর্দারের মেয়ে রোকেয়াকে দেখে এমন করে মন মজবে কেন মকবুলের? যে মকবুলের মাথা গোঁজবার গোলপাতার ছাউনিটুকু পর্যন্ত একটা দমকা হাওয়ার ভর সয় না—তার কেন হবে বিয়ে করে ঘর বাঁধবার শখ? আর গোলাম আলি সর্দারই বা কেন এমন হতে যাবে—যার চোখের চামড়া বলে কোনো জিনিস নেই! তারও তো সম্বলের মধ্যে বিঘে তিনেক জমি—তাও চাষ করতে হয় ইদ্‌রিশ মিঞার কাছ থেকে বলদ ধার করে। যদিও নামেই সর্দার তবু তার ঘর থেকেও তো দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ দেখা যায়। তবু সেই গোলাম আলিই বা জেনেশুনে কেন পাঁচকুড়ি টাকার দেন-মোহর চেয়ে বসবে মকবুলের কাছে?

ঘর নেই—জমি নেই, খোরাকী ছাড়া তিন টাকা মাইনে। লুঙ্গি কিনতে হলে এক মাস বিড়ি না খেয়ে থাকতে হয়। সেই মকবুল কিনা রোকেয়াকে দেখে দিশেহারা হয়ে গেল! তারপর ইদ্‌রিশ মিঞার কাছে গিয়ে দরবার করে বললে, মিঞা সাহেব, যদি পাঁচকুড়ি টাকা কর্জ দেন—

পাঁচকুড়ি টাকা! ইদ্‌রিশ মিঞা হা-হা করে হেসে উঠেছিল ঃ শোধ করবি কী করে? বিবি বাঁধা দিয়ে নাকি?

আশ্চর্য ধৈর্য মকবুলের! এর পরেও তাই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েনি ইদ্‌রিশ মিঞার ঘাড়ের উপর—চড়্‌-চড়্‌ করে টেনে ছিঁড়ে দেয়নি তার মেহেদী-রাঙানো দাড়িগুলো। শুধু রক্তচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে এসেছে সামনে থেকে।

সুধাকর জানে—সবই জানে। বুঝতে পারে দিনের পর দিন কী অসহ্য হিংস্রতায় মকবুলের বুকের ভেতরটা জ্বলে যেতে থাকে। কিন্তু সহানুভূতি বোধ করা ছাড়া আর কী-ই বা উপায় আছে তার! তার নিজের ঘরের মেঝেতে যে মেটে হাঁড়িটা পোঁতা রয়েছে, বড়জোর চারগণ্ডা টাকা মিলতে পারে তার ভেতর। কিন্তু পাঁচকুড়ি তার থেকে অনেক দূরে।

মকবুল বললে, তার চাইতে শহরে যাওয়াই ভালো। স্টীমারঘাটে মুটের কাজ করলেও পাঁচকুড়ি টাকা জমে যাবে এক বছরে।

—তা হয়তো যাবে। কিন্তু ততদিন রোকেয়া বিবি তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে না।

—থাকবে না?—মকবুলের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠলো ঃ না থাকে বয়ে গেল! আরো অনেক রোকেয়া জুটে যাবে দুনিয়ায়!

—এইটে কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ভাই।—এত দুঃখেও হাসি এল সুধাকরের ঃ মেয়ে হয়তো গণ্ডা-গণ্ডা জুটবে, কিন্তু রোকেয়া বিবি দুটি জুটবে না।

মকবুল ছাড়া এত বেশি করে আর কে জানে সেকথা? এমন করে আর কে সেটা অনুভব করে রক্তে রক্তে—নাড়ীতে নাড়ীতে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জোয়ারের জল কল্লোল তুলছে। ইঁটের পাঁজার ওপরে একটা সবুজ লতা দুলছিল, আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগল ফাটলের ভেতরে। লাউডগা সাপ একটা।

—ও মাঝি, কেরায়া যাবে?

আচমকা ডাক উঠল—যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। গায়ে ছিটের শার্টের ওপরে একখানা গামছা, এক হাতে পুঁটলি, আর এক হাতে জুতো একজোড়া।

মকবুল উঠে পড়ল ঃ ওই নাও—তোমার সোয়ারী এসে গেছে।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ লাফিয়ে নেমে পড়ল নৌকো থেকে। তারপর ডাঙা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

সুধাকর ভ্রূকুটি করল। যদিও সওয়ারীর জন্যেই সকাল থেকে সে অপেক্ষা করে আছে, তবু মনে হল যেন এ সময়ে না এলেই ভালো করত লোকটা। কেমন বিশ্রীভাবে রসভঙ্গ করে দিলে।

লোকটা আবার অধৈর্যভাবে বললে, যাবে নাকি কেরায়া?

—কেন যাব না? যাবার জন্যেই তো বসে আছি। কোথাকার কেরায়া?

—মুরাদপুর।

—দেড় টাকা দেবেন।

—দেড় টাকা? এই তিন মাইল রাস্তা দেড় টাকা?

—তবে অন্য নৌকো দেখুন।

কিন্তু লোকটা বোকার মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে রাজী নয়। দশ জায়গায় দর করে বেড়ানোর চাইতে এক জায়গায় দামদস্তুর করাই ভালো। রফা হল এক টাকায়।

সওয়ারী তুলে নিয়ে সুধাকর যখন নৌকো ভাসাল, তখন তার চোখে পড়ল মকবুল জলে ছিপ ফেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে।

জোয়ারের জলে মাছ উঠবে না—তা ছাড়া মাছের দরকারও নেই ওর। তবু!

॥ ২ ॥

কিন্তু মকবুলের জন্যে মিথ্যে দুঃখ করে কী হবে সুধাকরের? তার নিজের কথাই কি সে ভাববার সুযোগ পেয়েছে এ পর্যন্ত?

ওপরে আকাশ—নীচে গাঙ, মাঝখানে ডিঙি। সুধাকরের জীবনে এ ছাড়া কোথায় কী আছে আর? ঘর আছে—সে ঘরে থাকে তার বুড়ী পিসি। সে-ই চারদিক আগলে রাখে—যক্ষের মতো পাহারা দেয় কয়েকটা সুপুরি গাছ—রাত্রে কান পেতে থাকে পুকুরের দিকে। মাছেরই দেশ—তবু লোকের স্বভাব যাবে কোথায়? চুরি করতে না পারলে পেটের ভাত যাদের হজম হয় না, রাত-বিরেতে তারা আসে, ঝপাং করে জাল ফেলে পুকুরে—মোচা চিংড়ি, পোনা মাছ, কাঁকড়া—যা পায় তাই নিয়েই পালায়। পুকুর-ভর্তি কলের কাঁটা ফেলেও নিস্তার নেই তাদের হাত থেকে। তাই বুড়ী সারারাতই কান খাড়া করে থাকে, জলে একটা গোসাপ পড়লেও হুড়মুড় করে ছুটে যায় ঠ্যাঙা নিয়ে।

আর সারারাত পড়ে 'কফ্‌ফলের' মন্ত্র ঃ

'কফ্‌ফল, কফ্‌ফল, কফ্‌ফল—
চোরের রাত্তির নিষ্ফল!
সাপা, চোরা, বাঘা না বাড়াইও পাও—
যদ্দূরে যায় কফ্‌ফলের রাও!'

কিন্তু কফ্‌ফলকে পাহারা দেবার দরকার হয় না। বুড়ী একাই যথেষ্ট।

এক-একদিন চটে যায় সুধাকরের ওপর। প্রাণখুলে গাল দিতে শুরু করে।

—বিয়ে করবে না। সংসার করবে না, রাতদিন নৌকো আর নৌকো! আমারি বা এমন কোন্ দায়টা ঠেকেছে সংসার আগলে থাকার ? আমারও শ্বশুরবাড়ি আছে—ঘরদোর আছে। একদিন চলে যাব সেখানেই।

শুনে সুধাকরের হাসি পায়।

—যাও না, সেখানেই যাও।

—যাবই তো। ভয় করি নাকি তোকে?

—আমাকে ভয় করবে কেন খামোখা? কিন্তু আমি বলছিলাম কে আছে তোমার শ্বশুরবাড়িতে? সব তো কবে মরে হেজে শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখো, ভিটের ওপর এখন শেয়াল চরে বেড়াচ্ছে—ডিম পাড়ছে গোখরো সাপে।

—তা হোক—তা হোক। তবু এই অলক্ষ্মীর সংসারের চাইতে সেই জঙ্গলই আমার ঢের ভালো।

সুধাকর জানে, বুড়ী কোনোদিন যাবে না—সে প্রশ্ন ওঠেও না। তবু মধ্যে মধ্যে তারও কি মনে হয় না এ তার অলক্ষ্মীর সংসার? বউ আসবে, ধানের পালা সাজাবে, চিঁড়ে কুটবে ঢেঁকিতে, শাঁখ বাজাবে সন্ধ্যেবেলায়, বাড়ি ফিরলে মুখ ধোয়ার জলের ঘটি আর গামছা এগিয়ে দেবে, আর যখন রাত হবে—

যখন রাত হবে, তখন এই ভাঙা ঘরকেই মনে হবে যেন সায়েস্তাবাদের নবাববাড়ি। খড়ের ওপরে ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় নেবে আসবে স্বর্গ। একটা রাত শেষ হয়ে যাবে এক পলকে—সুপুরি বনের মাথার ওপর থেকে একডুবে চাঁদটা নদীর ওপারে গিয়ে ভেসে উঠবে!

কিন্তু সে আর হয় না। সুর কেটে গেছে।

মকবুলের মতো নয়। তার কারণ অন্য।

চব্বিশ বছরের সুধাকর ছ'বছর পেছনে ফিরে তাকালো। মুরাদপুরের সোয়ারী নামিয়ে, ভাঁটার টানে নৌকোটা ভাসিয়ে দিয়ে আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালো সুধাকর।

ছ'বছর আগেকার সুধাকর। আঠারো বছর বয়েস তখন। বুকের মধ্যে টগবগ করে ওঠে, সব সময়ে নিজেকে আশ্চর্য শক্তিমান মনে হয়। মনে হয়—ইচ্ছে করলে এখন সে লড়তে পারে ডোরাদার বাঘের সঙ্গে, তুফানের মুখে সাঁতার দিতে পারে কালাবদরের জলে, মানুষখেকো কুমীরের মুখ দুহাতে ধরে ছিঁড়ে আলাদা করে দিতে পারে। সেই আঠারো বছর বয়েস ঃ যখন মেয়েদের দিকে তাকালে মন একটা নতুন অর্থে গুঞ্জন করে ওঠে, তাদের চলার ছন্দে রক্তের ভেতর কী যেন ঝিন্‌ঝিন্ করে বাজতে থাকে।

সেই সময় বাইচ খেলা হচ্ছিল রায়মহলে।

বিজয়া দশমী—প্রতিমা বিসর্জনের দিন। গাঁয়ের বাইচের নৌকোয় সুধাকরও এসেছিল। নামকরা বাইচের দল তাদের। এর আগে অনেকবার তারা বাইচ্ জিতেছে—পাঁচ পাঁচ টাকা করে বক্‌শিশ পেয়েছে প্রত্যেক দাঁড়ী, পেয়েছে একখানা করে কাপড়। বড় রায়কর্তা বলেছেন, টাকা তো দেবেনই, তা ছাড়া একটা করে রূপোর মেডেলও দেওয়া হবে সকলকে।

তাই জোর পাল্লা হবে এবার।

হলও।

সে কি উত্তেজনা! দুপাড় থেকে ঢাক বাজছে—নদীতে নৌকোয় নৌকোয় উঠছে ঢাকের আওয়াজ। ধূপ-ধুনোর সঙ্গে যেন ঘন কুয়াসা জমেছে নদীর ওপরে—হুস্ হুস্ করে সাপের মতন আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে উড়ন-তুবড়ি। দাঁড়ের তালে তালে হালের মাঝি দমাদম পা ঠুকছে গলুইয়ের ওপর।

দুখানা নৌকো পাশাপাশি চলেছে—সমানে সমানে। বাকীগুলো হাল ছেড়ে দিয়েছে—পিছিয়ে পড়েছে তারা। সুধাকরদের নৌকোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে রায়মহল বাজারের নৌকো।

হঠাৎ রায়মহলের নৌকো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকখানি সরে এল এদিকে। ধাক্কা লাগল সুধাকরদের নৌকোর গলুইয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ওদের নৌকো প্রায় তিন হাত পিছিয়ে সরে গেল।

এটা বে-আইনি—মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধে বাইচের নৌকোয় খুনোখুনি হয়ে যায়—এর আগে হয়েও গেছে অনেকবার।

—মার শালাদের—

বিশাল বাবরী দুলিয়ে পা ঠুকল হালের মাঝি। গোঁয়ার ধরন—গায়ে অসুরের মতো শক্তি, তার ওপর মদ খেয়ে এসেছে লোকটা। বলেই ফস্ করে গলুইয়ের তলা থেকে একখানা রাম-দা বের করে ঘোরাতে লাগল মাথার ওপর, পৈশাচিক গলায় চিৎকার করে উঠল ঃ মার শালাদের—

নদীর দু ধার থেকে লোকে হৈ-হৈ করে উঠল, কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। মার্-মার্ শব্দে দু নৌকোতেই দাঁড়িয়ে উঠল আটচল্লিশ জন লোক। বেরুল রাম-দা, বেরুল শড়কী, বেরুল টেঁটা। তারপর—

সুধাকর একটা বল্লম ছুঁড়ে দিলে রায়মহলের নৌকোয়। কারো গায়ে লাগল না—একটা লোকের কানের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল নদীর জলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা টেঁটা এসে সুধাকরের হাঁটুতে বিঁধল শতমুখী ফলায়। অসহ্য যন্ত্রণায় টলে উঠল সুধাকর। ঝপ্ করে পড়ে গেল নদীতে।

সেই অবস্থাতেই টেঁটাটাকে পা থেকে খুলে নৌকোয় ওঠবার চেষ্টা করল সুধাকর। কিন্তু তাকে পেছনে ফেলে নৌকো অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখন। আর তার ওপর লক্ষ্যও ছিল ও নৌকোর—মাথা তুলতে ঝপাং করে একটা বল্লম একেবারে সামনে এসে পড়ল।

নদীর ওপর তখন অন্ধকার নামছে—কালো হয়ে গেছে জল, আবছা আবছা দেখাচ্ছে সমস্ত। কয়েকটা ভেসে-যাওয়া কচুরিপানার সঙ্গে আত্মগোপন করে সাঁতরে চলল

সুধাকর—পাড়ে উঠতে পারলে হয়। কিন্তু শরীরে আর বইছে না। ডান পা-টা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে—শতমুখী ক্ষতে নোন্‌তা জল লেগে একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণার চমক বইছে। সুধাকর বুঝতে পারছিল, আর বেশিক্ষণ এভাবে চলবে না। তার আঠারো বছরের লোহায় গড়া শরীরেও এই মুহূর্তে ভাঙন ধরেছে—বড় বেশি দপ্‌-দপ্‌ করছে হৃৎপিণ্ড। হয়তো—

হয়তো? মুহূর্তের মধ্যে সুধাকর অনুভব করতে পারল—সে নিঃশেষিত হয়ে আসছে, মৃত্যু এসে ছায়ার মতো নামছে তার মাথার ওপরে। আর এক মিনিট—কিংবা দু মিনিট—কিংবা হয়তো আরো কম—তার মধ্যেই সে তলিয়ে যাবে জলের মধ্যে। যে জলটা একসময় পাখীর পাখার মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, সেই জলই এখন একমণ ওজনের একটা গুরুভার বোঝার মতো তাকে আকর্ষণ করছে নিচের দিকে।

শুধু তাই নয়, এ অঞ্চলের জলের সঙ্গে পরিচিত সুধাকর স্পষ্ট একটা অভ্যস্ত শব্দ শুনল পেছনে। ছলাৎ করে একটা আওয়াজ—আরো একটা তারপরে। মুখ ফিরিয়ে চকিতের জন্যে সুধাকর দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড রাঘববোয়ালের মতো বিরাট উজ্জ্বল মাছ ক্রমাগত জলের ওপর লাফিয়ে উঠছে।

কামট! রক্তের গন্ধ পেয়েছে!

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল সুধাকরের গলা দিয়ে। কিন্তু কেউ শুনতে পেল না—শোনবার উপায়ও নেই। বাইরের নৌকোয় তখনো মারামারি চলছে—দুধার থেকে সমান কোলাহল উঠছে আকাশ ফাটিয়ে। তার মধ্যে নদীর কালোজলে কোথায় মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে সুধাকর—কে তার খবর রাখে?

ছলাৎ করে শব্দটা আরো কাছে। কামটটা এবারে অনেক কাছে এসে পড়েছে। পালাবার উপায় নেই। রক্তের গন্ধ অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে আনছে তাকে।

সুধাকর চোখ বুজল। সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। উড়ন-তুবড়ীর ফুলঝুরিগুলো শেষবারের জন্যে চোখের সামনে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল।

সেই তখন—

একটা কী তাকে আঁকড়ে ধরল, কিন্তু সে কামটের দাঁত নয়, মানুষের হাত। তারপর—সুধাকর যখন চোখ মেলল তখন সে রায়মহলের ছোট কর্তার বজরায়।

নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন ছোট কর্তা। বেপরোয়া মেজাজের লোক। নেশায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি—চরিত্রে গুণের ঘাট নেই। পাড়ার ঝি বউ সন্ত্রস্ত থাকে তাঁর ভয়ে। বিয়ে একটা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী ছ'মাসের বেশি টিঁকতে পারেননি। শোনা যায়, আফিং খেয়েছিলেন। ডাক্তার কবিরাজে তাঁকে বাঁচালো, কিন্তু ছোট কর্তার সংসারে তিনি আর রইলেন না। কিছুদিন পরে বাপেরবাড়ির লোক এসে ছোট গিন্নীকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। আর ফিরে আসেননি তারপরে।

কিন্তু ছোট কর্তা নিরঙ্কুশ সেই থেকে।

রেসের মরশুমে কলকাতা যান—মাসকয়েক থাকেন। তারপরে আবার গ্রাম। দিনদুপুরেই পড়ে থাকেন মদে চুর হয়ে—নিজের রক্ষিতা নিয়ে বেড়াতে বেরোন খোলা নৌকোয়।

আজো বিজয়ার দিনে বেরিয়েছিলেন রঙ চড়িয়েই।

তাঁরই বজরার মাঝিরা তুলে এনেছে সুধাকরকে।

চোখ মেলতেই সুধাকর দেখল গোলগাল ফর্সা একটি মুখ। পানের রসে রাঙানো টুকটুকে ঠোঁট। পরনে নীলাম্বরী শাড়ী—হাতে সোনার চুড়ির ঝলক।

—একটু ভালো আছো এখন?

কথা তো নয়—যেন গানের সুর।

বজরার ভেতরে গ্যাসের আলো জ্বলছে। সেই আলোয় যেন মায়াপুরীর মতো মনে হল সমস্ত। পায়ের পাতায় টেটার অসহ্য যন্ত্রণা ভুলে গেল সুধাকর। তাকিয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

একটা গম্ভীর গম্‌গমে গলা এল এবার।

—লোকটাকে এখন নামিয়ে দাও ডাঙায়। বাড়ি চলে যাক।

সেই ফর্সা সুন্দর মুখখানা ভরে উঠল করুণায়। দুটি কালো চোখ চকচক করে উঠল।

—না-না। দাঙ্গার পরে পুলিসে সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওকে পেলে এখুনি নিয়ে যাবে থানায়।

—তা হলে কী করা যায়! আবার সেই গম্ভীর জড়ানো গলাটা শুনতে পাওয়া গেল ঃ কী করতে চাও একে নিয়ে?

সুধাকর তাকিয়ে দেখল। প্রকাণ্ড মুখ—কালিপড়া কোটরের ভেতরে রাঙা টক্‌টকে চোখ। ছোটবাবু!

সুন্দর মানুষটি বললে, আজ আমাদের ওখানেই নিয়ে চলো।

—কী বলছ তুমি? একটা দাঙ্গার আসামীকে নিয়ে—

—সে আমি বুঝব। তোমায় ভাবতে হবে না।

সেই মিষ্টি মুখের কথা। কিন্তু কথা নয়—আদেশ। ছোট কর্তা বললেন, বেশ, তাই হবে।

তারপর—

তারপরের অভিজ্ঞতা কী করে ভুলবে সুধাকর? সে যেন স্বপ্নের ঘোরে পরীর দেশের আশ্চর্য কাহিনী। বাইচের নৌকো থেকে রূপকথার রঙমহলে।

সুধাকর আবার কখন যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল কে জানে। যখন ঘোর ভাঙল তখন পিঠের নীচে দুধের মতো নরম বিছানা। সামনে ছোট টেবিলে একটা কাচের গ্লাসভর্তি গরম দুধ। আর—আর সেই স্বপ্নময়ী মেয়েটি। একটা চেয়ারে তারই মুখোমুখি বসে আছে।

আবার সেই গানের সুর শোনা গেল।

—নাও, এই দুধ খাও।

সুধাকর চোখ কচলালো। ব্যাপারটা এখনো বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না তার।

—উঠে বোসো, খেয়ে নাও দুধটা।

আদেশ। সুধাকরকে উঠে বসতে হল। পরনে ভিজে কাপড়টা নেই—একখানা মসৃণ ধুতি কে যেন জড়িয়ে দিয়েছে। পায়ে যেখানে টেটার ঘা লেগেছিল, সেখানে একটা পুরু ব্যাণ্ডেজ। যন্ত্রণা আছে, তবু আঠারো বছরের শরীরটা আবার শক্তি আর লঘুতায় ভরে উঠেছে।

—দেখুন, এবার আমি যাই।

—এখনি যাবে কোথায়? আজ রাতে বিশ্রাম করো এখানে। তোমার কোনো ভয় নেই—এ বাড়িতে পুলিস আসবে না।

—দেখুন, আপনারা আমাকে—

মেয়েটি ভ্রূভঙ্গি করলে। বিহ্বলতার নেশা লাগল সুধাকরের।

মেয়েটি বললে, আমাকে অত আপনি-আপনি করছ কেন? আমি এ বাড়ির গিন্নী নই।

—তা হলে আপনি—

—আমি কে, পরে বলছি। তোমার নাম কী?

—আমার নাম সুধাকর।

—সুধাকর! বেশ নাম। মেয়েটি মনে মনে যেন আউড়ে নিলে একবার: কী জাত?

বলতে গিয়ে একটা ঢোঁক গিলল সুধাকর। এই ঘর, দুধের ফেনার মতো নরম বিছানা, সামনে বিচিত্র চেহারার ওই ঝাড়লণ্ঠনের আলো, আর এই আশ্চর্য মোহময় মেয়েটি। এখানে নিজের পরিচয় আরো একটু বুক ফুলিয়ে বলতে পারলে হত। ভালো হত আরো গর্বের সঙ্গে বলতে পারলে। কিন্তু কুঁকড়ে গিয়ে সুধাকর বললে, আমরা জাতে জেলে।

—আমি কপালীর মেয়ে। রাধা আমার নাম।

কপালীর মেয়ে! চকিতে বিস্ময় চল্‌কে পড়ল সুধাকরের চোখ থেকে। তা হলে—! তারপরেই লোকশ্রুতিতে শোনা ছোটবাবুর কাহিনী মনে পড়ে গেল সুধাকরের। ছোট কর্তা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র লোক, নিজের স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে—রক্ষিতা নিয়ে থাকে—

সুধাকর শিউরে উঠল একবার। রক্ষিতা! জেলের ছেলে সুধাকরেরও সর্বাঙ্গে একটা ঘৃণার ঢেউ বয়ে চলে গেল। একবার মনে হল—

কিন্তু পরক্ষণেই রাধার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখল সে। কাকে ঘৃণা করবে সে—কাকে ভাববে রক্ষিতা? বয়েসে তারই সমান হবে মেয়েটি—রূপ আর যৌবন ফেটে পড়ছে পাকা ডালিমের মতো। কপালীর ঘরে এমন মেয়ে কোথা থেকে জন্মায়—কী করেই বা জন্মায়?

রাধা বললে, কাজেই বুঝতে পারছ আমার কাছে তোমার লজ্জার কিছু নেই। আমাকে আপনি-আজ্ঞেও করতে হবে না। এখন এই দুধটা খেয়ে নাও।

এবার আর দুধের গ্লাস তুলে নিতে আপত্তি রইল না কোথাও।...

—আপন ডাইন, আপন ডাইন!

একটা তীব্র চিৎকার। সুধাকরের ঘোর ভেঙে গেল। ক্ষিপ্র হাতে নৌকোকে সামলে নিলে সে। খালের বাঁক ঘুরে আর একখানা নৌকো যে আসছিল, তার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ছইয়ের বাতাগুলো কট-কট করে উঠল—ও নৌকো থেকে একটা লগি ঝপাস করে পড়ে গেল জলের ভেতরে।

—এই মাঝির পো—চোখ থাকে কোন্ দিকে? নৌকো বাইতে শেখোনি এখনো?—বিপরীতমুখী নৌকো থেকে ধমক এল।

লজ্জিত সুধাকর জবাব দিল না।

বেলা তিন প্রহর। আরো দুটো বাঁক সামনে। রোদের রঙ হলদে হয়ে আসছে।

সুধাকরের মন ফিরে এসেছে বাস্তবের সীমায়। চোখে পড়ল পাশে একটা মস্ত কচুরিদামের ভেতরে কুচো চিংড়ি লাফাচ্ছে।

সুধাকর ঝুপ করে লগিটা পুঁতে ফেলল। তারপর কচুরির ঝাঁকটাকে টেনে তুলল নৌকোর ওপর। অনুমান নির্ভুল। প্রায় আধপো কুচো চিংড়ি আর গোটাকয়েক ডারকিনা মাছ ছটাং-ছটাং করে লাফাতে লাগল চারদিকে।

—নে জুয়ান, খা। তোর ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়।

জুয়ানকে নিমন্ত্রণ করবার দরকার ছিল না। যেমন করে ছোট ছেলেপুলে এক একটা করে মুড়ি কুড়িয়ে খায়, তেমনি ভাবেই সে মাছগুলোর সদ্‌গতিতে লেগে গেল।

আবার নৌকো ছাড়ল সুধাকর।

মকবুল—রোকেয়া! গোলামের বাদশাজাদী পাওয়ার স্বপ্ন! কিন্তু সে নিজেও তো—

কিছুতেই তো ভোলা যাচ্ছে না রাধাকে। বারে বারে মনে পড়ছে—একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় মনে পড়ে যাচ্ছে। সুধাকর ঠোঁট কামড়ে ধরল।

সেই রাত। সে তো শেষ রাত নয়। আঠারো বছরের সুধাকরকে রাধা বলেছিল, আবার এসো।

—কিন্তু এখানে?

—কোনো ভাবনা নেই। সন্ধ্যার পরে বাবুর আর সাড় থাকে না।

তা থাকে না। কিন্তু সেজন্যে ছোট রায়কর্তার কোনো লজ্জা-সংকোচের প্রশ্ন নেই। তিনি নিজেই গর্বভরে অনেকবার বলেছেন, সন্ধ্যের পরে কোনো ভদ্রলোক কী করে যে চোখ মেলে তাকায় আমি তো সেকথা ভেবেই পাইনে!

নিঃসন্দেহ। খাঁটি ভদ্রলোক হতে গেলে সন্ধ্যের পরে কিছুতেই চোখ খুলে রাখা উচিত নয়। কিন্তু সুধাকর তো ভদ্রলোক নয়। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার তার রক্তে একটা কিসের যেন ঘুম ভাঙায়ঃ প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন তার বুকের মধ্যে মৃদঙ্গের আওয়াজের মতো ঘা দিতে থাকে। রাত্রির আড়ালে আড়ালে যারা শিকার খুঁজে বেড়ায়—তাদের মতোই কতগুলো খরধার নখ-দন্তের অস্তিত্ব নিজের মধ্যে অনুভব করতে থাকে সুধাকর। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠো দুটো যেন থাবা হয়ে যায়—বনবেড়ালের চোখের মতো জ্বলতে থাকে দৃষ্টি।

সুধাকর ভদ্রলোক নয়। তাই রাত্রিই তার সময়।

প্রথম দিন রাধাই দাঁড়িয়ে ছিল দোরগোড়ায়। খিড়কির ধারে।

—আপনি?

—আবার আপনি?—রাধা ধমক দিয়ে উঠেছিলঃ আমি কপালীর মেয়ে। নাম ধরেই ডেকো আমাকে।

একবার তাকিয়ে দেখল সুধাকর। কানে সোনার দুল দুটো ঝকঝক করছে। কপালের উল্‌কিটা যেন রাজটীকা। তবু রাজকন্যা নয়—রাধা।

রাত্রির নেশা তখন একটু একটু করে কাঁপছে রক্তে। আকাশে নক্ষত্ররা বিহ্বল। গাছের ডালে-ডালে অতন্দ্র বনবেড়াল ঘুরছে শিকারের সন্ধানে। সেই বনবেড়ালের লুব্ধ পিঙ্গল চোখের মতোই জ্বলে উঠল সুধাকরের চোখ।

সেই মুহূর্তের প্রভাবে সুধাকর বলেছিল, বেশ তাই হবে। কিন্তু তুমি আমায় ডেকেছ কেন?

—সেকথা তো এখানে বলা যাবে না। চলো ভেতরে।

—ভেতরে? একবারের জন্যে কুঁকড়ে গিয়েছিল সুধাকর। কিছুই বিশ্বাস নেই—কে জানে কোথায় অপেক্ষা করে আছে একটা বিপজ্জনক ফাঁদ! ছোট রায়কর্তা যদি টের পান—

রাধা বলেছিল, কোনো ভয় নেই। আমি বলছি, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

সত্যিই ভয় ছিল না। নেশায় বেঘোর হয়ে একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছেন রায়কর্তা। পড়ে আছেন উবুড় হয়ে মস্ত ফরাসের ও পর। রাধার পায়ের শব্দ শুনে জড়ানো গলায় কী যে বললেন সেটা বোঝাও গেল না।

কী করে সেই রাতকে ভুলবে সুধাকর? কেমন করে ভুলবে সেই আশ্চর্য রূপকথা?

কত সহজে নিজের কথা বলেছিল রাধা! কত অবলীলাক্রমে কপালীর মেয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিল জেলের ছেলের কাছে!

সে-মুখ সুধাকর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখনো। পদ্মফুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে জলের বিন্দু।

—আমি আসতে চাইনি, কক্ষনো আসতে চাইনি এখানে। একমুঠো টাকা নিয়ে আমার কাকা আমাকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল জমিদারের বজরায়।

তারপর—

তারপর চার বছরের ইতিহাস। অন্ধকার আর অন্ধকার। টাকা-গয়না সব পেয়েছে রাধা। কিন্তু আর কিছুই তো পায়নি। রায়কর্তার ঘরে আরো অনেক পুতুলের মতো তাকেও সাজিয়েই রাখা হয়েছে শুধু। আরো বহু মেয়ে এসেছে এর মধ্যে—একটার পর একটা শূন্য মাটির ভাঁড়ের মতো তাদের দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে ছোটকর্তা।

রাধা তার পাটরাণী। তবু—

সেই বৃষ্টি-ধোয়া পদ্মের মতো মুখখানা রাধা তুলে ধরেছিল সুধাকরের দিকে।

—নিয়ে যাও আমাকে এখান থেকে—নিয়ে যাও। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে ছেড়ে দাও। নতুন করে ঘর বাঁধতে না পারি, ভিক্ষে করে খাব।

শিউরে উঠে পালিয়ে এসেছিল সুধাকর।

সেই শেষ নয়! তারপরে আরো। আরো অনেক সন্ধ্যা। অনেক প্যাঁচার ডাক—ঝম্‌ঝম্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ রাতের অনেক বুক-দুরু-দুরু প্রহর। সবশেষে রাধা সুধাকরের দুহাত জড়িয়ে ধরেছিল।

—নিয়ে যাও এখান থেকে, নিয়ে যাও আমাকে। অনেক সোনার গয়না আছে আমার, অনেক টাকা আছে। কোনো কষ্ট হবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুধাকর বুঝেছিল, বড় বেশি এগিয়ে গেছে সে। পা দিয়েছে সাপের গর্তে।

রাধা বলেছিল. চলো শহরে যাই। তুমি বিড়ির দোকান করবে—আমি পান সেজে দেব। কোনো অভাব আমাদের থাকবে না। না—না, এ শহরে নয়—কলকাতায়। আমি দেখেছি কলকাতা। কত বড়—কত লোক! সেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না—

ঠিক সেই সময় হঠাৎ শোনা গিয়েছিল চটির আওয়াজ। ছোটকর্তা। আজ নেশাটা তাঁর মাঝপথে কেন চটে গিয়েছিল—কে জানে!

পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়েছিল সুধাকর।

সেই থেকে রাধাও মুছে গেল চিরদিনের মতো। আর রাধার কোনো খবর পায়নি সে। ছোটকর্তার যে মাঝিটা চুপি চুপি রাধার খবর নিয়ে আসত তার কাছে সে-ও কোনো হদিস দিতে পারেনি আর।

কী হল রাধার?

কেউ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, ছোটকর্তা তার গলা টিপে মেরেছে। কেউ বলে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে কোথাও। কেউ বা আন্দাজ করে—রাধা নিজেই পালিয়ে গেছে ছোটকর্তার খপ্পর থেকে—কোনো মনের মানুষকে নিয়ে ভেসে পড়েছে যেদিকে চোখ যায়।

মনের মানুষ?

বুকের ভেতরে জ্বালা করে সুধাকরের। আঠারো থেকে চব্বিশ—এই ছ'বছরের পরেও সে জ্বালা এখনো অনির্বাণ। আজো সে বিশ্বাস করে, রাধা যদি কারো খোঁজে বেরিয়ে পড়ে থাকে, তবে সে সুধাকর ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু এখনো সে তাকে খুঁজে পায়নি। এক-একটা বাঁকের মুখে পড়ে যেমন আনাড়ি মাঝির নৌকো বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে অথচ বেরিয়ে আসবার পথ পায় না—সে দশা রাধারও। যদি বেঁচে থাকে—তবে আজো সে সুধাকরের জন্যেই বেঁচে আছে।

কয়েকবারই ভেবেছিল, একদিন রাতে ধারালো একটা দা নিয়ে সে ঢোকে রায়কর্তার বাড়ি। নেশায় অচেতন ওই প্রকাণ্ড লাশটার বুকের ওপর চেপে বসে, তারপর প্রশ্ন করে ঃ বলে দাও, কোথায় আছে রাধা! নইলে এই দা দিয়ে গলা দুখানা করে ফেলব তোমার!

কিন্তু সে আশাও সুধাকরের মেটেনি। আজ প্রায় চার বছর আগে কলকাতায় ছট্‌ফটিয়ে মরে গেছে ছোটকর্তা। যকৃতে জল হয়েছিল তার।

সেজন্যে একবিন্দু দুঃখ নেই। শুধু এই ক্ষোভটাই সে কিছুতে ভুলতে পারছে না যে মরে গিয়ে ছোটকর্তা চিরদিনের মতোই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে রাধাকে। আর তাকে ফিরে পাবার পথ নেই কোথাও।

তবু সুধাকর অপেক্ষা করবে।

ছ'বছর কেটে গেছে। আরো কতদিন যাবে জানা নেই। কিন্তু রাধাকে না পাওয়া পর্যন্ত তো সুধাকরের বুকের উপবাসী জন্তুটা তৃপ্তি মানবে না কিছুতেই; আর কাউকে তো সে ঠাঁই দিতে পারবে না মনের মধ্যে। আর কাউকে নিয়ে তো তার ঘর বাঁধবার উপায় নেই। তাতে যদি তার ঘর চিরদিন শূন্য থাকে তবে তাই থাক।

একটা বাঁক ঘুরে সুধাকরের নৌকো এবারে গাঙে এসে পড়ল। লাল আলো পড়েছে জলে, কেমন অদ্ভুত লাগছে দেখতে। জোয়ারের ঘোলাজলে দিনান্তের শেষ রঙ দেখে মনে হচ্ছে যেন মোষবলি হয়ে গেছে একটা—রক্তে আর কাদায় চারদিক একাকার।

সামনে গঞ্জ। নৌকোর সারি এখনো তেমনি করে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। দুটি-চারটি সরেছে বটে, কিন্তু জমেছে আরো বেশি। পূজোর পরে কেরায়া নৌকোর মাঝিদের বড় দুঃসময় এখন।

তার মধ্যে মকবুলের নৌকো দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। ওর ভাড়াটে জোটেনি। জীবনের সব কিছুই ওর ফাঁকা—নৌকোও ফাঁকা পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী!

॥ ৩ ॥

—এলে?—নৌকো লাগাতেই মকবুলের প্রশ্ন।

—এলাম। পাল্টা উত্তর সুধাকরের।

মকবুলের পাশেই খালি জায়গা ছিল একটা। সুধাকর নৌকো ভেড়ালো সেখানে।

—এবেলাও ফাঁকা গেল তাহলে?—প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল না, তবু সুধাকর সেটা থামাতে পারল না।

জিজ্ঞাসা করেই সে লজ্জা পেল।

—আমার কী? ভাড়াটে জুটল না ইদ্‌রিশ মিঞার—আমি কী করব? আমি চিনির বলদ—বোঝা টেনে চলেছি, টেনেই চলব। এক-আধটা দিন ছুটি পাই তো হাত-পা ছড়িয়ে বেঁচে যাই।

—কিন্তু মাইনে কেটে নেবে যে!

—নিক্‌গে যাক। আমার তো এম্‌নি উপোস—অম্‌নিও উপোস। একমুঠো আমানি ভাত না জোটে মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকব।

সুধাকর কিছুক্ষণ মকবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। মকবুলের মুখ থেকে দুপুরের সেই ছায়াটা এখনো সরে যায়নি। রোকেয়া বিবি। এখনো ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে বুকের ভেতরে।

সুধার ছইয়ে বসল হেলান দিয়ে। একটা পোষা বেড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে উদ্‌টা। সস্নেহে সুধাকর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বেড়ালের ডাকের মতোই একটা গুরগুরে আওয়াজ বেরুতে লাগল তার গলা দিয়ে।

একটু দূরে দুখানা বড় ভাওয়ালি নৌকো তখন এসে লেগেছে। সুধাকরের চোখ সেদিকে পড়তেই মকবুল জবাব যুগিয়ে দিলে।

— গানের দল এসেছে আজ। ঢপ-কীর্তনের দল। বারোয়ারীতলায় গান হবে।

—আজই?—সুধাকর চকিত হয়ে উঠল।

—তাই তো শুনেছি।

—একবার গেলে হত শুনতে! কখন লাগবে?

—সন্ধ্যের পরেই। তা যেতে চাও যাও না।

—তুমি যাবে?

—আমি?—মকবুল একবার উদাস আর উদার দৃষ্টিতে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকালো ঃ কিন্তু আমি গিয়ে কী করব? আমি মুসলমান, আমাকে তো আর ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

—আর ভেতরে ঢুকলে আমাকেই বুঝি ফরাসে বসিয়ে তামাক খেতে দেবে? সুধাকর হাসল ঃ সব গরীবেরই এক অবস্থা ভাই, হিন্দু মুসলমান বলে কোনো কথা নেই। বেশ তো, দুজনেই নয় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। গান শোনা নিয়ে কথা!

—তবে চলো।—নিরাসক্ত উত্তরটা প্রায় নদীর বাতাসেই ছেড়ে দিলে মকবুল।

রাত্রে আর রান্নার পাট করবার উৎসাহ নেই। সুধাকরের নয়—মকবুলেরও না। তাড়াতাড়ি চারটি চিঁড়ে চিবিয়ে নিলে দুজনে। সকালের একমুঠো ভাত আছে, আর আছে দুটো কুচো চিংড়ি। ওদের ওতেই কুলিয়ে যাবে।

তারপর রওনা হল গান শুনতে।

বন্দরের অবস্থা জমজমাট ছিল এককালে—এখন ভাঙনদশা। অর্ধেক নদীতে নিয়েছে—সে আমলের বনেদী বাড়িগুলো এখন নিশ্চিহ্ন। তা ছাড়া পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছে ঝালকাঠির বন্দর—এখানকার ঐশ্বর্য গিয়ে সংহত হয়েছে সেখানে। এর অর্ধেক এখন শূন্যপুরী। ধানচালের যে কারবার এখানকার সব জায়গাতেই চলে, তারি কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে এখন। আট-দশ ঘর বড় বড় সাহা আছে আর আছে দুটো ধানের কল। সেগুলো সরে গেলেই সব অন্ধকার।

বারোয়ারীতলা সেই অতীত আমলের। রাধাকৃষ্ণের মস্ত মন্দির আছে—আছে নাটমন্দির। তারাও ভাঙতে শুরু হয়েছে—কেউ বিশেষ হাত লাগায় না আর। যতদিন আছে ততদিনই চলবে, তারপর যেদিন ঝুপঝুপিয়ে ভেঙে পড়বে, সেদিন একেবারেই মিটে যাবে সমস্ত।

তবু রামধন সাহার এক-আধটু নজর আছে এদিকে। তারই চেষ্টায় কিছু কিছু জমে আছে বারোয়ারীতলা। এই গানের ব্যবস্থাও তারি উদ্যোগে।

দুজনে যখন পৌঁছুল, তখন গান শুরু হব-হব করছে। এর মধ্যেই বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। মকবুলের চিন্তার কারণ ছিল না, ভেতরে ঢোকবার পথ এমনিতেই বন্ধ। আরো দশজন মাল্লা-মাঝি-গরীবের সঙ্গে সিংহ-দরজার বাইরেই দাঁড়ালো তারা।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল, উঁচু নাটমন্দিরের ওপর দুজন বৈরাগী অল্প অল্প খোলে চাঁটি দিচ্ছে, জন-দুই ঝম্‌ঝম্ করছে করতাল নিয়ে। রামধন সাহা গলায় সিল্কের চাদর জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন—হাতজোড় করে কী যেন বললেনও সবাইকে। কিন্তু চারদিকের প্রচণ্ড গোলমালে তার একটি বর্ণও শোনা বা বোঝা গেল না।

কিন্তু তার পরেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল সব। জনতার কোলাহলের ওপর দিয়ে তীরের মতো তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় ভেসে এল ঃ

"ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস,
পদতলে লুটাই সো পীতবাস।
সখিরে, যাক দরশ বিনু ঝুরই নয়ান—
অব নাহি হেরসি তাকে বয়ান—"

ঢপের প্রধান নায়িকা এসে দাঁড়িয়েছে আসরে। সাদা শাড়ির জরিপাড়টা চকচক করছে—মোটা একছড়া গোড়ের মালা দুলছে তার গলায়। এত দূর থেকে তাকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যতদূর অনুমান করা যাচ্ছে মেয়েটি সুন্দরী—রীতিমতো সুন্দরী।

মকবুল বললে, বেড়ে গাইছে—না?

সুধাকর সংক্ষেপে বললে, হুঁ!

"সুন্দরী তেজহ দারুণ মান—
পদতলে লুটই রসিক কান—"

সভা স্তব্ধ। এতগুলো মানুষ নিঃশব্দ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা দুলছে শুধু, কখনো বা টান পড়ছে হাতের বিড়ি সিগারেটে।

গাইতে গাইতে মেয়েটি মুখ ফেরালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাপের ছোবল খেল সুধাকর। আর্তনাদের মতো চাপা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

—কী হয়েছে?—প্রশ্ন করল মকবুল। চারপাশের মানুষগুলো ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলল সুধাকরের ওপর।

কিন্তু ততক্ষণে শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমেছে সুধাকরের মাথায়। বুকের ভেতরে পড়েছে হাতুড়ির ঘা। বিশ্বাস করা যায় না—তবুও মিথ্যে নয়! ওই মেয়েটি—

আর কেউ হতেই পারে না। রাধা!

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুধাকর। গানের একটি বর্ণও আর কানে আসছে না। মাথার মধ্যে একরাশ কুয়াশা পাক খাচ্ছে। বুকের ভেতরে যেন এক্সপ্রেস স্টীমারটা চলছে, আর রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মাথার খুলিতে।

সামনের পাঁচ-সাতশো মানুষের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর মাঝির ছেলে সুধাকরের সাধ্য কি এখন হাত বাড়ায় রাধার দিকে! আকাশের চাঁদের চাইতেও অনেক দূরে—ধরা-ছোঁয়ার সীমার বাইরে সরে গেছে রাধা।

মকবুল আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ফিস্‌ফিস্ করে বললে, খাসা চেহারা, খাসা গান!

সুধাকর বললে, হুঁ।

কিন্তু কতক্ষণ এভাবে থাকা যায় আর? একটা বনবেড়াল যেন হৃৎপিণ্ডটাকে আঁচড়ে চলেছে সমানে। কপালের ওপরে খর-খর বিঁধছে একরাশ তীক্ষ্ণধার কাঁটা। খানিক পরেই সুধাকর বললে, তুমি গান শোনো, আমি নৌকোয় ফিরে যাই।

—সে কি কথা! এই তো সবে জমে উঠেছে!—মকবুলের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

—আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে—আর থাকতে পারছি না।

—কিন্তু বড় ভালো গান হচ্ছে যে!

—তা হোক।

মকবুল আর আপত্তি করল না। তার সারা মন পড়ে রয়েছে গানের দিকে।

সমস্ত মানুষ যখন দুকান ভরে রাধার গান শুনছে—তখন আসর থেকে একা বেরিয়ে এল সুধাকর। বন্দরের অন্ধকার পথটাকে আরো কালো মনে হচ্ছে এখন। পায়ের নিচে মাটিটা কালাবদরের ঢেউয়ের মতো দুলছে। ছ'বছরের ক্ষুধার্ত জানোয়ারটা এখন আর এক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করতেও রাজী নয়!

রাধা! এতদিন পরে যখন পেয়েছে—তখন আর ছাড়বে না। সেদিন আঠারো বছরের মন নিঃসংশয় হতে পারেনি—ছোটবাবুর প্রেতমূর্তিটা সব সময় চোখের সামনে যেন ভেসে বেড়াত। কিন্তু এই ছ'বছরে অনেক গাঙ্ পাড়ি দিয়েছে সুধাকর—অনেক কালবৈশাখীর মুখে পাল তুলেছে মাতাল নদীতে। গত শীতকালে বল্লম দিয়ে চিতাবাঘও মেরেছে একটা। চব্বিশ বছরের সুধাকর এত সহজেই হাল ছাড়বে না।

*   *   *

মকবুল ঘাটে ফিরল রাত এগারোটার পরে। মুখে গুন্-গুন্ গান। অদ্ভুত পরিতৃপ্ত সমস্ত মন। এমন কি রোকেয়া বিবির ক্ষোভটাও ভুলে গেছে আপাতত।

—কী দোস্ত, ঘুমিয়েছ?

ঘুমোবার সাধ্য কি সুধাকরের! অসহ্য যন্ত্রণা চমকে বেড়াচ্ছে সর্ব শরীরে। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে বেরিয়ে ডাকাতি-খুনোখুনি যা হোক একটা কিছু করে আসে!

—কী মাঝির পো, ঘুমে বেঘোর নাকি?

আবার জিজ্ঞাসা এল মকবুলের। কিন্তু সুধাকর জবাব দিলে না, পড়ে রইল মুখ গুঁজে। কথা বলবার মতো কোনো উদ্যম তার অবশিষ্ট নেই। আর কী-ই বা বলবার আছে? হয়তো মকবুলকে ব্যথার ব্যথী করা চলে, একটা উপদেশ চাওয়াও যাবে তার কাছে। কিন্তু সব কথা খুলে বলার মতো মানসিক প্রশান্তি এখন নেই সুধাকরের। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

মকবুল আর ডাকল না। সুধাকর কান পেতে শুনতে লাগল তার সুরের গুঞ্জন—রাধার গানই নিশ্চয়! তারপরে লণ্ঠন জ্বালল, তামাক সাজল, অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেল। কল্‌কেটা নদীর জলে উবুড় করে ফেলার ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ আওয়াজ পর্যন্ত কানে এল সুধাকরের।

মকবুল এবার গলা ছাড়ল :

মুখ তুলে চাও সজনি—
তোমারি নাম বাঁশিতে মোর
বাজে লো দিন-রজনী।

রাধার গান! একটা অদ্ভুত হিংস্রতায় সুধাকরের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। থামো থামো। ও আমার রাধার গান—ওর ওপরে তোমাদের কারো কোনো দাবি নেই। কিন্তু সে-কথা কিছুতেই বলা গেল না, দাঁতে দাঁত চেপে সুধাকর পড়ে রইল।

রাত বাড়তে লাগল—কৃষ্ণপক্ষের রাত। বন্দর নিঝুম হয়ে গেল—। স্টীমারঘাটের কাছে যে কেরোসিনের আলোটা জ্বলে সেটা নিবু-নিবু হয়ে এল। পন্টুন থেকে কখন একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল ঘাটবাবু—কাল সকালের আগে আর সে আসবে না। নদীর অনেকটা দূর দিয়ে আবার একটা ডেস্‌প্যাচ চলে গেল—ঢেউ এসে নৌকোগুলোকে দোলাতে লাগল দোলনার মতো—পাড়ের ওপর উঠল আছড়ে-পড়া জলের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ।

আবার সব নিথর। স্টীমার-ঘাটের আলোটা নিভে গেছে এখন। শুধু জলের কলশব্দ। থমথমে রাত নেমে এসেছে চারদিকে—নদীটাকে কেমন আদি-অন্তহীন মনে হচ্ছে এখন। কেমন অদ্ভুত গুমোট রাত—কেমন ছাইরঙের অন্ধকার। হঠাৎ মনে হয় এর পরেই উঠবে একটা প্রচণ্ড 'কাইতান'—কার্তিকের ঝড়।

এই রকম এক-একটা রাত মাঝিদের বুকে ভয় ধরায়। এমনি এক-একটা থম্‌থমে অন্ধকারে নদীর চাপা শব্দটা যেন একটা গোপন-অর্থে ভরে ওঠে—হঠাৎ সন্দেহ হয় জলের মধ্যে কারা যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে। একটু কান পেতে শুনলেই সে কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে।

কারা কথা কইছে? কারা তারা?

সুধাকর জানে—মকবুল জানে—এ অঞ্চলের সমস্ত মাঝিরাই জানে। নদী—মা! জল দেয়, অন্ন দেয়। জ্যোৎস্নার রঙে—ভোরের আলোয় রূপসী হয়ে মন ভোলায়। কিন্তু!

কিন্তু এই সব রাত্রে? তার অতল তলায় যারা আছে তাদের ঘুম ভাঙে। কত মানুষ ডুবে মরেছে এই নদীর জলে, দায়ের আর বল্লমের ঘায়ে কত লোককে খুন করে ডাকাতেরা এই সর্বনাশা জলেই ভাসিয়ে দিয়েছে, গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করেছে কত জন—কতজনকে কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে! এমনি এক-একটা নিশি-পাওয়া রাত্রেই তাদের ঘুম ভাঙে। তখন কুমীরেরা ভয়ে ডাঙার দিকে পালিয়ে আসে, কামট, পাঙাশ আর ইলিশ মাছের দল আতঙ্কে নদীর তলায় কাদা কামড়ে পড়ে থাকে—একটা শুশুক পর্যন্ত ডিগ্‌বাজী খায় না। আর তখন—

তাদের যারা দেখে তারা শিবনেত্র হয়ে যায়। টকটকে লাল চোখে কোনো দৃষ্টি থাকে না—মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে বোবা গোঙানি। তারপর তিন দিনের দিন জ্বরবিকারে মরে যায়, নয়তো দু ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ওলাউঠোয়—মরা-মাঝির নৌকো স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চলে যায় যেদিকে খুশি।

সুধাকরের বুকটা গুর-গুর করে উঠল।

ভয় নয়—তার রক্তের তলা থেকেও অমনি একটা প্রেত উঠে আসতে চাইছে। কী অন্ধকার—কী বীভৎস অন্ধকার! পাতলা একটা মেঘের আস্তর ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, যেন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে রাতটা।

এই রাত! এই রাত সব সময়ে আসে না। কিন্তু যেদিন আসে—

সুধাকর চোরের মতো উঠে পড়ল। জলের শব্দ—দূরে ব্যাঙের ডাক। দু একটা বোয়াল মাছ ছলাৎ-ছলাৎ করছে ইতস্তত। সুধাকর নৌকো থেকে নেমে গেল নিঃশব্দে।

বন্দরের অন্ধকার পথ দিয়ে নিঃসাড়ে চলল সুধাকর। একটা গোসাপ পালিয়ে গেল সামনে দিয়ে—দু-তিনটে শেয়াল জ্বলজ্বলে সবুজ চোখে তার দিকে তাকিয়ে পাশের ঝোপগুলোতে গা-ঢাকা দিলে। আচমকা হাওয়া দিল একটা—এদিক-ওদিকের সুপুরিবন থেকে দুটো-চারটে পাকা সুপুরি টুপটুপ করে ঝরে পড়ল।

হঠাৎ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধাকর। একটু দূরেই একটা লণ্ঠন আসছে।

—ঘুমের মানুষ—জাগো—হো—

চৌকিদার। দেখতে পেলে এমনি ছাড়বে না—আধঘণ্টা ধরে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—নইলে হয়তো টেনেই নিয়ে যাবে থানায়। কয়েকটা বন্যগাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল সুধাকর।

—ঘুমের মানুষ—জাগো—হো—

ডাকতে ডাকতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল চৌকিদার। হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁক ঘুরে।

আরো খানিক নিঃসাড় হয়ে রইল সুধাকর। তারপরে আবার চোরের মতো এগোতে লাগল বন্দরের পথ ধরে। পায়ের কাছে ঝপাৎ করে কী পড়ল—দুরদুর করে উঠল বুক। নাঃ—ভয়ের কিছু নেই। কটায়-খাওয়া একটা শুকনো নারকেল খসে পড়েছে গাছ থেকে।

কিন্তু এই তো—বারোয়ারীতলা। এখানেই আস্তানা নিয়েছে ঢপের দল।

সদরের বড় দরজাটা বন্ধ। ভেতরেও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। উঁচু-উঁচু দেওয়ালগুলো যেন ভূতুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একবারের জন্যে অনিশ্চিত হয়ে রইল সুধাকর। কিন্তু আর উপায় নেই। এত দূর

যখন এসেছে—কোনো মতেই ফিরে যাওয়া চলে না। এই ভূতে পাওয়া সর্বনেশে রাত্রে তাকেও যেন ভূতে পেয়েছে। যা হওয়ার হোক—একটা কিছু সে করে যাবেই। যেমন করে হোক—রাধার কাছে তাকে পৌঁছুতেই হবে।

কিন্তু!

এই ছ'বছর পরে রাধা যদি তাকে চিনতে না পারে? যদি ছ'টা বছর নদীর জলের মতোই একেবারে মুছে গিয়ে থাকে তার মন থেকে? রাধার জীবনে হয়তো সুধাকরের মতো কত মানুষ এসেছে, আরো কত আদরে সোহাগে ভরে দিয়েছে তাকে। সেখানে জেলের ছেলে সুধাকরকে সে মনে রাখতে পারে না। রাখবেই বা কোন্ দুঃখে?

তা ছাড়া ওই মেয়েটিই যে রাধা—তাই বা কে বলতে পারে জোর করে? দূর থেকে যতটুকু দেখেছে তাতে তো ভুলও হতে পারে তার। একরকম চেহারার মানুষ কি দুজন থাকতে নেই সংসারে!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে লাগল। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না। সন্দেহের শেষ কোথাও নেই। তাকে যতই বাড়িয়ে চলো—ততই সে ফেঁপে উঠতে থাকবে। থামতে সে জানে না।

তার চেয়ে যা হওয়ার তাই হোক। রাধাই হোক আর যেই হোক, এসেছে যখন আর ফেরা চলে না।

উঁচু পাঁচিলের চুন-সুরকি ঝরে গেছে—ইট বেরিয়ে পড়েছে এখানে ওখানে। তাদের ওপর পা দিয়ে সতর্ক একটা জন্তুর মতো উঠতে লাগলো সুধাকর। তারপর তিন মিনিটের মধ্যেই একেবারে প্রাচীরের মাথায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল সে—রাত্রির প্রেতের মতো চোখটা তীক্ষ্ণ করে দেখতে চাইল সবটা।

নাটমন্দিরেই পড়ে আছে সব। একরাশ মড়ার মতো নিস্তব্ধ। সারাদিনের ক্লান্তির পরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দেওয়ালের মাথাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে যথাসম্ভব নিজের শরীরটাকে নিচে ঝুলিয়ে দিলে সে। তবু আরো দুহাত তলায় মাটিটা। হাতটা ছেড়ে দিতেই সে নিচে পড়ল, ধুপ্ করে আওয়াজ উঠল একটা।

কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে রইল সুধাকর—দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। কারো কি ঘুম ভেঙে গেছে, টের পেয়ে গেছে কেউ? অসহ্য উৎকণ্ঠায় হাতুড়ি পড়তে লাগল বুকের মধ্যে। কান পেতে সে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগল।

না—কেউ নড়ে উঠল না। তেমনি নিঃসাড় নিস্পন্দ সব। একদল মড়া মানুষের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। প্রাচীর ঘেঁষে ঘেঁষে ছায়ামূর্তির মতো সরতে লাগল সুধাকর। এর মধ্যে কোথায় সে খুঁজে পাবে রাধাকে?

সতর্ক পায়ে ঘুমন্ত মানুষগুলোর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করল সুধাকর। নানা অঙ্গভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে সব। মাথার কাছে ছোট বড় পুঁটলি—হারমোনিয়াম, খোল—অন্ধকারে চক্‌চকিয়ে ওঠা পেতলের করতাল। কিন্তু মেয়েরা কোথাও নেই।

আরে তাই তো—মেয়েরা কী করেই বা থাকবে খোলা নাটমন্দিরে? নিশ্চয় আর কোথাও আছে তারা। কিন্তু কোথায় তা হতে পারে?

ভয়ের আড়াল ভেঙে সুধাকর ক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল। অন্ধকারে একটা রাত্রির

প্রাণীর মতো সে নাটমন্দিরের চারদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তারপর ভোগের ঘরের কাছে আসতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে।

এককালে বারোয়ারীতলা যখন জমজমাট ছিল, তখন এই ঘরে বড় বড় হাঁড়ায় ভোগ রান্না হত। সে দশ বছর আগের কথা। এখন আর ও ঘর কোনো কাজেই লাগে না। কবাটহীন দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাতেই সুধাকরের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম করল।

প্রায় দরজার পাশেই শুয়ে আছে রাধা—নিঃসন্দেহেই রাধা। ওদিকের জানালা দিয়ে হেলে-পড়া চাঁদের আলো তার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ছ'বছর আগেকার সেই মুখ—কপালে সেই উল্কির চিহ্ন। আরো ভারী হয়েছে—আরো ফর্সা হয়েছে যেন। কয়েক মুহূর্ত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের রক্তে করতাল শুনতে লাগল সুধাকর। তারপর লঘুভাবে স্পর্শ করে ডাকল ঃ রাধা!

সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড হল একটা।

বিদ্যুৎবেগে রাধা উঠে বসল। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে সুধাকরের গালে। চোখে যেন সর্ষের একরাশ ফুল দেখতে পেল সুধাকর।

—তুমি আবার এসেছ বাবাজী? তোমার লজ্জা করে না? তোমাকে আমি হাজার বার বলিনি যে তেমন মেয়ে আমাকে তুমি পাওনি?—সাপের গর্জনের মতো চাপা তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল রাধার গলায়।

বিহ্বলতা। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। তার পরেই সুধাকর বললে, বাবাজী নয় রাধা—আমি!

—কে—কে তুমি?—তারস্বরে রাধা চিৎকার করে উঠতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সুধাকরের হাত পড়ল তার মুখে। আত্মরক্ষার জৈবিক তাগিদে নিষ্ঠুরভাবে রাধার মুখ চেপে ধরে ফিসফিসে গলায় সুধাকর বললে, রাধা—আমি—আমি! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি জেলের ছেলে সুধাকর।

এতক্ষণ দুহাতে রাধা সুধাকরের হাত সরাতে চাইছিল, বো-বো করে একটা চাপা আওয়াজ উঠছিল তার গলা থেকে—ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তার চোখ। কিন্তু সুধাকরের নামটা কানে আসতেই তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। ঝুলে পড়ল হাত দুটো—উদ্‌ভ্রান্ত চঞ্চল চোখের তারা দুটো এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সুধাকর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলে।

—আমাকে এর মধ্যেই কি ভুলে গেলে তুমি?

রাধা আরো কিছুক্ষণ কথা কইতে পারল না। অদ্ভুত বিহ্বল চোখে সমানে তাকিয়ে রইল।

—এই ছ'বছর ধরে আমি দিন গুনেছি। শুধু তোমারি জন্যে। তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না?

রাধা হঠাৎ যেন আত্মস্থ হয়ে উঠল। জড়িয়ে ধরল সুধাকরের দুহাত।

—কী করে এলে তুমি এখানে?

—যেমন করে আসতে হয়। প্রাচীর টপকে।

—এখনি পালাও। পালিয়ে যাও এখান থেকে।

—তোমাকে না নিয়ে আমি আর যাব না।

—সর্বনাশ, কী করে নেবে আমাকে?

—যেমন করে নিজে এসেছি। প্রাচীর টপকে।

—মাঝি, তুমি কি পাগল? এখনো ধরা পড়োনি—সে তোমার বিস্তর পুণ্যের ফল। কিন্তু বেশি দেরি করলে কী যে হবে কিছুই বলা যায় না। এরা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে পৌঁছে দেবে থানায়—দারোগা হাজতে ভরে দেবে চোর বলে। তুমি পালাও—

—রাধা!

—আমাকে তুমি পাবে না মাঝি। আমি ছাড়লে দল ভেঙে যাবে। সর্দার বৈরাগী বাঘের বাচ্চার মতো পাহারা দেয় আমাকে। আমি ইচ্ছেয় চলে যেতে চাইলেও ছাড়ান নেই তার হাত থেকে। আগে ডাকাতি করত, এখন বুড়ো হয়ে গেছে, খুঁতো হয়ে গেছে ডান হাত, তাই বৈরাগী সেজে ঢপের দল খুলে বসেছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই খুন করতে পারে এখনো।

—আমিও খুন করতে পারি!—সুধাকরের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

—তোমার হাত ধরছি মাঝি, আমার কথা রাখো। আজ তুমি পালাও। কাল সন্ধ্যায় যখন গান শেষ হয়ে যাবে, তখন মন্দিরের পেছনে বড় গাব গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়ো। আমার যা বলবার আছে সেই তখন বলব।

—বেশ, তাই হবে।—সুধাকর উঠে দাঁড়ালো। দুচোখে ক্ষুধার্ত আগুন ছড়িয়ে বললে, সেই কথাই রইল। কিন্তু ছ'বছর তোমার জন্যে দিন গুনেছি আমি—আর আমার সইবে না। কাল যদি একটা হেস্তনেস্ত না হয়—তাহলে দুজনের একজন খুন হয়ে যাবে।

সুধাকর নাটমন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল। যেন মিলিয়ে গেল চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে। রাধা বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

একটু পরেই বাইরে শব্দ উঠল ঃ ধুপ্—ঝপাস্!

এতক্ষণে ঘুম ভেঙে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল সর্দার বৈরাগী ঃ কে—কে ওখানে?

রাধার বুকের ভেতরটা যেন আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কেউ জবাব দিলে, কী আর হবে! একটা খটাস কিংবা একটা ভাম হয়তো!

॥ ৪ ॥

সকালে যখন সুধাকরের ঘুম ভাঙল, সূর্য তখন অনেকখানি উঠে বসেছে আকাশে। রোদে ধার লেগেছে—একটু পরেই এসে পড়বে এক্সপ্রেস স্টীমার। চকিতভাবে উঠে পড়ল সুধাকর। নৌকোর খোলের ভেতর থেকে উদ্‌বেড়ালের ডাক আর মৃদু মৃদু আঁচড়ানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে ওর।

সুধাকর উদ্‌কে টেনে তুলল নৌকোর ওপর। তারপর জল দেখিয়ে বললে, যা—সঙ্গে সঙ্গেই ছপাৎ করে শব্দ। উদ্ জলে পড়ল।

সুধাকর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল জলের ভেতর কীভাবে ওর ধূসর শরীরটা খেলে বেড়াচ্ছে।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। তারপরেই উদ্ সাঁতরে এল নৌকোর দিকে। বেশ বড় চেহারার একটা সরপুঁটি মাছ তার মুখে।

সুধাকরের পায়ের কাছে মাছটা এনে সে রাখল।

সদয় হাসিতে সুধাকর ইঙ্গিত করলে, খা—

বেশি বলবার দরকার ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ তার সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

সুধাকর তাকিয়ে দেখল চারপাশে। অনেক নতুন নৌকোর আমদানি হয়েছে—চেনা, অচেনা। অনেক নৌকো সোয়ারী নিয়ে চলে গেছে। মকবুলও।

কখন গেল? কী জানি! যাওয়ার আগে হয়তো দু চারবার ডেকেও ছিল তাকে। কিন্তু সুধাকর একেবারে জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে—একটা শব্দও তার কানে যায়নি।

নিজের মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিলে সুধাকর। কালকের রাতটা কীভাবে কেটেছে তার? যা কিছু হয়েছে সে কি স্বপ্ন? সব কি ঘটে গেছে ঘুমের ঘোরে? সেই ছ'বছর পরে দেখা রাধাকে—অসহ্য উত্তেজনায় মাঝরাতে সেই নাটমন্দিরে গিয়ে হাজির হওয়া—সেই আশ্চর্য আবিষ্কার—সর্দার বৈরাগীর কথা—রাধা—আরো সুন্দর হয়েছে, ফর্সা হয়েছে আরো—

কিন্তু কী করেই বা বলা যাবে স্বপ্ন? ওই তো পর-পর দুখানা ভাউলি নৌকো দাঁড়িয়ে। ঢপের নৌকো! ওই তো যেন একটা স্টীমার-ঘাটের কাঠের রেলিঙে বসে চড়া সুরে গান ধরেছে ঃ

'ওলো, মন-মজানো বিনোদিনী রাই লো,—
তোমার প্রেম-সায়রে ডুব দিয়েছি
তল তবু না পাই লো!'

সুধাকরের মাথার ভেতরে চড়াৎ করে উঠল। আজ সন্ধ্যার পরে গান শেষ হলে মন্দিরের পেছনে নিথর কালো গাব গাছটার ছায়ায়। তারপর—তারপর একটা খুন হয়ে যাবে। হয় সর্দার বৈরাগী, নইলে সে নিজেই। দুজনে একসঙ্গে পেতে পারে না রাধাকে।

—মাঝি, কেরায়া যাবে?

দুজন ভদ্রলোক যাত্রী। বগলে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা—হাতে চামড়ার সুটকেস্।

—কোথায় যাবেন? কত দূরে?

—গৈলা।

—গৈলা! সে তো অনেক দূর!

—অনেক দূর বৈকি!—ভদ্রলোক যাত্রীরা ভ্রূকুটি করলেন ঃ হেঁটে যেতে পারলে আর তোমার নৌকো ভাড়া করতে আসব কেন? যাবে কিনা বলো?

—না, অত দূর যেতে পারব না।

—ওরে বাপরে, তোমরা দেখছি দস্তুরমতো বাবু হয়ে গেছ আজকাল। ঘাট হয়েছে বাপু, তোমাকে বিরক্ত করেছি। বসে-বসে ঝিমুচ্ছিলে—ঝিমোও।

ঠাট্টা করে গেল বাবুরা! তা যাক। আজ কিছুতেই ঘাট ছেড়ে নড়বে না সুধাকর—কুড়ি টাকার কেরায়া পেলেও না। কাছাকাছির যাত্রী হলে তবু ভেবে দেখা যেত—সন্ধ্যের আগেই যাতে সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু আজ উৎসাহ নেই। আজ সারাদিন সে

অপেক্ষা করবে—অপেক্ষা করবে দাঁতে দাঁত চেপে। অসহ্য প্রতীক্ষাটাকে মন্থন করবে নিজের রক্তের ভেতরে।

দূরে গম্ভীর বাঁশির আওয়াজ। স্টীমার-ঘাটে চাঞ্চল্যের স্পন্দন। এক্সপ্রেস স্টীমার আসছে। পুরো একটা দিন—চব্বিশ ঘন্টা। কিন্তু এই একটা দিনের মধ্যেই যেন যুগ-যুগান্ত কাল-কালান্ত পার হয়ে গেছে সুধাকর। ছ'বছর ধরে বুকের মধ্যে সব ঝিমিয়ে এসেছিল—এখন খড়ের আগুনের মতো দপদপ করে জ্বলছে।

স্টীমার এগিয়ে এল ঘাটের দিকে। সাড়া পড়েছে নৌকোর মাঝিদের মধ্যে, ঘাটের কুলিদের ভেতরে। মাঝনদী থেকে বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে—কাদাভরা তীরের ওপর। ইঁটের পাঁজাটার ওপরে গোটা দুই মাছরাঙা বসে ছিল— কর্কশ আওয়াজ করে আকাশে ডানা মেলল তারা।

স্টীমার ঘাটে এসে লাগল। আজকে লোক নামল আরো কম। মাত্র দু-চারটি যাত্রী—ঘাটের কাছাকাছি যে দু-চারটে নৌকো ছিল, যা হয় তারাই ভাড়া পেল।

যাক—নিশ্চিন্ত। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত প্রতীক্ষা।

কিন্তু ও কে! হঠাৎ খরশান হয়ে উঠল সুধাকরের দৃষ্টি।

দু-তিনজন বৈরাগী এসে ঘাটের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে—স্টীমার দেখতে এসেছে। তাদের মাঝের লোকটাকে দেখবামাত্র একটা অশুভ অনুমান বিদ্যুতের মতো চমকে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

সর্দার বৈরাগী! নিঃসন্দেহ!

এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে কালো কদাকার লোকটাকে। মাথার চুল ধূসর—মুখে বসন্তের গোটাকয়েক চিহ্নও আঁকা আছে বলে বোধ হল। বয়েস হয়েছে, একটু কুঁজোও হয়েছে পিঠটা। তবু শরীরটা এখনো অসামান্য শক্তিমান। মুখে একরাশ বিশৃঙ্খল সাদা দাড়ি—হাওয়ায় উড়ছে সেগুলো। চেহারা দেখলেই মনে হয়—রাধার কথা মিথ্যে নয়, লোকটা এককালে ডাকাতি করত।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঘ। শিকারের মতো আগলে বসে আছে। সহজে কেড়ে নেওয়া যাবে না! এ ছোট রায়কর্তা নয়—এর চোখ নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না। অনেকখানি শক্তির পরীক্ষা দিয়েই এর কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে রাধাকে।

সুধাকর জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ভুল হয়ে গেছে—মস্ত বড় ভুল। সেদিন সে হাত বাড়িয়ে দিলেই রাধাকে কেড়ে নিতে পারত, ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারত যেদিকে যতদূরে খুশি, সেদিনকার সেই সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে। আঠারো বছরের শরীরে উন্মাদনা ছিল, কিন্তু মনে সাহস ছিল না। তখনো অনেক ঝোড়ো নদী তার পাড়ি দেওয়া হয়নি, তখনো বল্লমে ফুঁড়ে চিতাবাঘ মারবার সাহস ছিল না তার। সেদিন সুযোগ হারিয়েছে, তাই আজ তার জন্যে ঢের বেশি দাম দিতে হবে।

চিতা বাঘ নয়—লড়তে হবে জাত-বাঘের সঙ্গে!

তা হোক।

লোকগুলো বন্দরের দিকে ফিরে চলেছে। সুধাকরের ইচ্ছে হল এখনি গিয়ে দাঁড়ায় লোকটার সামনে—এই মুহূর্তেই যা হোক একটা কিছুর চরম নিষ্পত্তি করে ফেলে।

কিন্তু—কিন্তু এখনো সময় হয়নি। আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে তাকে।

দিন এগিয়ে চলল—বেড়ে চলল বেলা। আবার নদী উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোদের খরধারে, খরশুলা মাছের ঝাঁক নৌকোর আশেপাশে খেলে বেড়াতে লাগল। সুধাকরের মনে পড়ল রান্না চাপানো দরকার। কাল রাতে সে কিছুই খায়নি।

চাল আছে, আলু আছে, পেঁয়াজ আছে দু'চারটে। উদ্ নামালে এক-আধটা মাছও মিলতে পারে হয়তো। কিন্তু খাওয়ার জন্যে বিশেষ উৎসাহ হচ্ছে না। যা আছে চলে যাবে ওতেই।

ক্লান্তভাবে তোলা উনুনটায় আগুন দিতে বসল সুধাকর।

আচ্ছা, ধরো যদি রাধাকে পাওয়া যায়—

বুকের নাড়ীগুলো তারের বাজনার মতো ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠল ঃ যদি রাধাকে পাওয়া যায়? কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? ওই ঘরে—ওই গ্রামে? যেখানে পিসির কাছে তাকে জিম্মা করে রেখে আবার পরের সোয়ারী বওয়া? নিজের ঘর ছেড়ে রাতের পর রাত এই খাল-বিল-নদী-নালায় ভূতের মতো ঘুরে বেড়ানো? তার নৌকোয় উঠবে অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী, সারারাত তারা গুঞ্জন করবে জলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আর তখন—

তখন দাঁতে দাঁত চেপে হয়তো বা নৌকোর লগি ঠেলে চলবে সুধাকর? ওরা যখন দুজনে ঘন হয়ে জড়িয়ে থাকবে, তখন তার মাথার ওপরে ঝরঝরিয়ে ঝরবে বৃষ্টির জল?

তা হয় না। কিছুতেই না।

আজ যদি কয়েক কাঠা ধানী জমি থাকত! থাকত একটুখানি ক্ষেতখামার! রাধাকে নিয়ে কী নিশ্চিন্ত আনন্দে তাহলে সংসার বাঁধত সে! সামনে ধানের ক্ষেত, ঘরে রাধার সোনা মুখ, জানলা দিয়ে সোনার মতো চাঁদের আলো—

ধান! ক্ষেত! মাটি!

নদীর মতো দুলে ওঠে না—রাক্ষসী ক্ষুধায় থাকে না মুখ বাড়িয়ে। একটু অসতর্ক হও—সঙ্গে সঙ্গে আর কথা নেই! অমনি ডাইনীর মতো হাজারটা হাত বাড়িয়ে একেবারে টেনে নেবে পেটের মধ্যে। মেঘের লক্ষণ দেখে যদি বুঝতে না পারো, তাহলে অথৈ গাঙের ক্রোধ থেকে আর তোমার আত্মরক্ষা করবার কোনো আশাই নেই। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া যদি সেই রকম একটা রাত আসে? যে রাতে জলের অতল থেকে উঠে আসে সেই সব অপঘাতের দল? যারা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিয়েছে, যাদের নিচে টেনে নিয়েছে মানুষখেকো কুমীর—গলায় কলসী বেঁধে আত্মহত্যা করেছে যারা, যদি কখনো তাদের হাতে তোমাকে পড়তে হয়? তারপরে কী হবে সে কথা ভেবে লাভ নেই।

তার চেয়ে ভালো মাটি। ঢের ভালো। সে স্থির—সে ভর সয়। জীবনকে আঁকড়ে রাখে দুহাতে। তার ওপরে ফুল ফোটে—পাখি গান গায়, ফসল ফলে। তার ওপরেই মানুষ ঘর বাঁধে। মাটি—একটুখানিও সে যদি পেত!

তা হলে রাধাকে নিয়ে সোনার সংসার গড়ে তুলত সেখানে।

সুধাকর চমকে উঠল। ধক্ করে জ্বলে উঠেছে উনুনটা। একটু হলেই তার হাতে লাগত আগুনের ঝলক।

দিনটা কী অদ্ভুত বিলম্বিত! যেন নদীর স্রোতটা হঠাৎ থমকে গেছে—যেন সূর্যটা আর চলতে পারছে না। কোনোমতে একমুঠো ভাত গিলে, উদ্‌কে খাইয়ে—সুধাকর লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

মাটি। ধানের ক্ষেত। নদীর স্রোতের মতো অস্থির অনিশ্চিত জীবন নয়।

যদি একটুখানি জমি থাকত তার—তবে কি এইভাবে ঘুরে বেড়াত সে? সুধাকর জানে—চব্বিশ বছর চিরদিন থাকবে না। তারপরে আসবে চল্লিশ—পঞ্চাশ। সেদিন আর এমন শক্তি থাকবে না শরীরে—সেদিন মাতলা নদী পার হওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না সে—রাত্রির পাথুরে অন্ধকারে সে পথ দেখতে পাবে না। সেদিন?

এই মাটি নেই বলেই তো এমন করে নতুন বৌকে ফেলে গাঙে গাঙে ঘুরে বেড়ায় মাঝিরা। মাটি নেই বলেই তো জীবনের মূল নেই কোথাও—স্রোতের কচুরিপানার মতো তাদের ভেসে বেড়াতে হয়। তাই মকবুল রাতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর অভিশাপ দেয় ইদ্‌রিশ মিঞাকে, তাই রোকেয়া তার কাছে আশমানের চাঁদের চাইতেও সুদূর।

রাধা! রাধাকে নিয়ে থাকবার মতো একটু মাটি যদি সে পেত! পেত একফালি নিশ্চল মাটি!

ঘটাং-ঘট্—

একটা নৌকো এসে ধাক্কা দিলে সুধাকরের নৌকোর গায়ে। ভয়ঙ্কর ভাবে দুলে উঠল সবটা।

বিরক্ত হয়ে উঠে বসল সুধাকর ঃ গায়ের ওপর এমন করে এসে নাও ভিড়োয় কে? একটুও আক্কেল-পছন্দ নেই নাকি?

যার নৌকো, সে তখন হিংস্রভাবে লগি পুঁতছে নৌকোর। বললে, মকবুল!

—সোয়ারী নামিয়ে ফিরলে?

—না।—তিক্ত জ্বালাভরা গলায় মকবুল বললে, নিজের কবর দেখে এলাম।

—কবর? কী বকছ দোস্ত? পাগল হলে নাকি?

হিংস্রভাবেই নৌকোর লগিটা মকবুল ছইয়ের ওপরে ছুঁড়ে দিলে।

—কী হয়েছে খুলে বলো দেখি।

—বলছি।—মকবুল ঝুপ করে প্রায় এক-হাঁটু জলের মধ্যে নেমে পড়ল—অনেকখানি ভিজে গেল লুঙ্গিটা। তারপর ক্ষিপ্ত স্বরে বললে, শালার নৌকোর তলা ফুটো করে ডুবিয়ে দেব মাঝগাঙে!

—উঠে এসো, উঠে এসো এখানে।—নিজের কথা ভুলে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠল সুধাকর ঃ সব খুলে বলো। নতুন কিছু করেছে নাকি ইদ্‌রিশ মিঞা?

মকবুল উঠে এল সুধাকরের নৌকোয়। কান থেকে একটা বিড়ি নামালো ধরাবার জন্যে, তারপরেই সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নদীর জলে ছড়িয়ে দিতে লাগল। দুটো লাল টক্‌টকে চোখ সুধাকরের মুখে ফেলে দিয়ে বললে, শালা গোলাম সর্দার এতদিন তামাসা করছিল আমাকে নিয়ে!

—সে কি!

মকবুল পৈশাচিক মুখে বলে যেতে লাগল ঃ তলায় তলায় ঠিক ছিল সবই। হয়তো বান্দার খরচায় একটু মজা দেখবার জন্যেই ওকে লেলিয়ে দিয়েছিল শয়তান ইদ্‌রিশ

মিঞা!

—কী হয়েছে? অমন রেখে রেখে বলছ কেন?—সুধাকর অধৈর্য হয়ে উঠল ঃ খোলসা করো সব।

—খোলসা কী করব আর? খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম ইদ্‌রিশ মিঞার সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়ে গেছে!

সুধাকর অস্ফুট আর্তনাদ করল একটা।

—বিশ্বাস হচ্ছে না—না?—মকবুল অদ্ভুত ধরনের হাসতে চেষ্টা করল ঃ এই-ই দুনিয়া। তিনটে বিবি আছে ইদ্‌রিশ মিঞার—চারটে বাঁদী। কিন্তু তবু আর একটা বিবি না হলে শরিয়তী কানুনটা পাকা হয় না। তাই তিনশো নগদ টাকা দিয়েছে গোলাম আলী সর্দারকে—টিনের ঘর করে দেবে এরপরে। থুঃ—মকবুল জলের মধ্যে থুথু ফেলল। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুধাকর। তারপর ঃ কিন্তু রোকেয়া বেগম? তার আশ্‌নাই?

—মেয়েমানুষের আশ্‌নাই! ও শুধু কথার কথা! হাজার হাজার টাকা ইদ্‌রিশ মিঞার—হাজার বিঘে ধানের জমি—গণ্ডা গণ্ডা গোরু ছাগল মুরগী—পাঁচ-সাতটা খামার। রোকেয়া হবে লাল বিবি—ইদ্‌রিশ মিঞার চোখের সুর্মা হয়ে থাকবে। কোন্ দুঃখে ও আসবে ভাঙা গোলপাতার ঘরে—কেন খেতে যাবে ক্ষুদের জাউ আর পেঁয়াজের তরকারি!

—কিন্তু দোস্ত—সুধাকর যেন বারকয়েক খাবি খেল ঃ আমি ভেবেছিলাম রোকেয়া বিবি তোমাকে—

—খুব পেয়ার করে, না?—আমার সেই অদ্ভুত বিকৃত হাসিটা ভেসে উঠল মকবুলের মুখে ঃ মেয়েমানুষ শুধু জোরকেই পেয়ার করে। হয় টাকার জোর—নইলে গায়ের জোর। টাকার জোরে ইদ্‌রিশ মিঞা ওকে নিয়ে গেল, কিন্তু তার আগে আমি যদি ওকে গায়ের জোরে কেড়ে আনতাম, তা হলে এমন করে বুক চাপড়াতে হত না আমাকে।

মেযেমানুষ শুধু জোরটাকেই পেয়ার করে! কথাটা যেন তীরের মতো এসে আঘাত করল সুধাকরকে। তাই বটে! সেই ভুল করেই সে একবার হারিয়েছিল রাধাকে—আর আজ—

মকবুল কর্কশ গলায় বলে চলল, ইদ্‌রিশ মিঞার বাড়িতে খুব খানাপিনা হচ্ছে। আমাকে বললে, বড় বড় মুরগী রান্না হচ্ছে—পোলাও হচ্ছে—মিঠাই এসেছে। খেয়ে যা। আমি ভাবছিলাম কোথাও যদি খানিক বিষ পাই তা হলে মিশিয়ে দিই ওই পোলাওয়ের সঙ্গে! ওই ইদ্‌রিশ মিঞা, ওই লাল বিবি, ওই হারামী গোলাম আলী সর্দার—এক-সঙ্গেই মিটে যায় সমস্ত!

যদি বিষ পাই! কিন্তু একথা কেন বলছে না মকবুল যে ইদ্‌রিশ মিঞাকে সে খুন করবে?

—চলে যাব, শহরেই চলে যাব। আমার পক্ষে শহরও যা—নদীও তাই। মজুরের খেটে খাওয়াই সার—সে নদীতেই হোক আর শহরেই হোক।

হাঁটুতে থুত্‌নি রেখে মকবুল বসে রইল। সুধাকরের মনে হল, অদ্ভুত রকমের ভাঙাচোরা যেন তার চেহারাটা। যেন প্রকাণ্ড একটা তালগাছের মাথা থেকে আছাড়ে

পড়ে সম্পূর্ণ তালগোল পাকিয়ে গেছে সে।

সুধাকর আস্তে আস্তে বললে, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে মকবুল।

—পরামর্শ! কিসের?—মকবুল যেন কেমন চমকে উঠল।

—মেয়েমানুষ সম্বন্ধেই।

—মেয়েমানুষ?—মকবুল গজরে উঠল ঃ না—ওর মধ্যে আমি আর নেই। কোনো কথা শুনতে চাই না আর।

—কিন্তু শুনতে তোমাকে হবেই।—সুধাকর মকবুলের কাঁধে হাত রাখল ঃ তোমার রোকেয়া তোমায় ঠকিয়েছে—কিন্তু আমার রাধা আমায় ঠকাতে পারবে না। তোমাকে আমার দরকার।

—মেয়েমানুষ! থুঃ!—জলে আবার থুথু ফেলে মকবুল বললে, বলে যাও।

॥ ৫ ॥

বারোয়ারীতলায় ঢপ-কীর্তন আজ শেষ হয়ে গেল।

গানটা আরো ভালো জমেছিল আজ। রাধাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মাটির নয়—আকাশ থেকে নেমে এসেছে। তার গলায় গন্ধর্বলোকের সুর।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর!
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে—
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে—"

'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।' তেমনি নাটমন্দিরের বাইরে—দরজার সামনে অসংখ্য চাষাভূষোর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান শুনেছে সুধাকর। হিয়ার পরশের জন্যে হিয়া কাঁদে না—কথাটা ভুল। বুকের প্রত্যেকটা হাড়-পাঁজরা পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে।

চারদিকে বার বার হাততালি পড়েছে আজ। সাহাবাবুদের বাড়ির ছেলেরা শহরের কায়দায় বলেছে, এন্‌কোর—এন্‌কোর! আর তারি তালে দুলে উঠেছে রাধার শরীর—যেন জোয়ারের ঢেউ দুলেছে উছল গাঙে। রামধন সাহা নিজে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—একটা সোনার মেডেল দেবেন রাধাকে। রাধা তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করেছে। কিন্তু সুধাকর এসব দেখেছে নিছক ছায়াবাজীর মতো। যেন স্বপ্ন দেখেছে। শুধু অপেক্ষা করেছে কখন শেষ হবে গান—কখন সেই অন্ধকার গাব গাছের নিচে—

আসর শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কালো ছায়ার তলায় নিশ্চল প্রতীক্ষা সুধাকরের। সময় বয়ে চলেছে। কই—রাধা তো আসছে না এখনো!

তবে কি আসবে না? তবে কি মিথ্যেই স্তোক দিয়েছে কাল? সুধাকরের চোখের সামনে একটা রক্তাক্ত ঘূর্ণি ঘুরছে যেন। যদি না আসে, তা হলে—

শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ একটা। সুধাকরের হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে চাইল। রাধাই বটে। অন্ধকারের মধ্যে একটা শ্বেতপদ্মের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে—চিকচিক করছে গলার সোনার হার। সুধাকর এগিয়ে এল। দুঃসহ উত্তেজনায় বললে, রাধা! দু'পা পিছিয়ে গেল রাধা। বললে, না।—আমার সঙ্গে চলো রাধা। নদীতে নয়—খালের ঘাটে নৌকো রেখে এসেছি। দুটো সুপুরিবন পার হলেই খাল। আঁধারে

আঁধারে চলে যাব—কেউ দেখতে পাবে না।

—আমি যাব না।—পাথরের মতো শক্ত শোনালো রাধার স্বর।

সুধাকরের গায়ে যেন সাপের ছোবল লাগল।

—রাধা?

—আমি যাব না। কেন যাব?—রাধার গলার স্বরে বিদ্রোহ ভেঙে পড়ল ঃ কোন্ দুঃখে মরতে যাব তোমার সঙ্গে? ছ'বছর আগে তোমায় ভালো লেগেছিল—একটা মাতাল শয়তানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আসতে চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তো আমার কোনো কষ্ট নেই। কত নাম হয়েছে আমার—গয়না হয়েছে, টাকা হয়েছে। সর্দার বৈরাগী আমার হাতের মুঠোয়। কেন যাব আমি?

সুধাকরের গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইল।

—রাধা, ছোট রায়কর্তাও তোমাকে অনেক সোনাদানা দিয়েছিল।

—দিয়েছিল বই কি। কিন্তু সেদিন আমার বয়স ছিল অল্প, তাই তার কদর বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার চোখ খুলেছে। আমি জানি টাকাতেই সুখ। সে টাকা আমি দুহাতে রোজগার করতে পারব। মাঝি, তুমি ফিরে যাও।

—রাধা!

—তুমি ফিরেই যাও মাঝি, সে-ই ভালো হবে সবচেয়ে। সর্দার বৈরাগী টের পেয়ে যাবে এখনি। সে এলে আর তোমার রক্ষা থাকবে না। এককালে ডাকাতি করত সে—দরকার হলে এখনো খুন করতে পারে।

—তা হলে সেই চেষ্টাই সে করুক।—সুধাকর আর নিজের ধৈর্য রাখতে পারল না। দৃঢ় কঠিন বাহুতে হঠাৎ সে দুহাতে রাধাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

কাল রাতের মতোই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলতে চাইল রাধা—কাল রাতের মতোই সুধাকর তার মুখ চেপে ধরল। তীব্র গোঙানি—প্রাণপণ ছট্‌ফটানি কিছুক্ষণ। কাঁধের গামছাটা সজোরে সুধাকর রাধার মুখের ভেতরে চালিয়ে দিলে। একটু পরেই নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে পড়ল রাধা।

ঝোপের মধ্য থেকে এগিয়ে এল মকবুল।

—দিব্যি হয়েছে—খাসা। এই হল পাকা হাতের কাজ। পালাও এবার।

অন্ধকার সুপুরি বাগানের মধ্য দিয়ে পথ। মাঝরাতের চাঁদ উঠতে আরো দেরি আছে খানিকটা। রাধাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে কুঁজো হয়ে এগোতে লাগল সুধাকর। কিন্তু পিঠে অত বড় ভারটাকেও যথেষ্ট ভারী বলে মনে হচ্ছে না তার। শুধু রক্তের চাপে বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম করছে। আর পেছনে পেছনে পাহারা দিতে দিতে আসছে মকবুল। ঠিকই বুঝেছিল সে। মেয়েদের পেতে গেলে জোর চাই। সে টাকার জোর হোক—আর গায়ের জোরই হোক!

খালের ধারে যেখানে শ্মশান—আশেপাশে জনমানুষের চিহ্ন নেই যেখানে, সেইখানেই ভাঙা ঘাটলার আড়ালে সুধাকরের নৌকোটা লুকানো ছিল। রাধাকে নৌকোয় নামিয়ে ছইয়ের ভেতরে তাকে ঠেলে দিলে সুধাকর। মড়ার মতো পড়ে রইল রাধা। তারপরে দুখানা দাঁড় ধরল দুজনে। তীরের মতো খালের কালো জল কেটে নৌকো এগিয়ে চলল। একটি কথা নেই কারো মুখে।

প্রায় দশ মিনিট পরে নৌকো বড় গাঙে গিয়ে পড়ল। স্টীমারঘাট অনেকখানি বাঁদিকে পড়ে আছে—মিট্‌মিট্‌ করছে ঘাটের কেরোসিনের আলোটা, জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে নৌকোগুলো। সেই দিকে তাকিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল সুধাকরের।—দোস্ত, তোমার নৌকো যে পড়ে রইল!

—নৌকো আমার নয়—ইদ্‌রিশ মিঞার।

—কিন্তু—

—কেন মিছিমিছি নিয়ে আসতে যাব ওই বাঁদীর বাচ্চার নৌকো? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি তো শহরে চলেছি, খেটেই খাব সেখানে। ওর নৌকো থাক্ পড়ে। গরজ থাকে তো নিজেই নিয়ে যাবে খোঁজ করে।

আর কোনো কথা বলল না কেউ। দুখানা দাঁড়ের টানে নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলল কালো অন্ধকারের স্রোত বেয়ে। তারপর আরো খানিকটা পরে যখন মাঝরাতের চাঁদ উঠল আকাশে, দুজনের মুখে পড়ল তার আলো, তখন আবার কথা কইল মকবুল। —মুখের গামছাটা খুলে দাও মেয়েটার। নইলে শেষে হয়তো দম আটকেই মরে যাবে।

* * *

রাত ভোর হয়ে গেছে। রাধা চোখ মেলল। স্তিমিত শান্ত আলোয় ঝিমন্ত চোখে বৈঠা বাইছে সুধাকর। রাধা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। মাথাটা তার পরিষ্কার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রাধা ডাকল, মাঝি?

সুধাকর চমকে উঠল। রাধা উঠে বসেছে। বসেছে গলুইয়ে হেলান দিয়ে।

আবার ডাকল, মাঝি?

সুধাকর বিবর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন নিজের অপরাধটা একটা কালো ছায়ার মতো তার সামনে এসে দাঁড়ালো। রাধাকে জোর করে ধরে এনেছে সে। কিন্তু রাধার মন যদি ধরা না দেয় তার কাছে? চোখ তুলে তাকানোর সাহসও সে খুঁজে পেল না—নতদৃষ্টিতে পাণ্ডুর জলের দিকে চেয়ে রইল।

রাধা বললে, অত শক্ত করে কি মুখ বাঁধে? একটু হলেই মরে যেতাম যে।

—আমায় মাপ করো রাধা—একটা আবেগ ঠেলে এল সুধাকরের গলায় ঃ ঝোঁকের মাথায় তোমাকে ধরে এনেছি। কিন্তু এখন দেখছি, তাতে লাভ নেই। আমি তোমায় ফিরিয়েই দিয়ে আসব।

রাধা হাসল। করুণ, ক্লান্ত হাসি।—ফিরেই যদি যাব, তা হলে কাল কেন দেখা করতে আসব তোমার সঙ্গে?

হঠাৎ নৌকোটা দুলে উঠল—যেন একদিকে হেলে গেল একবার।

রাধা বললে, কী করছ—ডুবিয়ে দেবে নাকি নৌকো? জোর করে ধরে এনে শেষে ডুবিয়ে মারবে নদীতে?

বিহুল বিস্ময়ে সুধাকর বললে, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

রাধা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চোখ তুলল আকাশের দিকে। পূবের দিগন্ত রাঙা হয়ে আসছে—সাদা মেঘের মাথায় সিঁদুর পড়ছে একটু একটু করে। তারই

একটুখানি আভা এসে যেন রাধার সিঁথিতেও পড়ল—অন্তত সেই রকমই মনে হল সুধাকরের।

রাধা গম্ভীর গলায় বললে, কী যে হয়েছে সে কি আমিই বুঝতে পারছি? আমি খাঁচার পাখির মতো। খাঁচা আমার সয়ে গেছে—দাঁড়ে বসে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু কেউ যদি খাঁচার বাইরে এনে আমায় ছেড়ে দেয়, তা হলেই কি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি আমি?

—আর একটু স্পষ্ট করে বলো রাধা!—আকুল গলায় জানতে চাইল সুধাকর।

—কী স্পষ্ট করে বলব এর চেয়ে?—সিঁদুরে আলোটা এবার শুধু রাধার সিঁথিতেই নয়, তার সারা কপালেও ছড়িয়ে পড়ল ঃ ছোট রায়কর্তার ঘর থেকে পালাতে পারতাম অনেকদিন আগেই, তবু এত দেরি হল কেন পালাতে? খাঁচার নেশা আমার সহজে কাটতে চায় না। ভেবেছিলাম বোষ্টুমি হয়ে বৃন্দাবনে চলে যাব—তোমাকেও ভুলে যাব। পারলাম কই? পদ্মার ওপারে শ্রীপাট খেতুরের মেলায় গিয়ে পড়লাম সর্দার বৈরাগীর হাতে। ভিড়লাম ঢপের দলে—সর্দার বৈরাগী আমাকে সেবাদাসী করে নিতে চাইল—লোভ সামলাতে পারলাম না। আবার চলে এলাম খাঁচায়। তারপর কাল রাতে তুমি এলে। মন একবার দুলে উঠল, তারপরেই মনে হল ঃ আর নয়—এই বেশ আছি। কিন্তু থাকতে তো পারলাম না। চলে এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আর তুমিও কী করবে—সেও আমি জানতাম। তোমার চোখ দেখেই আগের রাতে সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—তবে কেন মিথ্যে করে আমায় বাধা দিলে?

—মিথ্যে করে বাধা দিইনি মাঝি—সেও সত্যি। জোর করে না আনলে আমায় তুমি পেতে না—সর্দার বৈরাগীই তার জোরে আমায় ধরে রাখত।—ভোরের আলো এবার সোনা হয়ে রাধার চোখমুখ আলো করে তুলল।

সুধাকর এবার সোজা হয়ে বসল। আঠারো বছরের চঞ্চলতা ফিরে এসেছে শরীরে—এসেছে চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। হাতের পেশীতে সমস্ত শক্তি এনে জোর করে বৈঠায় টান দিলে সুধাকর। বললে, এবার আমার জোরেই তোমায় ধরে রাখব রাধা।

রাধা হাসল। সূর্যের প্রথম আলোয় মন-ভোলানো অপরূপ হাসি।—পারবে?

—পারব।

—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে? শহরে?

—না, শহরে নয়।—এবার সুধাকরও হাসল ঃ সেখানে অনেক ছোট রায়কর্তা আছে, অনেক সর্দার বৈরাগী আছে। তাদের সকলের সঙ্গে জোরে আমি পেরে উঠব না। আমি তোমায় দক্ষিণে নিয়ে যাব।

—দক্ষিণে?

—হ্যাঁ। নতুন চরে নতুন মাটি উঠেছে সেখানে। বিনা পয়সায় পত্তনি পাওয়া যায় শুনেছি। নোনা কাটিয়ে ফসল ফলাব আগে, তারপরে দেব খাজনা। আর সেইখানে ঘর বাঁধব তোমায় নিয়ে।

রাধা স্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। আর ঠিক সেই সময় কাঠের পাঠাতনের তলা থেকে একলাফে সুধাকরের কোলের কাছে লাফিয়ে উঠল জুয়ান। রাধা চমকে উঠে চাপা আর্তনাদ করল একটা। সুধাকর হা-হা করে হেসে উঠল।

—ভয় নেই, আমার উদ্—জুয়ান ওর নাম। দুজন বন্ধু আমার—একজন জুয়ান, আর একজন মকবুল।

জুয়ান তখন সুধাকরের হাঁটুতে মাথা ঘষছে। এক হাতে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুধাকর। কৌতুকভরা চোখে রাধা দেখতে লাগল। তারপর শুধালো ঃ —মকবুল কে?

—সে না থাকলে কী করে আনতাম তোমাকে? সে-ই তো ভরসা দিয়েছিল। তাকিয়ে দেখো, পেছনের গলুইয়ে সে ঘুমুচ্ছে।

রাধা ফিরে তাকালো।—কই, পেছনের গলুইয়ে তো কেউ নেই!

—নেই!—সুধাকর চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল ঃ নেই! তাই তো—তবে কোথায় গেল মকবুল?—পাণ্ডুর বিবর্ণমুখে বললে, তবে কি জলে পড়ে গেল? অনেকক্ষণ আগে নৌকোটা একবার দুলে উঠেছিল বটে—ঝুপ্ করে একটা আওয়াজও হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম শুশুকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল বোধ হয়। তবে কি মকবুল ঘুমোতে ঘুমোতে—

কিন্তু মকবুল তো ঘুমুতে ঘুমুতে জলে পড়ে যায়নি। একটা চরের পাশ দিয়ে যখন নৌকো চলেছে, তখন নিজেই সে টুপ করে নেমে পড়েছিল তা থেকে। কারণ রোকেয়াকে সে পায়নি। কিন্তু দেখেছে রাধাকে কী করে পেয়েছে সুধাকর। আরো দেখেছে রাধার রূপ—নিজের বুকের মধ্যে শুনেছে উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি। যদি নিজের মনের পশুটা তার বাগ না মানে? যদি ওইভাবেই সেও সুধাকরের কাছ থেকে রাধাকে কেড়ে নেবার কথা ভাবে? যদি শয়তান তার মাথার ভেতরেই সব কিছু ওলোট্-পালোট্ করে দেয়? তার চেয়ে—

প্রথম সূর্যের আলোয় একটা নির্জন চরের একবুক বেনাঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে মকবুল ভাবতে লাগল, তার চেয়ে আর একবার ফিরে যাবে গ্রামে। আর একবার নতুনভাবে চেষ্টা করে দেখবে—রোকেয়াকে সত্যিই ফিরে পাওয়া যায় কিনা।

সীমান্ত

দাওয়ায় বসে চিন্তিত মুখে হুঁকো টানছিল ফজলে রব্বি। না, আর দেরি করা উচিত নয়। এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বিয়েশাদীর ব্যবস্থা করে ফেলতে হচ্ছে মেয়েটার।

এদিক থেকে তাদের নিয়মকানুন বরং অনেকটা ভালো। নিতান্ত চাষাভুষোর ঘরেও ন'বছর হতে না হতে পর্দা হয়ে যায় মেয়েদের—অনেকখানি আড়াল থাকে শকুনগুলোর চোখ থেকে। কিন্তু হিঁদুর ঘরের বেটি, নট্‌খট্ করে সব জায়গায় বেরুনো চাই। গাঁয়ের যে বখা-বাঁদরগুলো আগে তটস্থ হয়ে থাকত ভয়ে, ইদানীং যেন সাপের পাঁচখানা করে পা দেখেছে তারা। কিছুদিন থেকেই এ রাস্তায় তাদের আসা-যাওয়া অকারণে বেড়ে উঠেছে। কবে রাতারাতি কী হয়ে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে—

ছেলে তাহের একখানা গোরুরগাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছিল। ফজলে রব্বি তাকে ডাকল।

—হ্যাঁ রে, কোন্ দিকে চললি?

—সাপাহার হাটে যাব বা-জান। ধান আনতে হবে আজ।

—ভালোই হল। যাওয়ার সময় কান্তরামকে ডেকে দিবি একবার।

—কান্তরাম? তাহের একবার চোখ মিটমিট করলঃ সে তো শুনছি হিন্দুস্থানে পালাবার ফিকির খুঁজছে। তাকে কেন?

ফজলে রব্বি চটে উঠলঃ সব কথার জবাবদিহি করতে হবে নাকি তোকে? যা বললাম তাই করবি।

—আচ্ছা।—মুখ গোঁজ করে তাহের গাড়িতে গিয়ে উঠল। চাপা ক্রোধে একটা নির্দোষ গোরুর ওপরেই সবেগে চালিয়ে দিলে শাঁটাটা। একরাশ ধুলো উড়িয়ে মেহেদী-বেড়ার আড়ালে গাড়িটা অদৃশ্য হল।

বিরক্ত হয়ে হুঁকো নামাল ফজলে রব্বি। সত্যি-সাঁই মেয়েটা তার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। নিজে বুড়ো হয়ে পড়েছে, তার ওপরে একটা পা তার খোঁড়া। এমনিতেই অশক্ত মানুষ, সব সময়ে আগলে আগলে রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া পট্ করে একদিন যদি মরে যায়, তাহলে যে মেয়েটা অথই জলে পড়বে এ সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে। হাঙর-কুমীর চারদিকে মুখিয়ে তো আছেই, তার নিজের ছেলে তাহেরের মতিগতিও খুব সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না। তাই বেঁচে থাকতে থাকতে কোনো বেইমানি ঘটবার আগেই মেয়েটার একটা সুরাহা সে করে দিয়ে যাবে।

বন্ধু!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সুতোয় টান পড়ল একটা ; আর সেই টানে পুতুলবাজীর মতো কতকগুলো পেছনের দিন সামনে এসে দাঁড়ালো। পাশাপাশি বাড়িতে থাকত, পাশাপাশি জমিতে চাষ করত দুজন, তার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে তাতে একটা নল বসিয়ে টান লাগাত দয়াল মণ্ডল। বন্ধু বইকি! অমন বন্ধু কারো হয় না—কারো কোনদিন হয়নি।

তারপর ঝড়ের রাত এল! সে ঝড় আকাশ ভেঙে ঝরে পড়ল না, মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। সমস্ত রাত ধরে লাল মাটির মাঠ জুড়ে ডুম-ডুম করে মেঘের ডাকের মতো বাজতে লাগল সাঁওতালের নাগারা-টিকারা। বাঘের জিভের মতো সড়কি বল্লম টাঙির ফলা।

আগস্ট আন্দোলন। নামটা ভোলবার কথা নয়—কলিজার ভেতর গাঁথা হয়ে আছে আগুনের হরফে। সেদিনের লড়াইয়ের ডাকে দয়াল মণ্ডল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, ফজলে রব্বিও পেছনে পড়ে থাকল না। প্রথম দুটো দিন কাটল অবিচ্ছিন্ন জয়ের গৌরবে। শহর দখল হয়ে গেল—থানার বাবুরা, মহকুমা হাকিম কে যে কোন্ দিকে পালিয়ে বাঁচল, তার হদিস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মনে হল, ইংরেজ সরকার ফৌত হয়ে গেছে, কায়েম হয়েছে গরিবের মালিকানা, দেশের মানুষ তার দেশের মাটি ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু তিন দিনের দিন এল ফৌজ। একটা টিলার দুধারে জমায়েত হল দুদল। এপার থেকে যখন সড়কি বল্লম নিয়ে হাজার মানুষ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, ওপার থেকে তখন তার জবাব দিলে কয়েকশো বন্দুক। সে বন্দুকের সামনে টাঙি বল্লম শুকনো পাতার মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল, সেই সঙ্গে বুক চেপে পড়ে গেল দয়াল মণ্ডল।

হাঁটুতে গুলি খেয়ে তার পাশেই বসে পড়েছিল ফজলে রব্বি। মরবার আগে দয়াল মণ্ডল তার হাত ধরল।

—আমার বেটিটাকে দেখো দোস্ত। ওর আর কেউ নেই। ওর ভার তোমার হাতেই

দিয়ে গেলাম।

সেই থেকেই ফুলমণির দায় ফজলে রব্বির ওপরে এসে পড়েছে। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল কাঞ্চন নদীর ওপর দিয়ে। যে আজাদীর জন্যে অতগুলো মানুষ অমন করে প্রাণ দিলে, যার জন্যে অতগুলো মানুষকে অমন করে চাবুক মারা হল, জ্বালিয়ে দেওয়া হল গ্রামের পর গ্রাম, কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল ধানের গোলা—সেই আজাদী একদিন না চাইতেই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো। বাও নেই, বাতাস নেই, অথচ ভাদ্র মাসের পাকা তাল যেমন টুপ করে পড়ে যায়, তেমনি করে আজাদী এসে পৌঁছুল।

ভারী তাজ্জব লেগেছিল গোড়াতে। পাকিস্তানের কথা শোনা আছে অনেকবার, ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারে ভোটও দিয়েছে লীগের লোককে, কিন্তু পাকিস্তান যে এমন বিনা নোটিশে মুঠোর মধ্যে চলে আসবে, কে ভেবেছিল সে কথা!

এসেছে, ভালই হয়েছে। মুসলমানের মাটি, মুসলমানের তমদ্দুন! কোথাও কোথাও এ নিয়ে খুব দাঙ্গা ফ্যাসাদও হয়েছে হিন্দু-মুসলমানে—সেকথাও অজানা নেই ফজলে রব্বির। কিন্তু ওসব দাঙ্গার আঁচ কখনো এসব তল্লাটে লাগেনি, কখনো-সখনো মৌলবীরা গরম গরম বক্তৃতা শুনিয়ে গেছে বটে, কিন্তু লোকে ঝিমুতে ঝিমুতে সে-সব কথা শুনেছে, কখনো কান পাতেনি। কিন্তু সত্যি-সত্যিই পাকিস্তান হয়ে গেল। নদীর ওপার থেকে ঝাঁক বেঁধে আসতে লাগল মুসলমান, এপার থেকে দল বেঁধে পালাতে লাগল হিন্দু। বোঝা গেল রাতারাতি পালটে গেছে দুনিয়ার হালচাল। কিন্তু মনে মনে কিছুতেই একটা জিনিসের ফয়শালা করতে পারল না ফজলে রব্বি। আজাদীব জন্যে যে মাটিতে দয়াল মণ্ডল তার বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে দিলে—সেই মাটিই তার রইল না, সে হল ভিন দেশের বাসিন্দা!

চিরকালের চেনা মানুষগুলো যখন এক এক করে পর হয়ে গেল, বুকের ভেতরে তখন মোচড় দিয়ে উঠেছিল বইকি। তবু মনে হয়েছিল এক দিক দিয়ে এ ভালই হয়েছে। কাগজের পাতায় আর লোকের মুখে উড়ো-উড়ো ভাবে যখন কলকাতার খবর আসত, খবর আসত 'কাফের'রা কিভাবে সাবাড় করে দিচ্ছে মুসলমানের ধন-প্রাণ-ইজ্জৎ, তখন খাঁটি মুসলমান ফজলে রব্বিও কি রক্তের মধ্যে একটা চঞ্চলতা অনুভব করত না? আগুন ঝরানো ভাষায় মসজেদে মোক্তবে মৌলবী সাহেবরা যখন 'ওয়াজ' করে যেতেন, তখন সে আগুনের তাপ কি তাকেও এসে স্পর্শ করত না? তার চাইতে এই-ই ভালো হয়েছে। ওরা থাক হিন্দুস্থান নিয়ে, পাকিস্তান নিয়ে খুশি থাক মুসলমান। কারো গায়ে কেউ এসে পড়বে না, যার যত ইচ্ছে বাজনা বাজাক, আর যত খুশি কোরবানী করুক। কোনো ঝামেলা নেই।

তবু ঝামেলা বেধেছে ফুলমণিকে নিয়ে।

দয়াল মারা যাবার পরে তার জমিজিরেত ফজলে রব্বিই তদারক করত। মেয়েটাকে দেখবার জন্যে ভিন গাঁ থেকে এসেছিল তার এক বিধবা মাসী। মোটের ওপর নিশ্চিন্তেই কাটছিল দিনগুলো। কিন্তু আট বছরের ফুলমণি যখন সতেরো বছরে পড়ল, তখন একদিন ওলাবিবির নেকনজরে পড়ে চোখ বুজল মাসী। আর সেই থেকে মুখের প্রতিটি গ্রাস তেতো হয়ে উঠলো ফজলে রব্বির। একা ঘরে থাকে মেয়েটা, একা ঘাটে জল ভরে।

তারই সুযোগ নিয়ে শুরু হয়েছে ভূতের উৎপাত। দিনদুপুরে বাড়ির সামনে কে গান গেয়ে ওঠে, পুকুরপাড়ের ভাঁট ঝোঁপের আড়াল থেকে চড়া গলায় শিস্ টানে রাতবিরেতে, টর্চের আলো পিছলে পড়ে উঠোনে দাওয়ায়।

এই তো কাল সকালে। ফুলমণি এসে বললে, চাচা, আর তো ঘাটে যেতে ভরসা পাই না।

—কেন, কি হয়েছে?—নড়েচড়ে বসল ফজলে রব্বি।

—পানু মোল্লার বড় ছেলে জিকরিয়া আজ দুদিন থেকে ছিপ নিয়ে ঘাটে বসছে। আর যা-তা বলছে আমাকে।

—জিকরিয়া!—অসহ্য ক্রোধে ফজলে রব্বির সারা গা জ্বলে উঠল। এক নম্বরের বদমায়েশ, একটা মেয়েচুরির হাঙ্গামায় কিছুদিন আগেও দুবছর হাজত খেটে এসেছে। এতদিন চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াত, হালে আবার বড্ড বাড় বেড়েছে ওঃ। নাঃ, একবার দেখতে হচ্ছে!

খোঁড়া পা-খানাকে টেনে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ফজলে রব্বি ঃ আয় আমার সঙ্গে।

ঘাটে তখনো ছিপ ফেলে বসে ছিল জিকরিয়া ওরফে জ্যাকেরিয়া। ওদের আসতে দেখে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না, তাকিয়ে রইল ফাত্নার দিকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ফজলে রব্বি। ভেবেছিল, তাকে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পাবে না জিকরিয়া। কিন্তু আশ্চর্য দুঃসাহস, অবিশ্বাস্য স্পর্ধা ছোকরাটার!

নিজেকে সামলে নিয়ে ফজলে রব্বি বললে, জিকরিয়া!

মাথা না তুলে জিকরিয়া সাড়া দিলে, কী বলছ?

—ছিপ নিয়ে বসেছিস কেন মণ্ডলের পুকুরে?

—মাছ ধরব।—শান্ত নিস্পৃহ স্বর জিকরিয়ার।

—কিন্তু পরের পুকুরে মাছ ধরতে কে হুকুম দিয়েছে তোকে?

—পাকিস্তানে হিন্দুর কোনো সম্পত্তি নেই। সব মুসলমানের।

ফজলে রব্বি এইবার ফেটে পড়ল।

—চুপ কর হারামজাদা বদমায়েশ! তোদের মতো শয়তানের জন্যেই পাকিস্তানের এত বদনাম। উঠে যা বলছি এক্ষুনি, উঠে যা—

আকস্মিক বিস্ফোরণে বিভ্রান্ত হয়ে ছিপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল জিকরিয়া। কিন্তু তার দু চোখে আগুন ঝিলমিল করতে লাগল।

—অত চোখ দেখিয়ো না মিঞা—এ তোমায় বলে দিচ্ছি।

—কী করবি, কী করবি তুই? হতভাগা শয়তান! খোঁড়া পা নিয়েই হিংস্র ক্রোধে জিকরিয়ার দিকে এগোতে লাগল ফজলে রব্বি ঃ ফের এদিকে এগোবি তো মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

জিকরিয়া পিছু হটতে লাগল। তার সমস্ত মুখ যেমন কুটিল, তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ঃ কাফেরের পথ নিয়ে তুমিও বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছ মিঞা। কিন্তু অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আমার মাথা গুঁড়োবার ভয় দেখাচ্ছ, কিন্তু অমন করে চোখ রাঙালে তোমারো ভালো হবে না।

এরপরে একমাত্র হাতের লাঠিটা তুলেই ছুঁড়ে মারতে পারত ফজলে রব্বি। করতে যাচ্ছিলও তাই, কিন্তু তার আগেই বুদ্ধিমানের মতো উধাও হয়েছে জিকরিয়া। অদৃশ্য হয়েছে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে।

—হারামজাদা!—নিরুপায় ক্রোধে ফজলে রব্বি দাঁত কিড়মিড় করল একবার, বিষাক্ত চোখে তাকালো ফুলমণির দিকে ঃ কাল থেকে ঘাটে আসবার সময় আমায় ডাকবি তুই।

কিন্তু এমন করে কতদিন আগলে রাখা যাবে? শয়তানের মওকা পড়েছে চারদিকে। মানুষের আরজ আর খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছোয় না। সাচ্চা লোকের জান-মান কিছুই আর থাকবে না বলে সন্দেহ হয়। রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে পাপ—মজ্জায়-মজ্জায় বাস্তু বেঁধেছে বেইমানি। খোঁড়া পা দিয়ে বুড়ো ফজলে রব্বি কতদিন লড়তে পারবে, লড়তে পারবে ক'জনের সঙ্গে?

নইলে তাহের—তার নিজের ছেলে তাহের! সেই কিনা বলতে পারল কথাটা!

—ফুলমণির শাদী নিয়ে এত ভাবনা কেন আব্বাজান? দিয়ে দাও না আমাদের মকবুলের সঙ্গে। কথাটা শুনতে পায়নি, এমনি বিহ্বল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল ফজলে রব্বি। তাহের আবার শুরু করল ঃ কালই কল্‌মা পড়িয়ে উকিল ডেকে—

কথাটা শেষ হতে পারল না। তার আগেই ফজলে রব্বির ডান পায়ের চটিটা বাজের মতো গিয়ে উড়ে পড়ল তাহেরের গালে। একটা টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলে তাহের।

—কমবখ্‌ত—উল্লুক! ফের যদি এসব তোর মুখে শুনতে পাই তাহলে পঁচিশ পয়জার লাগিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দেব।

তাহের চলে গেল। কিন্তু যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেল—সে দৃষ্টি জিকরিয়ার চোখের। ঠিক কথা—তামাম দুনিয়া জুড়ে শয়তানের দেওয়ানি কায়েম হয়েছে। কেউ বাদ নেই, কোথাও বাদ নেই। বাইরের ক্ষ্যাপা কুত্তাগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরের দাওয়াতে যখন গোমা সাপে গর্ত করে বসে আছে, তখন যত তাড়াতাড়ি দায় চুকিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

হ্যাঁ, কান্তরাম। ভালোই হবে। দয়ালেরই স্বজাতি। দেখতে-শুনতেও মন্দ নয় ছোকরা, সুখীই হবে ফুলমণি। হিন্দুস্থানে পালাতে চাইছে কান্তরাম—তা পালাক। একেবারে চোখের আড়াল হয়ে যাবে মেয়েটা এ কথা ভাবতে গেলেও মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের ভেতরে। কিন্তু নিজের চেনা, নিজের জানা মানুষগুলোর মধ্যে গিয়েই নিশ্চিন্ত হোক মেয়েটা, দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক। ফুলমণি তার নিজের মেয়ে হলেও এর চাইতে বেশি কী আর দোয়া সে চাইতে পারত আল্লা রহমানের কাছে?

না, কান্তরামের সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে আজকালের মধ্যেই। নইলে চট্‌ করে কোন্‌ দিন হিন্দুস্থানে সরে পড়বে তার ঠিকঠিকানা নেই কিছু।

নেবা হুঁকোটায় একটা টান দিয়ে নামিয়ে রাখল ফজলে রব্বি। পোড়া টিকে আর তামাকের ছাই ঝাড়তে লাগল দাওয়ার নিচে।

—ডেকেছেন বুড়ো মিএগ?

কান্তরাম ভয়ার্ত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে দাওয়ার নিচে। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই হাত কচলাতে শুরু করবে যেন। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর সব হিন্দুর চোখেই ওই

রকম একটা উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতা লক্ষ্য করেছে ফজলে রব্বি। যেন কোথা থেকে কেউ মস্ত একটা ডাণ্ডার ঘা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওদের শিরদাঁড়াগুলো, ওদের কলিজার রক্তটুকু শুষে নিয়েছে কেউ। দিনেদুপুরে আচমকা বেরিয়ে পড়া শেয়াল যেমন পালাবার জন্য ঝোপঝাড় সন্ধান করে বেড়ায়, ওরাও ঠিক সেই রকম সব সময় একটা লুকোবার জায়গা খুঁজে ফিরছে।

বিশ্রী লাগে, কেমন সহজভাবে কথা বলতে পারা যায় না ওদের সঙ্গে। মিষ্টি করে বললে সন্দেহ করে, চোখ রাঙালে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সত্যিই ওদের ঘৃণা করা যেন আর অন্যায় নয় এখন।

ফজলে রব্বি ভ্রূকুটি করল।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে একটা চৌপাই টেনে নিলে কান্তরাম।

—চলে যাচ্ছ বুঝি ঘরবাড়ি ছেড়ে?

কান্তরাম মাথা নিচু করে রইল, জবাব দিলে না।

—তা যাও। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে মরতে যাও যেখানে খুশি।—ফজলে রব্বি আর একবার ভ্রূকুটি করল ঃ কিন্তু এই বুড়োর একটি আর্জি আছে তোমার কাছে।

—আর্জি! হকচকিয়ে উঠল কান্তরাম ঃ আর্জি কি বুড়ো মিঞা? হুকুম করুন।

—থামো! পাকামি করো না—ফজলে রব্বি একটা ধমক দিলে ঃ দয়াল মণ্ডলের মেয়ে ফুলমণিকে দেখেছ তো?

—দেখেছি।—সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল কান্তরাম।

—কেমন মেয়ে?

—তা—তা মন্দ কি! কান্তরাম গোটা দুই ঢোঁক গিলল। প্রশ্নটার কোন অর্থবোধ করতে না পেরে তাকিয়ে রইল বোকা-বোকা শঙ্কিত দৃষ্টিতে।

—ফুলমণিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

—কী বললেন?—কান্তরাম ভয়ানক ভাবে চমকে গেল এবারে।

—অমন হাঁ করছ কেন! আমি কি রসগোল্লা গিলতে বলছি নাকি? খাসা মেয়ে ফুলমণি, আমার নিজের বেটির মতোই দেখি ওকে। ঘরে নিলে বর্তে যাবে। তোমাদের যা পাওনা-থোওনা সব আমিই দেব, সেজন্যে কিছু আটকাবে না তোমার।

—আজ্ঞে তা বটে তা বটে।—কান্তরাম মাথা নাড়তে লাগল ঃ কিন্তু—

—কিন্তু আবার কী? হিন্দু, তোমার স্বজাতি—কিন্তু কোথায় এল এর ভেতরে?—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ফজলে রব্বি জানতে চাইলে।

—আমি বলছিলাম—কান্তরাম ঢোঁক গিলল ঃ ওদের নিচু ঘর, আমাদের সঙ্গে ঠিক—

—চোপরাও!—জিকরিয়া আর তাহেরের ওপরে সঞ্চিত ফজলে রব্বির যা কিছু ক্রোধ দ্বিগুণ বেগে ফেটে পড়ল কান্তরামের ওপর ঃ নিচু ঘর! জাতের বড়াই হচ্ছে! ওই করেই মরতে বসেছ তোমরা! খেয়াল থাকে যেন এটা পাকিস্তান। এখন যদি মাটিতে চিৎ করে ফেলে খানিক গোস্ত ঠেলে দিই, জাতের গরমাই কোথায় থাকবে তখন?

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল কান্তরাম। পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল চৌপাইটার ওপরে।

—জাত জাত! অসহ্য জ্বালায় দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল ফজলে রব্বি ঃ আজ যদি গুণ্ডারা এসে মেয়েটাকে লোপাট করে নিয়ে যায়, জাতের মান বাড়বে তোমার? যদি জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে ওর বিয়ে দিই, হিঁদুর মুখ উজ্জ্বল হবে? ডরপোক জানোয়ারের দল! একটা মেয়ের ইজ্জত বাঁচাবার সাহস নেই, জাতের বড়াই! সাধে কি তোমাদের ঠেঙিয়ে দূর করে দিতে চায় পাকিস্তান থেকে।

নিষ্প্রাণ কান্তরাম নড়ে উঠল এবার। থরথর করে কাঁপতে লাগল বাঁশপাতার মতো। তার হাত দুটোকে জড়ো করে আনল কোনোক্রমে। প্রায় নিঃশব্দ আবছা গলায় বললে, মাপ করুন। আপনি যা বললেন, তাই করব।

... ...

পুরো একটা বছর হয়ে গেছে তারপর।

আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে ফজলে রব্বি, খোঁড়া পা-খানাকে টেনে চলতে আরো বেশি কষ্ট হয় আজকাল। তাহেরের হাতে তুলে দিয়েছে ঘরসংসার ক্ষেত-খামারের ভার—শূন্য দাওয়ায় বসে বসে ঝিমোনো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আজকাল। এক-একবার ইচ্ছে করে এই শেষ বয়সে হজটা একবার ঘুরে আসে, কিন্তু উৎসাহ হয় না, ভরসা জাগে না দুর্বল অশক্ত দেহটার ওপরে।

ঝিমঝিমে স্তব্ধ দুপুরে নেশা-জড়ানো চোখে চুপ করে বসে থাকে দাওয়াটার ওপরে। কানে আসে শালিকের কচকচি, ঝিরঝিরে হাওয়ায় সামনের নিমগাছ থেকে ঝুরঝুরিয়ে পাতা পড়তে থাকে; আর ওই ঝরা পাতাগুলোর মতোই বোধ হয় জীবনকে—তার দিনগুলোও যে কবে কখন অমন করে ঝরে গেছে, ভালো করে যেন মনেও পড়ে না সে-সব।

নিমগাছটার পেছনেই দয়ালের ভিটের দাওয়াটা শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। এই এক বছরেই চালের খড় ঝরে ঝরে মাটিতে মিশে গেছে ওর, হলুদের গুঁড়োর মতো রেণু-রেণু হয়ে লয় পেয়েছে ঘুণে-খাওয়া বাঁশের খুঁটিগুলো। দরজা জানালা যা ছিল, যে যা পেরেছে রাতারাতি হাতিয়েছে সব। পোড়া দাওয়ার ওপরে উঠেছে হাঁটুসমান বিছুটি কচু আর তেলাকুচোর লতা। ওখানে কোনোদিন মানুষ ছিল, ছিল সংসার—একথা যেন আজ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

ওদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশি করে মনে পড়ে বন্ধুর কথা, মনে পড়ে ফুলমণির কথা। এই দেশের জন্যে লড়াই করে যে নিজের'জান কোরবানি করে দিয়েছিল, দেশের মাটিতে তার চিহ্নমাত্র রইল না। ভারী তাজ্জব লাগে, কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। আর মেয়েটার জন্যে থেকে থেকে একটা তীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠা আর বেদনা তাকে পীড়ন করতে থাকে। যাওয়ার দিনে গোরুরগাড়িতে ওঠার আগে যখন অশ্রুভরা চোখে ফুলমণি তার পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করল, সেদিন তাকে বাধা দিতে পারেনি ফজলে রব্বি, একটা কথাও বলতে পারেনি। শুধু চলন্ত গাড়িটার ধুলোর মেঘের দিকে চোখ মেলে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ।

আজ এক বছরের মধ্যে কোনো খবর পায়নি ফুলমণির। কোথায় আছে কেমন আছে কে জানে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। মাঝখানে শুধু একটা নদীর খেয়াঘাট পার হয়েই মানুষ কেমন করে এত দূরে সরে যায় কে বলবে!

—বুড়ো মিঞা?

—কে? একটু দূরের মানুষ আর ভালো করে ঠাহর হয় না আজকাল। ভুরুর ওপর হাতখানা তুলে ধরে ফজলে রব্বি বলল, কে ওখানে?

—আমি মকবুল।

—কী খবর রে?

—ওপারে গিয়াছিলাম। তোমার ফুলমণির সঙ্গে দেখা হল।

ফুলমণি! ফজলে রব্বি চমকে উঠল ঃ কোথায় আছে তারা? ভালো আছে তো সব?

—শহরেই বাসা বেঁধেছে। কিন্তু ভালো নেই চাচা। সেই খবরটাই তোমায় দিতে বললে।

—ভালো নেই! বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল ফজলে রব্বির ঃ কী হয়েছে?

—কী একটা হাঙ্গামায় মানুষ খুন করে উধাও হয়েছে কান্তরাম। খাওয়া জুটছে না তোমার ফুলমণির। ওপারে ষাট টাকা চালের মণ আজকাল।

ফজলে রব্বি বিমূঢ়ের মতো বসে রইল। খুন করে উধাও হয়েছে কান্তরাম, উপোস করছে ফুলমণি! দুটোই এত অসম্ভব, এমন অবিশ্বাস্য যে একটা অস্ফুট শব্দ পর্যন্ত বেরুল না ফজলে রব্বির মুখ দিয়ে। সেই ভীরু দুর্বল কান্তরাম মানুষ খুন করেছে আজ! মুমূর্ষু দোস্তের কাছে কসম খেয়ে যার দায় সে মাথা পেতে নিয়েছিল, আজ না খেয়ে উপোস করছে সেই মেয়ে!

এই দিনদুপুরেও ফজলে রব্বির কানের কাছে ঝিঁঝি ডাকতে লাগল, আরো ঝাপসা হয়ে এল ঝাপসা চোখের দৃষ্টি। তাহের—তাহেরই ঠিক বলেছিল। কলমা পড়িয়ে ওই মকবুলের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ফুলমণির। হিন্দুয়ানির খাঁড়ায় মেয়েটাকে অমন করে বলি দেওয়ার চাইতে তাকে সুখী করলেই বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞার মর্যাদা বজায় থাকত তার। ভালো ছেলে মকবুল। চরিত্রবান, জমিজিরেত সব আছে। শুধু জাতের জন্য মেয়েটাকে নিজের হাতে জবাই করেছে সে—ভালো করতে গিয়ে ঠেলে দিয়েছে সর্বনাশের মুখে।

উঠে দাঁড়াতে চাইল ফজলে রব্বি, ইচ্ছে করতে লাগল ছুটে গিয়ে গলাটা চেপে ধরে কান্তরামের।

—আমি চলি বুড়ো মিঞা।—মকবুল বিদায় নিয়ে গেল।

একটা অসহ্য জ্বালায় ফজলে রব্বি জ্বলতে লাগল। উপায় করতে হবে যে করে হোক, বাঁচাতে হবে ফুলমণিকে। দরকার হলে আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে পাকিস্তানে। এবার তার নিজের মেয়েকে সে তার জাতের হাতে তুলে দেবে, যাতে তার ভাল হয়, তাই-ই সে করবে। সে কলমা পড়িয়েই হোক আর যে উপায়েই হোক।

বিকেলবেলায় তাহেরকে সে ডাকল।

—আধমণ চাল পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

—আধমণ চাল! কোথায়?

—ওপারে—শহরে। ফুলমণিকে দিয়ে আসবি।

শুনে বারকয়েক খাবি খেল তাহের।

—তুমি কি ক্ষেপে গেলে আব্বাজান?

—ক্ষেপব কেন?—ফজলে রব্বি চটে উঠল ঃ যা বলছি তাই করবি। দিয়ে আসবি চাল।

তাহের করুণার হাসি হাসল ঃ কী পাগলামি করছ? চাল নিতে দেবে কেন ওপারে?

—বোকা ভুলোচ্ছিস আমাকে, এত লোক নিয়ে যাচ্ছে—চোরা-কারবার করছে চালের, আর তুই পারবি না? না হয় আটগণ্ডা পয়সা গুঁজে দিবি হাতে!

তাহের আবার সহিষ্ণু করুণার হাসি হাসল ঃ দিনরাত তো ঘরেই বসে আছ আব্বাজান, দুনিয়ার হালচালের কোনো খবর রাখো না। আনসার আর ফৌজের ঘাঁটি বসেছে খেয়াঘাটের ধারে। এক দানা ধানচাল নিতে দেবে না ওপারে।

—ফৌজের ঘাঁটি!—ফজলে রব্বি ম্লান হয়ে রইল কিছুক্ষণ ঃ বেশ তো—তা হলে রাতের অন্ধকারে—

—আস্তে আস্তে আব্বা! কারুর কানে গেলে ফাটকে যেতে হবে।—তাহের সভয়ে বললে ঃ রাতের অন্ধকারে? কিছু বোঝো না তাই বলছ এসব কথা। ও চেষ্টা করতে গেলে ফৌজের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে যাবে। আইন হয়ে গেছে—সাঁকের পরে খেয়া পেরুনো একদম বারণ।

—আইন থাকলে বে-আইনও আছে। তর্ক করিসনি আমার সঙ্গে।—নিরুপায় ক্রোধে ফজলে রব্বি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ঃ আমি বলছি তোকে নিয়ে যেতে হবে।

—অসম্ভব কথা বলো না আব্বাজান। আধমণ চালের জন্যে আমি জান দিতে পারব না। তাহের আর কথা বাড়াল না, সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করে দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

ফজলে রব্বির মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে।

কিন্তু ফজলে রব্বিও পারল না।

পরের দিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন কাঁধে আধমণ চালের বোঝা নিয়ে খোঁড়া বুড়ো ফজলে রব্বি খেয়াঘাট থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আঘাটায় নেমেছে নদী পার হওয়ার জন্যে তখন তার মুখের ওপর এসে পড়ল কড়া টর্চের আলো। হাঁটুসমান কালো জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

—শালা বদমাস!

গর্জন করে উঠল একজন। আর একজনের হাতের লাঠিটা প্রবল বেগে এসে আছড়ে পড়ল তার মাথায়।

ঝুপ করে জলের মধ্যে খসে পড়ল চালের বস্তাটা, পড়ে গেল ফজলে রব্বিও। নদীর কালো জলের চাইতেও আরো কালো আরো প্রখর অন্ধকার স্রোতের মধ্যে ভেসে গেল তার চেতনা।

শুধু ফজলে রব্বি একটা জিনিস জানতে পারল না। জানতে পারল না লাঠি যে মেরেছে সে মাত্র আট মাস আগে পাকিস্তানে পালিয়ে এসে মুসলমান হয়েছে। আগে তার নাম ছিল কান্তরাম—এখন সে ইয়ার মহম্মদ!

মশা

অফিস থেকে বেরিয়ে, একটা পানের দোকান থেকে দুটো পান কিনে একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে রাজভবনের পাশ দিয়ে—বাতিল-হয়ে-যাওয়া বিধানসভার কোনো বিষণ্ণ এম-এল-এ'র মতো অবসন্ন পায়ে অপূর্ব এসে ময়দানে নামল।

লালচে রুক্ষ ঘাসের ওপর এখন শেষ বেলার রোদ। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ছে। সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পর এখন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ পাঠিয়েছে দক্ষিণের সমুদ্র। শুকনো কুটোর সঙ্গে উড়ে আসছে হলদে ফুলের পাপড়ি। আশপাশে মানুষ, চীনেবাদাম, মুড়ির ঠোঙা, আইসক্রীম।

পড়ন্ত রোদটাকে আড়াল দিয়ে, বনেদী একটা পাথরের মূর্তির পেছনে পিঠ এলিয়ে বেশ আরাম করে বসল অপূর্ব। বাড়ি ফেরবার কোন তাড়া নেই—আদৌ না। উত্তর-পূর্ব কলকাতার যেখানে আদ্যিকালের জলাগুলি বুজিয়ে হালে নতুন সব উপনগর তৈরী হচ্ছে, সেইখানেই তার আস্তানা। দিনের বেলা বেশ লাগে দেখতে—চকচকে সব বাড়ি, ছড়ানো সবুজ গাছপালার উঁকিঝুঁকি, পাখিদের যাওয়া-আসা। কিন্তু বেলা ডুবতে-না-ডুবতেই বিভীষিকা। কয়েক কোটি মশা তখন অবাধে রাজত্ব করতে থাকে। দাঁড়ানো যায় না, বসা যায় না, পড়া যায় না—শুধু দুহাতে নিজের সর্বাঙ্গ থাবড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না তখন। মশারির মধ্যে অবশ্য ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু বাইরে যখন কেবল একটি মনোরম সন্ধ্যা, হাওয়ায় যখন কারো টবের বেলফুল কিংবা কারোর বাগানের হেনা গন্ধ ছড়িয়েছে, যখন খোলা আকাশ আর নতুন তারার নীচে বসে গল্প করবার সময়—তখন মশারির জীবন্ত সমাধি কি কল্পনাও করা চলে?

তার চাইতে একটু দেরি করে ফেরা ভালো। সাড়ে আটটা—ন'টা—সাড়ে ন'টা। তখন মশারা খেয়ে-দেয়ে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত, হুলের ধার কিছুটা ভোঁতা এবং তখন রাতের খাবার গিলে মশারিতে ঢোকবার পরম লগ্ন। অতএব অপূর্ব এখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গড়ের মাঠে অপেক্ষা করতে পারে। দু-আনার বাদাম কিনে চিবোতে পারে, এক ভাঁড় চা খেতে পারে—একটা আইসক্রীম—না, আইসক্রীম নয়—বাঁদিকের একটা দাঁতে কনকনানি উঠেছে—এক ভাঁড় চা খেয়ে, একটু কোল-আঁধার ঘনিয়ে এলে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়েও পড়তে পারে।

আর ভাবতে পারে।

সেই ভাবনাটা বাসে যেতে যেতে ভাবা যায় না—কারণ পাতিপুকুর অঞ্চলের নিয়তির মতো রাস্তা যে-কোনো মানুষকে পরম নির্ভাবনায় পৌঁছে দেয়; সে ভাবনা বাসায় বসে চলে না, কারণ রেশন-বাজার-মায়ের অসুখ—ভাইদুটোর স্কুল-কলেজের খরচ সেখানে সবটুকু জুড়ে আছে; অফিসে এসে অনেকের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে হয়—সকলের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে হয়, সেখানেও নিজের জন্যে ভাববার মতো ফাঁকা মেলে না।

অথচ অপূর্বর ভাবনাটা খুব ছোট।

শান্তার ভাবনা। সেই আগে যখন শ্যামপুকুর স্ট্রীটে থাকত—সেখানকার তিনটে বাড়ির পরের মেয়েটি। ছোট চেহারার শ্যামবর্ণ মেয়ে, মুখের দিকে চাইলেই বড়ো বড়ো

কালো চোখ দুটো প্রথমে নজরে আসে। গলাটি খুব মিষ্টি—বাড়িতে বাড়িতে ছোট ছোট মেয়েদের সে গান শেখায়।

শ্যামপুকুরে থাকতেই সে শান্তার কথা ভাবত, এখানে এসেও ভাবে। তখন নিজের ঘরে বসে ভাবা যেত—এখন ময়দানে এসে ভাবতে হয়।

ভাবনাটা ছোট। বেশ মেয়েটি। দেখলে মন খুশি হয়, কথা বললে ভালো লাগে, একটুখানি সঙ্গ পেলে আরো ভালো লাগে। আর এইসব মিলিয়ে যে দরকারী কথাটা তার শান্তাকে বলতে ইচ্ছে করে, সেই কথাটা কিছুতেই আর বলা হয় না।

শান্তা কখনো বলবে না—অপূর্ব জানে। তার মতো মেয়েরা কোনো দিন এগিয়ে এসে মনের আড়াল সরিয়ে দেবে না। শান্তার মা-বাবা বলবেন না, কারণ মেয়ের টিউশনির টাকায় তাঁদের দরকার আছে; অপূর্বর মা বলবেন না—তাঁর কাছে এখন রেশন-বাজার আর ছোট ভাইদুটোর স্কুল-কলেজের খরচের ভাবনাটা ঢের বেশি জরুরী।

অগত্যা রোজকার মতো শান্তার কথা ভাবতে লাগল অপূর্ব। একাই ভাবতে লাগল।

সেই জরুরী কথাটা শান্তাকে বলতে পারলে বেশ হয়। অপূর্ব জানে, শান্তা খুশি হবে। মুখ ফুটে সে বলতে চাইবে না, কিন্তু তার চোখ দুটো কথা বলে। এখানে এই ছায়ার মতো অন্ধকারে যেমন চারিদিকের অনেক অলক্ষ্য আলোর কণাগুলো কাঁপতে থাকে, তেমনি তার কালো তারায় অনেক কথার কণা ঝিকমিক করে, যেমন করে এই সন্ধ্যার হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো কথা বলে, তেমনি করে তারও চোখের পাতায় কথারা শিউরে ওঠে।

একটু বাতাসের অপেক্ষা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে বাতাস। সেই সমুদ্র অপূর্বর মন। সেখান থেকে হাওয়া উঠলেই শান্তার ছায়ায় ছায়ায় আলোর কণা দুলবে, পাতারা সাড়া দেবে, হলুদ ফুলের পাপড়িরা উড়ে আসবে।

কিন্তু চার বছর ধরে সেই ছোট দরকারী কথাটা বলা হল না। বলাই হল না।

কেন হয় না? অপূর্ব ঠিক জানে না। সময় আসে—অপূর্ব টের পায় না; সময় চলে যায়—তখনো টের পায় না অপূর্ব। তারপর একা হলে—একটা পানের দোকান থেকে পান-জর্দা কিনতে কিনতে—কখনো বা দোকানের আয়নায় নিজের বোকাটে ছায়াটা দেখতে দেখতে তার মনে হয়—আজ বেশ সুন্দর সময়টা ছিল, আকাশ মেঘলা ছিল, ভিজে ভিজে হাওয়া ছিল; শান্তার মনে একটা গানের সুর গুনগুন করছিল আগাগোড়া, আজ বেশ বলা যেত।

ময়দানে বসে বসে বাসার সেই কোটি কোটি দুঃসহ মশাকে এড়াতে একা শান্তার কথা ভাবতে ভাবতে মাটির ভাঁড়ের গন্ধে ভরা স্যাকারিনে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে—আজ হঠাৎ পৌরুষ জাগলো অপূর্বর। চেষ্টা করা যাক্ না—আজই চেষ্টা করা যাক্ না?

আধ-খাওয়া চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলল, খুলে-ফেলা জুতোটা পায়ে গলিয়ে নিলে, তারপর উঠে পড়ল। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেকটা দূরে সরে গেছে সে, এরপরে শান্তা হয়তো তাকে ভুলতে আরম্ভ করবে।

দেরি হয়ে গেলে, দূর হয়ে গেলে, কে না ভোলে?

বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না—ট্রামরাস্তার মুখেই দেখা হয়ে গেল।

'এই যে শান্তা।'

'এই যে।'

'তোমাদের ওখানেই যাচ্ছিলুম।'

'ও।'—শান্তা একটু চুপ করে রইল। যেন অস্বস্তি বোধ করছিল একটা।

'বেরুচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ। গানের টিউশন।'

'একটু দেরি করে গেলে হয় না?'

একবার রোগা মণিবন্ধের ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল শান্তা। কপাল কুঁচকে ভাবল একটুখানি। বললে, 'নিজেরও একটু—সে থাক, আধঘণ্টা সময় পাওয়া যেতে পারে।'

'যথেষ্ট।'—অপূর্ব একবার শান্তার চোখের দিকে তাকালো: 'আধঘণ্টাই যথেষ্ট। তোমার সঙ্গে আমার ছোট্ট একটু কথা ছিল কেবল।'

'বেশ, চলো আমাদের বাড়িতে।'

'না—তোমাদের বাড়িতে নয়।'

'কোথায় তা হলে?'—আশ্চর্য হল শান্তা। এর আগে অপূর্ব কোনোদিন তাকে কোথাও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়নি।

অপূর্ব বললে, 'অন্য যেখানে হোক। ধরো একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে? কিন্তু তুমি তো জানো, আমি বেশি চা খেতে পারি না।'

'গানের গলা খারাপ হয় বুঝি?'

শান্তা হাসল: 'না। সন্ধ্যের পরে চা খেলেই কেমন যেন মাথা গরম হয়ে যায় আমার। রাতে ঘুম আসে না।'

'তা হলে চা খাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কোনো একটা কোল্‌ড্‌ ড্রিংক্‌?'

'বেশ—চলো।'

নির্জনতা এ তল্লাটে কোথাও পাওয়ার উপায় নেই। ভিড়-ভিড়-ভিড়। এখানে দক্ষিণ-সমুদ্রের হাওয়ায় শালপাতা আর ছেঁড়া-কাগজ ওড়ে; এখানে অন্ধকারের টুকরো মুখথুবড়ে থাকে কোনো গলির ভেতরে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা এক-আধটা নোংরা দেওয়ালের পাশে। এখানে পথের ধারের শীর্ণ গাছ রিকেটি বাচ্চার মতো অস্থিসার আঙুল মেলে আকাশ হাতড়ায়।

অনেক খুঁজে-পেতে এক জায়গায় খালি কেবিন পাওয়া গেল একটা।

'দু গ্লাস সরবৎ।'

'অরেঞ্জ? পাইন অ্যাপল? ম্যাংগো?'

'অরেঞ্জই আনো।'—শান্তাই জানিয়ে দিলে।

বাইরে ফুটবল-রাজনীতি-সিনেমার তর্ক। পথে ট্রাম-বাস-মানুষের হুড়োহুড়ি। কেবিনের ভেতরে শব্দ করে করে ছোট পাখা ঘুরছে। তার হাওয়াটা গরম। দক্ষিণ সাগর এখানে নেই।

সরবৎ না আসা পর্যন্ত দুজনে চুপচাপ। যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।

বেয়ারা গ্লাস রেখে গেল। স্ট্র দিয়ে একটা বরফের টুকরোকে নাড়াচাড়া করতে করতে শান্তা বললে, 'কেমন আছো?'

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

'নতুন বাসায় বেশ ভালোই লাগছে—তাই না?'

'চারদিক খোলা-মেলা, মন্দ কী!'

'বেঁচেছ বলো।'—শান্তা আলতোভাবে ঠোঁটে স্ট্র-টা ঠেকালোঃ 'যা ঘিঞ্জি এ-সব জায়গায় আর কী লোক বেড়েছে।'

'কিন্তু ভীষণ মশা ওখানে সন্ধ্যের পর।'

'খুব?'

'খুব।'

'স্প্রে করা যায় না?'

'অ্যাটম বোমা মারলেও কিছু হবে না।'

শান্তা হাসল, অপূর্ব হাসল। আর অপূর্ব বুঝল, মশার কথাটা সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছে না শান্তা। ও-তল্লাটে যারা থাকে না, তারা কেউই নেয় না। মশা তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে সরবৎ খেল দুজন। মাথার ওপরে ছোট পাখাটা বিরক্তিকর ভাবে কট-কট করছে। হাওয়াটা গরম। দোকানের বেসুরো রেডিয়োতে শ্রোতাহীন রবীন্দ্র-সংগীত। 'প্রথম তপন তাপে—'

শান্তা বললে, 'অফিসের খবর কী?'

'নতুন কিছু নেই। সেই একভাবেই চলছে।'

'তোমাদের একটা স্ট্রাইকের কথা শুনেছিলুম না?'

'আপাতত হচ্ছে না। আলোচনা চলছে ইউনিয়নের সঙ্গে। হয়তো একটা মিটমাট হয়ে যাবে।'

'খুব ভালো।'

'ভালোই তো। ওসব ঝঞ্ঝাট কে চায়?'

শান্তা আবার স্ট্র দিয়ে গ্লাসের ভেতরটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। অপূর্ব প্রথমে তার রোগা আঙুলগুলো দেখল, তারপর পাশে রাখা হ্যাণ্ড-ব্যাগটা দেখল। ব্যাগটা পুরোনো আর জীর্ণ হয়ে গেছে, স্ট্র্যাপের একটা ধার ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেফ্‌টিপিন দিয়ে আটকে রেখেছে সেখানটা। এখন এই ব্যাগটা শান্তার বদলানো দরকার। কিন্তু ওর হাতে নিশ্চয় টাকা নেই।

টাকা অপূর্বরও হাতে নেই। থাকলে একটা ভালো চামড়ার ব্যাগ সে-ই প্রেজেণ্ট করত শান্তাকে। কিন্তু কী দিনই পড়েছে! মাইনের শ-চারেক টাকা যে কোথায় চলে যায়!

অপূর্ব আস্তে আস্তে বললে, 'আমার কথা তো হল, এবার তোমার কথা বলো।'

'আমার কথা আর নতুন কী বলব! চলছে একভাবে।'

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'ভালো!'

'তোমার বাবা?'

'আরথ্রাইটিস কখনো সারে?'

'কবিরাজী করাচ্ছিলেন না?'

'সব একরকম। মনের সান্ত্বনাই শুধু।'

সরবৎ দুটো প্রায় শেষ হয়ে এল। পাখার হাওয়াটা তেমনি গরম। রাস্তায় কিসের একটা জোরালো চ্যাঁচামেচি উঠেছে। দোকানের ছেলেমানুষ বেয়ারাটা বোধ হয় দেখে এল একবার। কাকে যেন বললে, 'ও কিছু নয়—একটা পাগল। খ্যাপাচ্ছে।' দোকানের রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা শূন্যে মাথা খুঁড়তে লাগল।

শান্তা বললে, 'সেলাই-করা পাঞ্জাবি পরেছ কেন?'

'এমনি।'

'জামা নেই বুঝি?'

অপূর্ব হাসল। জবাব দিল না।

'আগে তো পরতে না।'

'অখিল কলেজে ভর্তি হয়েছে—সায়েন্সে। অনেক খরচ।'

'তা হোক। দু-একটা ভালো জামাকাপড় তোমার দরকাব। বাইরে তো বেরুতে হয়।—'

সমবেদনায় স্নিগ্ধ আর সিক্ত হয়ে উঠল শান্তার স্বর।

জামা-কাপড় তোমারও দরকার, অপূর্ব বলতে চাইল। শান্তার শাড়িটা পুরোনো, রং জ্বলে গেছে বোঝা যায়; ব্লাউজের গলার কাছটা ঘামে মলিন। একটা সেফ্‌টিপিন যেন সেখানেও দেখা যায়। এই মলিন দীনতা ভালো লাগে না। অথচ বাইরেই কাপড়ের দোকানের শো-কেসে—

'কয়েকটা জামা-কাপড় তোমারও কেনা উচিত'—এমনি একটা কিছু শান্তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারল না অপূর্ব। তার বদলে শান্তার কথারই জবাব দিলে।

'ধুতি-পাঞ্জাবি আর পরব না ভাবছি।'

'কী পরবে তবে?'

'শার্ট-ট্রাউজার। অনেক কম খরচ। ধুতি-পাঞ্জাবির লাক্‌সারি আর পোষাচ্ছে না।'

'কিন্তু শার্ট-ট্রাউজারে তোমাকে মানাবে না।'—শান্তা প্রতিবাদ করল।

'ওটা চোখে দেখার অভ্যেসে বলছ। দুদিন পরেই সয়ে যাবে।'

আবার একটু চুপ করে থাকা। সরবতের গ্লাস শেষ হল অপূর্বর—স্ট্র'র টানে সবটুকু তলানি উঠে এল, বাতাসের আওয়াজ উঠল একটা। শান্তার পড়ে রইল খানিকটা—গ্লাসটা সরিয়ে দিলে একদিকে।

শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে। অপূর্ব কথা খুঁজছিল। এতক্ষণ যে আলোচনা হল—জামা-কাপড় ছাড়া—তার সব পুরোনো, সব হাজারবার বলা আর শোনা। একটা নতুন কিছু বলা দরকার—সেই দরকারী বিষয়টার সূচনা করা উচিত।

কিন্তু এবারেও পুরোনো প্রশ্নই বেরিয়ে এল।

'ক'টা গানের টিউশন করছো এখন?'

'চারটে।'

'নিজের জন্যে গান গাও না আর?'

'সময় কই?'

'আর অডিশন দিয়েছিলে রেডিয়োতে?'

'দিয়ে কী লাভ? হবে না।'

'কী আশ্চর্য—কেন হবে না?'—ব্যথিত আর উত্তেজিত হল অপূর্ব ঃ 'এত ভালো গান করো তুমি।'

'তোমার ভালো লাগলেই তো আর হবে না—' শীর্ণ রেখায় হাসল শান্তা ঃ 'ওখানে যাঁরা জাজ—তাঁদের পছন্দ হলে তো!'

'সব পার্শিয়ালিটি। তদ্বির ছাড়া হয় না।'

'বলতে নেই ও-রকম। আমিই বা কতটুকু শিখেছি।'

বেয়ারা গ্লাস নিতে এল। হাতে বিল। অপূর্ব পয়সাটা মিটিয়ে দিলে। আর হাত-ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল শান্তা।

'আমার বোধ হয় এবার ওঠা উচিত। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো অপূর্ব।

'বেশ চলো।'

আবার পথ। ভিড়—ভিড়—ভিড়। দক্ষিণের হাওয়া এঁটো শালপাতা আর ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে—পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধ মেখে ধুলোমুঠি ছড়িয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর। রিকেটি বাচ্চার আঙুলের মতো শীর্ণ গাছের শুকনো ডালগুলো ছাইরঙা শূন্য আকাশে যেন মাকে হাতড়াচ্ছে। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কতগুলো ট্রাম—ব্রেকডাউন। একটা তেলেভাজার দোকান থেকে উঠে আসছে পোড়া বাদাম তেল আর ফেটানো-বেসনের উচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার ময়দানে হাওয়া থাকলে মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে বৃষ্টি দরকার। খুব অনেকক্ষণ ধরে ঝিরঝিরানো ঠাণ্ডা বৃষ্টি—ন্যাড়া গাছগুলোতে ক'টা সবুজ পল্লব ধরানো বৃষ্টি। ছাই রঙের আকাশে মেঘ নেই। কটা ঘষা তামার পয়সার মতো মিটমিটে তারা।

কয়েক পা একসঙ্গে হেঁটে—মধ্যে মধ্যে মানুষের ভিড়ে শান্তার পাশ থেকে সরে গিয়ে অপূর্ব জিজ্ঞেস করল ঃ 'কোথায় টিউশন? কত দূরে যেতে হবে?'

'কাছেই। মোহনবাগান রো।'

'চলো, এগিয়ে দিই।'

'বেশ তো।'

কিন্তু এগিয়ে দেওয়া পর্যন্তই। শান্তা কী ভাবছিল সে-ই জানে, আর অপূর্ব কথা খুঁজছিল। সেই দরকারী আলোচনাটার ভূমিকা। কিছুতেই সেটাকে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'কী বিশ্রী গরম পড়েছে কলকাতায়!'

শান্তা বললে, 'হ্যাঁ, খুব।'

'একদম বৃষ্টি নেই। অথচ ওয়েদার ফোরকাস্ট রোজ বলছে বিকালে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা।'

'ওরা ওই রকমই বলে।'

'বোগাস।'

'তোমাদের ওদিকটা ঠাণ্ডা—না?'

'একটু। কিন্তু বেলা পড়লেই ভীষণ মশা।'

'ওঃ তোমার সেই মশা!'—শান্তা একটু হাসল।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল অপূর্ব। ও অঞ্চলে যাদের থাকার অভ্যেস নেই, তারা কেউ মশার কথা সিরিয়াসলি নেয় না। কেউ বা বুঝতেই পারে না।

বেলফুলের মালা বিক্রি করছিল একজন—শালপাতায় রেখে। গলির ভেতরে, হাওয়াটা একটু মধুর হল, একটু কোমল হল তার গন্ধে। শান্তা তাকালো অপূর্বর দিকে। অনেক আলোর কণা লুকানো তার গভীর চোখের ছায়া দেখল অপূর্ব।

'কী একটা দরকারী কথা আছে, বলছিলে না?'

বেলফুলওলা দূরে সরে গিয়েছিল। কাদের উনুনে যেন দেরিতে আগুন দিয়েছে—ঘুঁটে আর কয়লার খানিকটা ধোঁয়া হাওয়ায় পাক খেতে খেতে এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর।

একটু দ্বিধা করে অপূর্ব বললে, 'আজ থাক।'

আঙুল বাড়িয়ে সামনের একটা লাল বাড়ি দেখালো শান্তা।

'ওখানে আমি গান শেখাই।'

'আমি আসি তা হলে।'

'আচ্ছা।'

'মশারির মশাহীন বিরুদ্ধতা'র বাইরে লক্ষ লক্ষ মশার গর্জন। বাতাসটা পড়ে গেছে, দম-চাপা গরম। ঘাড়ের নীচে বালিশটা ঘামে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে। ঘুম আসবার আশা কম। কান পেতে মশার গুঞ্জন থেকে যেন কিছু অর্থবোধ করতে চাইল অপূর্ব। দক্ষিণ সমুদ্রের সব হাওয়া, টবের বেলফুল আর কাদের বাগানের হেনার গন্ধ—সব চাপা দিয়ে তারা ঘামে-ভেজা ব্লাউজ, সেলাই করা পাঞ্জাবি আর অনেক—অনেক ভিড়ের ক্লান্তির খবর পৌঁছে দিচ্ছে তাকে।

সেই দরকারী কথাটা হয়তো কোনোদিনই বলা হবে না অপূর্বর।

দিনান্ত

॥ ১ ॥

প্রিন্সিপ্যাল বলেছিলেন, 'রবিবার দিন একবার যাবেন আমার ওখানে। এই ধরুন বিকেল চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে।'

'আচ্ছা স্যার, যাব।'

কথাটা আলতোভাবে বলেছিলেন, মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ ছিল না। থাকবার কথাও নয়। আসল গরজটা ছিল হিমাংশুর নিজেরই।

প্রিন্সিপ্যাল নতুন এসেছেন। বয়েস অল্প, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের এধারে নয়, কিন্তু দস্তুরমতো ভারিক্কী গম্ভীর চেহারা। চোখমুখ দেখলে বেশ শান্ত আর বিবেচক বলে মনে হয়। কেন কে জানে, প্রথম দৃষ্টিতেই হিমাংশুর ধারণা জন্মেছিল যে লোকটি তার কথাগুলো

মন দিয়ে শুনবেন, প্রতিকারও করবেন দরকারমতো।

কিন্তু গরজ হিমাংশুর বলেই প্রিন্সিপ্যাল ভুলে গেছেন। হাজারো কাজের ভেতরে বুধবারের একটুকরো কথা রবিবার পর্যন্ত মনে থাকবে এমন আশা করা অন্যায় হয়েছিল হিমাংশুর। তারই উদ্যোগ করে কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি কালও যখন কলেজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়েছে, তখনও বলতে পারত—'স্যার, রবিবার বিকেলে কিন্তু আপনার ওখানে আমার যাওয়ার কথা আছে।'

সেই কথাটাই বলা হয়নি। এবং আজ দুপুরে প্রিন্সিপ্যাল তাঁর বন্ধু ধরণী রায়ের সঙ্গে কোন্ এক ফরেস্ট বাংলোয় বেড়াতে গেছেন। ফিরবেন কাল সকালে।

চাকরের কাছ থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করে হিমাংশু ফিরে আসছিল। এমন সময় বসবার ঘরের বড়ো একটা জানলা খুলে গেল। জানলার পর্দা সরিয়ে ফ্রেমের ভেতরে ছবির মতো ফুটে উঠল একটি মেয়ে। কাঁধের ওপর এলোচুলের গুচ্ছ নেমে এসেছে, কপালে গাঢ় একবিন্দু রক্তের মতো জ্বলন্ত সিঁদুরের টিপ, তাকে ঘিরে লাল শাড়ীর পটভূমি।

আর জানলার ওপার, ছাতের ওপরে যে আকাশ ছিল, হিমাংশু দেখল শরতের হলুদ রোদে তার রঙ কাঁটালিচাঁপার পাপড়ির মতো। একটুকরো ভবঘুরে মেঘ সেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল, যেন একটা সাদা প্রজাপতি। অনেক দূরে দুটো শকুনের ডানা ভাসছিল কি ভাসছিল না। জানলা, মেয়েটি, আকাশ, মেঘ—সব একসঙ্গে মিলে ফ্রেমে বাঁধা, অথচ ফ্রেম ছাপিয়ে পড়া একখানা ছবি হয়ে রইল, তেমনি কে যেন হিমাংশুর পা দুটোকেও পুঁতে দিলে মাটির ভিতরে—লনের ফুলধরা কাঞ্চন গাছটার পাশে সে-ও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সামনের হিসেবটা মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল বিদ্যুতের চমকে। এগারো বছর। না—আরো দু-এক মাস বেশি হয়েছে হয়তো। আকাশে সেদিন শরতের রঙ ছিল না—একটা তপ্ত দিনের রুদ্র আভাস ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। একটা সুটকেস হাতে করে মাথা নামিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হিমাংশু। ফসলহীন মাঠ আর রুক্ষ আলোর ওপর দিয়ে দেড় মাইল স্টেশনের রাস্তা পাড়ি দিতে দিতে অমিতার জন্যে শেষ যন্ত্রণায় জ্বলেছিল সে।

যদি বিকেলের আলো চারদিকে এত ধারালো হয়ে না থাকত, যদি জানলার ফ্রেমের ভেতরে প্রায় কোমর পর্যন্ত ফুটে না উঠত অমিতার, যদি তার দিকে চোখ পড়তেই অমিতা ছবির চাইতেও নিথর হয়ে না যেত, তা হলে এমন একটা সম্ভাবনার কথা হিমাংশু ভাবতেও পারত না। কোনো পড়ন্ত বেলার ছায়ায়, কোনো রাত্রির আলো-অন্ধকারে দূর থেকে হঠাৎ দেখে হয়তো খুব চেনা কারো একটা আদল মনে আসত, তারপরেই ভাবত—এমন তো কত হয়। ওই মেয়েটিই যে একান্তভাবে অমিতা—এগারো বছর কয়েক মাসের ওপার থেকে কোন্ একটা দুর্বোধ বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে আবার হিমাংশুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, এ-কথা ভাববারও তার দরকার পড়ত না। কিন্তু আশ্চর্য, তাই ঘটল।

মেয়েটি অমিতা। নিজের অস্তিত্বে যদি হিমাংশুর সন্দেহ না থাকে তাহলে এতেও সন্দেহ নেই।

খোলা জানলাটা আবার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, আচমকা যেন একটা রিভলভারের আওয়াজ শুনল হিমাংশু। ঘাড় না ফিরিয়েও সে বুঝতে পারল, জানলার ফ্রেমে ছবির

চাইতেও নিশ্চল ছবিটা আর নেই। কোনো এক অন্ধকার ঘরে আরো গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে সেখানেই লুকোতে চাইছে সে। কিন্তু পালানোর জায়গা কি অমিতারই দরকার? হিমাংশু মুখ লুকোবে কোন্‌খানে? গেটের বাইরে সে সাইকেলটা রেখে এসেছে, ওই সাইকেলে চড়ে এই ঝকঝকে দিনের আলোয় এখন শহরের আর এক প্রান্তে যেতে হবে তাকে। না—হিমাংশুর পালাবার জায়গা কোথাও নেই।

কিন্তু আচমকা জানলা বন্ধ হওয়ায় ওই রিভলভারের মতো শব্দটা হিমাংশুর নিশ্চল অসাড় শরীরটাকে সজীব আর সজাগ করে তুলল। যেন তাড়া খেয়েছে, এমনিভাবে বড়ো বড়ো পা ফেলে সে বেরিয়ে এল গেটের বাইরে, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তার সাইকেল।

শুধু এই শহরের শেষ প্রান্তেই নয়, হাজার হাজার মাইল দূরে পালাতে পারলে তবেই যেন নিষ্কৃতি পেত হিমাংশু। কিন্তু দ্বিতীয়বার পালাবার সাহস আছে তার? মা মৃত্যুশয্যায়, ছোট বোনটার বিয়ে হয়নি—চারদিকের এই অসংখ্য দায়-দায়িত্ব ফেলে সে কোথায় পালাবে?

অথচ অমিতার জন্যে তাকে পালাতে হবে। কিংবা নিজের জন্যেই। হিমাংশুর সাইকেল থেকে কেমন একটা বেয়াড়া আওয়াজ উঠতে লাগল, যেন যন্ত্রণার গোঙানি ফুটে বেরুচ্ছে কারো।

কাঁটালিচাঁপার পাপড়িরঙা আকাশে তেমনি করে নিথর হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল দুটো কালো কালো বিন্দু শকুন।

॥ ২ ॥

শহরের বাইরে বহুকালের পুরানো একটা দরগা। বছরের দুটি-একটি দিন ভক্তেরা এখানে চেরাগ জ্বেলে দিয়ে যায়, কবে যেন একবার শিরনিও পড়ে। তাছাড়া একেবারে নির্জন। বৃষ্টিতে ফকিরের সমাধির ওপর শ্যাওলা পড়ে, রোদে সে শ্যাওলা কালো হয়ে যায়। দুপুরবেলা ঘুঘু ডাকে, রাতে ঝিঁঝির ডাক ঝম্‌ঝম্‌ করে বাজতে থাকে চারদিকে। অনেকদিন আগে নাকি একটা চিতাবাঘ এসে একবার এই দরগাতেই আস্তানা নিয়েছিল।

চিতাবাঘের দোষ নেই। সামনে একটা পুরোনো আমবাগান, ঝাঁকড়া, ঝুপসী—বয়েসে আর অযত্নে কেমন কদাকার আর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। আম প্রায় হয়ই না, যে দু-চারটে হয় তা এমন অখাদ্য টক যে খুব সম্ভব বাদুড়ে পর্যন্ত খায় না। সকালের রোদেও বাগানের ভেতরে খানিকটা বিষণ্ণ ছায়া মুখথুবড়ে পড়ে থাকে, কেউ তার ভেতর দিয়ে চলতে গেলে মুখে চটচট করে উড়ে পড়ে পোকার ঝাঁক।

দরগার আর এক দিকে ওই রকম পুরোনো একটা পুকুর। শ্যাওলা আর কলমীতে তার বারো আনাই অদৃশ্য, কেবল ঘাটের কাছে একটুখানি কালচে জল চোখে পড়ে। কখনো-সখনো ভক্তেরা এখানে হাত-পা ধোয়, রাত্রে শেয়ালে জল খায়। চিতাবাঘের আশ্রয় নেবার মতো জায়গাই বটে।

কিন্তু আজ চিতাবাঘ নয়, হিমাংশু তার সাইকেলটা ঠেলে পুকুরধারে নিয়ে এল। আজ এখানে তারই লুকোনো দরকার। বড়ো বড়ো ঘাস গজানো ঘাটের পৈঠাগুলোর দিকে চেয়ে দেখল একবার, একবার হয়তো ভাবল ফাটলগুলোর মধ্যে সাপ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেই কতকগুলো বিবর্ণ ঘাসের ওপর সাইকেলটাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘাটের

ওপর বসে পড়ল। আকাশের দিকে হলুদের ওপর তখন লালের ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে।

একটি লাল শাড়ীর ছায়া।

সে প্রায় বারো বছর হতে চলল। বি-এ পরীক্ষা দেবার পর বন্ধু কেশবের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সে।

দিনগুলো বেশ কাটছিল। বেশ কাটছিল—সেই রাতটা না আসা পর্যন্ত।

রাত বোধ হয় একটার কাছাকাছি, গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল হিমাংশু। হঠাৎ মশারি তুলে তাকে একটা ধাক্কা দিলে কেশব।

'এই ওঠ্—উঠে পড়্ চটপট।'

হিমাংশু লাফিয়ে উঠে বসেছিল।

'কী হয়েছে, ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়িতে?'

'তার চাইতেও রোমাঞ্চকর।'

'মানে?'

'পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেশব হেসে উঠেছিল ঃ 'আরে ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা মজার নাটক জমে উঠেছে, দেখতে চাস তো চল্।'

'কী পাগলামি হচ্ছে কেশব এই রাতের বেলায়? ঘুমুতে দে আমাকে।'

ঘুমুতে কেশব দিল না। তার বদলে ঘর থেকে টেনেই বের করে আনল এক রকম।

নাটকটা জমেছিল দুখানা বাড়ির পরেই।

প্রচুর গণ্ডগোল সেখানে। সামনে বিরাট জটলা। অনেকগুলো লণ্ঠন, টর্চের আলো। সব গোলমালকে ছাপিয়ে একজনের গলা ঃ 'সব ওই বুড়োর জন্যেই। এই বয়সে বিয়েটা না করলেই চলছিল না? অমন জোয়ান ছেলে ঘরে, মেয়েটা বড়ো হয়েছে—'

'বুড়োকে পুলিসে দিন মশাই। এ তো সুইসাইডের ব্যাপার নয়—রেগুলার খুনের চেষ্টা!'

কেশব বলেছিল মজার নাটক, হয়তো তার হিসেবে জিনিসটা নিদারুণ মজার। হিমাংশুকে আলতোভাবে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা দেখতে হলে চলে আয় এদিকে।'

এদিকে মানে বাড়িটার খোলা সদর দরজার সামনে।

সেখানেও একদল লোক অপরিসীম কৌতূহলে বকের মতো গলা বাড়াচ্ছিল ভেতরে। কে যেন মোটা গলায় ধমক দিয়ে বলছিল, 'এখানে আপনারা ভিড় করছেন কেন? চলে যান—যান—'

দুএকজন সরে এল বটে, কিন্তু অধিকাংশেরই নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। এক ধরনের অশ্লীল আনন্দে তাদের চোখমুখ উদ্ভাসিত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যখন উঠেই এসেছে, তখন নাটকটার আরো কিছু অংশ না দেখে চলে যাওয়ার পাত্র নয় তারা। যাত্রাটা কেবল জমে উঠেছে, এখন বৃষকেতুর পুনর্জীবনটা না দেখে তারা যায় কী করে?

মোটা গলায় যে লোকটি ধমক দিচ্ছিলেন, বোঝা গেল তিনি ডাক্তার। মাথায় ছাইরঙের পাতলা চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গলায় স্টেথিস্‌কোপ। ছুটে আসতে হয়েছে বলে আর গ্রামের ডিস্‌পেন্‌সারির ডাক্তার বলে জামাটা পর্যন্ত গায়ে পরেন নি, গেঞ্জিটা গুঁজে দিয়েছেন ধুতির ভেতরে। তিনি আবার চীৎকার করে উঠলেন ঃ 'মজা

দেখছেন নাকি আপনারা? এদিকে একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর আপনারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখানে?'

কে একজন রুক্ষ স্বরে বলল, 'বেশি মেজাজ দেখাবেন না, ডাক্তারবাবু। আমরা প্রতিবেশী, আপদে-বিপদে এসে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য।'

হাত জোড় করলেন ডাক্তার।

'আমার ঘাট হয়েছে, মাপ করবেন। কিন্তু এখন তো আমি রয়েছি, আমাকে সাহায্য করবার লোকও কেউ কেউ আছে। এখন আর আপনাদের কিছু করবার নেই। যদি দরকার হয়, নিশ্চয় ডাকব আপনাদের। দয়া করে আপাতত আপনারা যান—আমার কাজের ভারি অসুবিধা হচ্ছে।'

'ওঃ, ভারি ডাক্তার এসেছেন। ও-রকম কত দেখলাম।' গজর গজর করতে করতে ভিড় খানিকটা পাতলা হয়ে গেল। হিমাংশু বলল, 'কেশব, ফিরে চল।'

পাড়াগাঁয়ের আড়িপাতা বেহায়া মেয়ের মতো কেশব তবু চোখ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তেই চায় না।

'তুই থাক তবে, আমি চললুম।'

হনহন করে পা বাড়াতে কেশব এসে সঙ্গ ধরল।

'আরে, অত ছটফট করছিস কেন? একটু দেখে গেলে ক্ষতিটা কী!'

'কী আর দেখবি? তাছাড়া ডাক্তার—'

'ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। ডাক্তার আমার আপন বড়ো মামা—তা জানিস? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে বসে পাড়াগেঁয়ে চাষাভুষোর পেট টিপে আর তাদের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে বড়ো মামার মেজাজটাই খিটখিটে হয়ে গেছে। ওতে মাইণ্ড করতে নেই।'

'মাইণ্ড না করলেও আমার ভালো লাগছে না। চললুম।'

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেশবও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। হিমাংশু তার কলেজের বন্ধু, ছুটিতে তাদের বাড়িতে অতিথি। অতিথির সঙ্গে অভদ্রতা চলে না।

দুজনে বাড়ি ফিরে এল। সেখানেও তখন জটলা। জানা গেল, কেশবের মা তখনো ও-বাড়িতে আছেন, গোকুল মল্লিকের স্ত্রী তাঁর হাত ধরে কেঁদে বলছে—'দিদি, ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, আমাকে ফেলে আপনি যাবেন না।'

হিমাংশুর ঘরে ঢুকে কেশব তার মশারিটা তুলে ফেলল, বসে পড়ল তার পাশে। অর্থাৎ এখন আর হিমাংশুকে সহজে সে শুতে দেবে না। কেশবের মুখের দিকে চেয়ে হিমাংশু বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে অজস্র কথা সোডার ফেনার মতো গজগজিয়ে উঠছে তার পেটের ভেতর, সেগুলোকে উগড়ে না ফেলা পর্যন্ত কেশবের শান্তি নেই।

মুখের ওপর একটা অদ্ভুত কুশ্রী হাসি টেনে কেশব বললে, 'দেখলি কিছু?'

'দেখেছি! দু-তিনজন লোক একটি মেয়েকে ছেলেপুলের মতো হাঁটাচ্ছে ভেতরের বারান্দা দিয়ে। মেয়েটা জড়িয়ে জড়িয়ে কী সব বলে চলেছে মাতালের মতো।'

কেশব বলল, 'হুঁ, আফিং খেয়েছিল।'

'আফিং?' দারুণ রকমের চমক খেল হিমাংশু ঃ 'হঠাৎ কেন খেতে গেল?'

'আরে সে হল সেই পুরোনো আদ্যিকালের গল্প। গোকুল মল্লিকের ছেলে রেলে

চাকরি করে, মেয়েও বেশ বড়ো হয়েছে—নিজের চোখেই তো দেখলি! মজাটা কী জানিস, এরই মধ্যে ছেলের জন্যে একটা পাত্রী খুঁজতে গিয়ে মল্লিক হঠাৎ কি রকম ক্ষেপে গেল। দশ বছর বৌ ছিল না, মল্লিকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিও ছিল না, কিন্তু আজ সাতান্ন-আটান্ন বছরে পৌঁছে দুম করে একটা বিয়ে করে ফেলল। রেগে আগুন হয়ে ছেলে আগ্রা থেকে চিঠি দিয়েছে—তুমি তোমার নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন করে সুখে ঘর-সংসার করো, আমার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আর সেই জন্যে মেয়েও হঠাৎ আফিং খেয়ে বসল?'

'না—সেজন্যে নয়। নতুন বৌ—কি বলে, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় হা-ঘরের মেয়ে।'—বেশ মেয়েলী ঢঙে চোখ গোল গোল করে কেশব বলে চলল—'বাড়িতে খেতে পেত না, এখানে এসে জমিজমা, গোরু-বাছুর পুকুর-বাগানের গিন্নী হয়ে বসল। মল্লিক তো বলতে গেলে একেবারে শ্রীচরণের ছুঁচো হয়ে রইল আর ওর গিন্নী দুবেলা দাঁতে কাটতে লাগল অমিকে।'

'অমি? মেয়েটির নাম?'

'হ্যাঁ, ওর ভালো নাম অমিতা। জানিস, মেয়েটা বোকা নয়। আমাদের এদিকে তো কাছাকাছি মেয়েদের হাই স্কুল নেই, যা পড়েছিল ওই ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। তারপর নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ম্যাট্রিকের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বড়ো মামাকে তো দেখলি—ডাক্তারীতে যাওয়ার আগে মামা আই.এস.সি পাস করেছিল—কখনো কখনো ওকে পড়ায়। ছেলেদের স্কুলের হেডমাস্টারও বই-টই দেন। মানে-বুঝলি—সব দিক থেকে খুবই ভালো মেয়ে। আর চেহারাও তো দেখলি!'

'তা দেখেছি। দেখতে ভালোই।'

শুধু ভালোই? রীতিমত সুন্দরী।'—কেশব উত্তেজিত হল : 'আমাদের গ্রামে ওর মতো সুন্দরী মেয়ে একটিও নেই। আর এই মেয়েটাকে মল্লিকের দ্বিতীয় পক্ষ যে কী কষ্ট দেয় ভাই, সে আর তোকে কী বলব। মেয়েছেলেকে তো আর কিছু বলা যায় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমার হাত দস্তুরমতো নিশপিশ করে ওঠে। ইচ্ছে হয়, মল্লিককে ধরে ঘা-কতক কষিয়ে দিই।'

একটু চুপ করে রইল হিমাংশু। চারদিকেই কথার আওয়াজ, বাড়ির সামনে দিয়ে মানুষের চলার শব্দ, এই রাতে গ্রামটা মল্লিকের বাড়িকে কেন্দ্র করে জেগে আছে—আলোচনা করছে—উত্তেজিত হচ্ছে। দূরে বারকয়েক শেয়ালের ডাক উঠল—জুড়িদারেরা সাড়া দিলে ইতস্তত, তারপর মানুষকে অতিমাত্রায় সজাগ দেখে তারা থমকে গেল।

কেশব একটা বিড়ি ধরালো। পাড়াগাঁয়ের ছেলে—অল্পবয়স থেকেই বিড়িতে অভ্যস্ত।

'বিড়ি দেব একটা?'

'না—থাক। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মেয়েটা আফিং যোগাড় করল কোত্থেকে?'

'আরে, মল্লিক খায় যে! শহরে যায়, একবারে পনেরো দিনের আফিং নিয়ে আসে। তাই দুধে গুলে সবটা খেয়ে নিয়েছিল মেয়েটা। কেউ টের পায়নি। হঠাৎ ওর গলা থেকে কি রকম আওয়াজ বেরুচ্ছে শুনে বুড়োর সন্দেহ হয়, দুধের বাটিতে পায় আফিঙের গন্ধ—দৌড়ে খবর দেয় বড়ো মামাকে। বড়ো মামা ছুটে এসে স্টমাক পাম্প দিয়ে সবটা প্রায় বের করে ফেলেছেন। আর একটু দেরি হলেই—'

হ্যাঁ, আর একটু দেরি হলেই মুক্তি পেত মেয়েটা।

হিমাংশু আবার বসে রইল চুপ করে। দরজার ভেতর দিয়ে যা দেখেছিল, তা এখনো চোখের সামনে একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো অদ্ভুত হয়ে আছে। বাড়ির লম্বা বারান্দায় সারি সারি লণ্ঠন, যেন দীপালি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, চারদিক আলোয় আলোময়। আর সেই বারান্দা দিয়ে এক মাঝবয়েসী বিধবা আর জন-দুই পুরুষ মেয়েটির হাত ধরে একবার বারান্দার এ-প্রান্তে, আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি বোজা, সে চলতে চাইছে না, প্রত্যেক মুহূর্তে তার সারা শরীরটা যেন ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। সোনার পাতের মতো পা দুটি পড়ছে অসংলগ্ন ভাবে, গুচ্ছ গুচ্ছ নীল চুল বুকের ওপর এসে পড়েছে, আঁচল খসে যাওয়ায় লজ্জা ঢাকতে চাইছে, ঘুমের ঘোরে যেমন করে পাখিরা ডেকে ওঠে, তেমনি করে একটা অস্পষ্ট কাকলি শোনা যাচ্ছে তার মুখে। হিমাংশু একবার যেন শুনতেও পেয়েছিল—'ঘুমুতে দাও—আমাকে ঘুমুতে দাও না তোমরা—'

বারান্দার নীচে, উঠোনে বসে ছিল আর একজন। বসে ছিল নিজের ভেতরে মাথা মুখ গুঁজে কুণ্ডলি-পাকানো একটা কুকুরের মতো। ওপরের সারি সারি লণ্ঠনের আলো হিংস্রভাবে তার ছাঁটা ছাঁটা চুলগুলোর ডগায় ডগায় জ্বলছিল—যেন একটা জানোয়ারের গায়ের রোঁয়ার মতোই দেখাচ্ছিল সেগুলোকে। গায়ের ফতুয়াটার ওপর গলার কাছে চিকচিক করছিল একটা সরু সোনার হার—গোকুল মল্লিক।

কেন ও-ভাবে বসে ছিল সে? অনুতাপ করছিল? শুধু ছবিতে একজন ছিল না—সে মল্লিকের স্ত্রী। খুব সম্ভব কেশবের মা'র হাত ধরে কোনো অন্ধকার কোণায় ভয়ে কাঠ হয়ে বসে ছিল সে।

নাটকই বটে। কিন্তু মজার নাটক নয়। একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে হিমাংশু বলল, 'মেয়েটা বাঁচবে?'

'বাঁচবে বই কি। বড়ো মামা ঠিক টাইমলি এসে গিয়েছিলেন যে। পাম্প দিয়ে সব বের করে ফেলেছেন।'

'তবে ও-ভাবে হাঁটাচ্ছে কেন? শুতে দিচ্ছে না কেন মেয়েটাকে?'

'ঘুমিয়ে পড়লে ফল খারাপ হতে পারে। সেই জন্যেই জাগিয়ে রাখতে হয়, হাঁটাতে হয়।'

'ও।'

'হয়তো আজ সমস্ত রাত ওইভাবে হাঁটতে হবে মেয়েটাকে।'

'সমস্ত রাত?'

আবার সেই ছবিটা ফুটে উঠল ফ্রেমের মধ্যে। লম্বা টানা বারান্দাটার ওপর দিয়ে সোনায় গড়া পা দুখানা আর চলতে পারছে না, যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। বন্ধ চোখের কোণায় বুঝি জলের বিন্দু। নীল রুক্ষ চুলের রাশ বুকের ওপর। ঠোঁটের একপাশে রক্তের দাগ, পাম্প দেবার সময় বোধ হয় চিরে গেছে মুখটা। অতল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইছে সে—'ঘুমুতে দাও, ঘুমুতে দাও আমাকে।'

কী বেদনায় ভরা ছবিটা। কী অসম্ভব করুণ।

কেশব বলল, 'নে, শুয়ে পড় তা হলে। কী হল জানা যাবে কালকে সকালে। ঘুমো।' চলে গেল।

কিন্তু ঘুম সেদিন আসেনি। সারারাত শুধু একটি বিনিদ্র কাকলি দু কান ভরে বেজেছিল তার, জাগিয়ে রেখেছিল তাকে—'আমাকে ঘুমুতে দাও।'

হিমাংশুর চমক ভাঙল খানিকটা সর্‌সর্‌ খর্‌খর্‌ আওয়াজে। চেয়ে দেখল, মধ্যরাতের সেই দূর গ্রাম নয়, সেই ফ্রেমে আঁটা ছবিটিও নয়; এগারো বছর আগেকার সেই উপন্যাসের মতো রাতটাকে মুছে দিয়েছে শরতের লাল রোদ। সে বসে আছে পীরের দরগার ফাটলধরা ঘাটলার ওপরে, একটু দূরে বড়ো বড়ো ঘাস ভেঙে অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে একটা কদাকার গো-সাপ, জিভটা তার হিলহিল করছে। থেকে থেকে গো-সাপটা আড়চোখে লক্ষ্য করছে তাকে—যেন তার মতলবটাকে বুঝে নিতে চায়।

হিমাংশু চোখ সরিয়ে নিল। ওই গো-সাপটা যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। ওর কুৎসিত চেহারা, কদর্য চলনের সঙ্গে তারও যেন মিল আছে কোথাও। ও যেন তারই প্রতিচ্ছায়া একটা।

হিমাংশুভূষণ বসু নামে যে পাড়াগাঁয়ের ছেলেটি একটু বেশি বয়েসে ম্যাট্রিক পাস করেছিল, তারপর বি. এ. পরীক্ষায় একবার ফেল করে কেশবের সঙ্গ ধরেছিল, এতদিন তার জীবনে স্বপ্ন-কল্পনার দৌড় বেশি দূর পর্যন্ত ছিল না। সে বড়ো জোর কোনো কোনো সিনেমার নায়িকার মুখওলা ক্যালেণ্ডার এনে ঘরে টাঙাত, উপন্যাস পড়ে নায়কের সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করত, মিলন না হলে কিংবা নায়িকা হঠাৎ মারা গেলে কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে এক-আধটু কেঁদেও ফেলত। অর্থাৎ হিমাংশুর জীবন খুব সহজ ছিল, খুব সহজ হতে পারত। আজ এগারো বছর ধরে যে যন্ত্রণা তাকে চেতনে অচেতনে বিঁধছে, এই সাদাসিধে জীবনের ছোটখাটো দুঃখ-সুখের ভেতরও তাকে কখনোও সম্পূর্ণ করে হাসতে দেয়নি। অকারণে এক-একটা বিনিদ্র রাতকে তার চোখের পাতায় ঘনিয়ে এনেছে, সেগুলো কিছু ঘটত না—যদি সেই রাতটা না আসত।

সেই এক-একটা রাত—যা চক্ষের পলকে মানুষকে অন্য জগতে নিয়ে যায়, তাকে নতুন করে গড়ে দেয়। যে দুঃখ তার জীবনে কখনো আসত না, একটা বটের অলক্ষ্য সূক্ষ্ম বীজের মতো সঞ্চার করে তাকে; নিজের যে পরিচয় সে কখনো পেত না, একটা যাদুর আয়না মুখের সামনে ধরে তারই ভেতরে তাকে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তোলে; যেখানে পাথরের একটা নিরনুভব দেওয়াল ছিল, সেটা ভেঙে বেদনার নদী বইয়ে দেয়।

সেই রাত!

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হিমাংশুর। চেয়ে দেখল সামনের পুকুরের জলে শরতের শালুক ফুটে উঠেছে দু-চারটে। পুরোনো দরগার এই নিঃসঙ্গ জীর্ণতার ভেতর, চারদিকের এই শূন্যতার মাঝখানেও কয়েকটা রাঙা শালুক আর একটা জীবনের ইঙ্গিত। সেই রাতে হিমাংশুর বুকের মাঝখানেও এমনি করে একটা ফুলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ঝপাং করে শব্দ হল একটা, গো-সাপটা মাছের আকর্ষণে ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। একবারের জন্যে চমকে উঠল হিমাংশু, চেয়ে দেখল শ্যাওলা-পানার ভেতর দিয়ে কুমীরের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে গো-সাপটা। ঠক্‌-কঁর ঠক্‌-কঁর-র্‌—শব্দে

একটা তক্ষক রব তুলতে লাগল দরগার ভেতর। তখন মনে হল, বেলা পড়ে আসছে, রোদের রঙ লাল হল—এইবার এখানে আর একটা জীবনাতীত জগতের কাহিনী শুরু হবে।

তা হোক। কিন্তু হিমাংশু এখনি উঠবে কোন্ লজ্জায়? কী করে যাবে এখান থেকে—যখন চারদিকে আলো যখন চারদিকেই মানুষের মুখ?

সেই রাত। আর একটি মানুষ ঘুমুতে চেয়েও ঘুমুতে পারছে না, তার অনিচ্ছুক শরীরটাকে—যা ভেঙে পড়তে চাইছে, যা গলে যেতে চাইছে—যা মিলিয়ে যেতে চাইছে যমের অতল সমুদ্রে, তার সেই সমস্ত রাতব্যাপী যন্ত্রণার কথা ভেবে হিমাংশুও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারল না। ঝিমুনি এল ভোরবেলায়, কেশব তাকে টেনে তুলল বেলা সাড়ে আটটায়।

'কিরে, জেগে কাটিয়েছিস নাকি রাতভোর? বৌদি দুবার তোর চা নিয়ে এসে ফিরে গেছে।'

'না—ঠিক জেগে নয়, মানে অসময়ে ঘুম ভেঙে মাথাটাই কেমন যেন গরম হয়ে গেল।' —একটু অপ্রতিভ বোধ করল হিমাংশু : 'ভালো কথা, সে মেয়েটি কেমন আছে রে?'

'ভালো। আউট অব ডেঞ্জার।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী?'—কেশব একটু হাসল : পুলিশ কেস হবে এর পরে। অ্যাটেমপ্‌টেড সুইসাইডের জন্যে হয়তো মাস ছয়েক জেল হয়ে যাবে।'

'জেল!'—প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল হিমাংশু।

মিট-মিট করে হেসেছিল কেশব : 'সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে সিম্‌প্যাথি বুঝি উথলে উঠছে তোর? এসব তো ভাল লক্ষণ নয় হিমাংশু!'

'ফাজলামি করতে হবে না। সত্যি বল তো, মেয়েটার জেল হবে নাকি?'

'আইনত তাই তো হওয়া উচিত। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। সেই হাত যে দিয়ে বসে আছে, তাকে কে বাঁচাতে পারে, বল?'

বেদনায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল হিমাংশু। মেয়েটির যে যন্ত্রণার চেহারা নিজের চোখে সে দেখে এসেছে, তার পরেও জেল খাটতে হবে? এর চাইতে নির্মমতা কল্পনাও করা যায় কখনো? হিমাংশুর মনে হল একটা ফুটন্ত পদ্মকে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ের তলায় সযত্নে পিষে ফেলছে কেউ। এই নিষ্ঠুরতার কথা জানলে কশাইয়ের ছুরিও শিউরে উঠত!

একটু চুপ করে থেকে হিমাংশু বললে, 'শাস্তি হবে এই মেয়েটারই? আর যারা যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে তাকে আত্মহত্যার পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাদের কোনো বিচারই নেই?'

কেশব বললে, 'আমার মেজদা কাল বাড়িতে এসেছে—দেখেছিস তো? মেজদা হল মোক্তার। তুই শুয়ে পড়লি, তারপর আরো অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের ভেতরে এ নিয়ে আলাপ করছিলুম। মেজদা বলছিল, মেয়েটি দরকার হলে তার বাপ-মার নামে নিষ্ঠুরতার জন্যে আদালতে নালিশ করতে পারত, কিন্তু কোনো কারণেই সে সুইসাইড্ করবার চেষ্টা করতে পারে না। কেস হবে, জেলও অনিবার্য।'

হিমাংশুও পাথর হয়ে বসে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না।

কেশব বললে, 'যাক গে, তুই আর ও নিয়ে মনখারাপ করে কী করবি! তুই এ গ্রামের

লোক নোস, ওদের সঙ্গে তোর কোনো সম্পর্ক নেই, এমন কি এক জাত পর্যন্ত নয়। মেয়েটা মরুক আর ফাঁসিই যাক, তোর কী আসে যায়—বল্‌? তুই তো এখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা ভুলে যাবি।'

হিমাংশু ক্ষুণ্ন হল।

'কী ভাবিস তুই আমাকে? হার্টলেস ব্রুট?'

'ব্রুট ভাবব কেন?'—আবার মিটমিটে হাসি দেখা দিল কেশবের মুখেঃ 'যা স্বাভাবিক, তারই কথা বলছি আমি। সে যাকগে—মিথ্যে এসব নিয়ে আর মন খারাপ করবার দরকার নেই। মা অনেকক্ষণ ধরে তোর জন্যে জলখাবার তৈরী করে বসে আছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খাবি চল।'

কিন্তু খাবারে সেদিন আর হিমাংশুর রুচি ছিল না। সব বিস্বাদ ঠেকেছিল মুখে।

আসলে 'মেয়েটির জেল হয়ে যাবে'—এই কথাগুলো নিতান্তই ঠাট্টা করে বলেছিল কেশব। সাত মাইল দূরের থানায় রিপোর্ট করবার আসল মালিক হলেন কেশবের বড়ো মামা—ডাক্তারবাবু। কিন্তু তিনি গ্রামের লোক, এই মেয়েটির যন্ত্রণার সমস্ত ইতিহাস তিনি জানতেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভালোবাসতেন মেয়েটিকে ; তাই তার এত দুঃখ-যন্ত্রণাকে আর অপমান দিয়ে তিনি কালো করতে চাননি। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। খুব সম্ভব আইননিষ্ঠ ডাক্তার জীবনে এই প্রথম আর এই শেষবার আইন ভঙ্গ করেছিলেন স্বেচ্ছায়।

অনেক গল্প হয়েছিল তাঁর ডিস্‌পেনসারিতে বসে।

'গোকুল মল্লিকটাই ক্রিমিন্যাল। ওরই জেল হওয়া উচিত।'—তিক্তস্বরে ডাক্তার বলেছিলেন, 'এখন মধ্যে মধ্যে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে আসে। বলে, ভারি ভুল করেছি। কেন, বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না? অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে দেখেই মাথাটা একেবারে ঘুরে গেল?'

'সংসারে যখন অশান্তি, তখন গোকুলবাবু নিজের মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো পারেন।'

'মেয়ের বিয়ে দিতে হলে খরচ করতে হবে না?'—ডাক্তারের গলায় বিষ মিশল ঃ 'মল্লিক হাড়-কেপ্পন, ভুল করে হাত দিয়ে একটা পয়সা গলে গেলেও তার বুক ফেটে যায়। আমি তো বলেছিলুম, মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, লেখাপড়া করতে চায় দিন না টাউনে পাঠিয়ে। হোস্টেলে থাকবে, পড়াশুনো করবে। সে কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল মল্লিক। 'হোস্টেলে রেখে মেয়েকে পড়াব! দেউলে হয়ে যাব যে!' রাস্কেল্‌! ও দেবে মেয়ের বিয়ে?'

'কী অন্যায়!'—এ ক্ষোভও বেরিয়ে এসেছিল হিমাংশুর মুখ থেকেই।

ডাক্তার বলেছিলেন, 'টু বী ফ্র্যাঙ্ক, সুইসাইড করবার চেষ্টা না করে মেয়েটা যদি কারুর সঙ্গে পালিয়েও যেত, তাহলেও আমি খুশি হতুম! সতেরো-আঠারো বছর তো বয়েস হল, সাবালিকা যদি না হয়ে থাকে, তাহলেও তার কাছাকাছি। এটুকু বুদ্ধিও কি মাথায় আসে না? কিন্তু ও-সব কিছু করবে না, একেবারে শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, কারুর দিকে চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত জানে না। সংসারে এরাই বাঁধা গোরুর মতো মার খেয়ে মরে। হত দজ্জাল, ওই শয়তান সৎমা আর সেনিলিটি-ধরা বাপকে সায়েস্তা করে দিতে পারত।'

সেই সোনার পাতের মতো পা'দুখানি মাটিতে পড়তে পারছে না—যেন তরল হয়ে এখনই গলে যাবে। দুটি চোখ মৃত্যুর স্বপ্নে বোজা। নীল রুক্ষ চুলগুলো তার বুকের ওপর, ঠোঁটের কোণায় রক্তের রেখা, নেশায় জড়ানো পাখির কাকলির মতো তার গলা। সেই ছবিটা হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিঁধে রইল ছোরার মতো।

আর সেই ছোরা নিয়েই নিজের বাড়িতে ফিরে এল হিমাংশু।

...আমবাগানের ওপর সূর্যটা নেমে এল, বেলাশেষের সূর্য। মজা পুকুরের জলের ভেতর থেকে কখন উঠে গেছে গো-সাপটা। কলমী বনের ভেতর দিয়ে, শালুক পাতায় পা ফেলে ফেলে শিকার খুঁজছিল জলপিপি। একটা ফড়িঙের স্বচ্ছ সোনালি পাখা কাঁপছিল হিমাংশুর কানের কাছে। আকাশের রঙ আরো নিবিড় নীল হয়ে এল—এর পর সোনা মেখে কালো হয়ে যাবে। হিমাংশুর মনে হল, এবার তার বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু এখনো অন্ধকার নামেনি—এখনো আত্মগোপনের উপায় নেই, এখনো লোকে তার মুখ দেখতে পাবে।

সে চিঠি লিখেছিল কেশবকে।

'যদি মল্লিক মশাইয়ের আপত্তি না থাকে, আমি অমিতাকে বিয়ে করতে চাই।'

জবাবে কেশব লিখল ঃ 'আশ্চর্য হইনি, তোর মুখচোখ দেখে মনে হয়েছিল সিমপ্যাথি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রস্তাব ভালো, পাত্র হিসেবে তুই চমৎকার, কিন্তু মল্লিক মশাই সুবর্ণবণিক—সেটা খেয়াল আছে? জাতের বালাই কাটাতে পারবি? আমি বড়োমামাকে তোর চিঠিটা দেখিয়েছিলুম। মামা বললেন, বুড়ো মল্লিক আপত্তি হয়তো করবে না, আর আপত্তি করলেও মামা তাকে ম্যানেজ করে নেবেন। কিন্তু সত্যিই তোর সাহস আছে? তাহলে আর একবার চলে আয় এখানে। মেয়েটির সঙ্গেও একটু আলাপ-পরিচয় হোক। তারপর—'

তারপর—

সন্দেহ নেই, বড়োমামা সাহায্য করেছিলেন অনেক। তাঁর বাড়িতে মেয়েটি যখন পড়তে আসত, তখন নানা কাজের ছুতোয় উঠে যেতে হত তাঁকে, পড়াবার ভার হিমাংশুই নিত। কেশবও আবহাওয়া তৈরী করত সাধ্যমতো, ফাঁক পেলেই গুণ-কীর্তন শোনাতো হিমাংশুর—বলত, এমন ভালো—এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র আর হয় না। হিমাংশু যে এক বছর বি.এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিল এবং এবার সে কোনোমতে পাস করলেও করে যেতে পারে, এসব তথ্য বেমালুম গোপন করে গেল কেশব।

আর হিমাংশু দেখল, ছবির ফ্রেমে যতটুকু ধরা পড়েছিল মেয়েটি তার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর। তার যে চোখদুটি মৃত্যুর স্বপ্নে সেদিন মগ্ন হয়ে ছিল, আজ তারা অনেক সন্ধ্যা, অনেক সকালের আলোয় তার কাছে জীবনের ভেতর ফুটে উঠল। হিমাংশু দেখল সেখানে কত ভয়, কত শূন্যতা! বার বার মনে হল, এই শূন্যতার ভেতরে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠা করবে কেমন করে?

শুধু একটা জায়গায় তার জিৎ ছিল। গানের সুর ছিল তখনো তার গলায়।

'তুমি গান শেখো না কেন অমিতা?'

'কে শেখাবে?'

'আমি শেখাতে পারি।'

'আপনাকে কোথায় পাব? দুদিন পরেই তো চলে যাবেন।'

তারপরেই বলা চলে, যদি যাই, একলা যাব না—তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু মেয়েটির চোখদুটির দিকে চেয়ে সে-কথা বলতেও যেন ভয় করে। মনে হয়—নিজের অগোচরে কখন তাকে আঘাত দিয়ে বসবে, যে যন্ত্রণার ভেতর সে তলিয়ে আছে প্রতিদিন, নতুন করে রক্ত ঝরাবে তা থেকে।

কাজেই মুখের কথা রূপ পেল গানে।

'একদা তুমি প্রিয়ে
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে-কথা কি গেছ ভুলে?'

আলোয় চোখদুটো বেঁচে উঠতে চাইল। হিমাংশু অনুভব করল ঃ বলা যায়—এখনি বলা যায়। তবু সাহসে কুলিয়ে উঠল না। শেষ পর্যন্ত বলবার ভার কেশবকেই দিতে হল। দেরি করবারও আর উপায় ছিল না, কারণ বন্ধুর বাড়িতে এসে পড়ে থাকারও একটা ভদ্ররকম সীমা আছে—সে বন্ধু যতই প্রিয়তম হোক।

কেশব এসে বললে, 'ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলেছে মেয়েটা।'

রক্তে অনিশ্চয়তার ঝড়। অবরুদ্ধ গলায় হিমাংশু জিজ্ঞেস করল : 'রাজী, না অরাজী?'

'অরাজী মানে? হাতে স্বর্গ পেয়েছে।'

'ওর বাবা? গোকুল মল্লিক?'

'পণ দিতে হবে না, মিনিমাম খরচ, সে বুড়ো তো লাফিয়ে উঠবে। তা ছাড়া নিজের জাত না হলেও কুজাত তো নয়, আপত্তিই বা করবে কেন? ওর দ্বিতীয় পক্ষের প্যাঁচাটির হাড়ে বাতাস লাগবে নিশ্চয়। তবু যদি গাঁইগুঁই করে—মামা আছেন। বুড়োর—' একটু গলা নামিয়ে কেশব বললে, 'কয়েক বছর আগেও এটা-ওটা দোষ ছিল, কোত্থেকে খারাপ রোগও বাধিয়ে এসেছিল। মামাই গোপনে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। সে-সব অস্ত্র মামার হাতেই আছে—তাই ওঁকে যমের মতো ভয় করে বুড়ো।'

'বুড়োর তো অনেক গুণ তাহলে!'

'অনেক।'—কেশব মাথা নাড়ল ঃ 'কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো আশ্চর্য ভালো, মনে হয় যেন আলাদা একটা জগৎ থেকে এসেছে ওরা। আসলে ওর আগের স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মী প্রতিমা—এরা তাঁরই পুণ্যের ফল। খুব জিতে গেলি ভাই হিমাংশু, জীবনে তুই সুখী হবি। জাতের সংস্কারটাও যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিস. দেখিস ভগবান তোকে আশীর্বাদ করবেন।'

কেশবের ভারী বিশ্বাস ছিল ভগবানের ওপর।

তারপরের অংশটা যেমন দ্রুত, তেমনি সংক্ষিপ্ত।

দশদিন পরে বিয়ের দিন ঠিক করে—গোকুল মল্লিকের সম্মতি আদায় করিয়ে—হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরেছিল হিমাংশু। সেদিন তেইশ বছর বয়সে তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা খুব সহজ জায়গা, এখানে সব কিছু একটি নিশ্চিন্ত সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে। অসবর্ণ বিয়ে করে, একটি অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে—যে অতুল কীর্তি সে রাখতে যাচ্ছে, তার জন্য বাবা তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

করেননি।

চা খাচ্ছিলেন, প্রস্তাবটা শোনবামাত্র তাঁর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা মেজেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। তারপর বললেন, 'মেয়েটি সুবর্ণবণিক?'

'হুঁ।'

'তুমি কী জানো?'

'জানি।'

'না—জানো না! অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশে তোমার জন্ম।'

'বাবা, বৈষ্ণবেরা জাতিভেদ মানতেন না।'

'থামো। বৈষ্ণব ধর্মের তুমি কিছু জানো না, একটা কথাও বলবে না তা নিয়ে।'

'বলব না। কিন্তু এই মেয়েকে আমি বিয়ে করবই। কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছ? কিন্তু আমিও কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে কখনো এ অনাচার আমাদের বংশে ঘটতে দেব না। আজকাল কলকাতা নরককুণ্ড হয়ে গেছে, সেখানে বামুনের মেয়ে মুদ্দোফরাসের সঙ্গে হাসিমুখে মালা-বদল করে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ওসব শ্রীক্ষেত্তর এখনো তৈরী হয়নি, এ-বিয়ে আমি হতে দেব না।'

হঠাৎ যেন হিমাংশু অনুভব করছিল তার বাবা তার চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান, তার যুক্তির জোর যাই থাক—একটা কঠিন ভয়ঙ্কর শক্তি দিয়ে তিনি হিমাংশুকে অভিভূত করে ফেলেছেন। তবু সাধ্যমত সে মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে রাখতে চাইল, 'আমি বিয়ে করবই।'

'করবে?'

বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, দেওয়ালের কোণায় ফিট করা বন্দুকটা দাঁড় করানো ছিল, দ্রুত হাতে দুটো টোটা পুরলেন তাতে। তারপর নিজের গলায় নল ঠেকিয়ে, ট্রিগারে আঙুল লাগিয়ে বললেন, 'করো বিয়ে, কিন্তু তার আগে আমার রক্ত দেখে যাও। বিয়ে করার জন্যে যদি নিজের বাপকেই খুন করতে না পারলে, তাহলে আর উপযুক্ত পুত্র হবে কী করে!'

মা হাহাকার করে ছুটে এলেন, বাবার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। বন্দুকে ফায়ার হয়ে গেল একটা—বজ্রের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল ঘর, মা'র চিৎকারে বিদীর্ণ হল চারদিক। কিন্তু মা'র টানাটানিতে বন্দুকের নল সরে গিয়েছিল; তাই গুলিটা বাবার গায়ে লাগেনি—টিনের চাল ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'একবার ফসকেছে, কিন্তু বার বার ফসকাবে না।'

মা হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে, চোখ থেকে জলের বদলে রক্ত ঝরিয়ে বিকৃত গলায় চিৎকার করতে লাগলেন : 'ওরে খুনে—আমাকেও শেষ করে দে তোর বাপের সঙ্গে। আর দেরি করছিস কেন?'

যেন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে, এইভাবে ঘরের মেজেতে মিলিয়ে গেল হিমাংশু।

কেশব চিঠি লিখল বারো দিন পরে।

'ভেবেছিলুম তুই দেবতা, দেখলুম জানোয়ারেরও অধম, গোকুল মল্লিকেরও পায়ের ধুলোর যোগ্য নোস। চিঠি তোকে দিতুম না—প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, কিন্তু একটা খবর না জানালেই নয়। এতদিনে সত্যিই তোদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে অমিতা। কাল

শেষরাতে সে যে কোথায় কোন্ দিকে চলে গেছে কেউ জানে না।'

তারও পরের দিন লজ্জায় গ্লানিতে, ভোরের আলোয় একটা তপ্ত বৈশাখের পূর্বসংকেত দেখা দেবার আগেই, ফসলহীন মাঠের রুক্ষ কাঁটাভরা আলের ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিয়েছিল হিমাংশু।

তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তখন অমিতার জন্য শেষ যন্ত্রণার বহ্ন্যুৎসব।

সেই জ্বালা কতদিন জ্বলেছিল?

কে বলতে পারে—নিশ্চিত করে কে তার হিসেব রাখে! যন্ত্রণার খাতাটা লুপ্ত করে দিতে পারলেই খুশি হয় স্মৃতি। এগারো বছরের ওপর।

বাবা নেই, হিমাংশু দ্বিতীয়বার বি.এ. ফেল করে শহরের কলেজের ক্লার্ক। মাকে এনেছে নিজের কাছে, মা মৃত্যুশয্যায়। ছোট বোন দুটো সঙ্গে আছে—তারা বড়ো হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে তাদের। যে হিমাংশুর বুকের ভেতর এক রাতে একটা অপূর্ব নির্ঝর জেগেছিল, একটা অচেনা দরজা খুলে গিয়েছিল, আর সেই মুক্তির উৎসগুলো ঢেকে দিয়ে আবার দেখা দিয়েছে সেই নিরনুভব পাথরের দেয়াল। হিমাংশু আর গান গায় না, চর্চা ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল; আজ, যদি পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পায়, রেডিয়োতে বাজছে—'আজি কি সবই ফাঁকি, সে-কথা কি গেছ ভুলে'—তা হলেও হিমাংশু একবারের জন্যে থমকে দাঁড়াবে না।

আট বছর ধরে এই কলেজের সে কেরানী-কাম-টাইপিস্ট্। দু-দফা মিলিয়ে মাইনে দুশোর কাছাকাছি। তাতে সংসার পনেরো দিন চলে। তারপর টুকটাক টিউসান, দু-একটা ছোটখাটো ইন্স্যুরেন্স, সেই সঙ্গে অন্য কোনো ধরনের দালালী জোটানো যায় কিনা তার ভাবনা। এর মধ্যে অমিতা কোথাও ছিল না—কোথাও থাকবার উপায়ও ছিল না।

শুধু একটি জায়গায় হিমাংশু নিজের মনকে সহজ করতে পারেনি। বিয়ে করেনি সে। মা'র বার বার অনুরোধের জবাবে বলেছে, 'আমি বিয়ে করে কী করব, স্ত্রীকে তো খাওয়াতে পারব না।' তার উত্তর মা সহজেই দিতে পারতেন। বলতে পারতেন, 'একদিন যেচে পাত্রী ঠিক করেছিলে, সেদিন তো খাওয়ানোর ভাবনা মনে আসেনি।' কিন্তু মা সেকথা বলেন না। দুঃখ দিতে চান না বলেই বলেন না।

তবু অমিতা সুদূর ছিল। তার স্মৃতির চাইতেও হিমাংশুর কাছে অনেক বেশি সজাগ ছিল আত্মগ্লানি। সেই কারণেই এতদিন সে বিয়ে করেনি। কিন্তু অমিতা যে আবার এগারো বছর পরে ওপার থেকে ফিরে আসবে, ফিরে আসবে নতুন প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির জানলায়, ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো শরতের আলোয় ঝলমল করে উঠবে—কে ভাবতে পেরেছিল এই সম্ভাবনার কথা!

দুটো ছবির মধ্যে কী তফাৎ!

সেই এগারো বছর আগের রাত্রে অন্ধ চোখে সে মৃত্যুর ভেতরে পরিক্রমা করছিল; তার সোনার পুতুলের মতো শরীর যন্ত্রণার উত্তাপে গলে ভেসে যেতে চাইছিল, তার নীল চুলের গোছা যেন অনন্ত রাত্রিকে তরঙ্গিত করে আনছিল তার ওপর। আজ শরতের রোদেও আবার তাকেই দেখতে পেল সে। আজও কালো চুলের গুচ্ছ তার কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তার মুখ আজ অন্ধকারের আড়াল থেকে এক নিঃশঙ্ক সূর্যোদয়। আজ লাল শাড়ির পটভূমি, তাকে ঘিরে ঘিরে সাদা মেঘের ওপর অরুণ রাগ—রাত্রির

সহচর হিমাংশু সেখানে কোথায় দাঁড়াবে!

হিমাংশুর সম্বিৎ ফিরে এল। দরগার মলিন শ্যাওলাধরা প্রাচীরগুলো এখন কালো হয়ে গেছে। সূর্য নেমে গেছে পশ্চিমে, জংলা আমবাগানের মাথায় তার শেষ রঙ। পুকুরের ধার থেকে দুটো বক আকাশে ডানা ছড়িয়ে দিল। দীর্ঘ ছায়া পড়ল আশপাশে, তীব্র ঝিঁঝির ডাক উঠল।

ঘাটলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বুকের মধ্যে একটা ব্যাকুল কান্না ফেটে পড়ছিল—ফিরে যেতে হবে—তাকে ফিরে যেতে হবে। কাল প্রিন্সিপ্যাল তাকে আবার তাঁর বাসায় যেতে বলবেন, আর—'

সন্দেহ নেই, মেয়েটি অমিতাই। যদি জানলার ফ্রেমের ভেতর তার কোমর পর্যন্ত ধরা না পড়ত, যদি তাকে দেখে মেয়েটি অমন করে স্তব্ধ হয়ে না যেত, তা হলে—

কিন্তু এ কী করে সম্ভব হল?' কোন্ পথে—কী উপায়ে দূর গ্রামের সেই মেয়েটি--আত্মহত্যার চাইতেও নিষ্ঠুর ভাগ্যের মধ্যে যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, কী করে প্রিন্সিপ্যাল অজয় পালচৌধুরীর স্ত্রী হল? কোন্ ঘটনাচক্রে—কী যোগাযোগে?

হিমাংশু তা কোনোদিন জানবে না—জানবার পথ নেই।

॥ ৩ ॥

সাতদিন পরে, আবার ভাঙা ঝরঝরে সাইকেলটা চালিয়ে হিমাংশু এল সেই নির্জন দরগার কাছে। আজ সে নিশ্চিত হয়েই এসেছে। সঙ্গে এনেছে শক্ত একগাছা দড়ি, পকেটে আছে একখানা চিঠি—'কেহই দায়ী নয়।'

না—কেহই দায়ী নয়।

এই এক সপ্তাহে হিমাংশু তিনবার গেছে প্রিন্সিপ্যালের স্ত্রীর কাছে। প্রিন্সিপ্যাল পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, 'আমার স্ত্রী নমিতা।'

নমিতা—অমিতা নয়। তবু নমিতা হতে অমিতার কতক্ষণ সময় লাগে? জীবনের ছাঁচে এমন করে দুজন এক হয় না, বোধ হয় যমজও নয়। অমিতার কোনো যমজ বোনও ছিল না।

অমিতা তাকে চেনেনি। কোনোদিন আর চিনবে না। শুধু শরতের রোদে খোলা জানলার ভেতর একখানা ছবির মতো সে যে জমাট বেঁধে গিয়েছিল—সে মুহূর্তটা মিথ্যে কথা বলেনি।

এখন দূরে সরে গিয়েও হিমাংশুর আর মুক্তি নেই—অমিতা তাকে চিনবে না—এই যন্ত্রণা তাকে পাগল করে দেবে; আর সে এখানে থাকতে অমিতারও শান্তি নেই—রাহুর ছোঁয়া যে অমিতারও লেগেছিল, বিয়ের দিন ঠিক করে চলে আসার আগে, একটি নিভৃত অবসরে, ভাবী বধূর সসঙ্কোচ সরলতায় সে যে মুখখানি হিমাংশুর মুখের দিকে তুলে ধরেছিল—সে গ্লানিই বা সে কেমন করে ভুলবে!

সাইকেলটা ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল হিমাংশু। চেয়ে দেখল বেলা-শেষের আকাশে শেষ আলোর একটা রক্তিম দীর্ঘ রেখা—যেন অমিতার রক্তাক্ত ঠোঁটের মতো। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে নিলে হিমাংশু, মোটা দড়িটাকে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল আমবাগানটার উদ্দেশে—যেখানে ছায়ারা এখন মৃত্যুময় অন্ধকারের পর্দা খুলছে একে একে।

বন-জ্যোৎস্না

জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়েছে।

দুপাশে নিবিড় শালের বন। কিন্তু নিবিড় হলেও পত্রাচ্ছাদন লতাগুল্মে জটিল নয়—পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো-আঁধারির মায়ায় অপরূপ হয়ে আছে অরণ্য।

সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে শিউকুমারী এগিয়ে চলেছিল। কাঁখের কলসী দেহের ললিত ছন্দে দোল খাচ্ছে—শুকনো শালের পাতা পায়ের নিচে যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। এই সন্ধ্যায় একা জঙ্গলের পথ নিরাপদ নয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, হাতি আছে, নীলগাই আছে, বরা আছে—কী নেই এই বিশাল অরণ্যে? তবু শিউকুমারীর ভয় করে না। তা ছাড়া ডুয়ার্সের বাঘ নিতান্তই বৈষ্ণব, পারতপক্ষে তারা মানুষের গায়ে থাবা তোলে না, এমনি একটা জনশ্রুতিতেও এদেশের লোক প্রগাঢ়ভাবে আস্থাবান।

বনের মধ্য দিয়ে একা চলেছে শিউকুমারী। গায়ে রূপোর গয়নার জ্যোৎস্নার ঝিলিক। জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্নের-মতো বিসর্পিত রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে গেছে, সেখানকার ঘন-বিন্যস্ত ঝোপের ভেতর উঠেছে বুনো ফুলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল—পূর্ণিমা-রাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে থেকে কোথায় তীব্রস্বরে চিৎকার করছে একটা ময়ূর—পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করেছে শিশু একটা পাইথনকে। অকৃপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি—হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র-মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।

জঙ্গল শেষ হতেই খরখরে বালি। পলিমাটির নরম কোমলতা নয়, মুক্তা-চূর্ণের মতো মিহি মখমল-মসৃণ বালিও নয়। চূর্ণ পাথরের টুকরো এখানে কাঁকরের মতো ধারালো। ভরা বর্ষায় জলঢাকা যে সমস্ত পাথরের চাঙাড় হিমালয়ের বুক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতিকায় কতগুলো কচ্ছপের মতো সেগুলো বিশাল বালি-বিস্তারের ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ওপারে ভুটানের কালো পাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অরণ্য—ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনী। দেবতাত্মা নগাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রাকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ী নদী জলঢাকা।

কতটুকু নদী, কতটুকুই বা জল। বুক পর্যন্তও ডুববে কিনা সন্দেহ। দেখে মনে হয় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু মনে হওয়া পর্যন্তই—শুধু হেঁটে কেন, নৌকোতেও পার হওয়া চলে না। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে দুর্দান্ত স্রোতে জল নেমে চলেছে, পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে সমুদ্রে। স্বপ্ন থেকে হঠাৎ-জাগা নির্ঝরের বজ্র-গর্জন। জলের তলায় তলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বেলে পাথর আর গ্র্যানাইটের জগদ্দল স্তূপ। নিচে পাথরে পাথরে সংঘর্ষ—ওপারে খরখরে বালি ভেঙে জলের হুঙ্কার। এতটুকু নদীর কলরোল এক মাইল দূর থেকেও কানে আসে।

জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ঘুমন্ত আলোর বাঁকা তলোয়ার নয়। পাহাড়ীরা যাকে সোনালী অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালী অজগরের মতো গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে—যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।

কাঁখে কলসী নিয়ে শিউকুমারী স্থির হয়ে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। পেছনে অরণ্য, ওপারে অরণ্য আর পাহাড়, মাঝখানে নদী। আকাশে চাঁদ।

ভারী খুশি লাগছে মনটা। আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। এমনি জ্যোৎস্না-রাতেই তো 'পিতমে'র আসবার কথা। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দুধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে! পাহাড়ী ঝাউয়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। জংলী কলার পাতাগুলো কাঁপছে, কাঁপছে জ্যোৎস্নার রঙ মেখে। আর সেই পথ বেয়ে নামছে ঘোড়া, নেমে আসছে ঘোড়সওয়ার। খট্ খট্ খটাখট্! বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিতে হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। 'পিতম' আসছে অভিসারে।

একটা গানের কলি গুন গুন করে দু-পা এগিয়ে আসতে-না-আসতেই আবার শিউকুমারীকে থেমে পড়তে হল। আকাশের চাঁদে আর মায়াময় পৃথিবীতে মিলে বন-জ্যোৎস্নার যে অপূর্ব সুর বাজছিল—হঠাৎ সে সুর কেটে গেছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় সমস্ত শরীর ছম ছম করে উঠল।

জলের ধারে সাদামতো পড়ে আছে, ওটা কী? পাথর? না—পাথর নয়। বিকেলেও শিউকুমারী ওখানে গা ধুয়ে গেছে, তখন তো ওটা ছিল না। আর এতটুকু সময়ের মধ্যে এত বড় একখানা পাথর তো আর হাওয়ার মুখে উড়ে আসেনি। তা হলে?

নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু মানুষ এল কী করে? কেউ খুন করেছে নাকি? জানোয়ারে মেরে দিয়েছে? দুটোই সম্ভব। ননরেগুলেটেড্ এরিয়া—আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সে-জন্যে তাদের সদরে আদালতে ছুটে যেতে হয় না। আর সন্ধ্যেবেলায় দু-চারটে জানোয়ারের জলের কাছে আনাগোনাও খুবই সম্ভব। বিশেষ করে ভালুকের আমদানিটা তল্লাটে এমনিতেই একটু বেশি।

কয়েক মুহূর্ত শিউকুমারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে? এগিয়ে যাবে ওখানে? কে জানে কোনো অনিশ্চিত বিপদ ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে কি না। এই জঙ্গল আর জনহীন নদীর ধারে। এখানে বিপদ-আপদ এলে সে কী করতে পারে!

কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই। দেখাই যাক না। ভুটানী মেয়ের নির্ভীক নিঃসংশয় মন আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মানুষই বটে। কিন্তু বিদেশী—বাঙালী। জলের ধারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে। ভালুকে খায়নি, তা হলে চোখ-নাক নিশ্চয় আস্ত থাকতো না। গায়ে কোথাও রক্তের দাগ নেই—ক্ষতচিহ্ন নেই কোনোখানে। কাপড়টা গোছানোই আছে, সাদা জামাটার সোনার বোতামগুলি আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে। আর, আর—কী আশ্চর্য, মানুষটা মরেনি। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস উঠছে তার, নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তারপর আর ভাবতে হল না শিউকুমারীকে। কলসী ভরে সে জলঢাকার জ্যোৎস্নায় গলা তুহিন শীতের জল নিয়ে এল, সস্নেহে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে একটুখানি উড়ানির হাওয়া দিতেই অজ্ঞান মানুষের দীর্ঘায়ত ক্লান্ত নিঃশ্বাস ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আরো খানিক পরে চোখ মেলল মহীতোষ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি। সমস্ত চিন্তা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড, ছিন্ন ছিন্ন। রূপ নেই, আকার নেই, অর্থ-সঙ্গতি নেই!

আরো জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল শিউকুমারী। আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিলে জল। জলঢাকার বরফগলা স্পর্শে মরা মানুষ চমকে উঠতে পারে, আর মহীতোষ তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে মহীতোষ উঠে বসল।

সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানিতে জ্যোৎস্না, কর্ণাভরণে জ্যোৎস্না। পাশ দিয়ে তীব্র কলরোলে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা। পুলিস নয়, পেছনে ছুটে-আসা শত্রুও নয়। গতিশীল, ভয়ত্রস্ত জীবনের সমস্ত চঞ্চলতা যেন এখানে এসে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে কি পরী এসে নেমেছে তার পাশে? অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে কি শেষ পর্যন্ত মরে গেছে মহীতোষ, আর মৃত্যুর পর পৌঁছে গেছে একটা আশ্চর্য জগতে?

মর্মরশুভ্রা বিদেশিনী তরুণী। মূর্তির মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে—বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা একসঙ্গেই সে দৃষ্টির মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু মর্মরমূর্তি নয়, মানুষই বটে।

মহীতোষ বললে, আমি কোথায়?

হিন্দী-মেশানো বাঙলায় জবাব দিলে মেয়েটি ঃ নদীর ধারে।

নদীর ধারে! মহীতোষের মনে পড়ে গেল। পালিয়ে আসছিল—সে আর অরবিন্দ। শালবনের মধ্যে অরবিন্দ কোথায় হারিয়ে গেল—তার আর সন্ধান মিলল না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, প্রতীক্ষা করবার উপায় নেই। পালাও, পালাও, আরো জোরে পালিয়ে চলো। আগের দিন কিছু খাওয়া হয়নি, সারারাতের মধ্যে চোখ বুজবার উপায় ছিল না একটিবারও। ক্ষিদে-তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা অসাড় আর শিথিল হয়ে গেছে। তারপর ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল জল। পিপাসার্ত পশুর মতো সেদিকে ছুটে এল মহীতোষ। তারও পরে? আর কিছু মনে পড়ে না।

মেয়েটি আবার বললে, কী করে এলে এখানে?

জবাব দিলে না মহীতোষ। কী জবাব দেবে, কেমন করে জবাব দেবে! অবসাদে ভারী, আচ্ছন্ন চোখ দুটো উদাসভাবে মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল ওপারের ঘনান্ধকার অরণ্য কালো পাহাড়ের অতিকায় দিগ্-বিস্তারের দিকে।

শিউকুমারী বললে, উঠতে পারবে? তা হলে চলো আমাদের ঘরে।

মহীতোষ তবুও ভাবছে। কোথায় যাবে সে? কোন্‌খানে তাকে নিয়ে যাবে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি? কোন্ অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ তার দৃষ্টিতে?

মহীতোষ শেষ পর্যন্ত উঠেই দাঁড়ালো। ক্লান্তিতে সর্ব শরীর কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে

পড়তে চাইছে মাটিতে। এক কাঁখে কলসী ধরে আর একখানা হাত অসংকোচে শিউকুমারী এগিয়ে দিলে মহীতোষের দিকে ঃ নাও, আমার হাত ধরে চলো।

অন্য সময় হলে দ্বিধা করত মহীতোষ। সহজাত শিক্ষা আর সংস্কারে একটি অজানা অচেনা তরুণী মেয়ের শুভ্র হাতখানিকে আশ্রয় করবার কল্পনাতেও রক্তে দোলা লেগে যেত। কিন্তু চেতনা তখনো সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। যেন অর্ধতন্দ্রায়, অথবা পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যেই সে খেয়াল দেখছে। চাঁদের আলোয়, বালিতে, জল-কল্লোলে আর বনের মর্মরে সমস্ত পৃথিবীটাই তো অবাস্তব হয়ে গেছে। মন এখানে প্রশ্ন করে না, দ্বিধা করে না। এমন একটা আশ্চর্য পটভূমিতে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক।

শিউকুমারীর ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা আঁকড়ে ধরলে মহীতোষ। সুগঠিত সুঠাম দেহের ওপর সমস্ত শরীরের ভারটাই এলিয়ে দিয়ে বালির ওপরে পা টেনে এগিয়ে চলল সে। একটা সুগন্ধ নাসারন্ধ্র বয়ে যেন তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু সে গন্ধ মেয়েটির দেহ থেকে, অরণ্য থেকে, না আকাশের চাঁদ থেকে—মহীতোষ ঠিক বুঝতে পারল না।

বালির রেখা ছাড়িয়ে জঙ্গল। শালবনের ভেতর দিয়ে মানুষ হরিণ আর ভালুকের চলার পথ। ঝরা শালপাতায় পদধ্বনির মর্মরিত প্রতিধ্বনি। ময়ূর ডাকছে না, কিন্তু হরিয়ালের মাদক সুর ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। হিংস্র জানোয়ারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কোথাও। চকিতের জন্য কানে এল হরিণের মিষ্টি আহ্বান। এমন অপূর্ব বন-জ্যোৎস্নায় সে হয়তো হরিণীকেই সন্ধান করে ফিরছে। কঁক-কঁক-কোঁ! ঝোপের মধ্য থেকে অস্পষ্ট গদ্‌গদ ধ্বনি। বন-মোরগ দম্পতি হয়তো মিলনমায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও।

বন-জ্যোৎস্না। শিউকুমারীর মনে পড়ে এমনি রাত্রে আসবে পিতম। জংলী কলার পাতায় পাতায় ছায়া কাঁপছে পাহাড়ী পথে। ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস। আর পাথরবাঁধা পথ দিয়ে সাদা ঘোড়ার খট্ খট্ সোয়ারী হয়ে আসছে দূরবাসী প্রিয়তম—শালের কুঞ্জে বাসর-যাপন।

শিউকুমারী কি গুনগুন করে গান গাইছে? মহীতোষ কিছু বুঝতে পারছে না। চেতনা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই জ্যোৎস্নায়, বনের এই সংগীতে, এই রহস্যমধুর পথ চলার ছন্দে। শিউকুমারীর গায়ের ওপর ভারটা ক্রমশ বেশি হয়ে চেপে পড়েছে। মহীতোষ আবার কি ঘুমিয়ে পড়ল, না অজ্ঞান হয়ে গেল একেবারে?

জঙ্গলের এদিকটা অনেকখানি ফাঁকা। ডি-ফরেস্টেশনের প্রভাবে জঙ্গল হাল্‌কা হয়ে গেছে—ওদিকে তো একেবারেই নেই। মানুষের কুঠারের ঘা পড়েছে অরণ্যের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যে। কাঠ চাই। ইন্ধনের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সভ্যতার সংখ্যাতীত প্রয়োজনের জন্য, এমন কি জঙ্গল সংহার করবার কুঠারের বাঁটের জন্য। ক্ষত-বিক্ষত অরণ্য দিনের পর দিন হ্রস্ব হয়ে আসছে, অন্তিম প্রতিবাদে ছোট বড় গাছ আর একরাশ লতাগুল্ম দলিত করে লুটিয়ে পড়ছে বৃদ্ধ বনস্পতি, মানুষের অবিশ্রান্ত দাবীর মুখে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীরা নিঃশব্দে আত্মদান করে চলেছে। শুধু ব্যথাতুর বুকের মধ্যে সঞ্চিত জ্বালা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে দাবানল হয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুকনো পাতায় ধু ধু শিখা জ্বালিয়ে আর লতাগুল্মকে পুড়িয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে এদিকে ওদিকে সরীসৃপ-

গতিতে আগুনের প্রবাহ চলে জলস্রোতের মতো। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়—সোজা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরে। বনানীর বুকের জ্বালা আগুনের সাপ হয়ে ছুটোছুটি করে। একদিন, দুদিন, তিনদিন—যে পর্যন্ত না শাল-বনের ডালে ময়ূরের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে হিমালয়ের চূড়ো থেকে আসা নীল মেঘে ধারাবর্ষণ নামে।

জঙ্গল যেখানে হাল্‌কা হয়ে এসেছে সেখানে ভুটানীদের একটা ছোট বস্তি। দেশটা কিন্তু ভুটান নয়—বাঙলা দেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল আর চা-বাগান। চা আর কাঠের প্রয়োজনে একটু দূরেই ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট একটি রেল লাইন—তার ওপর দিয়ে যে রেল গাড়ি চলে তা আরো ছোট। বুনো হাতি দেখলে ইঞ্জিন ব্যাক্ করে—শালগাছ পড়লে গাড়ির চলাচলতি বন্ধ হয়ে থাকে। ননরেগুলেটেড্ অঞ্চল, থানা পুলিসের উপদ্রবটা গৌণ বস্তু। একজন সার্কল অফিসার আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন অথবা কী করেন সেটা নিরাকার ব্রহ্মের মতোই গুরুতর তত্ত্ব-চিন্তা সাপেক্ষ।

এইখানে—চা-বাগান, কাঠের কারবার আর রেল-লাইনের সীমানা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে, কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। চা-বাগান আর কাঠ-কাটা কুলিদের প্রাণরস-সঞ্চয়ের কেন্দ্র। সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথ-ঘাট ভালো নয়, আপদ-বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তবু কুলিরা এখানে আসে—দিনান্তে উগ্র মাদকতায় একবারটি গলা ভিজিয়ে না নিলে তাদের চলে না। কুলবীরের রোজগার যে প্রচুর তা নয়, তবু দিন কাটে, চলে যায় এক-রকম করে।

রাত বাড়ছে। জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ উঠে আসছে মাথার ওপর। কোথা থেকে চিৎকার করছে হায়না। কুলিরা একে একে উঠে পড়ল সবাই, সাঁওতাল কুলিদের মাদলের শব্দ আর জড়িত গানের সুর ক্রমে মিলিয়ে এল দূরে। হঠাৎ কুলবীরের খেয়াল হল, মেয়ে শিউকুমারী এখনো ফেরেনি। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর—

কুলবীরের মনটা ছলকে উঠল। জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি তো? ঝকঝকে ভোজালিখানা খাপে পুরে নিয়ে সবে বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় এল শিউকুমারী। একা নয়, কাঁধে ভর দিয়ে আসছে মহীতোষ। আর আসছে বললেই কথাটা ঠিক হয় না, শিউকুমারী বয়ে আনছে তাকে।

কুলবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ছোট ছোট মঙ্গোলীয়ান চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অস্ফুট গলায় বললে, এ কি?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শিউকুমারী বললে, চুপ। একে কিছু খেতে দিয়ে এখন শোবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। যা শোনবার শুনো সকালে।

কুলবীরের একটা পা কাঠে তৈরি। ১৯১৪ সালের লড়াই-ফেরত লোক সে। ফ্ল্যাণ্ডার্স, কামানের গর্জন—ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট। শেলের টুকরোতে বাঁ পা-খানা হয়তো উড়ে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলেই আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধ থামল, কুলবীর ফিরে এল দেশে। ভুটান সরকার কিছু কিছু জমি-জমা দিলে, রাজভক্তির পুরস্কার। কিন্তু সেই জমি নিয়েই শেষকালে বাধল নানা গণ্ডগোল। বুড়ো কুলবীরের এসব ঝামেলা ভালো লাগল না। একদিন দুটো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সব চাপিয়ে দিয়ে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে, জলঢাকার হিম-শীতল তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে সে চলে এসেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

তারপর দিন কেটে চলেছে। ভালোয় মন্দে, ছোট বড় সুখ-দুঃখে। সাত বছরের মেয়ে শিউকুমারীর বয়স এখন উনিশ। দিনের পর দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কুলবীর, অথর্ব হয়ে পড়ছে। একটা পায়ের অভাবে বুনো ঘোড়ার মতো তেজীয়ান শরীরেও শিথিলতার সঞ্চার হয়েছে খানিকটা। অনেকটা এই কারণেই এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি শিউকুমারীর। বুড়ো বয়সে কুলবীরের অন্ধের যষ্টি।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায়নি, এখন প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী চূড়ো। শালবনকে অত ঘনবিন্যস্ত বলে বোধ হচ্ছে না। পাহাড়ের রেখাটা গাঢ় নীলিমা দিয়ে আঁকা, রাশি রাশি কুঞ্চিত রোমের মতো ঘন জঙ্গল তার সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে।

হুঁকো হাতে নিয়ে দড়ির খাটিয়ায় বসে মহীতোষের ইতিহাস সবটা শুনল কুলবীর। চাপা তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

—এখানে কেমন করে তোমাকে থাকতে দেব বাবু? ইংরেজের মুলুক। আমার দেশ ভুটান হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু এখানে—

পচাইয়ের একটা হাঁড়ি নিয়ে শিউকুমারী বেরিয়ে এল বাইরে। বন-জ্যোৎস্নায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল, দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। খর্ব নাসিকা, ছোট ছোট চোখ। পরনের উড়ানিটার রং বিবর্ণ। ফর্সা মুখখানার ওপরে স্বাভাবিক অযত্নের একটা মলিন রেখা পড়েছে, গলার খাঁজে কালো হয়ে জমে আছে ময়লা। অপগতক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্তই পথেঘাটে দেখা পাহাড়ী মেয়ে। বন-জ্যোৎস্না আর সোনালী অজগরের মতো খরধার নদীর পটভূমিতে আলোর পাখায় যে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল, সে যেন নিতান্তই অন্য লোক।

মহীতোষ কোনো জবাব দিলে না কুলবীরের কথায়, জবাবটা দিল শিউকুমারী। বললে, না বাবা, বাঙালীবাবুকে কটা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালীকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন?

এবার চমকাবার পালা মহীতোষের। আশ্চর্য, এমন একটা কথা এই নোংরা পাহাড়ী মেয়েটা বলতে পারল কী করে? এ কি স্বাধীন পাহাড়ী রক্তের থেকে স্বতোৎসারিত অথবা এই আরণ্যক উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রভাব? মহীতোষ তাকিয়ে রইল শিউকুমারীর দিকে। সুগঠিত দেহ—লালিত্যের চাইতে দৃঢ়তা বেশি। ছোট ছোট চোখ দুটোতে শাণিত দৃষ্টি। কানে রূপোর দুটো প্রকাণ্ড আভরণ—বাঙালী মেয়ের নরম কান হলে ছিঁড়েই নেমে পড়ত। এক লহমায় মনে হল ভুটানের স্বাধীন সৈনিকের জন্ম দেবার অধিকারিণী বীরমাতাই বটে।

কিন্তু কথাটা কুলবীরের মনে ধরেছে। স্বাধীন জাত—প্রতিদিন বিদেশী শৃঙ্খলের অপমান বয়ে বেড়াতে হয় না। তা ছাড়া নিজে লড়াই করেছে—কাদামাখা বোমাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, ফাটা শেলের ফুলঝুরিতে, রাশি রাশি বুলেটের মধ্যে, বেয়নেটের ধারালো ফলায়। সৈনিকের মর্যাদা সে বোঝে। আর তা ছাড়া মহীতোষও সৈনিক বইকি। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে সে-ই তো সৈনিক।

কুলবীর চিন্তিত মুখে হুঁকোয় টান দিয়ে বললে, আচ্ছা, থাকো। এখন কোনো ভয় নেই—এবেলা লোকজনের আমদানি হয় না জঙ্গলে। কিন্তু বিকেলে চা বাগান থেকে সব আসে, তাদের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে।

শিউকুমারী বলল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক করে নেব।

মহীতোষ কৃতজ্ঞ গাঢ় চোখে একবার তাকালো শিউকুমারীর আনন্দিত উজ্জ্বল মুখের দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে, তোমার দয়া থাপাজী।

—না, না, দয়া আর কিসের। এসেছো, থাকো দুদিন।—কুলবীর অল্প একটু হাসল, তারপর কাঠের পায়ে খটখট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু সংশয় কাটছে না।

থাকার অনুমতি মিলল, কিন্তু মহীতোষ ভাবতে লাগল, থাকা কি সত্যিই সম্ভব। পাহাড়ীদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর—ঝোপড়ী। দড়ির খাটিয়া। পচাইয়ের উগ্র দুর্গন্ধ। চারদিকে নীল জঙ্গল, পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখে কারাগারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ জগৎটাতে ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী যে ঘটে চলেছে তা এখান থেকে জানবার বা অনুমান করবারও উপায় নেই। এ কি আশ্রয়, না আন্দামানে নির্বাসন?

শিউকুমারী এগিয়ে এল। পাহাড়ী মেয়ের সহজ নিঃসংশয়তায় একখানা হাত রাখল মহীতোষের কাঁধের ওপর। বললে, বাঙালীবাবু, কী ভাবছ?

মহীতোষ অন্যমনস্কভাবে বললে, কিছুই তো ভাবছি না।

—না, কিছুই ভাবতে হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার, অংরেজ এখানে তোমাকে খুঁজে পাবে না!

মহীতোষ ম্লান হাসল ঃ ঠিক জানো তুমি?

—জানি বইকি! কিন্তু এখানে থাকতে হলে তো বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাজ করতে হবে। চলো, জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনি।

একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে যেন হাল্‌কা হয়ে গেল অনিশ্চিত অস্বস্তির বোঝাটা। মহীতোষ উঠে দাঁড়ালো, বললে, চলো।

শালবনের পথ। নিচের দিকটা দাবানলে জ্বলে গেছে এখানে ওখানে। শাল শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কালো কতকগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়েছে বলেই ওরা মরবে না। এ হচ্ছে ওদের জীবন-শক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করবার পরে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন-চার বছর দাবানল ওদের ডাল-পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নি-উপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠবে—ঋজু হয়ে উঠবে—নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।

ডালে ডালে পাখি। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বন-মুরগীর ছুটোছুটি। চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দুপাশে সবুজ ঘন-বিন্যস্ত ঝোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনো ফুল। পায়ে পায়ে ভুঁইচাঁপার নীল-বেগুনী মঞ্জরী।

কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের

রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম, এ কথা আগে কি কখনো কল্পনা করতে পারতো মহীতোষ? কিন্তু আর নুয়ে নুয়ে খড়ি কুড়োতে পারা যায় না। পিঠটা টনটন করছে।

শিউকুমারী ডাকল, বাঙালীবাবু?

মহীতোষ চোখ তুলে তাকালো ঃ কী বলছ?

—হাঁপিয়ে গেছ তুমি। এসব কাজ কি তোমাদের পোষায়? এসো, জিরিয়ে নিই।

একটা শালগাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসল দুজনে। নীল, ঠাণ্ডা ছায়া, খসখসে শালের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি। ঘুঘু ডাকছে। ভুঁইচাঁপার ওপরে উড়ে বসছে নানা রঙের বুনো প্রজাপতি। গাছের ডালে ডালে বানর লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, ঘুমন্ত অরণ্য। হিংস্র রাত্রির অবসানে জানোয়ারেরা হয়তো ঝোপ আর ঘাস-বনের ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখন।

শিউকুমারী আস্তে আস্তে বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঙালীবাবু।

মহীতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ না, কষ্ট আর কিসের?

—কষ্ট নয়? দেশ গাঁ ছেড়ে কোথায় এসে পড়েছ। এখানে জঙ্গল, আমরা জংলা মানুষ। এ তো তোমার ভালো লাগবার কথা নয়।

মহীতোষ মৃদু হাসল ঃ কিন্তু ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো নিশ্চয়ই।

—তা সত্যি।

শিউকুমারীর মনটা হঠাৎ ভারাতুর হয়ে উঠল। শুধু এইটুকুই ভালো, ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো? তার চাইতে আরো কিছু ভালো নেই কি এখানে? জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া—হাওয়ায় ঝরে-পড়া শালের ফুল। রাত্রিতে মাতাল-করা বন-জ্যোৎস্না। জলঢাকার কলরোল। কাঞ্চনজঙঘার সোনার মুকুট। দূরের পাহাড়ে পাথর-কাটা পথের ওপর যখন জংলা কলার পাতা হাওয়ায় কাঁপে, জানোয়ারের পায়ে লেগে গড়িয়ে-পড়া পাথরের শব্দে যখন মনে হয় দূরবাসী পিতম ঘোড়া ছুটিয়ে অভিসারে আসছে, তখন শিউকুমারীর ইচ্ছে করে—

কিন্তু শিউকুমারীর যে ইচ্ছে করে, সে ইচ্ছে মহীতোষের নয়। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। ছাব্বিশে জানুয়ারি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাত্রির তপস্যা। আগস্ট আন্দোলন—ডু অর ডাই। সেই জগৎ থেকে, সেই আন্দোলিত আবর্তিত বিপুল জীবন থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল সে? বিক্ষুব্ধ বোম্বাই—উন্মত্ত কলকাতা। পথে পথে 'বন্দেমাতরম্'। লাঠি, বন্দুক, রক্ত, আইন। চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ঘুরে যায় সমস্ত। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—সেই গর্জিত সমুদ্রের তরঙ্গে আফ্রিকার বনভূমির শিলাসৈকতের মতো জীবনের একটা অজ্ঞাত-তটে নিক্ষিপ্ত হয়েই পড়ে থাকবে সে? আকাশে যেখানে ঘূর্ণিত নক্ষত্রমালায় আর জ্বলন্ত নীহারিকায় ভাঙা-গড়ায় প্রলয় চলেছে, সেখান থেকে কক্ষভ্রষ্ট মৃত্যু-সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে থাকবে নিবে যাওয়া উল্কা?

মহীতোষ বললে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ তোমরা। এ ঋণ কী করে শোধ হবে জানি না।

—দয়ার ঋণ আমরা শোধ নিই না বাঙালীবাবু—শিউকুমারীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে আমাদের নিয়ম নয়। কিন্তু চলো, বেলা উঠে গেল।

খোঁচা খেয়ে মহীতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল। এ আকস্মিক তীক্ষ্ণতার অর্থ কী? ডুয়ার্সের

জঙ্গলের মতোই জংলী মেয়ের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

ছোট কাঠের বোঝাটা মহীতোষ তুলে নিলে নিঃশব্দে।

শালবনের ছায়ামেদুর কবিতায় ছন্দপতন হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বুনো হাতির ডাক। জলঢাকার কলগর্জন ছাপিয়ে মেঘমন্দ্রের মতো সে ডাক ভেসে এল।

কক্ষভ্রষ্ট উল্কা। কিন্তু নিবতে চায় না—বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরাম। তবু উপায় নেই, থাকতে হবে; অন্তত ক'টা দিনের জন্যে আশ্রয় নিতে হবে—যে পর্যন্ত অরবিন্দ ফিরে না আসে। আর মহীতোষ জানে, মনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই জানে, অরবিন্দ ফিরে আসবেই। যেখানে থাক, যেমন করে থাক, তাকে খুঁজে বার করবেই। মৃত্যুর হাত এড়ানো চলে, কিন্তু অরবিন্দের চোখকে এড়াবার উপায় নেই। তার দুটো চোখ যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তবু দিন কাটে। খড়ি কুড়োয়, কুলবীরের গাদা বন্দুক নিয়ে বন-মুরগী শিকার করে, হরিণের সন্ধান করে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় এখনি হয়তো কোথা থেকে একটা ছায়ামূর্তির মতো অরবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অরবিন্দ আসে না। যেখান সেখান থেকে বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউকুমারী। কাঁধে কলসী, ভিজে শাড়ি সুললিত দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হেসে চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলে, শিকার মিলল?

থমকে দাঁড়িয়ে যায় মহীতোষ। দৃষ্টিটাকে বন্দী করে ফেলে শিউকুমারীর অনিন্দ্য দেহসুষমা। মনে রঙ লাগে। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে অবচেতনার স্বীকারোক্তি ঃ মিলল বলেই তো মনে হচ্ছে।

শিউকুমারীর দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে যায় ঃ সত্যি?

—সত্যি।—যেন অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে টান লাগে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মহীতোষ ঃ অনেক খুঁজে এইবার পাওয়া গেল বলে ভরসা হচ্ছে।

শিউকুমারী আর দাঁড়ায় না। দেহভঙ্গিমার উন্মত্ত আলোড়ন রক্তের কণায় কণায় জাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। আর পরক্ষণেই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মহীতোষের। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়, মনে হয় একান্তভাবে ব্রতচ্যুত, যোগভ্রষ্ট। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো? ছব্বিশে জানুয়ারির সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে বনে বনে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সে?

দু হাতে মাথাটা টিপে ধরে মহীতোষ। নাঃ, আর নয়। এ কোন্ জালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে সে? স্বাধীনতার সৈনিক—শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কান্নায় কন্যাকুমারী থেকে গৌরীশেখরের তুহিন্ শৃঙ্গ অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ কি মোহ তার! এইভাবেই সে কি তার কর্তব্য পালন করছে?

বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত পচাই-লোভী কুলি আর পাহাড়ীদের আড্ডা বসে কুলবীরের দোকানে। কাঠের পা কুলবীর একা সব দেখাশোনা করতে পারে না; শিউকুমারী কাজের সহায়তা করে তার। মৃদু হাসির সঙ্গে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দেয় পচাইয়ের ভাঁড়। মনে রঙ লাগে; নেশার রঙ—শিউকুমারীর চোখের রঙ। ভুল করে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে।

আর সেই সময়ে কুলবীরের একটা ঢোলা হাফ-প্যাণ্ট পরে ঘরের পেছনে একটা

চৌপাইয়ের ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মহীতোষ। এই সময়টাই তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। কুলিরা আসে, কুলিদের সর্দার আসে। ফরেস্ট-অফিসের দু-চারজন আধাবাবুরও পদপাত ঘটে। ওখান থেকে হৈ চৈ শোনা যায়, হুল্লোড় শোনা যায়, দুর্বোধ্য গানের কলি শোনা যায়, উন্মত্ত হাসিতে কুলবীরের ছোট ঝোপড়ীটা যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে একটা তরল তীক্ষ্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে—শিউকুমারী হাসছে।

মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যিই কাটে? শিউকুমারী হাসছে—পাহাড়ী মেয়ে পচাই বিক্রির খরিদ্দারদের খুশী করবার জন্যে তার অভ্যস্ত হাসি হাসছে! তাতে মহীতোষের কোনো ক্ষতি নেই। তা হলে বুকের মধ্যে জ্বালা করে কেন, কেন মনে হয় শিউকুমারী তাকে ঠকাচ্ছে?

বন-জ্যোৎস্না শেষ হয়ে গেছে, এসেছে অমাবস্যা, আরণ্যক তমসা। অন্ধকারের মধ্যে মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে। বুকের মধ্যে অসহায় কান্নার রোল ওঠে—অরবিন্দ, অরবিন্দ? এমন সময় তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল অরবিন্দ?

নিজে চলে যাবে? এখুনি চলে যাবে এই কালো অন্ধকার-ঘেরা শালবনের ভেতর দিয়ে কালিমাখা জলঢাকার তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে? কিন্তু মন তাতেও উৎসাহ পায় না। কে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। একা চলে যেতে ভয় করে, ভয় করে আবার কোনো একটা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ীদের এই ছোট ঘরেই কি সে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেল, হারিয়ে ফেলল পথ-চলার ক্ষমতা? অরবিন্দ—এ সময়ে যদি অরবিন্দ থাকত!

কুলবীরের দোকানে কলরব ক্রমশ কমে আসছে। শিউকুমারীর হাসির আওয়াজ আর শোনা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে ঠুন ঠুন করে মিষ্টি শব্দ। কাঠের বাক্সের ওপর বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা গুনছে কুলবীর।

হঠাৎ কেরোসিনের টেমির আলো এসে মুখে পড়ে মহীতোষের। প্রদীপ হাতে বনরাজ্যের মালবিকা। চোখে সকৌতুক দৃষ্টিঃ চলো বাঙালীবাবু, ঘরে চলো। ওরা পালিয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহীতোষ উঠে পড়ে। ঠিক প্রথম দিনটির মতোই হাত বাড়িয়ে দেয় শিউকুমারীঃ এসো, এসো!

আর কিছু মনেও থাকে না। একটু আগেকার তীব্র হাসির জ্বালাটাও তেমনি করে আর কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে না। এই মেয়েটি কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে!

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাটল না। জীবনের অপরিহার্য জটিলতা এসে দেখা দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেও আবির্ভূত হল। একমুখ কুটিল হাসি বিস্তার করে বললে, ভালো আছো শিউ?

শিউকুমারীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কুলবীর তাকালো সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিতে। সাংঘাতিক লোক বলদেও। পচাইতে তার নেশা নেই—কোনো মতলব না থাকলে এদিকে পা দিত না সে। কিন্তু কী সে মতলব?

কুলবীর অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বলদেও প্রতিপত্তিশালী লোক। যেমন কূটবুদ্ধি, তেমনি নির্মম। তাকে ভয় না করে এমন লোক নেই। তবু শিউকুমারী ভয় করেনি তাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাত চেপে ধরে প্রণয় নিবেদন করেছিল বলদেও। বলেছিল, যত টাকা চাস—

কিন্তু কথাটা শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড চড়টার বিভ্রম থেকে আত্মস্থ হয়ে বলদেও যখন মাথা তুলেছিল, তখন জলঢাকার বালি-বিস্তারের ওপর একটি প্রাণীরও চিহ্ন নেই। শুধু নদীর গর্জন পরিহাসের মতো বাজছে।

টাট্টু ছুটিয়ে বলদেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু চড়ের জ্বালাটা যে সে ভোলেনি, সহজে ভুলবেও না—এ কথা শিউকুমারীও জানত।

বিবর্ণ মুখে শিউকুমারী বললে, ভালোই আছি।

—হুঁ, খুব ভালো আছো বলেই মনে হচ্ছে?—আবার নির্মমভাবে বলদেও হাসল। ছোট ছোট চোখ দুটোয় ঝিকিয়ে উঠল পাহাড়ী প্রতিহিংসার সর্পিল চমক।

বলদেও নেশা করে না সহজে। কিন্তু আজ তার কী হয়েছে—ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষ করে চলল সে। একটা দশ টাকার নোট কুলবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, চালিয়ে যাও থাপাজী।

রাত বেড়ে চলল। একে একে খরিদ্দারেরা চলে গেল সবাই। কিন্তু বলদেও ওঠে না। অধৈর্য হয়ে টাট্টু ঘোড়াটা পা ঠুকছে বারে বারে, লেজের ঘা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারকে ভয় করে না বলদেও। অমিত শক্তিমান লোক—ভোজালির ঘায়ে বাঘ মারতে পারে।

কী একটা কাজে কুলবীর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বলদেও এগিয়ে এল। শিউকুমারীর চোখের ওপর রক্তাক্ত হিংস্র চোখ দুটো স্থিরনিবদ্ধ করে বললে, ফেরারী আসামীকে ঘরে জায়গা দিয়েছ?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর কেঁপে গেল শিউকুমারীর ঃ কে বলেছে তোমাকে?

—আমাকে ফাঁকি দেবে তুমি?—মুষ্টিগত শিকারের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে বলদেও বললে, সাত-সাতটা চোখ আছে আমার। কালই খবর যাবে ফাঁড়িতে ঃ শুধু ওই বাঙালীবাবু নয়, হাতে দড়ি পড়বে থাপাজীরও।

শিউকুমারী আর্তনাদ করে উঠল।

বলদেও বললে, শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালীবাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সক্কলকে ফাটকে যেতে হবে।

শিউকুমারী তাকিয়ে রইল নির্বাক চোখে।

বলদেও খাপ থেকে বার করলে ঝকঝকে ভোজালিখানা, যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার ধার পরীক্ষা করলে একবার। বললে, টাকার জন্য ভেবো না। আমাকে খুশি করতে পারো তো যা চাও তাই দেব। যুদ্ধের বাজারে কাঠের ব্যবসা করছি জানো হয়তো। কিন্তু আজ রাতের কথা যেন মনে থাকে। যদি না যাও কাল সকালে যা হবে, তার জন্যে আমাকে দোষ দিও না।

বলদেও টলতে টলতে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। সাত সেলের তীব্র একটা হান্টিং-টর্চের

আলোয় অরণ্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এত ব্যাপার জানল না মহীতোষ। দড়ির খাটিয়ায় সে তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরে শালের পাতায় মর্মর তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, ঝোপড়ীর ফাঁকে ফাঁকে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে সে। কিসের স্বপ্ন? ছাব্বিশে জানুয়ারির নয়, নাইন্‌থ আগস্টেরও নয়। পতাকাবাহী উন্মত্ত জনতার তরঙ্গবেগ কোথায় চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতলতায়। জলঢাকার খরখরে বালির ওপর বন-জ্যোৎস্না। চোখে-মুখে জলের ছাট দিয়ে যে উড়ানির বাতাস দিচ্ছে, সে কি কোনো মর্মর মূর্তি? অথবা আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে নেমে-আসা কোনো আলোক-পরী?

চমকে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের ওপর কে যেন আছড়ে পড়েছে এসে। বড় বড় নিঃশ্বাস মুখের ওপর এসে পড়ছে—অনুভব করা যাচ্ছে তার উত্তেজিত প্রসরণশীল হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ। কেরোসিনের টেমির আলোয় মহীতোষ দেখলে, শিউকুমারী!

—চলো, পালাই আমরা! আমাকে নিয়ে চলো তুমি!

আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে মহীতোষ দুহাতে পাহাড়ী মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেঃ কোথায় যাব?

শিউকুমারীর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য আবেগে থরথর করে গলা কাঁপছে তারঃ যেখানে তোমার খুশি।

মহীতোষ ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে উঠছেঃ কিন্তু কী করে নিয়ে যাবো তোমাকে? এখান থেকে শুধু হাতে তো পালানো চলে না। পদে পদে বিপদ! সে-সব এড়াবার জন্যে টাকা দরকার। অনেক দূর দেশে তো যেতে হবে, টাকা নইলে চলবে কী করে?

—টাকা! শিউকুমারী বলে বসলঃ কত টাকা চাই তোমার?

—দুশো—তিনশো। তাহলে তোমাকে নিয়ে সিকিম চলে যেতে পারব, চলে যেতে পারব একেবারে গ্যাংটকে। সেই ভালো। সেখানে গিয়েই ঘর বাঁধব আমরা। যা পেছনে পড়ে আছে, পেছনেই পড়ে যাক—মহীতোষের যেন নেশা লেগেছেঃ নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

দুশো—তিনশো। শিউকুমারী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? কুলবীরের বাক্স হাতড়ালে কুড়িটা টাকার বেশি একটি আধলাও পাওয়া যাবে না, এ কথা তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে!

মহীতোষ লোভীর মতো হাত বাড়ালো।

কিন্তু সরে দাঁড়াল শিউকুমারী। দুশো টাকা! বলদেও আজ সারারাত প্রতীক্ষা করে থাকবে। চিন্তাগুলো একসঙ্গে আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুপুঞ্জের মতো ফুটতে লাগল। মাত্র একবার। একটি রাত্রির অশুচিতা। তারপরে যে জীবন আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

মহীতোষ বললে, বুকে এসো।

—টাকার যোগাড় করে আনছি—ঘর থেকে মাতালের মতো বেরিয়ে গেল শিউকুমারী। চিন্তার মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে—যেন এক পাত্র চড়া মদ খেয়েছে সে। দুষ্ট ক্ষুধা বলদেওয়ের। এক রাত্রের জন্য তিনশো টাকা খরচ করবে, এমন বে-হিসেবী সে নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে, যতদিন শিউকুমারীর যৌবন থাকে, ততদিন তাকে দলিত

মথিত করে লুটে নেবার জন্যেই বলদেওয়ের এই কৌশল। এই ফাঁদে আরো অনেকেই পড়েছে।

কিন্তু শিউকুমারীর পক্ষে মাত্র এক রাত্রি। সমস্ত জীবনের জন্যে একটি রাত্রির চরম গ্লানি, চূড়ান্ত অপমানকে মেনে নেবে সে। তারপর কাল, পরশু? তখন হয়তো তারা ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে চলেছে সিকিমের দিকে। সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র জ্বরের জ্বালা নিয়ে ডিলিরিয়ামের রোগী যেমন উঠে বসতে চায়, ছুটে যেতে চায়, তেমনি করেই শিউকুমারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বিছানার ওপরে বিহ্বল হয়ে বসে রইল মহীতোষ। তার রক্তে রক্তে এ কি আশ্চর্য দোলা! যেন নিশি পেয়েছে তাকে। তাই নিজের অতীত—জীবনের সঙ্কল্প, সব মিথ্যা আর মায়া হয়ে গেছে। নতুনের আহ্বান—বহু বিচিত্র—বহু ব্যাপক অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান। এই পুলিসের তাড়া—এই বিব্রত বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলো—এদের ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ক্ষতি কী, ক্ষতি কী নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আশ্চর্য একটা অ্যাডভেঞ্চারের সমুদ্রে?

চাপা গলায় মহীতোষ ডাকলে, শিউ শিউ!

কিন্তু শিউ এল না, এল অরবিন্দ। সত্যিই অরবিন্দ। জঙ্গলের মধ্য থেকে উঠে এল অমানুষিক মানুষ। মহীতোষের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন বরফ-গলা জলের শিহরণ নেমে গেল।

মহীতোষের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় অরবিন্দ বললে, অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এখানে বসে একটা পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা ছাড়াও ঢের কাজ আছে তোমার। উঠে পড়ো।

বিহ্বল ভীত গলায় প্রশ্ন এল ঃ কোথায়?

—পঁচিশ মাইল দূরে। ভালো শেল্‌টার আছে, দলের লোক আছে। ওখানে থেকে শহরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক বেশ করা চলবে। উঠে পড়ো।

—এখনি?

—হ্যাঁ, এখনি।—মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল অরবিন্দের। বাঁ-হাতে দেখা দিলে ছোট একটা কালো রিভলবার ঃ তিন রাত পাহাড়ীদের ঘরে কাটিয়েই কি আয়েসী হয়ে গেলে নাকি?

মহীতোষ কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো। রিভলবারের সংকেতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

অরবিন্দ বললে, বাইরে বড় ঘোড়া তৈরি আছে। দুজনকেই এক ঘোড়ায় উঠতে হবে। হারি আপ!

টর্চের আলো নিবে গেল। ঝোপড়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পচাইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূরে ঝম ঝম করে প্রচণ্ড শব্দে ভুটিয়ারা ঝাঁঝি বাজাচ্ছে—অপদেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে তারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কি অপদেবতার পদধ্বনিও মিলিয়ে এল?

চরম লাঞ্ছনা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা তিনশো টাকার নোট। শিউকুমারীর হাতের মধ্যে ঘামে ভিজছে নোটের তাড়াটা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। কালো অন্ধকার, এক হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না। শালের

পাতায় শিরশিরানি—এখানে ওখানে বন্যজন্তুর আগ্নেয় নয়ন।

মহীতোষ—এই কালো অন্ধকারে কোথায় মহীতোষকে খুঁজে পাবে শিউকুমারী? অরণ্য তাকে গ্রাস করেছে, নিঃশেষে তলিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু অন্ধকারে শিউ-কুমারী খুঁজে ফিরছে। শালের চারায় পা কেটে রক্ত পড়ছে—কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। এত অন্ধকার—এমন দুশ্ছেদ্য তমসায় একটুখানি আলো যদি পাওয়া যেত!

আলো পাওয়া গেল। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়ার শব্দ—বন-মুর্গীর ভীত কলরব চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জ্যোৎস্না নয়—দাবাগ্নি।

হয়তো

মঞ্জুশ্রী বললে, 'চমকালে?'

হাতের সিগারেটটা তখনও কাঁপছিল সুদেবের। জবাব দিতে একটু সময় লাগল।

'না—চমকাব কেন?'

শঙ্খধ্বনির মতো আওয়াজ তুলল ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিন। গাড়ি এগিয়ে চলল। আর প্ল্যাটফর্মটা পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত—ট্রেন খানিকটা স্পীড না নেওয়া পর্যন্ত সুদেব নিজেকে সহজ করে নেবার অবকাশ পেল।

এইবার সে চোখ তুলে চাইল মঞ্জুশ্রীর দিকে।

বেশ নতুন রকমের মনে হল—ঠিক এই বেশে মঞ্জুশ্রীকে এর আগে কখনো দেখেনি। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি। কপালে সিঁথিতে গাঢ় রঙের সিঁদুর ঝকমক করছে গাড়ির আলোয়।

সিঁদুর? তা হোক। প্রায় ছ'বছর পরে সুদেবের তাতে কী আসে যায়।

স্থির শান্ত দৃষ্টিতে মঞ্জুশ্রী তাকে দেখছে, এই অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। কী দেখছে? এর মধ্যে কতখানি বদলে গেছে সে? কিংবা বুঝতে চাইছে—রেবা দত্তকে নিয়ে সে সুখী হয়েছে কি না? সুদেব হাসতে চেষ্টা করল। সিগারেটে টান দিলে একটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'চমকাবার কিছু নেই মঞ্জু। পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে আজকাল। তাছাড়া তারকেশ্বর তো খুব দূর জায়গা নয়।'

মঞ্জুশ্রী বললে, 'কিন্তু তাহলেও তোমার সঙ্গে আজ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।'

ধাঁধা লাগল। ভুরু-দুটো একটু কুঁচকে উঠল সুদেবের।

'বুঝতে পারলুম না।'

মঞ্জুশ্রী হাসল। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সামনের একটু উঁচু দাঁত দুটো ফুটে উঠল এবারঃ 'আমি থার্ড ক্লাসের যাত্রী। তোমাকে এই কামরায় দেখে হঠাৎ উঠে পড়তে ইচ্ছে করল। নইলে আমি থাকতুম ট্রেনের আর এক কোণায়, নেমে যেতুম ভিড়ের ভেতরে—আমাকে দেখতেও পেতে না।' আবার হাসল মঞ্জুশ্রীঃ 'অবশ্য তাতে তোমার কোনো ক্ষতি ছিল না।'

'আশা করি, তোমারও না।'

'না।'—সহজভাবেই জবাব দিলে মঞ্জুশ্রী ঃ 'তবু এই ফার্স্ট ক্লাসে তোমাকে একা বসে থাকতে দেখে হঠাৎ কি রকম মনে হল, উঠে পড়লুম। সেই পুরনো অভ্যেসেই বোধ হয়।'

'ছ'বছরেও অভ্যেসটা কাটল না?'

'অভ্যেস বদলাতে মেয়েদের সময় লাগে। আরো যদি সেটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।'

সুদেব আশ্চর্য হচ্ছিল। স্পষ্টতায় নয়, মঞ্জুকে সে জানে—তার চিন্তায় অস্বচ্ছতার আড়াল নেই কোথাও। এই জন্যেই তাকে একদিন ভালবেসেছিল সুদেব, এই জন্যেই আর একদিন তাকে সে ভয় করত।

সুদেব বললে, 'তোমার তিনি একথা শুনলে রাগ করবেন।'

'কার কথা বলছ?'

'যিনি তোমার কপালে নতুন করে সিঁদুর পরিয়েছেন। তিনি কি আজ সঙ্গে নেই?'

'তিনি কোথাও নেই। নতুন করে সিঁদুর কেউ তো পরায়নি।'

প্রথমবারের চাইতে দ্বিতীয় চমকটা আরো জোরালো হয়ে ধাক্কা দিলে সুদেবকে। সিগারেটটা ঠোঁটে তুলতে চাইছিল, তার বদলে জানলার বাইরে হাওয়ার ঝড়ে ছেড়ে দিলে সেটাকে।

'তা হলে সিঁদুর—'

'কেন, পরতে নেই?'

'ওটা পরার দায় থেকে তোমাকে তো নিষ্কৃতি দিয়েছিলুম।'

'তা দিয়েছিলে।'—মঞ্জুশ্রীর শান্ত চোখ দুটোয় যেন কৌতুকের আভা মিলল একটু-খানি ঃ 'সিটি সিভিল কোর্টের থার্ড বেঞ্চে।'

'তারপরে তুমি তো কুমারী।'

'ওটা বিলিতি মতে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল খাঁটি হিন্দু নিয়মে।'

'সে বিয়ে তো বাতিল হয়ে গেছে।'

'আইনত। কিন্তু হিন্দু বিয়ের শর্ত জানো তো? জন্ম-জন্মান্তর।'—স্বর আরো সহজ মঞ্জুশ্রীর, কপালে সিঁদুরের মস্ত ফোঁটাটা জ্বল-জ্বল করতে লাগল প্রকাণ্ড একটা চুনীর মতো—মনে হল, তার সিঁথির ওপর দিয়ে যেন রক্তের একটা রেখা টানা।

কোনো একটা স্টেশনে ট্রেন থামল—হয়তো সিঙ্গুর, হয়তো অন্য কিছু। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শাঁখের আওয়াজ তুলে ছুটতে আরম্ভ করল আবার।

একবারের জন্যে স্মৃতি চমকালো সুদেবের। শাঁখ বাজছিল, উলু উঠছিল, কাঁপা হাতে তার গলায় মোটা গোড়ের মালাটা পরিয়ে দিচ্ছিল মঞ্জুশ্রী। লজ্জায় চোখ দুটো প্রায় বোজা—গালের চন্দন বিন্দুগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছিল ঘামের ফোঁটা। কে এক প্রৌঢ়া বলছিলেন, 'চোখ খোল্—এই মেয়ে, চোখ খোল্—'

বাইরে কতগুলো বাড়ি-ঘরের আলো একবার ঝকঝক করে উঠেই ঝাঁপ মারল ঘূর্ণি-লাগা অন্ধকারে—ভূপেন বসু অ্যাভিনিউয়ের বিয়ে-বাড়িটাও তেমনি করে সময়ের পেছনে নিশ্চিহ্ন হল তৎক্ষণাৎ। শরীরটাকে আর একটু জড়ো করে বসল সুদেব।

'তুমি কি সিরিয়াস্‌লি জন্ম-জন্মান্তরের কথা বলছ, মঞ্জু? আমাকে ঠাট্টা করছ না?'

'কপালের সিঁদুর নিয়ে বাঙালী মেয়েরা ঠাট্টা করে না।'

‘মানো তুমি এ-সব? বিশ্বাস করো?’

মঞ্জু একটু চুপ করে রইল। সুদেব সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল পকেট থেকে।

‘এত সিগ্রেট খাও এখনো? তোমার থ্রোট সেনজিটিভ্—কাশি হয় না?’

‘হয়।’—প্যাকেট খুলতে গিয়েও খুলল না সুদেবঃ ‘রাত্রে প্রায়ই ভারী ডিসটার্ব হয় ঘুমের।’

‘তবু পয়সা খরচ করে ওই ধোঁয়াগুলো গিলতে হবে? রেবা আপত্তি করে না?’

‘রেবা?’—সুদেব হেসে উঠলঃ ‘তার আপত্তির তো কোনো কারণ নেই। সে থাকে এর্নাকুলামে—তার পদবী এখন কল্যাণসুন্দরম্।

‘তার মানে?’—মঞ্জুশ্রীর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল একটুঃ ‘তাকে নিয়ে খেলাটা তোমার শেষ হয়ে গেছে?’

‘খেলাটা তো কোনোদিন জমেনি মঞ্জু। খেলার ভানটাই ছিল। একসঙ্গে কয়েক কাপ কফি খাওয়া আর ক’দিন সিনেমায় যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার ভেতরে।’

মুখের পেশীগুলো আবার আলগা হয়ে এল মঞ্জুশ্রীর।

‘আমি অনুমান করেছিলুম।’

‘তুমি তো জানো—নইলে সাক্ষী জুটত না, ডিভোর্স হত না।’

‘হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে মুক্তি তোমার দরকার ছিল।’

‘দরকার তোমারও ছিল মঞ্জু।’

‘ছিল—’, আলতো ভাবে কথাটা ছেড়ে দিলে মঞ্জুশ্রীঃ ‘তোমাকে ধন্যবাদ, নইলে আমাকে চরিত্রহীন বলে প্রমাণ করতে হত তোমাকে।’

‘মিথ্যেটা পুরুষের ওপর দিয়ে যাওয়াটাই ভাল, মঞ্জু। তারা টেরিলিনের জামার মতো—ওয়াশ অ্যাণ্ড উইয়ার। কিন্তু মেয়েদের নিন্দের রঙটা পাকা—সত্য-মিথ্যের যাচাই সেখানে অবান্তর।’

‘তবু সেই নিন্দেটা রেবা দত্তকে তুমি দিয়েছিলে।’

‘রেবার কোনো ক্ষতি হয়নি। কল্যাণসুন্দরম্ আর্মি-ম্যান। সে বাংলা জানে না, বাঙালী সমাজের নিন্দে-কুৎসায় তার কিছু যায় আসে না। তাছাড়া এনিমি ফ্ল্যাগ ক্যাপচার করবার মতো কলঙ্কবতীদের সম্পর্কে ওদের একটা সাময়িক আকর্ষণ থাকে বোধ হয়। কিন্তু সেও ঠকেনি। অন্তত আমার দিক থেকে রেবা সম্পূর্ণ নির্মল—সহৃদয়া বান্ধবীর বেশি নয়।’

মেঘলা আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল। কয়েকটা বড় বড় জলের ফোঁটা ছিটকে এল কামরার ভেতরে। জানলার কাঁচটা টেনে নামিয়ে দিলে সুদেব।

মঞ্জুশ্রী কী ভাবছিল। সুদেব আবার সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করল।

‘এত ঘন ঘন সিগ্রেট না খেলেই নয়?’—ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি ফুটল মঞ্জুশ্রীর।

এবারেও ধরানো হল না। সুদেব হাসল।

‘অভ্যেস মঞ্জু। মেয়েরা যেমন বদলাতে পারে না সহজে, পুরুষেরও ঠিক তাই।’

খোঁচা খেয়ে মঞ্জুশ্রীর চোখ দীপিত হয়ে উঠল একবার।

‘পুরুষেরা বদ-অভ্যেসটাই আঁকড়ে থাকে।’

‘তাই বুঝি?—সুদেবের হাসির ভঙ্গিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলঃ ‘বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও সিঁদুরের ফোঁটাটাকে তুমি ভাল অভ্যেস বলবে?’

'বললুম তো—হিন্দু বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের। বিলিতি আইনে তা ভেঙে যায় না।'

যে প্রশ্নের জবাবটা এর আগে পাওয়া যায়নি, সেইটেই আবার তুলে ধরল সুদেব। 'কিন্তু এ-সব তুমি বিশ্বাস করো?'

'করি না-করি, তাতে তো তোমার কিছু আসে-যায় না।'—মঞ্জুশ্রী বললে, 'কিন্তু কিছু ভেবো না—এই দাবীতে তোমার সম্পত্তি কোনোদিন আমি চাইতে আসব না।'

'আমি জানি মঞ্জু। আমি দিতে চাইলেও তুমি নেবে না। কিন্তু আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি কি মানো এ সমস্ত?'

'যুক্তি দিয়ে কিছুই মানি না।'—কাঁচের জানলার ওপর জলের বিন্দুগুলো বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে চোখ মেলে মঞ্জু বললে, 'ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি—সিঁদুর একবার পরলে আর নিজের হাতে মোছা যায় না।'

'স্বামী মরে গেলে?'

'মোছাবার লোকের অভাব হয় না তখন।'

'কিন্তু তোমার জীবনে আমি তো বেঁচে নেই।'

'সে বিচার আমার—তোমার নয়।'

কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত বোধ করল সুদেব। এখনো তাকে ভালবাসে মঞ্জুশ্রী? না—এরকম একটা অসম্ভব কথা কল্পনাই করা চলে না। কী তিক্ততা—কী দুঃসহ বিস্বাদের মধ্যে দিয়ে সেদিন দুজনে সেপারেশনের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—স্ট্র্যাণ্ড রোডের পীচের গন্ধ-মাখা দুপুরের গঙ্গার রুক্ষ হাওয়াতেও সেদিন কী মুক্তির স্পর্শ লেগেছিল দুজনের, সে কথা আজও ভোলবার নয়।

ভালবাসা?—ভালবাসা কোথাও ছিল না। বিয়ের এক বছরের মধ্যেও বোঝা গিয়েছিল—ব্যবধান রয়ে গেছে, গোত্র মেলেনি। সেটা গভীর—তার শেকড় জীবনের অনেক তলায়। বাইরে থেকে তাকে অনুমান করা যায় না—কোনো স্পষ্ট সংঘর্ষ যে ঘটে, তা-ও নয়—তবু দিনের পর দিন দুজন মানুষ তাদের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে কেন্দ্রিত হতে থাকে, মুখোমুখি বসলে কথা ফুরিয়ে যায়—নামে মেলাঙ্কলিয়ার ছায়া। তারপর তিক্ততা—শুধুই তিক্ততা।

Here am I here are you :
But what does it mean ?
What are we going to do ?

অডেন না কার একটা কবিতা। লাইনগুলোর তলায় লাল পেন্‌সিলের দাগ দিয়েছিল মঞ্জু।

ট্রেন লাইন বদলালো। ঝাঁকুনির আকস্মিকতায় চিন্তাটা কেটে গেল সুদেবের।

মিষ্টি গলায় মঞ্জু বললে, 'কী ভাবছিলে?'

'আমাদের ডিভোর্সের কথা।'

'সে তো মিটে গেছে।'

'তা গেছে। ছ'বছরে ইতিহাস হয়ে গেছে।'

'তবে ভাবছ কেন তার কথা?'

'তোমার সিঁদুরের জন্যে।'

'মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও।'—মঞ্জুর স্বর ক্লান্ত শোনাল : 'ধরে নাও না ওটা প্রসাধন।

মনে করো না—ও সিঁদুর নয়, কুমকুম!'

'আমার মনে করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এই অকারণ বন্ধনটা আমার ভাল লাগছে না।'

মঞ্জু হাসল, জবাব দিল না।

'তুমি ইংরেজি নিয়ে এম. এ. পাস করেছিলে।'

'সায়েন্সে নোবেল-প্রাইজ পেয়েও অনেক ক্রিশ্চান ভক্তিভরে চার্চে যান।'

এবার চুপ করতে হল সুদেবকে। বাইরে বৃষ্টিটা আরো জোর নেমেছে। সন্দেহ নেই, সেদিন বিচ্ছেদ ছাড়া কোনো পথ ছিল না। নার্ভাস্ ব্রেক-ডাউন ঘটেছিল মঞ্জুর—সুদেব আত্মহত্যার কথা ভাবত। অথচ কী কারণ? কী কারণ? সেই কারণগুলো কখনো বাইরের আলোয় তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ হয়ে ফুটে ওঠেনি—জীবনের গভীরে, অনেক গভীরে একটা তীব্র অসঙ্গতি, নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য, পরস্পর সম্পর্কে মৃদুসঞ্চারী অথচ অনিবার্য একটা ঘৃণা—সুদেবের দেশের নদী পদ্মার মতো পরিপূর্ণ ভাঙনের নিঃশব্দ আয়োজন করছিল।

অথচ—এই সূক্ষ্ম, এই নিরুপায় তিক্ততার কথা আদালতে বোঝানো যায় না। আইন স্থূল কারণ চায়, ফ্যাক্টস্ চায়, মানুষের কতগুলো মোটা বর্বরতার ফিরিস্তি চায়। মাতাল? ইম্পোটেন্ট? স্ত্রীকে মারধোর করে? অন্য মেয়ে আছে? স্ত্রী কি বন্ধ্যা? তার চরিত্র কি—

এই কালের মন, তার যন্ত্রণা, তার নিউরোসিস—এসব আইনের আওতায় আসে না। তখন রেবা দত্তদের আনতে হয়, শ্যামলদা মিহিরদা আসরে নামে, মজা দেখবার জন্যে একটা অশ্লীল জনতা আদালতে এসে ভিড় জমায়।

'ডিভোর্স না হয়ে আমাদের তো কোনো উপায় ছিল না মঞ্জু।'

মঞ্জু চোখ থেকে চশমাটা খুলে একবার শাড়ির আঁচলে কাঁচ মুছল। মাথা না তুলেই বললে, 'না।'

'আমি তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলুম।'

'আমার জন্যেও তুমি একফোঁটা শান্তি পেতে না।'

'অন্য কিছুই আর হতে পারত না এ ছাড়া।'

'না।'—মঞ্জু আবার সহজভাবে হাসতে চাইল ঃ 'কী হবে ওসব কথায়? কিন্তু একটা জিনিস খাবে একটু? বলতে ভয় করছে তোমায়।'

'আমি সর্বভুক। ও ব্যাপারে আমাকে ভয়ের কিছু নেই—তুমি জানো।'

'তারকেশ্বরের প্রসাদ। খাবে?'

'তারকেশ্বর অনাবশ্যক। মিষ্টিতে আপত্তি নেই।'

শাড়ির ভেতর থেকে বেলপাতায় ঢাকা ছোট্ট একটা বাঁশের ঝুড়ি বের করল মঞ্জু। এতক্ষণ কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল—সুদেব দেখতে পায়নি।

বেলপাতা সরিয়ে মঞ্জু বললে, 'বেশির ভাগই চিনির পিণ্ডি—তোমাকে দেবার কিছু নেই। এই সন্দেশটা নাও—এটা চলতে পারে বোধ হয়।'

হাতে হাত ঠেকল একবার। ছ'বছর? না—আরো বেশি। আইনগত বিচ্ছেদের অনেক আগেই শরীর-মনের বিচ্ছেদ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল দুজনের।

নিঃশব্দে প্রসাদ খাওয়া শেষ করল সুদেব। তারপর ঃ 'তারকেশ্বরে পূজো দিতে গিয়েছিলে?'

'গরদের শাড়ি দেখছ না?'—মঞ্জু আবার শ্রান্তভাবে বললে, 'দেশে বাবার অসুখ। মা তারকেশ্বরে পূজো দিতে বলেছিলেন। তাই দিয়ে এলুম।'

'বাবার নামে পূজো দিলে?'

মঞ্জু সুদেবের চোখে সোজা চোখ রাখল ঃ 'তাই কথা ছিল। কিন্তু পাণ্ডা হঠাৎ বললে, স্বামীর জন্য একটা পূজো দেবেন না মা? তা-ও দিলুম।'

হঠাৎ বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা বোধ করল সুদেব। কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু কথা ফুটল না মুখ দিয়ে।

মঞ্জু একটা নিশ্বাস ফেলল ঃ 'আর কী আশ্চর্য—দ্যাখো। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চোখে পড়ল তোমাকে। লোভ সামলানো গেল না—উঠে এলুম এখানে।'

যেন দম আটকে আসতে চাইল সুদেবের।

'আমার কল্যাণে পূজো দিলে তুমি?'

মঞ্জু হাসল ঃ 'সবই তো বাজে। নেহাতই কুসংস্কার। তবু তোমার যদি কল্যাণ হয় তো হোক না। আমার তো তাতে কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।'

'কিছুই নেই, কিছুই নেই মঞ্জু?'—একটা রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন ফুটল সুদেবের গলায়।

ট্রেন থামল শ্যাওড়াফুলিতে। বাইরে অশ্রান্ত বৃষ্টি। সারা কামরায় জলের বন্যা বইয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে এল একদল লোক। মঞ্জু উঠে দাঁড়াল।

'আমি এখানেই নামব।'

'এখানে?' হৃৎপিণ্ডে একটা মোচড় লাগল সুদেবের ঃ 'এখানে?'

'হ্যাঁ, এইখানেই তো আমি চাকরি করি।'

গাড়িতে ভিড় জমে উঠেছে। বাইরের পৃথিবী, বৃষ্টি, কাদা, মানুষ—সব চলে এসেছে এখন। তারই মধ্যে কোথায় নেমে চলে গেল মঞ্জু—আর দেখা গেল না তাকে।

বলা যেত? বলা যেত? তুমি বিয়ে করতে পারোনি—আমিও না—হয়তো, হয়তো ছ'বছর আগের সাপটা মরে গেছে এতদিনে, হয়তো আজ আমরা দুজনে মিলে সেই ভুলের মূলটাকে খুঁজে বের করতে পারি, হয়তো—

কিংবা—কিংবা—এই ভাল। সব তিক্ততার স্মৃতির ওপর এই সন্ধ্যাটাই সোনা ছড়িয়ে রাখুক। এইটুকুই সব গ্লানির মধ্যে পদ্ম হয়ে ফুটে থাকুক। হয়তো এই-ই ভাল।

কাঁপা হাতে আবার সিগারেট ধরাতে গেল সুদেব।

কিন্তু এবারও ধরাতে পারল না। কানের কাছে যেন ভেসে উঠল মঞ্জুশ্রীর শাসন ঃ 'আবার সিগ্রেট?' ঠোঁটে ছুঁইয়েই ওটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাইরের বৃষ্টির ভেতরে।

সেই মৃত্যুটা

ছোট কালভার্টটায় ক'দিন আগেই সাদা রঙের একটা পোঁচড়া লাগিয়েছে পি-ডবলু-ডি। আর সেই সাদা জামাটির ওপর কে যেন পেনসিল দিয়ে খুদে খুদে হরফে কী সব লিখে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত যোগ করে লিখেছে, বকেয়া তেইশ টাকা এগারো পয়সা।

দেখে মোনা মিঞার হঠাৎ খুব মজা লাগে। চিন্তাহরণ—ওরফে চিন্তাকে আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা মারে সে।

আঙুলের নখ বেড়ে গিয়েছিল, চিন্তাহরণের একটা আঁচড়ের মতো লাগে। ভারী বিরক্ত হয় সে।

—এঃ, আঁচড়াচ্ছিস কেন বেড়ালের মতো? চামড়া ছড়ে গেল যে।

—এতেই চামড়া ছড়ে গেল? এমন ফিনফিনে বাবুয়ানি চামড়া তোর হল কবে থেকে?—মোনা মিঞা আর একটা খোঁচা দেবার উদ্যোগ করতে দুহাত লাফিয়ে সরে যেতে চায় চিন্তেঃ কী আরম্ভ করলি বল্ তো মোনা? আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

—আর আমি বুঝি সুখের দরিয়ায় নাও ভাসিয়েছি —মোনারও এবার বিরক্তি লাগে ঃ —তাই বলে হাঁড়িপানা মুখ করে বসে থাকব নাকি রাতদিন? তাকিয়ে দ্যাখ না এই পুলটার গায়ে।

—কী দেখব, দেখবার কী আছে?

—হিসেব লিখেছে যে, অনেক ভেবে ভেবে মাথা খাটিয়ে হিসেব করেছে। বকেয়া তেইশ টাকা এগারো পয়সা—হি-হি-হি।

চিন্তে ভুরু কুঁচকে তাকায় মোনার দিকে।

—লিখেছে বেশ করেছে, তাতে হাসির কী আছে, শুনি?

—কি রকম ঝানু লোক দেখছিস, কাগজের খরচ বাঁচিয়েছে। হি-হি।

—খামোকা হাসতে তোর ভালোও লাগে?—চিন্তে বিরক্ত হয়ে কালভার্টটার ওপর বসে পড়েঃ তোর পয়সাকড়ি থাকে, তুইও হিসেব লেখ্ না। বিস্তর জায়গা রয়েছে—বারণ করছে কে?

—আরে হিসেব লিখতে পারলে আর এ দশা হয় নাকি? মগজে আঁক-ফাঁক কিছু ঢুকল না বলেই তো মৌলবী রেগেমেগে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিলে।—ধীরে-সুস্থে চিন্তের পাশে বসতে বসতে মোনা বলে, অবিশ্যি তিন মাসের মাইনেও বাকি পড়েছিল।

—হুঁ, সেইটেই বল্।—চিন্তে গম্ভীর হয়।

—বুঝলি, কিচ্ছু ক্ষেতি হয়নি। মৌলবীসাহেবও টের পেয়েছিল—কোনোদিন আমার পয়সাও জুটবে না, হিসেবও লিখতে হবে না। খুব এলেম ছিল লোকটার।

—আমি খুব ভালো আঁক জানতুম—চিন্তে তেমনি গম্ভীর হয়ে বলে।

—বেশি গুল দিসনি আমার কাছে—মোনা ফ্যাঁস করে ওঠে ঃ আমি কিছু জানি নে—না? ভালো আঁকই যদি কষবি তা হলে পাঠশালার সেই শুঁটকে পণ্ডিত তোর দুহাতে ইঁট দিয়ে তোকে রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখত কেন রে? আমি দেখিনি?

—যেতে দে ওসব।—চিন্তে অস্বস্তি বোধ করে ঃ বিড়ি-টিড়ি আছে নাকি সঙ্গে? দে তা হলে।

—দাঁড়া দেখি।—হাফ শার্টের পকেট হাতড়ায় মোনা ঃ আছে দু-তিনটে। এই একটা দিলুম, কিন্তু আর চাস নে তা বলে দিচ্ছি।

—না, চাইব না। কিন্তু মাইরি, ব্যাপারটা কী বল্ দিকি? বিড়ির দাম যে সিগ্রেটকে ছাড়িয়ে উঠল!

মোনা একটা মুখভঙ্গি করে ঃ শালার মুড়ির কেজিই চার টাকা উঠল তো বিড়ি।

দুজনে বিড়ি ধরায়—পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। মাথার ওপরে একটা কাঠবাদাম গাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপে, অথচ খচখচ করে শব্দ ওঠে—একটি নতুন বৌ যেন কাপড়ের আওয়াজ তুলে চুপিসাড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এমনি মনে হয়। কালভার্টের নিচে একরাশ ঘোলা জল থমকে আছে, কয়েকটা সোনা ব্যাঙ ড্যাবা-ড্যাবা চোখ তুলে চার পা ফেলে ভাসছে তার ভেতরে। হাতের বিড়িটায় গোটাকয়েক টান দিয়ে মোনা একটা ব্যাঙকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় সেটা—ব্যাঙটা খলাৎ শব্দে ডুবে যায়, তারপর আবার হাত তিনেক দূরে চার পা ছড়িয়ে ভেসে ওঠে।

সেইটে লক্ষ্য করে মোনা বলে, জানিস, সায়েবেরা ব্যাঙ খায়!

—হুঁ, তোর কানে কানে বলে গেছে।

—মাইরি, বানিয়ে বলছি না। রজ্জব চাচার এক ছেলে কলকাতার হোটেলে চাকরি করে—সে—

বাধা দিয়ে চিন্তে জিজ্ঞেস করেঃ সেও ব্যাঙ খায় বুঝি?

—তোবা-তোবা। মোসলমানের ব্যাটা না?

—রেখে দে, বারফট্টাই করিসনি।—চিন্তে ঠোঁট বাঁকায়। আধখানা খেয়ে তার বিড়িটা নিবে গিয়েছিল, সেটাকে সাবধানে কানের ওপর গুঁজতে গুঁজতে বলেঃ কলকাতায় গেলে হিন্দু-মোসলমান কিচ্ছু থাকে না।

—তা যা বলেছিস।—মোনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

ঠিক তখন চিন্তের চোখ পড়ে। নিচে বাঁ-দিকে, কালভার্টের জলের কোল ঘেঁষে, জলো ঘাসে ছাওয়া এক টুকরো ছোট জমির ওপর পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লাল-সাদা গোরুটা।

—ওটা কি রে?

মোনাও তাকিয়ে দেখে। একটু চুপ করে যায়। থেকে থেকে এক-একটা ঢেউয়ের মতো শ্বাস দুলে যাচ্ছে গোরুটার পাঁজরা-সার শরীরের ওপর দিয়ে। এখান থেকেও ছাই-ছাই রঙের একটা চোখ দেখা যায়, জলের মতো একটা রেখা নেমেছে তা থেকে, বিন-বিন করে ওনকি উড়ছে একরাশ। কালো লম্বা জিভটা বেঁকে বেরিয়ে এসেছে, মুখে ময়লা ফেনা জমেছে, ল্যাজের দিকটা গোবরে একাকার।

মোনা প্রায় চুপি-চুপি বলে, মরে যাচ্ছে গোরুটা।

—কার গোরু রে?

—কে জানে?

—এখানে মরতে এল কেন?

—কোথায় মরবে, বল্? একটা জায়গা তো চাই।

—ইস্, একেবারে চোখের সামনে।

—চোখটা কোথায় সরাবি চিন্তে? মরণ কোথায় নেই?

—তা বটে।

মাথার ওপর বাদামগাছটায় একটা কাক ডেকে ওঠে। অদ্ভুত শোনায় তার আওয়াজটা। মোনার শরীরটা শিউরে যায় একবার।

—কি রকম বিচ্ছিরি করে ডাকল রে কাগটা!

—ওরা নানা রকম করে ডাকতে পারে। ওদের সব ডাকের একটা মানে থাকে।

মোনা ঘাড় বাঁকিয়ে একবার চেয়ে দেখে চিন্তার দিকে।

—তুই আবার কাগ-চরিত্তির শিখলি কোত্থেকে?

—আমি শিখব কেন? লোকে বলে।

আবার সেইভাবে ডেকে ওঠে কাকটা। ডাল-পাতা নড়বার শব্দ পাওয়া যায়—এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে বসল বোধ হয়। একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় পাক খেতে খেতে নিচের ঘোলা জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সবচেয়ে বড় ব্যাঙটার নাকের সামনে। ব্যাঙটা নড়ে না—ড্যাবডেবে চোখ মেলে প'তাটার দিকে চেয়ে থাকে কেবল।

মোনা মাথা নাড়ে।

—হুঁ, নিশ্চয় কিছু বলছে কাগটা।

—কী বলছে বল্ তো?

—আমি জানব কী করে? তুই কাগ-চরিত্তির জানিস, তুই-ই বল্।

চিন্তের দৃষ্টি গোরুটার ওপর আটকে থাকে। ছাই-ছাই রঙের চোখের পাশ দিয়ে একটা জলের রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। মরবার আগে গোরুটা কেঁদেছে। কে কাঁদে না?

আবার কর্কশ রব তোলে কাকটা। কেমন আধো আধো আহ্লাদে ভঙ্গিতে বলে—'গ-গ-গ'। হঠাৎ বিশ্রী রাগ হয়ে যায় চিন্তার। পিছন দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় মাথার ওপর।

—ভাগ্ শালা, ভাগ্।

ঝটপট করে কাক উড়ে পালায়—দূর থেকে তার আপত্তি শোনা যায়ঃ কা-কা-কা। ঢিলটা আকাশে অনেকখানি ছুটে গিয়ে কালভার্টের জলে ঝপাং করে নেমে আসে। খলাৎ খলাৎ করে ডুব দেয় চমক-খাওয়া ব্যাঙগুলো—আবার চার পা ছড়িয়ে ভেসে ওঠে।

—বেশ করেছিস।—মাথা নেড়ে সায় দেয় মোনাঃ ভারী জ্বালাচ্ছিল।

চিন্তে আবার আগের মতো সোজা হয়ে বসে। গোরুটার দিকে চেয়ে থাকে একভাবে।

—কাগটা কী বলছিল জানিস মোনা?

—কী বলছিল?

—গোরুটা তো মরছে। এবার গিয়ে ওর চোখ দুটো ঠুকরে খাই। শালা!

—গো-মড়কে তো ওদেরই পাব্বন।

—আর শেয়ালের।

—আর মুচির। এখনো টের পায়নি। পেলেই ছুরি-ছোরা নিয়ে হাজির হবে।

এতক্ষণ পরে চিন্তে হেসে ওঠে। বাদামের পাতার মতো একটা শুকনো খসখসে আওয়াজ ওঠে তার গলায়। ভুরু দুটো একসঙ্গে জুড়ে যায় মোনার।

—হাসলি যে?

—ভাবছি, মুচি আসবে কোত্থেকে! সেই এক ঘর ছিল না গাঁয়ে? না খেয়েই তো মরল তার সব কটা। শেষে সেই বুড়ো কিষ্টোদাস একদিন গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলে পড়ল চালের আড়া থেকে।

—হুঁ, মনে পড়েছে।—স্মৃতিটা মোনার অস্বস্তি জাগায়ঃ আমিও দেখতে গিয়েছিলুম। জিভটা আধ হাত ঝুলে গিয়েছিল—ইয়া আল্লা।

—একদম ওই গোরুটার মতো।

—একদম।

—আর নাক-মুখ-কান দিয়ে রক্ত নেমেছিল।

—তখনো ওইটুকুনি রক্ত ছিল গায়ে। ইচ্ছে করলে বুড়োটা আরো ক'দিন বেঁচে থাকতে পারত।

—তা পারত। ঘরেও তখনো খাবার ছিল।

—ছিল?—মোনা আশ্চর্য হয়ঃ খাবার আবার কোথায় দেখলি তুই?

—কেন, একরাশ শুকনো জামের আঁটি পড়ে থাকতে দেখিসনি দাওয়ায়? ওইগুলো সেদ্ধ করে ছেঁচে নিয়ে—হি-হি-হি।

মোনার বিশ্রী লাগে। বিরক্ত হয়ে বলে, মানুষের মরণ নিয়ে হাসি-মশকরা করিস নে চিন্তে। ও-সব ভালো না।

—ভালো না কেন রে? এখন থেকে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। দ্যাখ না আর দু-এক মাস বাদে কী হয়। তোর-আমার বরাতে জামের আঁটিও জুটবে না।

আরো খারাপ লাগে কথাটা, কিন্তু মোনা জবাব খুঁজে পায় না। একটু পরে চিন্তেই আবার বিড়বিড় করে ওঠে।

—গোরুটা কিন্তুক না খেয়ে মরেনি।

দুজনে আবার গোরুটার দিকে তাকায়। বিকেলের একঝলক লাল আলোয় গোরুটার মৃত্যুকে আরো করুণ, আরো নিষ্ঠুর দেখায়।

—না, অসুখ করেছিল।

—কী অসুখ করেছিল?—আলতোভাবে জানতে চায় চিন্তে।

—আমি কী করে জানব?—মোনা ব্যাজার হয়ঃ আমি গো-বদ্যি নাকি?

—তোর বাপ তো অনেক ঝাড়-ফুঁক জানত।

—সে মান্‌সের, গোরুর নয়।

—গোরু আর মানুষে ফারাক আছে নাকি? দুই-ই মরে।

—কিন্তু গোরু না খেয়ে মরে না।

—না খেয়ে মরে না!—চিন্তার স্বর ঝাঁ করে ওঠেঃ ভারী পণ্ডিত এলেন উনি। খরা হয়ে মাঠের সব ঘাস পাতা শুকিয়ে গেলে—তখন? তোর যদি খোল-জাবনা কেনার পয়সা না থাকে, তখন?

—এই গোরুটা কিন্তুক বুড়ো হয়ে মরেছে।

—বলেছে তোকে।—চিন্তা শব্দ করে একরাশ থুথু ছুঁড়ে দেয় ব্যাঙগুলোর দিকে। খাবার ভেবে দুটো ব্যাঙ একটু এগিয়ে আসে—তারপর বোধ হয় বিরক্ত হয়েই চিন্তার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়।

চিন্তা আবার হেসে ওঠে। মোনা চোখ তোলে।

—হাসলি যে?

—একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল।

—কথাটা কী?

—গোরুর গলায় দড়ি থাকে, কিন্তু না খেয়ে মরলেও গোরু কখনো গলায় দড়ি দিতে

পারে না। হি-হি।

—বকিসনি।

কিছুক্ষণ চুপ। বাদামগাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ হয়। একটা ফিঙে লাফাতে লাফাতে গোরুটার পাশে গিয়ে বসে, তারপরেই আবার কোথায় উড়ে চলে যায়। দুটো বোলতা মাবামারি-জড়াজড়ি করতে করতে জলের কাছ পর্যন্ত গিয়ে আলাদা হয়ে যায়—একটা পালায়, আর একটা তাকে তাড়া করে। বিকেলের রাঙা আলোয় খুশি হয়ে এদিকে ওদিকে গোটাকয়েক পোকা কিট-কিট কির-কির করে ডাকে।

ঝুন-ঝুন-ঠিন-ঠিন করে আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে দূর থেকে। একটুক্ষণের জন্যে —গোরুটাকে ভুলে গিয়ে সেদিকে চোখ তোলে দুজন।

তিনজন লোক আসছে আধ-ছোটার ভঙ্গিতে। মালকোঁচা করে পরা ধুতি, কোমরে লাল গামছা বাঁধা, কাঁধে ঘুঙুর লাগানো ভারে দু-তিনটে করে ছোট ছোট তামা-পেতলের ঘটি। সেই আধ-ছোটার ভঙ্গিতে তারা এগিয়ে আসে, চিন্তে আর মোনাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভার থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যায়, চোখে পড়ে তাদের কোমরে বাঁধা লাল গামছা, তাদের পিঠের ছোট ছোট পুঁটলি দোল খায়, তামা-পেতলের ছোট ঘটিগুলো বিকেলের রোদে ঝিকমিক করে।

মোনা বলে, চিনিস?

চিন্তে জবাব দেয়ঃ না।

—ভিন-গাঁয়ের লোক।

—সে তো দেখাই যাচ্ছে।

—তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে চলল, না?

—হুঁ।

—কী হবে তাতে?

—পুণ্যি।

—ধ্যাত্তোর পুণ্যি!—মোনা নাক কোঁচকায়ঃ পুণ্যিতে পেট ভরে নাকি? বাবা তারকনাথ চালের কিলো নামিয়ে দিতে পারে বারো আনায়? ছটা বিড়ি দিতে পারে পয়সায়?

—অ্যাই—অ্যাই।—রাগ করার ভঙ্গিতে চিন্তে শাসায়ঃ হিঁদুর ধম্মো-কম্মো নিয়ে কথা বলিসনি।

—ঘোড়াড্ডিম ধম্মো-কম্মো। আমি কাউকে ডরাই নে। পীর নবী আল্লা—সকলকে হক কথা শুনিয়ে দিতে পারি। জমিরুদ্দিন মোল্লা তো জমি বলদ বেচে হাজী হয়ে ফিরে এসেছিল। কী হল শেষটায়? পোকা-মারা বিষ খেয়ে মরে বাঁচল।

—চুপ কর্ মোনা, ভালো লাগে না।

মোনা একবার ঠোঁট কামড়ায়।

—ভালো কি আমারই লাগে নাকি? কিন্তুক এই সব দেখলে—

—ওরা বিশ্বাস করে যদি সুখ পায় তাতে তোর আমার ক্ষেতিটা কী বল্ দিকি?

—তা যা বলেছিস। বিশ্বেস করতে পারলে আমরাও বেঁচে যেতুম।

আবার চুপচাপ। মাঠের বাতাসটা যেন থেমে যায় হঠাৎ। রাঙা আলোর বিকেলটাকে

আশ্চর্য রকম শান্ত আর নিঝুম মনে হয়। এতক্ষণে ওদের কানে ফোঁসানির মতো একটা আওয়াজ উঠে আসে। গোরুটার শ্বাস উঠছে—ঢেউ খেলে যাচ্ছে পাঁজরাসার শরীরের ওপর দিয়ে। ছাই-ছাই চোখের সামনে শুনকির ঝাঁক আরো কালো হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ডাঁশ উড়ছে—ওরা শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে চায় বোধ হয়।

—গোরুটা বেশ সুলক্ষণে ছিল রে।—মোনাই কথা শুরু করে আবার।

—কী করে জানলি?

—কপালে কেমন চাঁদ রয়েছে দেখছিস না!

চিন্তে হাসে। বাদামের পাতার মতো শুকনো হাসিটা খসখস করে।

—আমি যখন জন্মেছিলুম, তখন আমার ঠাকুরমা কী বলেছিল, জানিস?

—কী বলেছিল?

—বলেছিল, আমি খুব ভাগ্যিমানী হবো। নিজের হাল-গোরু হবে, দশ-বিশ বিঘে জমি হবে।

—হয়নি?—মোনা মুখ টিপে হাসে।

—জ্বালাসনি।—চিন্তে নিজেও একটু হাসতে চেষ্টা করেঃ আসলে বুড়ি বোধ হয় নাতিকে ঠাট্টা করেছিল একটুখানি। কিন্তু বাবা ছিল ভারী ক্যাব্‌লাটে ভালো মানুষ, সেই কথায় পেত্যয় করে আমার হাতে দু-তিনটে তাবিজ-কবচ বেঁধে দিয়েছিল—হি-হি-হি!

—গোরুটার কিন্তু কপালে—

—ওটা ভগবানের ঠাট্টা, বুঝলি? কী করে রাস্তার ধারে বেঘোরে মারা যাচ্ছে—দ্যাখ্‌। একটু পরে রাত হবে, তখনো হয়তো মহাপ্রাণটা বেরিয়ে যাবে না—আর সেই সময়ে শেয়ালেরা এসে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে। গোরুটা নিজের গলায় দড়ি দিতে পারলে বেশ হত, না রে?

মোনা জবাব দেয় না। বিকেলের রোদে ছায়া পড়েছে—এতক্ষণ একমুঠো সোনার মতো জ্বলছিল, এখন পুরনো তামার মতো রঙ ধরেছে। সেই ছায়া মোনার মনের ভেতরেও একটু করে ছড়াতে থাকে। দিনের আলোটা বেশ ভালো—তবু কোথায় একটা ভরসা থাকে, মনে হয় যা-হোক করে চলে যাবে, চালিয়ে যাব। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই—

চিন্তে শুরু করেঃ আমার মামার বাড়ির দেশে আর একটা গলায়-দড়ি দেখেছিলুম। ফুটফুটে একটা অল্পবয়সী বউ—

—তুই থাম্‌ দিকিনি। —মোনা এবার সত্যি সত্যিই ধমক দেয় চিন্তেকেঃ কী আরম্ভ করলি তখন থেকে? একটা ভালো কথাও মনে আসছে না?

—আসছে না রে। চোখের সামনে গোরুটাকে মরতে দেখে—

—তবে উঠে যা এখান থেকে, উঠে যা তুই।—মোনার স্বর কড়া হয়ে ওঠেঃ এখানে বসে থাকবার জন্যে তোকে দিব্যি দিয়েছে কে?

চিন্তে চুপ করে। মোনা বিকেলের তামাটে রোদের ভেতর অনেক দূরে চোখ মেলে দেয়।

"রমজানেরই রোজার শেষে এল খুশীব ঈদ—" হঠাৎ গুনগুনিয়ে বেসুরো গলায় গান শুরু করে মোনা।

হেসে উঠতে গিয়েও চিন্তে হাসে না। তার বদলে জিজ্ঞেস করে ঃ ঈদ এলে বুঝি খুব খাওয়া-দাওয়া করবি?

—হুঁ, কচু ঘণ্ট।

—তবে যে গান জুড়েছিস বড়ো?

—খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবতেও ভালো লাগে। মনে কর্—ভালো গোস্ত, পোলাও বিরিয়ানি, তিন রকমের কাবাব—

—ইস্—ইস্! ঘরে একেবারে নবাবের বাবুর্চিখানা!—মিটমিট করে তাকায় চিন্তে ঃ ভাত খেয়েছিস কবে?

—মঙ্গলবার।

—এই ক'দিন?

—গম-টম।

—টম কাকে বলে?

—কিচ্ছু জানিস নে—না? তুই আমি দুজনেই তো ক্ষেতমজুর। টম বুঝতে পারিস নে?

—বিলক্ষণ। আজই তো একবোঝা কলমী শাক তুলেছিল বউ। ক'টা কুচো চিংড়ি ছিল তার ভেতরে, আর একমুঠো গুগ্লি। দিব্যি খাওয়া হয়ে গেল।

—দুদিন পরে আর কলমিও থাকবে না।

—তা থাকবে না।

—তখন কী খাবি?

—এই গোরুটা যা খাচ্ছে এখন। খাবি।

নিজের রসিকতায় হাসতে যায় চিন্তা, কিন্তু আবার তাকে ধমক দেয় মোনা। গোরুটার কথা আর বলবি নে, খবরদার।

—আচ্ছা বলব না।

দুজনের চোখ আবার দূরে সরে যায়। বিকেলের রোদ আরো কাল্চে হয়ে এসেছে। খানিকটা সামনে দু-তিনটে বাবলাগাছ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে—নিচের গুঁড়িপানার ওপর ঝুরঝুর করে ফুল ঝরছে তাদের, যেন সবুজ চাদরের ওপর হলুদের নকশা কাটছে। আর একটু এগিয়ে জলে-ভরা ধানের ক্ষেত। ছায়া নুয়ে পড়েছে তার ওপর, তবু দেখা যায়। সাদা জলের সঙ্গে কী বাহারই দিয়েছে নতুন ধানের! কোথাও ফিকে হলুদের রঙ-মাখা নতুন শীষের সার, কোথাও আর-একটু বড় হয়ে চমৎকার শ্যামলা, কোথাও চোখ-জুড়োনো ঘন সবুজ। তাকিয়ে থাকলে আর পলক পড়ে না। জল আর সেই ধানের ওপর এখন শেষ বেলার রাঙা মেঘের একখানা অদ্ভুত আভা পড়েছে—চেয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

একটু পরে ধরা গলায় চিন্তে বলে, খুব ভালো ধান হবে এবার।

—হুঁ।

—গত দু-বছর এমন ফলন হয়নি।

—হুঁ।

—দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

—ওই প্রাণই ঠাণ্ডা হোক। পেটে পড়বে ক'দানা?

চিন্তের একটা মস্ত বড় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

—আচ্ছা, কোথায় ধানগুলো যায় বল্ দিকিনি?

—কিচ্ছু জানিস নে, ন্যাকা একেবারে!

পেছনের পথটা দিয়ে আওয়াজ আর ধুলোর ঘূর্ণি তুলে জীপগাড়ি বেরিয়ে যায় একটা। নেমে আসা হালকা সন্ধ্যায় একটা লাল আলো অনেকটা দূর পর্যন্ত দপদপ করে। সেই আলোটা থেকে চোখ সরিয়ে এনে ওরা দেখে সামনে সন্ধ্যার তারাটা উঁকি দিয়েছে।

কী ঝপ্ করে বেলাটা ডুবে গেল!

আর বেলা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানের ক্ষেতটাও যেন সুদূর হয়ে যায়—রাঙা মেঘটাকে কে যেন হাত বাড়িয়ে মুছে নেয়, তখন মনে হয় ওই ফিকে হলুদ, ওই শ্যামলা, ওই ঘন সবুজে রঙের ধানগুলো—সামনের এই জলের ওপারে নয়, একটা প্রকাণ্ড নদীর ওধারে সরিয়ে দিয়েছে কেউ। গুঁড়িপানার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাবলাগাছগুলোকে কয়েকটা ভূতুড়ে মূর্তির মতো মনে হয় তখন।

একটা অর্থহীন অকারণ বিদ্বেষে দাঁতে দাঁতে কষকষ করে চিন্তা।

—ভোটের সময় অনেক জীপগাড়ি এসেছিল এ তল্লাটে।

মোনা বলে, হুঁ এসেছিল। কেন আসবে না? পাকা সড়ক হয়েছে কি জন্যে? গাড়ি আসবে বলেই তো।

—তখন অনেক কথা শুনেছিলুম।

—কান আছে, শুনবি বইকি।

—চেঁচিয়েছিলুম।

—শোর তোলবার জন্যেই আল্লা গলা দিয়েছেন। বোবা হয়ে কী লাভ?

ছায়া কালো হয় চারিদিকে। মোনার ভয় করে এখন। পেটের গম-টমগুলো কখন নিশ্চিহ্ন। একটা যন্ত্রণা পাক দেয় সেখানে। হঠাৎ একটা-কিছু আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে তার—এই রাত্রির স্রোতে নিরুপায় হয়ে ভেসে যাবার সময় আলোর মতো—ডালের মতো একটা-কিছু।

—কে যেন বলছিল পাঁচ কাঠা করে জমি দেবে আমাদের।

—পেয়ে নে।

আবার চুপচাপ। দুজনের ভেতরে যেন সন্ধ্যার একটা আড়াল নামে এখন। নিতান্ত বলবার জন্যেই মোনা বিড়বিড় করে যায় ঃ আমার মেয়েটা বোধ হয় মরেই যাবে, বুঝলি।

—আমার বউটাও।—বিকৃতভাবে চিন্তা বলে, কিচ্ছু ভাবিসনি।

—না—ভাবনার কিছু নেই। মোনা নির্ভাবনা হতে চেষ্টা করে। চিন্তার হিংস্র ভাবে মনে হয়, দূরের ওই ধানক্ষেতটার ওপর অমন করে সন্ধ্যার আলোটা না পড়লেও পারত। তা না হলে সে বেশ ছিল, এত খারাপ তার লাগত না।

গোরুটার শ্বাসের শব্দ শোনা যায়। এখনো মরতে পারেনি। আবছা অন্ধকারে তার শরীরের রেখাটা অন্য রকম দেখায় এখন। আচমকা ওটাকে মানুষ বলে ভুল হয়ে যেতে পারে।

মোনা আস্তে আস্তে বলে, একটু পরে শেয়াল এসে ছিঁড়ে খাবে ওটাকে।

চিন্তা মাথা তোলে। তার চোখ জ্বলে।

—কী করতে চাস্?

—ইচ্ছে করছে, একটা লাঠি হাতে নিয়ে সারা রাত---

—সারা রাত শেয়াল তাড়াবি? ক'টা শেয়াল তাড়াবি রে?—হা-হা করে খানিকটা বেয়াড়া রকম হাসি শুরু করে চিন্তা। আরো ভয় পায় মোনা। বাদামগাছের ছায়ায় চারদিকটা তাদের অস্বাভাবিক কালো। কালভার্টের জলে খলাৎ করে একটা ব্যাঙ লাফ দেয়, সেই শব্দটা চিন্তার হাসির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে চমকে দেয়, খিদের যন্ত্রণা-ভরা পেটের ভেতরটা কেমন গুরগুর করে ওঠে।

হাসি থামিয়ে, মোনার কাঁধে গাঁট-বের-করা শক্ত আঙুলে একটা চাপ দেয় চিন্তা।

—আর পাগলামি করতে হবে না, বাড়ি চল্ এখন।

জোলো ঘাসে ছাওয়া ছোট ডাঙাটার ওপরে লাল-সাদা গোরুটা শ্বাস টানে। মরতে-মরতেও মরতে চায় না। হয়তো শেয়ালে এসে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করে।

দোসর

'দুনিয়ার সবচেয়ে তাজ্জব চিজ—বুঝেছ, এই শুয়োর।'—রেল-ইস্টিশনের বাইরে, নোংরা একফালি মাঠের ভেতরে, একটা মাদী শুয়োর কতগুলো ছাড়াপোনা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে—বাঁ চোখটা কুঁচকে আলতোভাবে কথাটা বলেছিল লোকটা।

তা—মানুষটাকে দেখলে কেমন যেন গা-শিরশির করে, একটু ভক্তি-টক্তিও হতে চায়। সাদায় কালোয় মাথার চুল, সাদার ভাগটাই বেশি। মোটা মোটা ভুরু দুটোও পাক-ধরা, তার নিচে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। মুখে খানিক এবড়ো-খেবড়ো সাদা দাড়ি, দেখলেই বোঝা যায়, দাড়িটা নিয়মিত রাখে না—খেয়ালমতো কমিয়ে ফেলে মধ্যে মধ্যে। নাকের বাঁ-দিকে একটা শুকনো কাটার দাগ—মনে হয় সাঁওতালী তীর কিংবা বল্লমের ঘা লেগেছিল কোনোকালে।

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে, পায়ের কাছে গামছার পুঁটলিটা রেখে, আধ-ঘণ্টা-লেট লোক্যাল ট্রেনটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে, একটু দূরের শুয়োরগুলোকে দেখে, বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে লোকটা বলছিল: 'হুঁ, যা বলেছি। দুনিয়ার সব চেয়ে তাজ্জব চিজ হল এই শুয়োর।'

পাশে বসে ভক্তিমানের মতো শুনছিল জন দুই চাষী গেরস্ত। কয়েক হাত দূরে সুটকেস পেতে বসে আমিও শুনছিলুম, কারণ আধ ঘণ্টা লেট হয়ে যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমাকেও যেতে হবে। সামনের ফাঁকা রেলের লাইন, মাথার ওপর রাধাচূড়োর পাতায় হালকা বাতাসের শব্দ, ওদিকের সাইডিঙে খানতিনেক কালো কালো পুরনো ওয়াগন, মালগুদামের টিনের চালে চোখ-ধাঁধানো খানিক রোদের ঝিলিক আর থেকে থেকে কাকের ডাক আমার সারা শরীরে একটা ক্লান্ত ঝিমুনি নিয়ে আসছিল। লোকটার ভরাট আর ভাঙা-ভাঙা গলার আওয়াজে আমি নড়ে-চড়ে বসলুম।

ভক্তি সত্ত্বেও একজন চাষী অবাক হল একটু।

'এত জীব থাকতে শুয়োর সব চাইতে তাজ্জব হল কেন?'

'কখনো সুন্দরবনের তল্লাটে যাওয়া হয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'নদীগুলো যেখানে রাক্ষুসে হয়ে সাগরে পড়ে—সে-সব মোহনার খবর জানা আছে কিছু?'

'আজ্ঞে জানব কী করে? যাইনি তো কখনো।'

'সেই সব নোনা গাঙের ভেতর চর জাগল। এলোপাতাড়ি গাছ-গাছলাও গজালো খানিকটা। কিন্তু মানুষ গিয়ে থাকতে পারে না। একে তো নোনা—তার ওপর জোয়ারের সময় সব ডুবে যায়, কিলবিল করে সাপ—একটা পানবোড়া একবার ঠুকে দিলে তো শিবের অসাধ্যি।'

'আজ্ঞে সে তো বটেই।'

'তখন সে চরে সবচে' আগে কে যায় বলোদিনি?'

'জানি নে।'

'যায় শুয়োর।'—লোকটা এবার একটু হাসল, কুঁচকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাঁ চোখটা।

'কোত্থেকে যায়?'

'অন্য চর থেকে, ডাঙা থেকে।'

'কী করে যায়?'

'কেন—সাঁতরে?'

'ওই গহীন গাঙ?'

'গহীন গাঙ বইকি। বাঘের অবধি সাহসে কুলোয় না—কিন্তু যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ওদের সাঁতরাতে দেখেছ কখনো? ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু-এক মাইল।'

'তা চরে গিয়ে কী করে শুয়োর?'—আর একজন চাষী একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও ভুলে গেল ঃ

'সেখানে তো কচু-কন্দ নেই, খায় কী?'

'কেন—কাঁকড়া।'

'কাঁকড়া?'—এবার দুটি শ্রোতাই চমকালো এবং সেই সঙ্গে আমিও।

'বললুম না—দুনিয়ায় অমন আজব চীজ আর নেই? নোনা জলের অ্যাই বড়ো বড়ো কাঁকড়া দেখেচ তো? শুয়োর সেগুলো ধরে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়।'

'শুয়োরে কাঁকড়া খায়?' একজন তখনো অবিশ্বাসী।

'তেমন তেমন হলে বাঘে ধান খায়, শোনোনি?'

'তা হলে পেটের চিন্তা নেই?'

'এক্কেবারে না। আর জোয়ারের জল এসে চর ডুবে গেলে কী করে জানো? বুনো গাছ জাপটে ধরে—মানুষের মতো সোজা হয়ে—জলের ওপর নাক ভাসিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।'

'খুবই তাজ্জব বলতে হবে তা হলে।'—প্রথম চাষীটি একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে

ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল ঃ 'আপনি এত সব জানলেন কী করে?'

'খুলনা জেলার লোক না আমি?'—এইবার লোকটি বিষণ্ণ হল একটু ঃ 'চোখেই তো দেখা এ-সব। কিন্তু পাকিস্তান হয়েই—' একটা ছোট নিশ্বাস পড়ল ঃ 'চারদিকে বানের কথা বলছিলে না তোমরা? তাই শুয়োরগুলোকে মনে পড়ছিল আমার।'

বান-বান-বান। গ্রাম ডুবছে, শহর ডুবছে, মানুষ ডুবছে, ফসল ডুবছে। যেন রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটাই। সেই যন্ত্রণা আর দুর্ভাবনা সব ক'টি মুখেই ছড়িয়ে পড়ল, বেলা এগারোটার সময়েও—রাধাচূড়োর হালকা ছায়াটার তলায়, যেন একটুকরো বিষণ্ণ অন্ধকার নামল।

মনে হল, গোটাতিনেক নিশ্বাস পড়ল একসঙ্গে। চুপ করে কাটল কয়েক সেকেণ্ড। যে চাষীটি তখন থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বসে ছিল, সে এবার সেটা এগিয়ে দিলে লোকটির দিকে। আমি দূরের চোখ-ধাঁধানো করোগেটেড টিনের চালাটার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেশলাইয়ের আওয়াজ পেলুম, বুঝতে পারলুম ওরা তিনজনেই তিনটে বিড়ি ধরিয়েছে।

আমাকে ওরা চোখ দিয়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মন দিয়ে কেউ দেখছিল না। ওরা দূরের সুন্দরবনে ছিল, নোনা গাঙের দেশে ছিল, ওরা গহীন গাঙে সাঁতার কাটতে দেখছিল বুনো শুয়োরকে, কড়মড় করে এই বড় বড় কাঁকড়া খেতে দেখছিল। আমি সেখানে কেউ নই। ওসব আমার দেখবার কথা নয়।

একটু সময় কেটে গিয়েছিল, তবু ওদের একজন মনে করে আগের কথারই জের টানল। এই সব সাধারণ মানুষের যেমন করে বলা উচিত, তেমনি বোকা-বোকা ভঙ্গিতে বললে, 'তা বটে। শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায় বইকি। মানুষ যদি শুয়োর হত, তা হলে অমন করে বানের তোড়ে তলিয়ে যেত না, নাক উঁচু করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে হোক পাড়ি দিত।'

'কিংবা—' যে লোকটাকে দেখলে গা-টা একটু শিউরে শিউরে ওঠে, সাধারণ গেঁয়ো মানুষের কেমন যেন ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়, কথা বলতে বলতে যার বাঁ চোখটা কুঁচকে যায় বার বার, একটু মোটা আর ভাঙা যার গলার আওয়াজ, সেই খুলনা জেলার মানুষটা আবার বললে, 'কিংবা হাতের কাছে দু-চারটে বুনো শুয়োর পেলে বেঁচেও যেত কেউ কেউ।'

'বুনো শুয়োর পেলে? সে আবার কি রকম কথা?'

সে আবার কি রকম কথা—আমিও এটা জিজ্ঞেস করতে পারতুম। কারণ—এই সে-দিন—উত্তর বাংলার বন্যার সময় আমিও তো ছিলুম এক বন্ধুর বাড়িতে। শেষ রাতে জল এল, হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল টিনের ঘর—কে যে কোথায় উধাও হল, আমি জানিও না। লাফিয়ে বেরিয়ে একটা গাছে উঠে পড়েছিলুম, জল নেমে গেলে এক কোমর পলি আর আতঙ্কে জমাট মৃত্যুর জগৎ ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছি, বন্ধু, তার স্ত্রী—তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খবর নেবার সময় ছিল না, উপায়ও ছিল না। দিন সাতেক পরে—অনেক কষ্টে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যাকে সামনে পেয়েছি—অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছি তাকে। আমি যদি একটা বুনো শুয়োর হতুম—এর বেশি কী আর করতে পারতুম আমি!

লোকগুলোব আলাপ-আলোচনায় আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল, একবার ভাবলুম

আমার পকেটে, 'ফ্লেশ-লাভার্স' বলে যে পেপারব্যাকটা আছে, সেটা বরং পড়ি—ট্রেনের তো এখনো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, আমি ঠিক শুনতে চাইলুম না—তবু শুনে যেতে লাগলুম—করোগেটেড টিনের চালাটা চোখের সামনে ঝকঝক করে চলল।

তারপর সেই লোকটার গলা আরো গভীর হতে থাকল, স্মৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে মানুষ যেমন করে কথা বলে—কখনো স্বপ্ন দেখে—কখনো জাগে, কখনো বাইরেটাকে আবছা করে দেখে—কখনো দেখে না, তেমনি স্পষ্ট অথচ ছায়া-ছায়া ভঙ্গিতে ভাঙা মোটা আওয়াজে সে কথা কইতে লাগল। এখন তার স্বরে জোয়ারে ফেঁপে ওঠা রায়মঙ্গল নদী গম গম করতে লাগল, নোনা সমুদ্রের হাওয়ায় সুন্দরী-হেঁতাল-গোলপাতার মর্মর উঠতে লাগল। আমি এতক্ষণে কোথাও ছিলুম না—এবার ওই লোক দুটো, রেলের লাইন, রোদ-ঝলসানো টিনের চাল, রাধাচূড়োর ছায়া—সব মিলিয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকারের ভেতরে শুধু স্মৃতি জড়ানো একটা স্বর জেগে রইল কুয়াশামাখা আলোক-বৃত্তের মতো।

'দেশ-ঘর যখন গেল, তখন বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি শেয়ালদা স্টেশনে। তারপর ক্যাম্পে। তারও পরে? বউটা মরল কলেরায়, ছেলেটা ভিক্ষুকের দলে মিশল, মেয়েটা একটু বড় হয়েছিল—সেটা যে কোন্ চুলোয় গিয়ে পৌছুল বোধ করি ভগবানও তা জানে না।

তা ভাই ছাড়ান দাও এ-সব কথা, এগুলো শুনে শুনে তো তোমাদের কান পচে গেছে। মোদ্দা—বছর না ঘুরতেই আমি হাত-পা ঝেড়ে সাফসুফ হয়ে গেলুম। তখন যেখানে যাই—যেখানেই থাকি, আমার আর কিসের ভাবনা! ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম বাংলা দেশের আর-এক মুল্লুকে।

কী না করেছি বছর দুই ধরে। সরকার থেকে লোন দিয়েছিল, ব্যবসা করতে গেলুম —ছ'মাসও টিকল না। জাত চাষীর ছেলে, সাতজন্মে করেছি ও-সব, না বুঝি কিছু! আসামের দিকে দল বেঁধে গিয়েছিলুম একবার—পাহাড়ের ঢালে বাস্তু বেঁধে জমিতে চাষ দিয়েছিলুম—বলব কী ভাই, সোনা ফলেছিল। কিন্তু থাকতে দিলে না, প্রথমে এল সরকারী নোটিস, কিন্তু বন-বাদাড় থেকে এত কষ্টে ফসল করেছি—ছেড়ে যাব? তাতে দিলে হাতি লেলিয়ে। ঘরদোর ভেঙে আমাদের বুকের পাঁজরার সঙ্গে ফসল দলে-পিষে উৎখাত করে দিলে—হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিলে, এরা পাকিস্তানের চেয়েও সরেস।

ও-সব কথা থাক দাদা—আমাদের ছোট মুখে মানায় না। কাঁদতে কাঁদতে কে যে কোন্ দিকে ছটকে পড়ল বলতে পারি নে, আমি আসাম ছাড়িয়ে আবার বাংলা দেশে এলুম।

পৌঁছেছিলুম একটা ছোট শহরে। জনমজুর খাটলুম কিছু দিন, কিন্তু চাষীর রক্ত যাবে কোথায়! কারো কাঁধে লাঙল দেখলে, একপশলা বৃষ্টির পর ক'টা লাউ-কুমড়ো-পালঙের পাতা সবুজ হয়ে লকলক করতে দেখলে, যেন কান্না উছলে উঠত বুকের ভেতর।

সরকার থেকে তখন লোক পাঠাচ্ছিল আন্দামানে, জমি-টমি দেবে। কিন্তু সেই হাতির পর থেকেই আমার ভয় ধরেছিল, দাদা। সে তো কালাপানির দেশ—সেখানে আবার কী লেলিয়ে দেবে কে জানে! আমার আর কী আছে, মরি তো এই বাংলা দেশেই মরব।

চাষীর ছেলে—একটুখানি জমি চাই আমার। এক বিঘে না হয় দশ কাঠা, দশ কাঠা না জুটলে পাঁচ কাঠা। কিন্তু কে দেবে জমি—কোথায় জমি! এ তো আমাদের দেশ নয় যে বন কেটে আবাদ করব, বাঘ-কুমির-সাপ তাড়িয়ে মাটির দখল নেব।

তবু আবার জমি পেলুম।

শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদী। যত বড় নদী, চর তার চাইতেও বেশি। এই চড়া বোধ হয় সরকারী সম্পত্তি—কিন্তু তাতে এখন কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল। আগে বর্ষায় চড়াটা তলিয়ে যেত, কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তার খানিক জায়গা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে, আর ডোবে না—সেখানে ঘাস-পাতা প'চে বেশ জমি তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষজন কেউ থাকে না—কার গরজ পড়েছে ওখানে থাকতে। নদীর খেয়া পেরিয়ে রাত-বিরেতে যারা চর পেরিয়ে আসে তারা হাওয়ায় ঘাসবনের শাঁই-শাঁই শব্দ শুনে মনে মনে রামনাম জপে। তা ছাড়া ভয় দেখাবার জন্যে দুটো-চারটে আলেয়া তো আছেই।

বিশ্বেস করবে কিনা জানি না, জমির খিদে আমি আর সইতে পারছিলুম না, কিছুতেই থামতে চাইছিল না বুকের কান্না, একটা ধানের ছড়া দেখলে, দুটো শাকের পাতা দেখলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। শেষকালে খ্যাপার মতো আমি ওই চরে গিয়ে উঠলুম। হাতে যে দু-চারটে টাকা ছিল, তাই দিয়ে দা কিনলুম, কোদাল কিনলুম, খুঁটিনাটি আরো কিছু কিনলুম। আমার জমি আমিই গড়ব।

একাই? একাই। আমার আর কে আছে—তা ছাড়া আর কেই বা আমার সঙ্গে যাবে ওই ভুতুড়ে চড়ায় জমি গড়তে? কোন্ ফসলটাই বা ফলবে ওখানে? বালি জমি, ধান-পাট কীই বা হবে?

কিন্তু কিছু না হোক, ক'টা শাক তো তুলতে পারব। পটোল হবে নিশ্চয়—দু-চারটে ফুটি-তরমুজও কি ফলাতে পারব না?

আরো দশ ঘর উদ্বাস্তুর সঙ্গে আমারও একটা হোগলার ঝাঁপ ছিল শহরের এক টেরেয়। সেটা তুলে নিলুম। সবাই অবাক হয়ে বললে, "কোথায় চললে?"

"নদীর চড়ায়।"

"সেখানে কী?"

"জমি গড়ব।"

"মাথা খারাপ? কী জমি হবে ওই কাশ আর শনের জঙ্গলে?"

"জানি নে। চেষ্টা করে দেখব।"

ঠাট্টা করে কী বিশ্বাস করে বলতে পারি নে, একজন বললে, "ওই চড়ায় পেত্নী আছে।"

বললুম, "দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি, পেত্নীতে আমার কী করবে।"

মরুক গে—সব কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায়। আমি একাই বাস্তু বাঁধলুম নদীর চড়ায়। বয়েস অল্প ছিল, কবজিতে জোর ছিল, মাথার ভেতরে খ্যাপামি ধরে গিয়েছিল। লেগে গেলুম জঙ্গল কাটতে। গোটাকতক সাপ-খোপ মেরে শেষতক বিঘেটাক জমি সাফ হয়ে গেল।

তোমরাও তো চাষী, জানোই তো ভাই—মাটিতে মন থাকলে মাটি তোমার কক্ষনো ঠকায় না। কিছু সে তোমায় দেবেই। শাক-সব্জী হল, পটোল হল, ফুটি ধরল বলে। তখন

দিনের বেলা যারা চেয়েও দেখত না, আর রাত-বিরেতে চড়া পেরিয়ে যাওয়ার সময় রামনাম করত, তারাই দু-একজন করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"বাঃ, বেশ পটোল হয়েছে তো তোমার!"

"এ মাটিতেও তো শাক-টাক হয় দেখছি!"

এক আধজন বলত ঃ "এই চড়ায় একলাটি থাকো, তোমার ভয় করে না?"

"কিসের ভয়?"

"মানে—জন-মনিষ্যি নেই, তেনাদের যাওয়া-আসা আছে—"

বলতুম, "তেনাদের তো কখনো দেখিনি। যদি আসেনই, আলাপ করে নেব।"

"তোমার সাহস আছে—বলতে হবে সে-কথা।"

"হুঁ। এখানে—এমন একলাটি থাকা—"

শুধু একজন একবার বলেছিল, "পাহাড়ে নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে হে? এসব নদীকে বিশ্বাস করতে নেই। ইচ্ছে মতো খাত বদলায়—একদিন এসে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো।"

"বারো বছর যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকে, আর পড়বে না।"

নদীতে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—প্রথম প্রথম রাত্তিরগুলোকে তেমন ইয়ে লাগত না। অন্ধকার থাকলে চারদিকটা কেমন থমথম করত, বাতাসে কাশ-শন-ইক্‌ড়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজে কেমন ভুতুড়ে কান্না শোনা যেত একটা। অনেক দূরে একটা শ্মশানঘাটা--তার চিতার আগুন দেখা যেত--আরো খারাপ লাগত তখন। অদ্ভুত আওয়াজ করে এক-আধটা পোকা ডাকত, অমন শব্দ এর আগে আর কখনো শুনিনি। যেদিন চাঁদ উঠত—সেদিন কেমন সাদা সাদা মড়া আলোয় ভরে যেত সবটা, মনে হত সমস্ত চড়াটা জুড়ে চিতার ধোঁয়ার মতো কী যেন জমাট হয়ে আছে, বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কেমন একটা কাঁপুনি জেগে উঠত বুকের ভেতরে।

কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে আঁধার রাতে এই চড়ায় আমি একলা মানুষ বসে আছি—এইটে ভাবতেই ভালো লাগত আমার। ভাবতুম—আমি সব পারি—সব বন-বাদাড় কেটে এই ভূতুড়ে চড়ায় সমস্ত জমি উদ্ধার করে আনতে পারি—ফসলে ফসলে ভরে দিতে পারি। এ চর কারো নয়, কেউ এর মালিক নয়—আমি একে দখল করেছি, এ আমার, শুধুই আমার।

তখন চাঁদের আলোরও রঙ বদলাতে লাগল। চিতার ধোঁয়া নয়—জ্যোছ্‌না রাত্তিরে যেন দুধের বান ডেকে যেত। আমি দেখতে পেতুম. সেই আলোয় আমার ফসলগুলো শ্বাসে আর স্বাদে ভরে উঠছে—টিপ্ টিপ্ করে ঝরা শিশিরে আরো পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে ক'টা বেগুন, ক'টি ছাঁচিকুমড়ো। আর তখন আমার মনে হত—এখন যদি বউ থাকত, আমার ক'টা ছেলেমেয়ে থাকত—

এমনি একটা জ্যোছ্‌নার সন্ধ্যায়, আমার একলা ঘরের দাওয়ায় বসে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একদিন ভয়ানক চমকে উঠলুম।

একটু দূরেই ছায়া ফেলে গোল মতো কী একটা দাঁড়িয়ে।

বাছুর? আরে দূর—এখানে কার বাছুর আসতে যাবে? তা ছাড়া অমন চেহারা তার হতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ অনেক মোটা, গোল, বেঁটে বেঁটে পা, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা,

গায়ে খাড়া খাড়া বড় বড় লোম, মুখের ডগাটা ছুঁচলো, আর তার ওপরে ওলটানো নথের মতো বাঁকা দাঁত দুটো। দেখেই বুক চমকে গেল, প্রকাণ্ড একটা মদ্দা বুনো শুয়োর।

অ্যাদ্দিন আছি এখানে—দেড়-দু বছর হয়ে গেল, এ মক্কেলকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। গোটা চরটাই আমি ঘুরেছি, বন-বাদাড় ঠেঙিয়েছি, শন কেটে এনে ঘরে ছাউনি দিয়েছি—দু-একটা খরগোস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি এর আগে। সাপ অবিশ্যি আছে, তা যে তল্লাটের মানুষ আমি—সাপ নিয়ে তো নিত্যি ঘর করতুম। এ হতচ্ছাড়া তো এখানে আগে ছিল না—থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যেত অনেক আগেই।

এল কোত্থেকে?

কিন্তু সে ভাবনা পরে। এখন তো বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। মদ্দা দাঁতাল শুয়োর—জানোই তো কী বজ্জাত জানোয়ার। আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেলে তো আর কথা নেই—সোজা তেড়ে এসে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। আমার এক পিসেমশাইকে শুয়োরে মেরেছিল—সে কথা মনে হলে এখনো গায়ের ভেতরে আমার ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

বেশ ছিলুম একলা চড়ায়—রাজার হালে। কোত্থেকে এই আপদটা এসে জুটল হে?

ঘরে একটা সাপমারা বল্লম ছিল। ভাবলুম, এনে তাক করে দিই ছুঁড়ে। তারপরেই মনে হল, যদি ফসকায়? প্রায় হাতির ছানার মতো চেহারা—তার ওপর যা বদখৎ মেজাজ! একেবারে ঘরসুদ্ধুই উড়িয়ে দেবে আমাকে।

আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই রইলুম ঠায় বসে, আর শুয়োরটাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে চেয়ে রইল। নড়া-চড়া কিচ্ছুটি নেই, যেন কাঠের পুতুল। আমি দেখতে লাগলুম জ্যোছ্‌নায় ওর ক্ষুদে চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে—একটা গোলমতন ছায়া জমে আছে ওর পায়ের কাছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে ও যে কী দেখছিল—সে ওই-ই বলতে পারে।

একটু পরে ফোঁস ফোঁস করে গোটা দুই শ্বাস ছাড়ল, ঘোঁৎ করে যেন আওয়াজও তুলল একটু, তারপর আস্তে আস্তে খুট খুট করে বেরিয়ে গেল ঘরের সামনে থেকে। আমি দেখতে পেলুম, একটু এগিয়ে ঢুকে গেল ঘাস বনের ভেতরে।

আপদ এখন তো গেল, কিন্তু গোটা রাত্তির আমি ঘুমুতে পারলুম না। এ তো মহা জ্বালা হল দেখছি। আর তো আমি ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘুরতে পারব না—বলতে পারব না, আমি এখানকার মালিক, এই চর আমার রাজত্বি। এ ব্যাটাচ্ছেলে কোন্‌খানে ঘাপটি মেরে থাকবে—কখন কে জানে এর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া লাগাবে—যাকে বলে শুয়োরের গোঁ। ঘাস-কাশের বন আর এবড়ো-খেবড়ো জমি আমি দৌড়েও পালাতে পারব না—ওই দাঁত দিয়ে একেবারে ফালা-ফালা করে ফেলবে আমাকে।

কোত্থেকে এসেছে এ-কথা ভেবে লাভ নেই। কোন্ দূরের জঙ্গল থেকে পথ ভুলে কিংবা তাড়া খেয়ে এই চড়ায় এসে নেমেছে সে ওই মক্কেলই বলতে পারে। কিংবা কে যে কোথা থেকে কোথায় যায়—ভগবানেরও কি জানা আছে সে খবর? আমিও কি জানতুম, সুন্দরবন, অথৈ গাঙ আর মেঘ-বরণ ধানের দেশ থেকে সোঁতের কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে আমি এই চরে এসে ঠেকব? আমি কি জানতুম এমন সন্ধ্যাও আমার আসবে যখন গাঁয়ের বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ঘণ্টার শব্দ উঠবে না, নিমগাছের ছায়া

কাঁপবে না আমাদের উঠোনে, হাওয়ায় উঠবে না বুনো ফুল-গাছ গাছালির সঙ্গে ফুটন্ত ভাত কিংবা তপ্ত খেজুর গুড়ের পাকে চিঁড়ের গন্ধ, শোনা যাবে না কীর্তনের গান? আমিও কি ভেবেছিলুম, আমার একলা সন্ধ্যায় কেবল ঘাসবনে শন শন করবে হাওয়া, কেবল অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পোকা আর ঝিঁ ঝিঁ ডাকবে আর অনেক দূরের জ্বলন্ত চিতা থেকে কয়েকটা আগুনের পিণ্ড লাফাতে লাফাতে এসে আলেয়া হয়ে দপদপ করবে এখানে-ওখানে?

তা হলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, বুনো ওল ছিল। হয়তো বা শুয়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে সেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের—বাস্তুহারা।

বাস্তুহারা কথাটা মনে হতে একটু হাসি পেল, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসিটা থাকল না। বাস্তুহারা হোক আর নাই হোক—আদতে তো বুনো শুয়োর। মানুষের শত্তুর। যখন নিজের তালে আছে, বেশ আছে। কিন্তু যা মেজাজী জানোয়ার, একবার যদি ক্ষেপল তো—

পরদিন থেকে যা হোক একটা দা কিংবা বল্লম সব সময় রাখতুম হাতের কাছে। চলতে ফিরতে বার বার নজর রাখতে হত চারপাশে। আর বলব কি হে—দেখাও হয়ে যেত শুয়োরটার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হলেই দাঁড়িয়ে যেত ওটা। দিনের বেলায় দেখেছিলুম, রাতে যা ভেবেছি, জানোয়ারটা তার চেয়েও বড়। গা-ভর্তি ঝাঁটার মতন রোঁয়া—মস্ত দাঁতটা চকচক করছে সাদা, এখানে-ওখানে কাদার চাপড়া লাগানো ইয়া পেল্লায় শরীর। তেড়ে এলে মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। কিন্তু যেই মুখোমুখি হল কিংবা আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বোঁ করে—অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। নড়া-চড়া নেই—কিছুই না—খানিকটা কেবল মিটমিট করে চেয়ে রইল, তারপর যেন কিছুই হয়নি—এমনি করে গা দুলিয়ে তুর তুর করে কোন্‌দিকে চলে গেল। অনেকবার ভেবেছি তুলি বল্লম—ধাঁ করে মেরে দিই, কিন্তু কিছুতেই হাত উঠত না। কেবল মনে হত—ও যখন আমায় কিছু বলে না, তখন খামোকা ওকে আমি মারতে চাই কেন!

দিনের বেলা আমার ঘর-দোরের দিকে ওকে কখনো আসতে দেখিনি। আমি ভেবে-ছিলুম, এই এল শুয়োর—আমার ক্ষেত-টেত খুঁড়ে কিছু আর রাখবে না—যে ক'টা ফুটি হয়েছে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেবে। তা গোড়ার দিকে এক-আধটু খোঁড়াখুড়িও করেছিল বইকি, শুয়োরের স্বভাব যাবে কোথায়।

একদিন বেশি রাত্তিরে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি—ওই কাণ্ড! কী মনে হল, হাঁক পেড়ে বললুম, "এই মক্কেল, কী হচ্ছে ওটা?" দুড় দুড় করে ছুটে পালালো, তারপর থেকে আর ওসব করতে দেখিনি।

হতে পারে—দাঁতাল হলেও শুয়োরটা ভীতু, ভালো মেজাজ, হাঙ্গামা-হুজ্জৎ পছন্দ করে না। মানুষ তো কত রকমের হয়, জানোয়ারেরই কি রকমফের হতে পারে না? তবু আমার মনে হতে লাগল, ওটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। এই নির্জন ভূতুড়ে চড়ায় ও-ও একা, আমিও একা। আমারও এক এক সময় বুকের ভেতর হু হু করে—মনে হয়, সব ছিল, ঘর ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল; তখন নিজের এই রাজত্ব—এই ক্ষেতটুকু—

এই জমি গড়বার সুখ—সব ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়—আমার কিছুই দরকার নেই, কিছুই না। তেমনি ওই শুয়োরটাও একা—ওরও চেনা জঙ্গলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, ওরও আপনার জন ছিল, তারা কেউ নেই—কোথাও নেই। আমি যখন ফাঁকা মন নিয়ে কোনো অন্ধকার রাতে—কোনো জ্যোছ্‌নার ভেতর দাওয়ার ওপর চুপ করে বসে থাকি —তখন অন্ধকারটা এক জায়গায় আর একটু ঘন হয়, জ্যোছ্‌নায় কখনো একটা ছায়া পড়ে—ওই শুয়োরটা এসে দাঁড়ায়। তখন ওরও একা লাগে—ও-ও সঙ্গ খোঁজে। আলোয় হোক আর আঁধারে হোক—ওর চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলে, ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। তারপর ফোঁস করে যেন একটা নিশ্বাস ফেলে, ঘোঁত করে একটু আওয়াজ হয়, কী এক্টা বুঝে নিয়ে ভারী শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে দোলাতে আবার চলে যায় ঘাসবনের ভেতর।

তোমাদের অবাক লাগবে শুনলে, এর পর থেকে আমার আর ওটাকে ভয় লাগত না। কতদিন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমার প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেছে, কতবার দেখেছি কোথায় একটু কাদাজল জমেছে—খুশি হয়ে গড়াগড়ি করছে তার ভেতরে, কোনোদিন দেখেছি মাটি খুঁড়ছে নিজের মনে। আর রাত হলে, যখন চরের ওপর কেবল শাঁই শাঁই করছে হাওয়া, যখন দূরের শ্মশানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চিতার আগুন—এমন কি মড়া-পোড়ার গন্ধও ভেসে আসছে এক-আধটু, আর আমি ফাঁকা মন নিয়ে—বুকের ভেতরে একটা কান্না নিয়ে বসে আছি, তখন ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, যেন বলতে চাইছে নিজের কথা, যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

শেষে এমন হল, শুনলে হাসি পাবে তোমাদের, দু-একদিন ওটাকে দেখতে না পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি চমকে উঠে ভাবতুম—যেমন নিজের খেয়ালে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল নাকি আবার? আর ভাবলেই আমার ভয় করত। যতদিন একা ছিলুম—বেশ ছিলুম। কিন্তু ওটা আসবার পরে কখন যেন দুজন হয়ে গেছি, ও আমাকে বুঝতে পারে, আমি ওকে বুঝতে পারি। তখন বেরোতুম খুঁজতে। হয়তো দেখতুম, অনেক দূরে, অনেকখানি জঙ্গলের ভেতর কোথাও খানিক জলকাদার ভেতরে হাত-পা মেলে শুয়ে আছে। তোমরা বলবে, আমাকে পাগলে পেয়েছিল। আমিও কি তা ভাবিনি? কিন্তু সেই চড়ায় সব অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, একটা আলাদা মন হয়ে গিয়ে ছিল আমার—আমিও একটা আলাদা জীব হয়ে গিয়েছিলুম যেন। জিজ্ঞেস করতুম, 'আসিসনি কেন?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তুলে ছুটে পালাতো। যেন লজ্জা পেত মনে হয়।

বলবে, আমার এ-সব মনগড়া। যাকে বলে বুনো শুয়োর, বোকা, গোঁয়ার, কচু-কন্দ খুঁজে বেড়ায়, যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাড়া করে—তার বয়ে গেছে তোমার মনের কথা বুঝতে। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সব মানি। তবু দেখতুম, সেই রাত্তিরে, কিংবা পরের রাত্তিরেই ওটা এসেছে। আমার দাওয়ার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট চোখ দুটো চিকচিক করছে জোনাকির মতো। কিছুক্ষণ থাকত ওইভাবে—যা হোক একটা কিছু বুঝে নিত—তারপর আবার আস্তে আস্তে চলে যেত নিজের মনে।

শহরের বাজারে তরকারী বেচতে আমি নিজে যেতুম না, অন্য লোক এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেত পাইকারি দরে। তারা আসত হপ্তায় দু-চারদিন, তা ছাড়া

একটু দূর দিয়ে খেয়ার লোকজনের যাওয়া-আসা তো ছিলই। তাদেরই কারো চোখে পড়ে থাকবে। একদিন হঠাৎ দেখি শহর থেকে শোলার টুপি আর হাফপ্যান্ট পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে দু-তিনজন ভদ্দরলোক এসে হাজির।

প্রথমটা ভেবেছিলুম—চরের ওদিকটায় এ-সময়ে, দু-চারটে চখাচখি পড়ে, তাই মারতে এসেছে। কিন্তু চলে এল আমার ঘরের দিকেই।

"তুমি এখানে থাকো?"

"আজ্ঞে।"

"এ-সব তরিতরকারি তোমার?"

"আজ্ঞে।"

"এ তো খাসমহল জমি। পত্তনি নিয়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"বে-আইনি। একদম বে-আইনি।"

কে জানে কাকে বলে আইন, কাকে বলে বে-আইন! এই ভূতুড়ে চড়ায় সরকারের নজর তো কোনোকালে ছিল না—আমিই এখানে একা হাতে মাটি গড়েছি, ফসল ফলিয়েছি। কিন্তু আইন বে-আইনের ভাবনা আমি আর ভাবতে পারি না। যেদিন হাতি এনে আসামের পাহাড়ে ফসলের সঙ্গে আমাদের বুকের পাঁজর অবধি দলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন থেকে ও-সব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বাবুদের একজন ফস করে একটা সিগ্রেট জ্বাললেন। বললেন, "যাক, সে-সব পরে হবে। এই চড়ায় বুনো শুয়োর আছে, তাই নয়?"

ধক্ করে উঠল আমার বুকের ভেতর। আমি তিনটে বন্দুকের দিকে তাকালুম।

"কে বললে আপনাদের?"

"আমরা খবর পেয়েছি।"

তোমরা শুনলে রাগ করবে কিনা জানি নে, আমি দেখেছি, হারামীর দিকে জানোয়ারের চেয়ে মানুষেরই টাঁক বেশি। তক্ষুনি মনে হল, বলি ঃ "যান ওদিক পানে—কাদার মধ্যে বসে আছে দেখেছি একটু আগে, দিন সাবড়ে।" আর তক্ষুনি কে যেন কানে কানে বললে, "ছি ছি হে, তুমি শুয়োরের চাইতেও ছোটলোক হয়ে গেলে। ও তোমায় বিশ্বেস করে, তার এই প্রিতিদান!"

বললুম, 'বাজে কথা। আড়াই বচ্ছর ধরে আমি আছি এখানে। চরের জঙ্গল ভেঙে চলাফেরা করি। কোনো শুয়োর কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"কিন্তু একজন যে বললে—"

"ভুল বলেছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে হয়তো।"

"তুমি ঠিক জানো?"

"আজ্ঞে এই চড়ার আমি বাসিন্দে। আমি জানি নে তো অন্য লোকে জানবে?"

বাবুরা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম, "তা খরগোস-টরগোস আছে দু-চারটে। খুঁজে দেখতে পারেন।"

"দূর, খরগোস অযাত্রা। আর সেগুলো খুঁজে কে সময় নষ্ট করবে—কেই বা টোটা খরচ করতে যাবে?"

বাবুদের দুঃখ হয়েছে মনে হল ঃ "বাজে লোকের কাছে উড়ো খবর শুনে হাঁটাহাঁটিই সার হল। চলো হে।"

শুয়োরটা সে রাতে এল না, এল পরের রাতে। বললুম, "তোকে বাঁচিয়েছি, বুঝলি? তিনটে বন্দুক ছিল—কিচ্ছু করতে পারতিস না।"

নিঃসাড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম, "এবার ক'টা কচু লাগাব ঠিক করেছি। খুঁড়ে-মুড়ে যেন বরবাদ করে দিসনি, তা হলে ঠিক বলে দেব বাবুদের।"

তেমনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

দিন কাটছিল, এইভাবে কতদিন কাটত জানি না। কিন্তু সেই সকালে সরকারী পেয়াদা এসে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল। কেন আমি খাসমহলে জমি জবর-দখল করেছি, কেন আইন-মোতাবেক পত্তনি নিইনি, হুজুরে হাজির হয়ে আমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই যে তিন বাবু এসেছিল, তারাই কেউ ফিরে গিয়ে এই উপকারটা করেছে আমার।

নোটিশ নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম ঘরের দাওয়ায়। আগের দিন থেকেই টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, আজ আকাশ আরো ঘোলাটে; আরো অন্ধকার। ওদিকে নদীতে জল বাড়ছে, গোঁ গোঁ করে উঠছে তার ডাক। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে—চারদিকের ঘাসবনে ঢেউ উঠছে।

জল আসছে নদীতে। চরের খানিকটা ডুবে যাবে। কিন্তু আমি যেখানে আছি সেটা ডুববে না—আজ চৌদ্দ বছর ধরেও ডোবেনি। নদীর ভাবনা নেই, আমি মানুষের কথা ভাবছিলুম। এমনি একটা মেঘলা দিনেই যখন ধানের ক্ষেতে বাতাস ঢেউ দিয়েছিল, সেইদিনই ওরা হাতি এনে—

পত্তনি নিতে হবে, খাজনা দিতে হবে? কত চাইবে কে জানে? নাকি উচ্ছেদই করে দেবে? ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখলুম বৃষ্টিতে ভিজে চিকচিক করছে পটোলগুলো—হাওয়ার মাতন লেগেছে ঢলঢলে লাউয়ের পাতায়। চোখ জ্বালা করতে লাগল। সারাদিন কিচ্ছুটি খেতে ইচ্ছে করল না আমার—ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে চুপ করে শুয়ে রইলুম।

শুয়োরটার ভাগ্যি ভালো আমার চাইতে। ওকে খাজনা দিতে হয় না, পত্তনি দিতে হয় না, ওর উচ্ছেদের ভয় নেই। ভয় নেই? আমি যখন থাকব না—তখন ওরও তো পালা মিটে যাবে। তখন আবার তিনটে বন্দুক আসবে, হয়তো লোকজন নিয়ে ঘেরাও করবে জঙ্গল—তারপর আনন্দে বাবুরা—

সব বিশ্রী লাগছিল, সব ফাঁকা ঠেকছিল, অনেকদিন পরে বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্যে আমার কান্না আসছিল। হাওয়া-বৃষ্টি-দুর্যোগের ভেতরে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যে যে কিভাবে কেটে গেল জানি না। তারপর রাতে ঘুম এল, আর তারো পরে—

জেগে উঠলুম বানের ডাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রায় মহাপ্রলয় তখন। কিন্তু কিছু আর ভাববার সময় ছিল না। চর ভাসিয়ে ছুটে এল পাহাড়ী নদী—মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘর, আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম—এক ঝটকায় আমাকে কুটোর মতো তলিয়ে নিয়ে চলল।

ডুবতে ডুবতেও টের পেলুম আমার কাছেই কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। তা হলে দুজনেই ভেসেছি—দুজনেই আবার একসঙ্গেই বাস্তুহারা। কী করে কী হল জানি

না—দু হাতে শুয়োরটাকে জাপটে ধরে মাথা জাগিয়ে তুললুম। আর সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—যার স্বজাতেরা সুন্দরবনের গহীন গাঙ পেরিয়ে চলে যায়—যারা সমুদ্দুরের মতো রাক্ষুসে নদীকে ভয় পায় না—বাঘ-হরিণ পৌঁছুবার আগে যারা নতুন জাগা চরে গিয়ে বাস্তু বাঁধে, সে আমাকে টানতে টানতে—জলের ওপর নাক তুলে সাঁতার কাটতে কাটতে, সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ক্ষ্যাপা স্রোত মরণ-সাপট দিচ্ছিল। সইতে পারলুম না—আমি জ্ঞান হারালুম।

যখন চোখ চেয়েছি, তখন সকাল। দেখি, জনতিনেক মানুষ আমায় সেঁকতাপ করছে। বললুম, "শুয়োরটা?"

তারা বললে, "কিসের শুয়োর? বানে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ডাঙায় ঠেকেছিলে, আমরা তুলে এনেছি তোমায়। কোথাকার লোক হে?"

শুয়োরটা কোথায় গেল জানি না। হয়তো আমায় কোনোমতে ডাঙায় ঠেলে দিয়ে সে নিজে আর উঠতে পারেনি, ভেসে গেছে। তোমরা হাসবে, পাগল বলবে আমায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি, ও যদি বেঁচে থাকত কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতো ওরও তো কোনো দোসর নেই।'

সেই ভাঙা গভীর গলাটা থামল। নিঃশব্দে বসে থাকল দুটি চাষী, আমি করোগেটেড টিনের চালাটার দিকে চেয়ে রইলুম, আমার চোখ জ্বলতে লাগল, একটা ক্লান্ত কাক ডেকে চলল রাধাচূড়োর ডালে।

সেই লোকটা আবার বললে, 'কখনো শুয়োর মানুষ হয়, বুঝেছ—কখনো আবার মানুষ—'

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালুম—আমাকেই বলছে? স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়েছিল। আমি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী—আমার কামরাটা থাকবে আর একটু ওদিকে। গাড়ি ফাঁকা থাকলে বসে বসে পড়তে পারব 'ফ্রেশ-লাভার্স' বইটা; আর তেমন যদি সহযাত্রী পাই তা হলে বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে উত্তর বাংলার বন্যার গল্পও শোনাতে পারব তাদের। রেল-স্টেশনের এই উদ্ভট বাজে গল্পটা ভুলে যেতে আমার সময় লাগবে না তখন।

বিসর্জন

এমন যদি হত, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত ঘরের এক কোণায়; যা সকলের জোটে তাই এক মুঠো খেয়ে চুপচাপ দিন কাটিয়ে দিত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই লালচ বাড়ছে বুড়ির। এখন যেন রাক্ষসের খিদে এসে পেটে জমা হয়েছে ওর। একরাশ গিলল, ঝিম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপরেই আবার ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগল ঃ 'ওরে—আমায় খেতে দে রে, খিদেয় যে আমি মরে গেলুম।'

তা-ও যদি পেটে রাখতে পারত!

ছেলেবেলায় একবার সখ করে একটা কোকিলের ছানা ধরে এনেছিল সুদাম। মনে মনে ভারী সাধ ছিল, ছানাটা বড় হবে, তারপর রাত-দিন 'কুহু-কুহু' করে গান গেয়ে প্রাণ

একেবারে মাতোয়ারা করে দেবে। হয়তো দিতও, কিন্তু বড় হওয়ার আগেই সে সুদামকে প্রায় পাগল করে দিলে। বাচ্চাটার খাঁই আর মেটে না। সব সময়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে চিৎকার আর লাল টুকটুকে একটা হাঁ সে মেলেই রয়েছে। ছাতুর গুলি, ময়দার পিণ্ডি—সেই হাঁয়ের ভেতরে ছেড়ে দিতেই টপ্ করে গিলে ফেলা, তারপরেই আবার কান-ফাটানো চ্যাচানি। যেন বিশ্বসংসার গিলে ফেলেও তার খাঁই মিটবে না।

ঠিক একরকম। বুড়িটার সঙ্গে কোকিলের ছানার কোনো তফাৎ নেই।

মেঘের আড়াল থেকে এক টুকরো ভাঙা আর জবুথবু চাঁদ উঠবে-উঠবে করছে, কিন্তু এখনো মুখ বার করতে পারছে না। মন-মেজাজ ভালো থাকলে সুদাম বেশ রস দিয়ে বলতে পারত ঃ 'ঘোমটার আড়াল থেকে নতুন বৌ একবার দেখে নিতে চাইছে—কিন্তু সামনে থেকে খাণ্ডার শাশুড়িটে আর নড়ে না।' কিন্তু এখন আর রসিকতা করবার অবস্থা নয় তার। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সুদামের মনে হল, আরো কিছুক্ষণ চারদিক এইরকম থমথমে অন্ধকারে তলিয়ে থাকুক—সারা আকাশটা মেঘে ঢেকে যাক—এই ডিঙিটাকে পৃথিবীর কেউ যেন এখন দেখতে না পায়, কেউ না।

ক্যানালের গেরি-মাটি জল এই অন্ধকারে মেঠো শামুকের মতো রঙ ধরেছে। দু ধারের ঝোপ-জঙ্গলে চাপ বাঁধা অন্ধকারে ঝিকমিক করছে জোনাকি, এক-আধটা খড়ের ছাউনি কিংবা টিনের চালা ছায়া ছায়া হয়ে দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে আবার। এরই ভেতরে কোথায় একটা ছোট বাচ্চা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল। সুদাম মনে মনে বললে, 'কাঁদো কাঁদো, এখন থেকেই গলায় জোর করে নাও। কান্নার এখুনি হয়েছে কী—দিন তো সামনে পড়েই রয়েছে।'

এক টুকরো আলোও কোথাও জ্বলছে না। কার দায় পড়েছে এই মাঝরাত্তিরে একটা লণ্ঠন জ্বেলে বসে থাকতে? কেরোসিন পেতে যা ঝঞ্ঝাট, আর যা তার দাম। কেবল ঝিলমিল করে জোনাকি জ্বলছে। ওদের কোনো ভাবনা নেই, পয়সা দিয়ে ওদের কেরোসিন কিনতে হয় না।

সুদাম একবার আড়চোখে চেয়ে দেখল বুড়ির দিকে। মাথাটা হাঁটুর ভেতরে গুঁজে একটা ময়লা তামাকের পুঁটলির মতো বসে রয়েছে। না—ঘুমুচ্ছে না। সুদাম জানে, বুড়িটা কখনো ঘুমোয় না। রাত—রাত-দিন—সন্ধ্যা-সকাল—সব এখন একাকার হয়ে গেছে। যখন জেগে থাকে, তখন থাকে; যখন জেগে থাকে না, তখনো সম্পূর্ণ ঘুমোয় না; ঘুম আর জাগার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত জায়গায় তার মন নানারকম ছবি দেখে—তিরিশ বছর আগে যে মরে গেছে সে এসে তার সামনে দাঁড়ায়; কোন্‌কালে কোন্ সধবা স্বামীপুত্রের সংসার রেখে চলে গিয়েছিল, তুলসীতলায় নামানো তার আলতা-রাঙানো পা দুখানা দেখতে পায় বুড়ি; কে যেন তাকে ডাক দিয়ে বলে, 'বাড়িতে দশ-সেরী রুই মাছ এয়েছে গো—ও নতুন বৌ, কুটতে যাবে না?' আর এইসব ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের ভেতর তার খিদে পায়, যন্ত্রণায় তার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যেতে থাকে, ঘোর ভেঙে গিয়ে বুড়ি হঠাৎ বিকট গলায় গোঁ-গোঁ করে ওঠে; 'এ বাড়িতে সব মরে-হেজে শেষ হয়ে গেল নাকি গো? আমাকে কেউ চাট্টিখানি খেতেও দেবে না?'

রাগে ঝন ঝন করে ওঠে সুদামের বৌ তুলসী।

'এ বাড়ির সব মরে শেষ না হয়ে গেলে তোমার খাঁই মিটবে কী করে? তুমি যে যমের

খিদে নিয়ে এসেছ। নিজে তো আর মরবে না, তিন যুগের ভুষুণ্ডী কাগ হয়ে বসে রয়েছ।'

না, বুড়ি যে মরবে না, এ ব্যাপারে সুদামও নিঃসন্দেহ হয়েছে। তারও তো একদিন ঘর-সংসার সব ছিল। স্বামী, ছেলেমেয়ে সব। কী করে যে মরে-হেজে একাকার হয়ে গেল—সুদাম তার খবর রাখে না। তার ছেলেবেলা থেকেই বুড়িকে এ বাড়িতে সে দেখছে। সম্পর্কে তার মায়ের কি রকম যেন মাসী হয়—অনাথা দেখে তার মা এনে এখানে ঠাঁই দিয়েছিল। তখনই বুড়ির চুলে পাক ধরা। তবু খাটা-খাটুনি করত, ধান সেদ্ধ করত, গোরু দেখত। তারপর সুদাম বড় হল, বিয়ে-থা করল, মা-বাপ চলে গেল। কিন্তু বুড়ি সেই যে ঠায় যক্ষি বুড়ির মতো বসে রয়েছে—তার আর নড়বার নামটিও নেই। এ বাড়ির ওপর দিয়ে এতবার যমের আনাগোনা ঘটে গেল, কিন্তু ওর দিকে চেয়েও দেখল না একটিবার।

এখন না পারে চলতে ফিরতে, না পারে উঠে দাঁড়াতে। বছর দুই আগেও পিঠটাকে একেবারে সামনে ঝুঁকিয়ে, একটা লাঠি নিয়ে, এক-আধটু ঘুরে বেড়াত। এখন তা-ও পারে না। কখনও পিণ্ডি পাকিয়ে বসে থাকে, কখনো কুকুরের মতো কুণ্ডলী করে ঘুমোয়। না—ঘুমোয় না। ঘুম আর জাগার মাঝখানে একটা অদ্ভুত জগতে একরাশ ছায়ার মিছিল দেখে আর থেকে থেকে চম্‌কে ওঠে ঃ 'কে—কে ওখানে? আজ কি তোরা আমাকে এক মুঠো খেতেও দিবি নে?' অথচ একটু আগেই—হয়তো আধ ঘণ্টা আগেই তুলসী যে তাকে এক কাঁসি ভাত-তরকারী গিলিয়ে গেছে সে তার মনেও থাকে না।

শুধু তাই নয়। ভাঙা গলায় দাঁত পড়ে যাওয়া মুখের জড়ানো আওয়াজে শাপমন্যিও দিতে থাকে ঃ 'হে ভগবান—এদের এত আছে, তবু এক মুঠো খেতে দেয় না আমাকে। তুমি এর বিচার কোরো।'

জ্বলন্ত চোখে তুলসী বলে, 'শুনলে? শুনছ তো?'

'হুঁ।'

'তুমি আর কতটুকুন বাড়িতে থাকো? রাতদিন ওই শাপ-শাপান্ত আমাকে শুনতে হয়।' —রাগে দুঃখে তুলসীর চোখে জল আসে ঃ 'ছেলেমেয়ের পেট মেরে সমানে খাওয়াই—এই তার প্রিতিদান!'

সুদাম বলে, 'বুড়িটার গলা টিপে মেরে ফেলবে একদিন।'

'আঃ, কী যে বকো!'

তবু সুদাম জানে, মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে কোথায় তুলসীর একটা মায়া আছে বুড়ির জন্যে। মন-টন ভালো থাকলে বলে, 'আহা—বলছে বলুক, ওর কি আর বোধভাষ্যি আছে কোনো? এককালে তো বিস্তর করেছে তোমাদের। নতুন বৌ হয়ে যখন তোমাদের বাড়িতে এলুম, রাতদিন কাঁদতুম মার জন্যে, তখন কত আদর করত আমায়, চোখের জল মুছিয়ে দিত, লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি এনে খাওয়াত। এখন অথর্ব হয়ে পড়েছে বলে—'

সুদাম তাকিয়ে থাকে তুলসীর মুখের দিকে। মেয়েদের মন বোঝা ভগবানেরও সাধ্যি নয়। একটু আগেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছিল ঃ 'হয় বুড়িটাকে যেখানে হোক বিদেয় করো, নইলে আমিই বিদেয় হই'—এখন ঠিক উলটো সুর ভাঁজতে শুরু করেছে। বুড়িটাও নিশ্চয় তুলসীকে বোঝে। তাই মরতে মরতেও মরে না—রাতদিন কোকিলের ছানার মতো হাঁ করে থাকে, ভাবে—দুনিয়ায় যা কিছু খাওয়ার আছে এই বেলা তা পেট পুরে খেয়ে নিই!

না—সুদামের কোনো মায়া নেই বুড়ির জন্যে। এক বিন্দুও না। কবে বুড়ি তাকে আদর করে দু-চারটে নাড়ু-মোয়া খাইয়েছে কিংবা কোলে বসিয়ে রূপকথা শুনিয়েছে—সে-কথা ভেবে সুদামের মন মমতায় ভরে ওঠে না। এই সংসারে থেকেছ খেয়েছ, যে-টুকু করবার করেছ! তারপর মানে মানে, সময় থাকতে যদি চলে যেতে—তা হলে সুদাম ডাক-চিৎকার ছেড়ে কাঁদত তোমার জন্যে, কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যেত, এমন কি শ্রাদ্ধ-শান্তি করতেও তার আপত্তি হত না।

কিন্তু এ কী ব্যাপার?

বাপ-ঠাকুর্দার আমলে যা ছিল, ছিল। কিন্তু সে সব দিন তো আর নেই। অবস্থা পড়ে গেছে। সামান্য যা জমি-জমা আছে, তাতে ছ'মাসের খোরাকির টানও উঠে আসে না। তরি-তরকারি বেচে, কখনও বা আরো দু-চারটে খুটখাট কাজ-কর্ম করে কোনোমতে চালিয়ে দিতে হয়—আষাঢ়-শ্রাবণের দুটো মাস একবেলার বেশি খাওয়াই হয় না। সামনে আরো আকাল আসছে, চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে সেটা। তিন টাকা ছাড়িয়ে উঠেছে চালের কিলো—আর ক'টা দিন বাদে গাঁয়ের আরো অনেক বাড়ির মতো তাকেও হয়তো মধ্যে মধ্যে উপোস দিতে হবে।

এর ভেতরে একটা বাড়তি পেট। কোনো আয় দেয় না—সুদ্ধু বাজে খরচ। দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যে—ঘোর ভাঙলেই মুখে কেবল খাই-খাই রব। সুদামের মাথার ভেতরে আগুন ধরে যায়। একটা ধূমাবতী এসে ঘরে ঢুকেছে। কখনো কখনো তার মনে হয়—বাড়িসুদ্ধ সব মরে গিয়ে যখন শ্মশান হয়ে যাবে, পোড়া ভিটের ওপর গজিয়ে উঠবে সাপের জঙ্গল, দাওয়ায় গর্ত করে শেয়ালে বাসা বাঁধবে, তখনো সেই শেয়াকুল কাঁটা আর ধুতরো-আকন্দ-বুনো ওলের মাঝখানে ডাকিনীর মতো জিভ মেলে বসে থাকবে বুড়িটা। তার পাটের মতো চুলগুলোতে লাউডগা সাপ খেলে বেড়াবে আর সন্ধ্যার লালচে আকাশের দিকে চেয়ে সে ডাক ছাড়তে থাকবে ঃ 'দে—দে—আরো খাই, আরো খাই।'

ভাবতে গিয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। সুদামের মনে হয়—সব বুড়িটার জন্যে। তারা তো মোটামুটি সচ্ছল গেরস্তই ছিল, কেন এমনভাবে একটু একটু করে সব যাচ্ছে? কেন দু'বছর আগে অমন দুধোল্ রাঙা গাইটাকে মা মনসায় কেটে দিলে? ধানগুলোর অমন সর্বনাশ হয়ে গেল কেন, যে মাটিতে প্রতিবার কম করে একশো কুমড়ো ফলে—সেখানে এ বছর বিশ-পঁচিশটার বেশি হলই না?

আশ্চর্য—বুড়িটা মরেই না। বয়েস কত হল? সত্তর-পঁচাত্তর-আশী? কিংবা আরো বেশি? সুদাম জানে না। তুলসীই ঠিক বলেছিল—ওটা ভুষুণ্ডী কাগ। ওদের বয়েসও নেই, মরণও নেই।

আজ তিন মাস ধরে এই মতলবটা তার মাথায় এসেছে। তুলসীটা এমনিতে বুড়ির ওপর যতই গর্জাক, কিছুতেই এতে সায় দেবে না, বরং নিজের ভাত ক'টা নিয়ে গিয়ে বুড়ির মুখে গুঁজে দিয়ে আসবে। তাজ্জব মেয়েদের মন—ভগবানও বুঝতে পারেন না!

কিন্তু সুদামের ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। আর চলে না, চলতেই পারে না।

সুযোগ এসেছে তিন মাস পরে। কাল ছেলেমেয়ে নিয়ে তুলসী গেছে বোনের বাড়িতে —ফিরতে আগামীকাল সন্ধ্যে। অতএব এই বেলাই—

বুড়ির তো দিনও নেই, রাতও নেই। চোখে কিছু দেখতে পায় না, কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে না উঠলে শুনতেও পায় না। তাই সুদাম যখন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে, তখন বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'কে ও? জগৎ নাকি!'

মা-কালীই জানেন জগৎ মানুষটা কে! কোন্ কালে কোথায় বেঁচে ছিল, কবে মরে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো বুড়ি এখন সেই লোকটাকে দেখছিল বসে বসে। না চেঁচিয়ে, বুড়ির কানের কাছে ঝাঁ-ঝাঁ করে চাপা স্বরে সুদাম বললে, 'আমি সুদাম।'

'অ—সুদাম।'

বুড়িকে তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে সুদাম এগোতে লাগল। একেবারে ওজন নেই গায়ে, একেবারে পাখির মতো হাল্কা। জটাবাঁধা চুলগুলো সুদামের মুখে লাগছিল, একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে যাচ্ছিল—নাকের পাশ দিয়ে পির্ পির্ করে কী উঠে যাচ্ছিল—নিশ্চয় বুড়ির চুল থেকে উকুন। অসম্ভব ঘেন্না করতে লাগল সুদামের। আশ্চর্য—এটাকে তুলসী নাওয়ায়-ধোয়ায়-খাওয়ায় কী করে! মেয়েরা সব পারে, ওদের অসাধ্যি বলে কিছু নেই।

বুড়ি বিড় বিড় করে বললে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে চললি সুদাম?'

'তুমি যে শিমুলতলীর মন্দিরে যেতে চেয়েছিলে গো। তাই নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বললি?'

'শিমূলতলীর মন্দিরে।'

'আহা—বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।'—বুড়ির জড়ানো অস্পষ্ট আওয়াজ যেন খুশিতে দুলে উঠল একবার: 'আহা, কতদিন মাকে দশ্শন করিনি।'

এখনই যেন কত দর্শন করতে পারবে! চোখের মাথা তো খুইয়ে রেখেছে।—কথাটা মুখে এলেও সুদাম বলল না। বরং তার মনে হল, দর্শনের ব্যবস্থাটা পাকাপাকিই করে দিচ্ছি এবার। আমার ঘাড় থেকে নেমে সেখানে গিয়েই বাস্তু বাঁধো এখন।

মেঘে আধখানা আকাশ ঢাকা, চাঁদের ভাঙা টুকরোটা তাই ভেতর থেকে ফুটতে পারছিল না। সারা গ্রাম মাঝরাতেই ঘুমে নিথর। একটু হাওয়া নেই, একটা পাতা নড়ছে না, একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও। মেঠো শামুকের মতো রঙ নিয়ে ক্যানালের গিরি-মাটি জল ভাঁটার টানে নদীর দিকে ছুটেছে। বুড়িকে নৌকোয় তুলে সুদাম স্রোতে ভেসে পড়ল।

সেই থেকে বুড়ি নিশ্চুপ। যেখানে বসিয়েছিল, সেইখানেই হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে একটা তামাকের ময়লা পুঁটলির মতো পড়ে আছে। আবার স্বপ্ন দেখছে হয়তো। অনেককাল আগেকার মরে-যাওয়া মানুষগুলো এখন একে একে সার দিয়ে তার মনের সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছে। একটু পরেই হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে: 'কে যায়, কে যায় ওখান দিয়ে? আজ কি তোরা আমাকে এক মুঠো খেতে দিবি নে?'

চাঁদটা উঠতে চেষ্টা করছে, উঠতে পারছে না, আশেপাশে, দূরে, অনেক দূরে—একটা আলোও জ্বলছে না—কার দায় পড়েছে আলো জ্বালবার, কেরোসিন তেল কি এতই সস্তা? জোনাকি ঝিলমিল করছে ঝোপ-জঙ্গলে, কিন্তু জোনাকির আলোয় কেউ কিছু দেখতে পায় না, জোনাকিরা কারো সাক্ষী থাকে না। এই ভালো। আজ এই অন্ধকারটাই সুদামের দরকার।

নৌকো নদীতে এসে পড়ল। ভাঁটার ডাক উঠেছে জলে। এতক্ষণ গুমোট ছিল, এবারে হঠাৎ খানিকটা হাওয়া যেন হা-হা করে উঠল। ডিঙিটা দুলতে লাগল অল্প অল্প, ফিকে সাদাটে জল চিক চিক করতে লাগল।

সুদাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলে চারদিক। না—কোথাও কেউ নেই। দু মাইল দূরে বাঁকের মুখে গঞ্জে এক-আধটা আলোর বিন্দু—দেখা যায় কি যায় না। এদিকে অন্ধকারে সাদ্রাটে রঙের প্রকাণ্ড নদীটা ধূ-ধূ করছে—বাতাসে হা-হা করছে। আজ রাতে সুদামের এইটেই দরকার ছিল।

মনে মনে সে হিসেব করেই রেখেছে। চার-পাঁচ ঘণ্টা ভাঁটা আছে এখনো। একটা চড়ায় পৌঁছুতে কতক্ষণই বা। বুড়িকে তার ওপর নামিয়ে দিয়ে নিঃসাড়ে ফিরে আসা। তারপরে জোয়ার আসবে। তারও পরে—

বোঠে টানতে টানতে সুদাম যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে চাইল ঃ কাজটা অন্যায়? কিন্তু কেন অন্যায়? মরবার সময় হলেও যে মরে না—সম্পূর্ণ অকারণে যে জ্যান্ত মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়—এ ছাড়া আর কী করা-যেতে পারে তার জন্যে? সুদাম জানে, সরকারী চাকরিরও একটা মেযাদ আছে; সময় হলেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে—সে তুমি হাকিমই হও আর পেয়াদাই হও। তেমনি বেঁচে থাকারও একটা সীমা থাকা দরকার—তারপরে তুমি আর কেউ নও, কোথাও তোমার আর দরকার নেই।

'সুদাম—সুদাম!'

সুদাম চমকে উঠল। প্রথমটা শুনতে পায়নি, কিন্তু শব্দটা এত অস্বাভাবিক, নদীর একটানা কলধ্বনির ভেতরে এমনই বেসুরো যে হঠাৎ যেন ওটা তার কানে গিয়ে ঘা মারল, হাত কেঁপে উঠল তার।

বুড়ি তাকে ডাকছিল।

ডাকছিল তার কাছ থেকে দু হাত দূরে বসেই। অথচ সুদামের মনে হল যেন আধ মাইলের ওপার থেকে ডাকটা তার কানে আসছে।

সুদাম বললে, 'হাঁ গা, বলছ কিছু?'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি—হাঁ রে সুদাম?'

'বললুম না, শিমুলতলীর মন্দিরে?'

'ঠিক, শিমুলতলীর মন্দিরে।'—বুড়ি বিড় বিড় করতে লাগল ঃ 'কতদিন মাকে দশ্‌শন করিনি। কিন্তু—আচ্ছা সুদাম!'

'আবার কী হল?'

'বড়ো গাঙের মতো আওয়াজ পাই যেন! গায়ে ঠাণ্ডা লাগে যেন! ও সুদাম!'

'কী বাজে বকছ?'—সুদাম বিরক্ত হয় ঃ 'একটু চুপ করে বসে থাকো দিকিনি।'

বুড়ি চুপ করে। হাঁটুর ভেতর মাথাটা গুঁজে দিয়ে আবার তলিয়ে যায় সেই না-জাগার স্বপ্নের ভেতরে। সুদাম আস্তে আস্তে দাঁড় বাইতে বাইতে সেই স্বপ্নগুলোর কথা ভাবতে চেষ্টা করে। কারা বেঁচে ছিল অনেকদিন আগে, এখন আর নেই। কিন্তু বুড়ির মনের সামনে তারা এখনো আসে যায়, কেউ এই মাত্তর ধান কেটে ফিরল মাঠ থেকে; কেউ কলমী শাক তুলছে একটা পুরনো পুকুর থেকে, নতুন জলে ভরা বর্ষার নদীতে কারা যেন নাইতে এসেছে দুপুরবেলা—নাকে নোলক আর ধানী রঙের শাড়ি পরে একটি নতুন বৌ

এসেছে তাদের সঙ্গে—বুড়িই হয়তো। কে যেন নতুন বৌটার হাতে রাঙা রাঙা কাচের চুড়ি পরিয়ে দিতে দিতে বলছে, 'হাট থেকে অনেক খুঁজে নিয়ে এলুম তোর জন্যে—এমন হাতে এ চুড়ি না হলে কি মানায়!'

সুদামের হঠাৎ হাসি পায়। দুত্তোর, তাকেও তো আচ্ছা পাগলামিতে ধরল! বুড়ির মতো সেও কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে!

যে হাওয়াটা উঠে এসেছিল, আবার থেমে গেছে সেটা। নদীতে ঢেউ আছে কি নেই—শুধু ভাঁটার জলের কলকল ডাক শোনা যায়। চোখে পড়ে—অনেক দূরে উত্তরের আকাশটা এক-একবার লালচে হয়ে উঠেই আবার ঢেকে যাচ্ছে কালচে ছাইয়ের রঙে। ঈস্—এই রাত্তিরে আবার কার সুখের ঘরে আগুন লাগল হে!

'সুদাম!'—বুড়িটা নড়ে উঠল।

'কী হল তোমার?'

'আমার শীত করে।'

'শীত কোথায় এখন এই চত্তির মাসের রাত্তিরে? তোমার যত বাজে কথা।'

'আমার শীত করে সুদাম।'

ভালো জ্বালা। সুদাম বিরক্ত হল। বোঠে ছেড়ে দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল বুড়ির দিকে, গিঁট বাঁধা ছেঁড়া আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে দিলে তার গায়ে। কিন্তু জড়াতে গিয়ে কি করে ফেঁসে গেল অনেকখানি। বুড়িব কাপড়টায় আর পদার্থ নেই, পচে গলে শেষ হয়ে গেছে একেবারে। কতদিন যে বুড়িকে কাপড় কিনে দেয়নি সুদাম, তা মনে করতে পারল না।

'সুদাম, আমার শীত যায় না।'

বুড়িকে নদীর চড়ায় নামিয়ে দিতে চলেছে বলে নয়, কতদিন—কতকাল তাকে একখানা কাপড় কিনে দেয়নি—হঠাৎ সেই কথাটা মনে হওয়ায় সুদামের নিজেকে কেমন অপরাধী বলে বোধ হয়। হতে পারে কাপড়ের অনেক দাম, কিন্তু—

'সুদাম, ভারী শীত লাগে আমার।'

অপরাধ-বোধটা তীব্র বিরক্তির ভেতরে বাঁক ঘুরল। 'তোমার শীত কোনোদিন আর যাবেও না'—মনে মনে দাঁত খিঁচোয় সুদাম। কোমরে বাঁধা বড় নতুন গামছাটা খুলে বুড়ির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নাও—হল এবার?'

হল কিনা কে জানে, বুড়ি চুপ করল। আবার সেই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে চুপ করে বসে থাকা। সুদাম বিড়ি ধরালো একটা। দেশলাইয়ের একটুখানি আলোতে হঠাৎ কেমন একটা চমক লাগল তার। লাল গামছায় জড়ানো বুড়িটাকে একবারের জন্যে লাল শাড়িপরা ভারী ছেলেমানুষ একটা বৌয়ের মতো মনে হল। সুদামের মা বলত, বয়েসকালে নাকি বুড়ির চেহারা খুব সুন্দর ছিল।

সে কতকাল আগে, কে জানে! সুদাম অবশ্য সে-রকম কোনো চেহারা দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। ছেলেবেলা থেকেই দেখছে পাকধরা চুল, শুকনো মুখ, রোগা-রোগা হাত-পা নিয়ে হয় ধানসিদ্ধ করছে, নইলে গোরুর জন্যে জাবনা কাটছে, আর নয়তো দাওয়ায় মাটি লেপছে। অল্প বয়সে লাল শাড়ি পরলে তাকে কেমন লাগত সে আছে বুড়ির স্বপ্নের ভেতর, সুদাম তা দেখতে পাচ্ছে না।

'অ সুদাম!'

'আবার কী?'

'বৌয়ের গলা শুনি নে কেন?' সে কোথায়?'

সুদাম ঝপাং করে জলে বোঠে ফেলল।

'কেন—তাকে কী দরকার আবার?'

'বাড়ি যে নিঝুম মেরে রয়েছে। সে গেল কোথায়?'

'কী জ্বালা! তোমাকে যে শিমুলতলীর মন্দিরে নিয়ে চলেছি। নৌকো করে যাচ্ছি যে। বৌ তো সঙ্গে আসেনি।'

বুড়ি মাথা তুলল। মাথাটা নড়তে লাগল থর-থর করে। বেশ জেগে উঠেছে এখন।

'বৌ কেন এল না সুদাম?'

'তার ঘর-সংসার আছে না? সব ফেলে সে কি বেরুতে পারে সব সময়?' —মিথ্যে কথার জের টানতে সুদামের খারাপ লাগছিল ঃ 'তোমার অনেক দিনের শখ, তাই নিয়ে এলুম।'

'তবু নিয়ে আসতে হত।'—যেন পলকা একটা সুতোয় বাঁধা রয়েছে এইভাবে বুড়ির মাথাটা নড়-নড় করতে লাগল ঃ 'বৌ মানুষ, মায়ের পূজো দিলে সোয়ামী-পুত্তুরের মঙ্গল হয়।' 'আর মঙ্গলে দরকার নেই, বেশ হয়েছে,'—সুদাম আস্তে আস্তে বললে। বুড়ি শুনতে পেল না।

নৌকোটা প্রায় নিঃশব্দে ছুটছে ভাঁটার টানে। সুদাম চোখ ছড়িয়ে দিলে অন্ধকার-ছড়ানো ধূ-ধূ নদীটার সাদাটে জলের ওপর। ভালো করে কিছু বোঝা যায় না—কিন্তু সুদামের সব চেনা, পুরো আন্দাজ আছে তার। আর বেশি দেরি নেই, যে চড়াটার কথা ভেবেছে, সেটা প্রায় এসে পড়ল বলে।

বিড়িতে একটা শেষ টান দিতে গিয়ে গলায় লাগল। খকখক করে কাশি এল খানিকটা।

বুড়ির বোধ হয় আবার ঝিম আসছিল, জেগে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'অ সুদাম!'

বাঁ হাতের তেলোয় মুখটা মুছে ফেলে সুদাম বললে, 'কী বলছ আবার?'

'তোর ভারী কাশি হয়েছে—না?'

'না, কিচ্ছু হয়নি।'

'হয়েছে বইকি, কাশছিস বলে মনে হল যে! 'চোখে তো দেখতে পাই নে দাদা, একটু কাছে সরে আয় দিকি, তোর বুকে একটু হাত বুলিয়ে দিই।'

'দরকার নেই, আমি বেশ আছি।'—সুদামের খুব খারাপ লাগল। বুড়িটা বুঝতে পেরেছে? তাই কি মায়া বাড়াতে চায়?

বুড়ি একটু চুপ করে রইল। তারপর ভাঙা গলায় বললে, 'তুই জানিস?'

'কী জানব আবার?'

'ঠিক কথা—তুই কী করে জানবি! তুই তখনো হোসইনি। তোর বাপের বুকে সেবার সর্দি বসে খুব কাশি হয়েছিল। আমাকে বলত, মাসী, তুমি আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই আমার সব কষ্ট চলে যাবে।'—বলতে বলতে গলা জড়িয়ে গেল, খেই হারিয়ে গেল কথার, অনেকগুলো ছায়ার মিছিল এল চোখের সামনে ঃ 'কী বিষ্টি—কী

বিষ্টি সেবার! দশদিন ধরে একনাগাড়ে চলেছে,—থামেই না। মাঠ-ঘাট-পুকুর সব ভেসে গিয়েছিল। উঠোনে উঠে এসেছিল কী বড় বড় সব কই মাছ—তোর বাবা ধরছিল, পেরাণকেষ্ট একটা মস্ত বোয়াল গেঁথে তুলেছিল, ঘরের দাওয়ায় একজোড়া চন্দ্রবোড়া সাপ—'

বুড়ির কথাগুলো আবছা হতে হতে স্বপ্নের ভেতর মিশে গেল। শুনতে শুনতে এক-বারের জন্য অন্যমনস্ক হল সুদাম। সেও হয়তো এমনি করে বুড়ো হয়ে অনেক—অনেক দিন, যতদিন তার বেঁচে থাকা ভালো—তারও চেয়ে ঢের বেশিদিন এই বুড়িটার মতো বেঁচে থাকবে! সেদিন তারও চোখ এমনি করে বাইরের জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়ে ভেতরে তলিয়ে যেতে থাকবে—এমনিভাবেই আজকের চেনা মানুষ, চেনা দিনগুলো ছাড়া-ছাড়া, ছবি-ছবি হয়ে, আর—

আর সেদিনও কি তার ছেলে, কিংবা তার নাতি—মাঝরাতে তাকে এমনি করে নৌকোয় তুলে নিয়ে—দুত্তোর!

কী আজেবাজে ভাবনা হে! না, এমন করে বেঁচে থাকা তাদের বংশে নেই। তার বাপ মরেছিল ষাটের ঘরে, তখনো ভারী জোয়ান ছিল সে, জ্বরে পড়বার দিনও সে সারাটা সকাল মাঠে লাঙল দিয়েছিল। সুদামের বেশ মনে আছে, বাড়িতে মা সেদিন বড় বড় লাল ধেনো কাঁকড়ার ঝোল রেঁধেছিল। মাঠ থেকে ফিরে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে শুতে শুতে বাবা বলেছিল, 'আজ আর কিছুটি খাব না সুদামের মা, শরীলটা যেন কেমন-কেমন লাগছে।' মা'র বয়েস কত হয়েছিল? সুদাম জানে না। কিন্তু বাবা চলে যাওয়ার পর তিনটে বচ্ছরও সে রইল না। বড় ভালোবাসত বাবাকে।

ক্যাঁও—ক্যাঁও—ক্যাঁও—

সুদাম চমকে উঠল। কী বেয়াক্কেলে একটা বিচ্ছিরি পাখি হে! এই মাঝরাত্তিরে বাজখাঁই গলায় ডাকতে ডাকতে চলেছে, বুকের ভেতরটা যেন কাঁপিয়ে দিলে একেবারে! এতবড় নদীটা পড়েই রয়েছে দু ধারে, ঠিক মাথার ওপর দিয়েই ডাকতে ডাকতে না গেলেই আর চলছিল না?

চমকে উঠল বুড়িও।

'অ সুদাম!'

'শুনছি, বলো।'

'তোর ছেলে কাঁদে কেন?'

'আমার ছেলে নয়। ওটা পাখি।'

'না, লুকোচ্ছিস আমায়। চোখে তো কিছু দেখতে পাই নে, তাই মিথ্যে করে বলছিস। কী হয়েছে ছেলের?'

'আচ্ছা জ্বালা তো। এই নৌকোয় ছেলে আসবে কোত্থেকে? বললুম না—ওটা পাখি?'

'নৌকো কেন সুদাম? তুই আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?'

'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না দিদিমা। বার বার করেই তো বলছি—তোমায় নিয়ে যাচ্ছি শিমুলতলীর বিশালাক্ষীর মন্দিরে।'

'হুঁ, মায়ের মন্দির। কতদিন বৌকে বলেছি, একবার নিয়ে চল্। বৌ বলে, এই শরীল্ নিয়ে তুমি যাবে কোথায়? আমি বলি, বৌ—আমার দিন তো ফুরিয়ে এল, যা হোক করে

নিয়ে চল্—শেষবার মায়ের পায়ে একটা পেন্নাম করে আসি।'

বোঠেটা একবারের জন্যে সুদামের হাতে আটকে গেল। বুড়িটাও তা হলে মরণের কথা ভাবে। ঠিক এই সময়, এই কথাটা শোনবার জন্যে সুদাম তৈরী ছিল না।

সেই বিড়িটার ধোঁয়া কী করে যেন গলায় আটকে আছে এখনো। আবার খানিকটা কাশি এল।

'তুই কাশছিস সুদাম।'

'না গো, ও কিছু নয়।'

'খুব পুরোনো ঘি আছে আমার কাছে। তোর ঠাকুর্দার ঠেঁয়ে চেয়ে নিয়েছিলুম। তোর বুকে একটু মালিশ করে দেব।'

আবার মায়া বাড়াচ্ছে বুড়িটা—সুদামের ভয়ঙ্কর খারাপ লাগল। কী একটা যন্ত্রণার মতো চমকে গেল মনের ভেতর, বুড়ির ওপরে খানিকটা প্রবল বিদ্বেষ অনুভব করল সুদাম।

'আমার কিচ্ছু দরকার নেই—আমি বেশ আছি।'

কিন্তু মরণের ভাবনা বুড়িকে পেয়ে বসেছিল। এমনি করেই এক-একটা ভাবনার ঘোর ওর আসে। মরণের কথাটা মনে হলেই যেন এতদিনের জীবনটাতে যত মৃত্যু সে দেখেছে, সবাই—সবগুলো,—ছবির মতো ভিড় করে আসতে থাকে তার নেবা চোখের সামনে।

'তোর দাদামশাই হঠাৎ মরে গেল। বেশ বসে ছিল দাওয়ায়—কী যে হল, বললে, বুকটায় বড্ড ব্যথা করছে। কবিরাজ এল, কিছুই করতে পারল না। আগের দিন নতুন কাপড় কিনে এনেছিল, সেইটে দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখল ছাতিমগাছটার তলায়। সুদাম, আমিও একদিন—'

চড়ায় নৌকো ভেড়াল সুদাম। চাঁদ এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। লালচে আলোয় নদীর জলে কচি বাদামপাতার রঙ লেগেছে মনে হয়। চড়াটা পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা বোয়াল মাছের সাদা পেটের মতো।

বুড়ি বললে, 'সুদাম, আমিও একদিন অমনি করে মরে যাবো। একটা কথাও বলতে পারব না হয়তো। তা ছাড়া সবই তো ভুলে যাই। সুদাম, আমার বালিশটার ভেতরে দু কুড়ি রুপোর টাকা লুকোনো রয়েছে। মনে করে বার করে নিস কিন্তু। আর পারিস তো —আমাকে একখানা নতুন কাপড় দিয়ে—'

দাঁতে দাঁত চাপল সুদাম। বোঠে রেখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'দিদিমা, এসে গিয়েছি।'

কিছু না—কিছু না। ঘণ্টা দুই আরো বুড়িকে বসে থাকতে হবে ভিজে চড়াটার ওপর। তারপরে জোয়ার আসবে। তারও পরে আর কিছুই নেই।

তুলসীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—গাঁয়ের লোকেও জানতে চাইবে। কিন্তু কী জানে সুদাম? হয়তো দোর খুলে রেখেছিল, শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে: হয়তো অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর উঠোন ডিঙিয়ে কোনো সময় খালে গিয়ে পড়েছে। সারাদিন খেটেখুটে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সুদাম, এ সব কিছুই তার জানবার কথা নয়। সে তো আর রাত জেগে বসে চৌকি দিতে পারে না।

বুড়ি মরার কথা ভাবছিল। আবার কী একটা যন্ত্রণার মতো চমকে গেল সুদামের মাথার ভেতর দিয়ে। এত দিন তো কেটেছে—না হয় যেতই আরো ক'টা দিন। বুড়ি, নিজেই হয়তো—

লগি দিয়ে নৌকোটাকে সরিয়ে আনতে আনতে সুদাম নিজের বিরুদ্ধেই প্রাণপণে মাথা নাড়ল। না—মরবে না। ওই ভুষুণ্ডী কাগের মরণ নেই। তার ভিটের সব মানুষগুলোকে খেয়ে শেষ করবার পরে পোড়ো পোতার ওপর বুনো ওল, আকন্দ আর বিছুটি বনের মধ্যে ধূমাবতীর মতো লক্‌লকে জিভ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকবে বুড়িটা—তার পাটের মতো চুলগুলোর ভেতরে খেলে বেড়াবে লাউডগা সাপ—

চড়ার দিকে কি রকম একটা আওয়াজ এল কানে। সুদাম ফিরে তাকালো। ভিজে বালির ওপর হাঁটুর ভেতরে মাথা গুঁজে বসে আছে বুড়িটা। জবুথবু ভাঙা চাঁদটা লালচে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো। সেই আলোয় লাল গামছা জড়ানো বুড়িকে ঠিক নতুন কনে-বৌয়ের মতো মনে হল।

আরে—চড়ার দিকে পোড়া কাঠের মতো ভেসে যাচ্ছে কী ওটা? তারই তো আওয়াজ পেয়েছিল সুদাম! মরা জ্যোৎস্নায় ওর দুটো চোখ জ্বলছে যে! শালা কুমির! বুড়িকে খেতে যাচ্ছে!

'হেই—হেই—হেই—'

জলের ওপর সজোরে বোঠে আছড়ালো সুদাম। তীরবেগে নৌকো ঘুরোল চড়ার দিকে। চোখের সামনে কুমিরে টেনে নিয়ে যাবে? ব্যাটাচ্ছেলে আর আধ ঘণ্টাও দেরি করতে পারল না?

কুমির ডুব মেরেছিল। সুদাম লাফিয়ে পড়ল চড়ার ওপর।

না, হল না। তুমি খুনী হতে পারো, কিন্তু চোখের সামনে আর একটা খুন সহ্য করবে কী করে?

আবার উজান ঠেলে ঠেলে ফিরে যাওয়া। ক্লান্তি, বিরক্তি আর না-ঘুমোনো রাতের অবসাদে পাড় ঘেঁষে হিংস্রভাবে লগি মেরে এগিয়ে চলল সুদাম। বুড়ি ডিঙির ওপর তেমনি পুঁটলি পাকিয়ে নিথর। হয়তো সব বুঝেছে—হয়তো কিছুই বোঝেনি। হয়তো আবার ওর চোখের সামনে দিয়ে ছায়ার মিছিল চলে যাচ্ছে।

হারামজাদা কুমির! আর আধ ঘণ্টাও দেরি করতে পারল না?

নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে লগি ঠেলতে লাগল সুদাম। তার মনে পড়ল —এই এতক্ষণ ধরে বুড়ি একবারও খেতে চায়নি—একবারও বলেনি—'বৌ খিদেয় যে আমি মরে গেলুম।'

যদি বলত—পরাভূতের সুদামের মনে হল, তা হলে কুমিরটাও কিছু করতে পারত না।

কালপুরুষ

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের বার্ষিক উৎসবের প্রথম পর্যায় শেষ হল। এইবার আরম্ভ হবে আজকের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান 'কালপুরুষ'। কিন্তু তার জন্যে মঞ্চটি তৈরি করে নিতে একটু সময় লাগবে। অতএব সেই অবসরে 'কালপুরুষ' সম্পর্কে দু-একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

আমাদের সম্পাদকের বিবৃতিতে আপনারা শুনেছেন যে, এই নৃত্যের পরিকল্পনা এবং পরিচালনা যাঁর ছিল, সেই সৌম্যেন লাহিড়ী আর আমাদের মধ্যে নেই। একটি পথ-দুর্ঘটনায় শোচনীয়ভাবে তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। আপনারাও এও শুনেছেন যে সেই কারণেই আমাদের এই বার্ষিক উৎসবটি প্রায় দু মাস পিছিয়ে দিতে হয়েছে। সৌম্যেন বেঁচে থাকলে আজ সে-ই এই নৃত্যনাট্যের ভাষ্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করত। কিন্তু সে নেই বলেই তার সহযোগী হিসেবে এই দায়িত্ব আমার ওপরে এসে পড়েছে।

কিন্তু দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ পালন করতে পারব না। কারণ, 'কালপুরুষে'র মধ্য দিয়ে সৌম্যেন ঠিক কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিল, কোন্ সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছিল আমি নিজেও তা সম্পূর্ণ বুঝেছি এ দাবি করতে পারি না। যদি মনে করা যায় যে, আমরা প্রত্যেকে নানা রঙের কাচের আবরণ দিয়ে ঘেরা—তা হলে এই নাটকের যে একটা নিজস্ব আলো আছে, তা আলাদা রঙ নিয়ে আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ এই নাটকের তাৎপর্য একার্থক নয়, তার একটা সার্বজনীন আর স্বীকৃত সীমারেখা নেই, আমরা সবাই নিজেদের মতো করেই একে গ্রহণ বা বর্জন করব। এ যেন সহস্র কোণিক—আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন কোণ থেকে একে দেখব, হয়তো একজনের দেখার সঙ্গে আর একজনের দেখার আদৌ মিল থাকবে না। সুতরাং এই নাটককে আমি কিভাবে বুঝেছি সে আলোচনা এখানে থাক। সৌম্যেন আমাকে যা বলেছিল, তারই প্রতিধ্বনি করে বলছি ঃ আপনাদের নিজস্ব দর্পণগুলোতেই 'কালপুরুষ' তার ভালোমন্দ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হোক।

আর একটি কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখি। এটি মিশ্র-চরিত্রের নাটক। নৃত্যনাট্য আছে, মূকাভিনয়ও আছে। আপনারা দেখবেন—যখন-তখন নাচের তাল কাটবে, বাজনা বেসুরো হয়ে উঠবে, মঞ্চে আলোক-সম্পাতের মধ্যে পুরো শৃঙ্খলা থাকবে না। অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, এগুলো এই নাটকেরই অঙ্গ। সৌম্যেন বলেছিল, সত্য যদি তালকাটা হয়, নাচেও তাল থাকে না; সাইক্লোনের হাওয়া আসে অনিয়মের মতো—বাজনাতেই বা নিয়ম থাকবে কেন? অন্ধকার আর আলো যখন এ-ওকে ছিঁড়ে খেতে থাকে, তখন সেই বিদ্যুৎ চমকানো ঝড়ের অরণ্যকে কোন্ নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? এই কথাগুলো মনে রেখে—দয়া করে অন্তত আপনারা 'লাইট-লাইট' বলে আবেদন জানাবেন না। সব বিশৃঙ্খলার ভেতরেও কোনো শৃঙ্খলা আছে কিনা, নাটক শেষ হলেই তার বিচার করবেন।

আমাদের যে 'সুভ্নির' আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখবেন, 'কালপুরুষ' নাটকের বিষয়টি কী তা কিছুই সেখানে বলা হয়নি। সৌম্যেন বলেছিল, অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে সে নিজেই সেটি আপনাদের কাছে তুলে ধরবে। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য তাব কথা সে আর কোনোদিন বলবে না। তাই অল্প কথায় আমিই

সেটি উপস্থিত করছি। আগেই বলেছি—কোনো ভাষ্য আমি করব না। আমি কেবল বিষয়টি পেশ করছি—আপনারা আপনাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটিকে দেখুন এবং বিচার করুন।

নাটকের সূচনাতেই দেখবেন এর নায়ক—যার নাম জীবন—অথবা নামে কী আসে যায়—আপনারা যা খুশি বলে তাকে ভেবে নিতে পারবেন—সে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। তার পেছনে সবুজ আর সোনালীতে মেশানো একটা পটভূমি, মেঠো বাঁশির মতো একটা অস্পষ্ট সুরে ভরে রেখেছে তাকে। স্বপ্ন দেখছে জীবন। তারপরই আসছে একটি মেয়ে, তার গলায় শিউলি ফুলের মালা; আর একজন এল—তার হাতে নতুন ধানের একটি মঞ্জরী—তার নাচের ছন্দে মনে হবে যেন হেমন্তের ধানের খেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ খেলে খেলে বয়ে যাচ্ছে; তারও পরে আরও একজন—তার পরিচয় আমি দেব না—দেখলেই তাকে চিনতে পারবেন—চিরদিন ধরে আমরা সবাই যাকে আমাদের রক্তের ভেতরে আসতে দেখেছি, যে মানুষের প্রথম ছবিতে রঙ লাগিয়েছে, প্রথম গানে সুর ফুটিয়েছে।

সুরে, আলোয়, অভিনয়ে নাটকের এই অংশটি সম্পূর্ণ রোম্যাণ্টিক। দেখা যাচ্ছে—আমাদের নায়ক ধীরে ধীরে জেগে উঠল। তারপরে তার আনন্দ-নৃত্য। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ক্রমেই একটা লাল আভায় ভরে উঠল আকাশটা—কালো কালো দীর্ঘ ছায়া ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার ভেতরে। মিলিয়ে গেল তিনটি মেয়ে—মনে হল আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে কতগুলো লোহার গরাদ নেমে নেমে এসেছে।

সেই লালচে আলোটা পোড়া ছাইয়ের মতো বিমর্ষ হয়ে গেল—শুধু কয়েকটা আরক্তিম বিন্দু জেগে রইল এখানে ওখানে—যেন নিবে-যাওয়া চিতার কয়েক টুকরো অঙ্গার জ্বলছে এখনো। চিৎকার করে উঠল আমাদের নায়ক। চাবুকের আওয়াজের মতো শিসটানা তীক্ষ্ণ শব্দ উঠতে লাগল থেকে থেকে—চাবুকের মতোই লিকলিক করে যেতে লাগল এক-একটা আলোর বিদ্যুৎ। তারপর শব্দের কতগুলো ঘূর্ণি—কেউ আসছে—কেউ গোঙিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়—কেউ বা কেঁদে উঠল বুক-ফাটা চিৎকারে—কোথায় যেন ডেকে উঠছে একপাল শিকারী কুকুর। তারই মধ্যে দেখতে পাবেন আমাদের নায়ককে—সে মাথা ঠুকছে, আকাশের দিকে হাত তুলে যেন অভিসম্পাত দিচ্ছে কাকে—অমানুষিক বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখ, চাবুকের মতো আলোর প্রত্যেকটা ঝলক যেন মর্মঘাতী আঘাত করছে তাকে, একটু আগেই যে স্বপ্ন দেখছিল তাকে আর আপনারা চিনতে পারছেন না।

এর পরে সম্পূর্ণ অন্ধকার। শুধু সেই শব্দের ঘূর্ণি চলল কিছুক্ষণ। আবার ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে একটা আলোয় মঞ্চটা ভরে উঠল। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নায়ককেই। তার পেছনে এমন একটা পটভূমি—যা অসংলগ্ন-ছায়া ছেঁড়া-ছেঁড়া—আপনারা যে ধরনের স্যুররিয়্যালিস্টিক ছবি দেখে থাকেন, অনেকটা সেই রকম। নায়ককে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন তার দুটো মণিবন্ধে লোহার শেকলের মতো কী দুলছে, তাকে সাপের ছেঁড়া খোলস বলেও ভেবে নিতে পারেন।

সে কিছু একটা খুঁজছে। কী খুঁজছে? কারগার থেকে পালিয়ে এসে কোথাও একটা জায়গা—যেখানে শিউলি ফুলের মালা পরে সেই মেয়েটি আবার এসে দেখা দেবে? সেই

আর একজন বয়ে আনবে একটি পাকা ধানের মঞ্জরী—যাকে ঘিরে ঘিরে ঢেউ দিয়ে যায় শিশির-জড়ানো হেমন্তের হাওয়া? কিংবা সে খুঁজছে চিরকালের সেই তাকে—যে প্রথম ছবি, প্রথম গান—যাকে চিনিয়ে দিতে হয় না—আমাদের রক্তের কণাগুলো চিরদিন ধরে যাকে চিনে আসছে?

একদল মানুষ আসছে এরপর। তাদের জনতা বলতে পারেন, ভিড় ভাবতে পারেন—যা খুশি কল্পনা করতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক এক টুকরো ছেঁড়া সাপের খোলস। আমাদের নায়ককে ঘিরে ঘিরে তাদের নাচ চলবে। নায়ক সেই নাচের তালে দুলে উঠতে গিয়েও পা ফেলতে পারবে না—একটা অদ্ভুত শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায় সে যেন ছিন্ন-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে—তারপরে আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। এইখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন তার মূকাভিনয়।

একটা ঝোড়ো-হাওয়ার পরিবেশ তৈরি করে বেরিয়ে যাবে নাচের দলটা। তাদের হাত দূরের আকাশের দিকে—সেখানে তারা কী যেন দেখছে, কী যেন একটা খুঁজে পেয়েছে। তারা চলে যাবার পর বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ উঠবে কয়েকটা। যেন সমুদ্রের গর্জন দুলে দুলে উঠবে কিছুক্ষণ। তারপর স্তব্ধতা। একটা নিঃসঙ্গ বেহালা কাঁদতে থাকবে একটানা। উঠে দাঁড়াবে আমাদের নায়ক।

তখনো তার পা টলছে। সে কোথায় যেতে চায়—যেতে পারছে না। একবার সামনে এগিয়ে আসবে, একবার পেছনে সরে যাবে; একবার ডাইনে যেতে চাইবে, একবার বাঁয়ের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াবে।

তখন আসবে কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি মূর্তি। তার মুখে দেখা যাবে সাদা দাড়ি—তার চোখের দিকে তাকালে দেখবেন সেখানে যেন অতলান্ত অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

আমাদের নায়ক মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি পথ জানো?'

সে মাথা নেড়ে বলবে, 'জানি।'

'তবে বলে দাও পথের নিশানা।'

সে হাত পেতে বলবে, 'তা হলে দক্ষিণা দাও।'

'আমার তো কিছুই নেই।'

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সে বলবেঃ 'আছে তোমার বুকের ভেতরে।'

আমাদের নায়ক থমকে যাবে প্রথমটায়। তারপর ছিন্ন জামাটিতে হাত পুরে দিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে দেবে একটি শিউলি ফুল।

কালো আলখাল্লায় ঢাকা বুড়ো আর দাঁড়াবে না। ফুলটি প্রায় কেড়ে নিয়ে, পেছনের সেই অবাস্তব—সেই স্যররিয়্যালিস্টিক পটভূমিটির দিকে একবার হাত বাড়িয়ে দিয়েই সে চোরের মতো পালিয়ে যাবে।

সে যেতে না যেতেই আর একজন এসে হাজির হবে। বাজে-পোড়া মাটির মতো তার আলখাল্লার রঙ—যে রঙ দেখলে মনে হবে পৃথিবীর শেষ বিন্দু জলকেও সে শুষে নিয়েছে, তার তৃষ্ণার ঘাসের বীজগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারও মুখে সাদা দাড়ি, তারও চোখ অন্ধকার।

'পথ জানো?'

'জানি।'

'বলে দাও।'

সেও দক্ষিণা চাইবে। নিয়ে যাবে যুবকটির বুকের ভেতর থেকে একটি ধানের শিস। তারপর সেই অসংলগ্ন অবাস্তব—ছেঁড়া-ছেঁড়া পটভূমিটি দেখিয়ে দিয়ে সেও পালিয়ে যাবে।

তৎক্ষণাৎ আসবে তৃতীয় জন। রক্ত জমে এলে যে রঙ ধরে সেই রঙের আলখাল্লা তার। তারও পাকা দাড়ি, কোটরে-ডোবা অদৃশ্য চোখ, শুধু বাড়তির ভেতরে তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি—সে হাসি যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কপট। সেও পথ দেখাতে চাইবে—তারপর হাত বাড়িয়ে বলবে: 'দাও—দাও—'

অনেকক্ষণ দ্বিধা করবে আমাদের নায়ক। এখানেও তার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করবেন আপনারা। একেবারে দেউলে হয়ে যাচ্ছে যেন, হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে সব। বিভ্রান্ত চোখে, মুখের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় তার মনের অসংখ্য ভাঙচুর দেখতে পাবেন আপনারা। শেষে কাঁপা হাতে বুকের ভেতর থেকে সে বার করে আনবে একটি সোনার কৌটো। ঝলমল করে জ্বলতে থাকবে সেটা।

কিসের কৌটো এটা? সৌম্যেন থাকলে বুঝিয়ে বলতে পারত—আমি শুধু অনুমানই করতে পারি, আপনারাও তাই করবেন। হয়তো এ সেই সোনার ঝাঁপিটির প্রতীক—যাব ভেতরে আমরা প্রথম রঙ, প্রথম গান আর প্রথম স্বপ্নকে সঞ্চয় করে রাখি। এই কৌটোটা তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে—যেন শেয়াল ডেকে উঠবে—যেন হা-হা করে শ্মশানের হাওয়া বয়ে যাবে খানিকটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আমাদের নাটকের এই অংশে গ্রীক-পুরাণের একটি গল্পের কথা আপনাদের কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে। সেই রাজপুত্র আর তিন দিশারী শকুনের কাহিনী। আপনারা এও লক্ষ্য করবেন—বুড়োদের আলখাল্লা নাড়বার ভঙ্গিতে খানিকটা ডানা-ঝাপটানোর সাজেন্‌শন আসবে। আমিও সৌম্যেনকে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। সে জবাব দেয়নি, একটু হেসেছিল কেবল। আমাদের সততার যাতে কোনো সংশয় আপনাদের না থাকে, সেই জন্যেই আমি এটুকু আপনাদের জানিয়ে রাখলুম।

এইখানেই আমাদের নাটকের তিন মিনিট বিরতি।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলে দেখা যাবে যেন একটা পাহাড়ের চূড়োয় বসে আছে সে। এখানে একটা পরিচিত বিলিতি অর্কেস্ট্রা থেকে কয়েকটা সুরের টুকরো তুলে নিয়েছি আমরা। সে সুরে মনে হবে—যেন হাজার হাজার বছর আগে যারা মরে গেছে, তাদের স্মৃতি থমকে আছে এখানে. আশপাশে কয়েকটা ক্যাক্‌টাসের আভাস পাবেন আপনারা—আচমকা মনে হবে যেন গভীর কোনো সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনা কতকগুলো শ্যাওলাধরা কঙ্কালের হাত বালি আর পাথরের মধ্যে পুঁতে রেখেছে কেউ; মনে হবে বহুকাল আগে মরে-যাওয়া সাগরের ঢেউ এখনো কেঁদে ফিরছে এই নগ্ন নির্জন বালির ওপর, চারদিকে যে ছাড়া ছাড়া পাথরগুলোকে দেখতে পাবেন—তারা কোন্ আদিম যুগের উল্কা, এইখানে আছড়ে পড়ে নিবে গেছে, কিন্তু তাদের সেই ভয়ঙ্কর জ্বালা এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে এর চারদিকে। মাথার ওপর ধূ ধূ করবে একটা দীপ্ত দীর্ঘ আকাশ—

সমুদ্রের তরঙ্গগুলো উতরোল কান্নায় চোরাবালির মধ্যে ডুবে যাওয়ার পরে যে আকাশে একটি মেঘের বিন্দুও কখনো দেখা দেয়নি।

বিলিতী অর্কেস্ট্রার সঙ্গে কিছু দেশী সুর মিলিয়ে এই পরিবেশটি আমরা তৈরী করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের নায়ক এই চূড়োর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। তারপরেই কী একটা যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করতে থাকবে—তার মুখে আত্মতৃপ্তির একটুকরো হাসি ছিল —ক্রমশ হতাশায় সেটা বিকৃত হয়ে যেতে থাকবে। নিজের বুকে হাত দিয়েই চমকে সরিয়ে নেবে—যেন কতগুলো ভাঙা কাচ ছিল কোথাও—তার আঙুল থেকে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়বে কয়েক ফোঁটা রক্ত।

মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে—আকাশে দু হাত তুলে চিৎকার করে উঠবে, তারপর পাগলের মতো ছুটে নেমে আসবে সে; চোরাবালি তার পা টেনে নিতে চাইবে—শ্যাওলা-ধরা কঙ্কালের হাতের মতো ক্যাক্‌টাসগুলো যেন তাকে আঁকড়ে ধরবে—মনে হবে নিজের সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে চাইছে। বাজনা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে—সব আলো এলোমেলো হয়ে যাবে—যেন সব কিছু দুলছে, টলমল করছে—যেন ভূমিকম্প ঘটে যাচ্ছে—আবার একটা বীভৎস চিৎকার তুলবে নায়ক।

অন্ধকারে ডুবে যাবে মঞ্চ। আলো হলে দেখবেন, আর এক পৃথিবী। পেছনের পটভূমিতে এখানে আমরা কিছু ছায়া ব্যবহার করব। তা দেখে বুঝবেন—কোনো একটা বড় শহর—তার উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা তুলে আছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনার, দেখা যাচ্ছে কারখানার চিমনি। ক্রেন উঠছে নামছে—গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—জাহাজের ভোঁ উঠছে।

এইখানে—কী বলব, কমিক রিলিফ? একটি ছোট মুখোশ-নৃত্য দেখতে পাবেন। দেখবেন নেকড়ে বাঘ হরিণের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইছে গোলাপ হাতে নিয়ে—বুকে ঘড়ি-বাঁধা ভালুক আসছে ঘুরতে ঘুরতে—দেখবেন শেয়াল আর মুরগী এর-ওর গলা জড়িয়ে রসালাপ করছে। কিন্তু এ সবের বিস্তৃত বিবরণ আমি দিতে চাই না—নিজেদের চোখেই দেখবেন আপনারা।

বাজনায় এরপর আপনাদের চেনা সুর শুনতে পাবেন। সে সুরে রক্তে নেশা ধরায়—মনকে মাতাল করে তোলে। আমাদের নায়ক একটি মেয়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে আসবে মঞ্চে। এই নাচটি এতই স্পষ্ট যে, এর কথা আপনাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। মেয়েটির চোখে আগুন, সারা শরীরে লালসার ছন্দ। আমাদের নায়ককে মনে হবে মন্ত্রমুগ্ধ —একটি ক্ষুধিত হায়নার মতো সে মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে—বার বার সাপিনীর মতো পিছলে সরে যাচ্ছে মেয়েটি।

এই উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবে তারা—সেই বাজনাই চলতে থাকবে, তারপর অন্য দিক দিয়ে তারা ফিরে আসবে আবার। কিন্তু এইবারে একটু বিশেষত্ব দেখা যাবে—মেয়েটির মুখ গাঢ় লাল একটা ওড়নায় ঢাকা। ছেলেটি তখন আরো বিহ্বল, আরো অসংযত হয়ে উঠেছে, তার তাল কাটতে থাকবে ঘন ঘন, যেন আকণ্ঠ নেশা করেছে এমনি মনে হবে তাকে। তারপর এক সময়—সম্পূর্ণ পরাভূতের মতো—টলতে টলতে সে মেয়েটির পায়ের কাছে বসে পড়বে।

তখন মুখের ওপর থেকে টকটকে লাল ওড়নাটি সরিয়ে দেবে মেয়েটি। একটু আগেই

একখানা সুন্দর মুখ দেখেছিলেন আপনারা—তার চোখে তখন আগুন খেলছিল। এবার সেখানে দেখবেন একটা অদ্ভুত মুখোশ। কঙ্কালের? ঠিক তা নয়। সে মুখ সাদা মার্বেল পাথরের মতো—তার নাক নেই—চোখ নেই—ঠোঁট নেই—যেন একটা বন্ধ দেওয়ালের মতো; যদি মানুষের শরীর হয়—তার রক্তের শেষ কণাটি পর্যন্ত চুষে নিংড়ে খেয়েছে কেউ, যদি পাথর হয়—সে পাথর চিরকালের মতো মৃত—তার একটি ফাটল দিয়েও একটি জলের বিন্দু কোনোদিন নেমে আসেনি।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে নায়ক—যেন সেও পাথর হয়ে গেছে। চারদিকে উঠতে থাকবে শহরের শব্দ—গাড়ি চলছে, বিমান উড়ছে, ভোঁ বাজছে, ক্রেন ওঠা-নামা করছে। নায়ককে এই অবস্থায় রেখে আমরা মঞ্চ অন্ধকার করে দেব।

এইবারে যা ফুটে উঠবে, তা একটি পোড়ো বাড়ি। আপনারা হানা বাড়িরই সুর শুনতে পাবেন। আলোয় অন্ধকারে দেখা যাবে—কোথাও তার ইট ধসে পড়েছে, কোথাও কালো কালো গর্ত রাক্ষসের করোটির শূন্য চোখের মতো তাকিয়ে আছে, কোথাও মাথা তুলেছে বটের চারা। মঞ্চের পেছন দিয়ে হিস হিস করতে করতে চলে যাবে একটা কালো রঙের প্রকাণ্ড সাপ। হয়তো দু-একবারের জন্য বুকের ভেতরে ছমছম করে উঠবে আপনাদেরও।

এইখানে—যন্ত্রের মতো পা ফেলে ঢুকবে আমাদের নায়ক। তার চলা দেখে মনে হবে —সে মানুষ নয়—যেন একটা 'রোবোট' এগিয়ে আসছে। সে এসে থেমে দাঁড়াবে। তখন সেই হানা বাড়ির একটা অন্ধকার গর্ত থেকে দুটো সার্চলাইটের মতো জ্বলে উঠবে এক-জোড়া চোখ। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না—একটা প্যাঁচার চোখ সে দুটো।

আমাদের নায়ক প্রশ্ন করবে, 'কে তুমি?' উত্তর আসবে প্রতিধ্বনির মতো ঃ 'তুমি।'

'আমি?' 'হাঁ—হাঁ—হাঁ।'—শুধু প্যাঁচা নয়—বাজনার সুরে সুরে সারা বাড়িটা কথা কয়ে উঠবে—সাড়া দেবে প্রত্যেকটা ভাঙা ইট, রাক্ষসের করোটি চোখের মতো প্রত্যেকটা গর্ত-গহ্বর, প্রতিটি অশ্বত্থের চারা। সাপটাও থেমে দাঁড়িয়ে ফণা তুলে হিস্‌হিস্ করে উঠবে।

আমাদের নায়ক শুনবে ঃ 'তুমি—তুমি—তুমি!'

'আমি!'

'তুমিই তো। চিনতে পারছ না নিজেকে? কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছো—ভুলে গেলে সে কথা?'

'কিন্তু—'

'আমি যে তোমারই দর্পণ!'—সার্চলাইটের মতো দুটো চোখের আলো নায়কের পাংশু মুখের ওপর এসে পড়বে—উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠতে থাকবে ঃ 'আমি যে তোমারই দর্পণ—হা-হা-হা।'

হা-হা-হা করে এই হাসির আওয়াজ আকাশ-বাতাস ভরে তুলবে—মনে হবে আপনাদেরও কান সেই শব্দে বধির হয়ে যাচ্ছে! তারপর বেরিয়ে আসবে কতকগুলো ছায়ামূর্তি—তাদের চেনা যাবে না, দেখা যাবে না,—কখনো বোধ হবে কতকগুলো কবন্ধ প্রেত, কখনো মনে হবে কতকগুলো অদ্ভুত জীব—মানুষের আদল আসে অথচ তারা মানুষ নয়; তারা আমাদের নায়ককে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, চলবে এক বেসুরো

খেয়ালি তাণ্ডব—আলোর রঙ বদলাবে ঘন ঘন, বাজনায় কোনো সঙ্গতি থাকবে না।

আমাদের নায়ক হাহাকার করে জিজ্ঞাসা করবেঃ 'কারা—কারা তোমরা?'

তারা সেই তাণ্ডব নাচের তালে-বেতালে সুরে-বেসুরে যেন জবাব দিতে থাকবেঃ 'তুমি—তুমি—তুমি!'

চিৎকার করে বলে উঠবে নায়কঃ 'আমি তোমাদের হত্যা করব—আমি তোমাদের হত্যা করব।'

কোথা থেকে কে একখানা তলোয়ার এগিয়ে দেবে নায়কের হাতে। সে পাগলের মতো আঘাত করতে চাইবে ছায়ামূর্তিগুলোকে। কিন্তু সে আঘাত তাদের কাউকে স্পর্শ করবে না। শূন্যে তলোয়ার ঘুরতে থাকবে—লক্ষ্য খুঁজবে চারদিকে, কিন্তু কাউকে পাবে না—প্রত্যেকটা আঘাত যেন কারা ঘুরিয়ে দেবে তার দিকে—তারই তলোয়ার ঘুরে-ফিরে এসে বার বার তার বুকে-পেটে বিঁধতে থাকবে।

তালে-বেতালে নেচে যাবে ছায়ামূর্তিগুলো। বাজনায় ঝড় চলবে, অসংলগ্ন আলোয় তুফান ছুটবে উথাল-পাথাল। অন্ধকার কোটরের মধ্যে হা-হা করে হাসতে থাকবে প্যাঁচাটা —আর মূর্তিগুলো পরম আনন্দে ঘন ঘন করতালি দিয়ে বলতে থাকবেঃ 'তুমি—তুমি—তুমি!'

সেই তাণ্ডবের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। যখন আলো হয়ে উঠবে, তখন আপনারা শুনতে পাবেন সেই প্রথম বাজনার সুর—যখন তিনটি মেয়ে এসেছিল শিউলি ফুল, ধানের মঞ্জরী আর চির-চেনা প্রাণরহস্যের সেই সোনার কৌটোটি নিয়ে।

কিন্তু এই মিউজিকের কনট্রাস্টে দেখা যাবে আমাদের নায়ক সেই ভাঙা বাড়ির মাটিতেই পড়ে আছে। সেই ছায়ামূর্তিটা নেই, সেই প্যাঁচার চোখও না। শুধু দেখা যাবে—হাতের তলোয়ারখানা তার বুকে বেঁধানো, সে মৃত। শুধু তার মাথার কাছে ফণা ধরে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই সাপটা।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, এই হল আমাদের নাটক 'কালপুরুষে'র বিষয়বস্তু। এ নাটক ট্র্যাজিডি কিংবা কমেডি , রূপক না প্রহসন—তা আমি জানি না, হয়তো সৌম্যেন জানত। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই—তার কথা সে আর বলতে পারল না। বন্ধুগণ, আমার কখনো কখনো সন্দেহ জাগে, এ নাটক কি তারই আত্মকাহিনী? কিংবা তার মতো আরো অনেকের—যাদের আমরা চিনি, যাদের আমরা চিনি না?

কিন্তু আগেই বলেছি—আমি এর কোনো ভাষ্য করব না। একে যদি সহস্রকোণিক বলে ভাবি—তা হলে বিভিন্ন কোণ থেকে এ আপনাদের মনে প্রতিফলিত হোক, আপনাবা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এর তাৎপর্য গ্রহণ করুন।

আমি আপনাদের অনেকখানি সময় নিয়েছি—সেজন্য আমাকে মার্জনা করুন। কিন্তু আমাদের মঞ্চ এবং শিল্পীরা প্রস্তুত—এখুনি অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

নমস্কার।

গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

নারায়ণ গল্পসমগ্র

প্রথম খণ্ডের সূচী